ইসলামে পারিবারিক কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(FAMILY WELFARE AND FAMILY PLANNING IN ISLAM: BANGLADESH PERSPECTIVE)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো: মাসুদ আলম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজি: নং-১৮৫/২০১১-১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগষ্ট - ২০১৪

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"ইসলামে পারিবারিক কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" (FAMILY WELFARE AND FAMILY PLANNING IN ISLAM: BANGLADESH PERSPECTIVE)** শীর্ষক থিসিসটি আমাদের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য সন্তোষজনক। আমরা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ মাসুদ আলম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"ইসলামে পারিবারিক কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** (**FAMILY WELFARE AND FAMILY PLANNING IN ISLAM: BANGLADESH PERSPECTIVE**) শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য প্রণীত এই অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. মোঃ মাসুদ আলম, সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এই মৌলিক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি এটি বা এর অংশ বিশেষ ডিগ্রি লাভ কিংবা প্রকাশনার জন্য কোথাও উপস্থাপন করিনি।

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি: ও শিক্ষাবর্ষ: ১৮৫/২০১১-১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ইসলামে পারিবারিক কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" (**FAMILY WELFARE AND FAMILY PLANNING IN ISLAM: BANGLADESH PERSPECTIVE**) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি প্রথমেই আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি। যিনি এ গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে আমাকে তাওফিক দান করেছেন। অত:পর দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদ আলম-** এর প্রতি একান্ত কতৃজ্ঞ। কেননা, তাঁরা আমার জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুধু আজ কেন, কোন দিনই তাঁদের এ ঋণ আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই ড. মুহাম্মদ রাইছ উদ্দিন ভূঞা, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইন্সটিটিউট, যিনি গবেষণা কাজে আমাকে সীমাহীন প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে আমার থিসিসটি অদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, এ জন্যে তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। আমার বহুদিনের কর্মস্থল সলিমউদ্দিন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ-এর সুযোগ্য অধ্যক্ষ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর মালুম-এর নিকটও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ কারণে যে, তিনি অনেক সময় আমাকে এ গবেষণা কর্মে সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও স্নেহাস্পদ মাওলানা আব্দুল বাছীর আমাকে এ ব্যাপারে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

দেশ-বিদেশের অনেক সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সহানুভূতি পেয়েছি সে কথাও আজ অতীব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। নানা অন্তরায় ও প্রতিকুলতার মাঝে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার সহধর্মীনী রাশিদা আক্তার যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছে তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেরা আমাকে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ।

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবর্ণায়ন
আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

اـ আ	ق - ক	او - উ
ب - ব	ك -ক	و -ওয়া
ت - ত	ل - ল	و -বি, ভি
ث - স	م - ম	وى - বী,
ج - জ	ن - ন	و - উ
ح - হ	و -ব, ও, ভ	وو - ঊ
خ - খ	ه - হ	ي -য়্যা
د -দ	ء - ’	يا - য়্যা
ذ - য	ي -য়	ى - ইউ
ر - র	া	يو - ইউ
ز - য	ি	ع - ‘আ
س - স	- ু	عا - ‘আ
ش - শ	- া	ع - ‘ই
ص - স	ي-ী	عى -‘ঈ
ض - য	- ু	ع- উ
ط - ত	اـ আ	عو - ‘ঊ
ظ - য	اـ আ	
ع - ‘	اـ ই	
غ- গ	اى -ঈ	
ف - ফ	ا - উ	

ع= সাকিন হলে ‘ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা نعت= নাত।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচি

‘আইনী	ঃ	বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্‌ন আহমদ ইবন মূসা ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ‘আইনী
আবূ জা’ফর আত-তাহাভী	ঃ	আবূ জা’ফর আত্-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস
আল-ইবার	ঃ	কিতাবুল ইবার
ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী	ঃ	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শফি‘ঈ ওরফে হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী
খাতিব	ঃ	হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী ওরফে আল-খাতীব আল-বাগদাদী
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
খ.	ঃ	খন্ড
খৃ.	ঃ	খৃষ্টীয় সন
ড.	ঃ	ডক্টর
ডা.	ঃ	ডাক্তার
তা. বি	ঃ	তারিখ বিহীন
দ্র.	ঃ	দ্রষ্টব্য
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
যারকানী	ঃ	মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ যারকানী
রা.	ঃ	রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বা আনহা
সা.	ঃ	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	ঃ	‘আলাহি ওয়া সাল্লাম
সং	ঃ	সংস্করণ
সুয়ূতী	ঃ	হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী
ইব্‌ন কাসীর	ঃ	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন শায়খ আবূ হাফয শিহাবুদ্দীন ওরফে হাফিয ইব্‌ন কাসীর
হি.	ঃ	হিজরী সন
বা.	ঃ	বাংলা সন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পরিবার মানব সমাজের মৌল ভিত্তি। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। যদি পারিবারিক জীবন অসুস্থ ও নড়বড়ে হয়, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তিও উপদ্রব সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ কারণে সমাজবিজ্ঞানীরা পারিবারিক জীবনের সুস্থতা ও সুষ্ঠুতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই। কিন্তু কাঙ্খিত এই সুস্থতা ও সুষ্ঠুতা আসবে কিভাবে? এ ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানীরা কোন যুক্তিযুক্ত, সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করলেও সুখী সুন্দর পরিবার ও কল্যাণমূলক পারিবারিক জীবন গঠনের স্বপ্ন কার্যত স্বপ্নই থেকে গেছে বিশ্বের মানব সমাজের এক বিশাল অংশে।

ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র কল্যাণময় জীবন বিধান। জীবনের অন্য সকল দিকের ন্যায় কল্যাণমূলক পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একজন পুরুষ ও একজন নারী কিভাবে দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ দেখা দিলে কিভাবে তার নিষ্পত্তি করবে ইত্যকার সকল বিষয়ই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত ধর্মের অনুশাসন বাস্তবায়নের যে সকল ক্ষেত্র রয়েছে, পরিবার হচ্ছে এর অন্যতম অধ্যায়। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত সমূহে পরিবার গঠন ও পারিবারিক কল্যাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং সেই দুইজন থেকেই (বিশ্বময়) ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল পুরুষ ও নারী"। (আল-কুর'আন, ৪:১)

অন্যত্র আরো বলেছেন, "তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরুপভাবে জন্তু জানোয়ারের মধ্যেও তাদেরই স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন'। (আল-কুর'আন, ২৬:১১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "তিনিই আল্লাহ তিনিই তোমাদেরকে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই স্বজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পার"। (আল-কুর'আন, ৭:১৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত আয়াতসমূহ প্রমাণ করছে যে, মানবতার জয়যাত্রা এ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল একজন মাত্র মানুষ দিয়ে। পরে তারই অংশ থেকে তার জুড়ি (স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এ দু'জনের পারস্পরিক ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধিসম্মত পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতি হিসেবেই দুনিয়ায় এত অসংখ্য পুরুষ ও নারী অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি ও বংশধারার স্থায়িত্ব।

কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব জগতে প্রজাতি রক্ষার জন্য সে স্বভাবগত আবেগ সংরক্ষিত, তার তুলনায় মানবীয় যৌন তাগীদের (Urge) সাথে বংশ রক্ষা ছাড়া আরো অনেকগুলো দিক এমন সংশ্লিষ্ট রয়েছে যা জীবনেরও দুটি পর্যায়ে (উদ্ভিদ ও জীবজন্তু) সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। উদ্ভিদ ও জীবজগতের পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন মিলনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা কিন্তু মানুষের দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক যৌন মিলনের উক্ত নিম্নতার লক্ষ্যকে অতিক্রম করে অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে। অন্যদিকে যৌন আবেগের ভিন্নতর এক দাবির দিকে ইঙ্গিত করছে। আর তা হচ্ছে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি লাভ। এটা নিছক দেহ কেন্দ্রিক (Biological) শান্তি-স্বস্তি-তৃপ্তি নয়। বরং সে শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর সুক্ষ্ম, মানসিক ও আবেগগত ব্যাপার। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে, সংঘবদ্ধতা সাহচর্য-সহৃদয়তা-সহানুভূতি-অনুকম্পার উদগ্র পিপাসা নিহিত উক্ত পরিতৃপ্তি-শান্তি-স্বস্তি তারই জবাব, তারই পরিপূরক। এক্ষেত্রে পুরুষ যেমন বিশেষভাবে নারীর মুখাপেক্ষী, সেই পুরুষের প্রতি নারীর মুখাপেক্ষীতাও বিন্দুমাত্র সামান্য নয়। তবে পুরুষের মুখাপেক্ষিতা অধিক তীব্র।

শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি এ উদগ্র কামনা স্থায়ী বন্ধন জনিত সাহচর্যের আকাংক্ষী, শুধু সাহচর্যই তো নয়, তারজন্য প্রয়োজন প্রেম ভালবাসাপূণ সংস্পর্শ। উভয় লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক অভ্যন্ত আন্তরিক ও আগ্রহপূর্ণ হতে হবে। এমন সম্পর্ক দু'জনের মধ্যে থাকতে হবে, যার ফলে উভয়ই উভয়ের জন্যে সর্বদিক দিয়ে পরিপূরক হতে পারবে। একজনের অসম্পূর্ণতা অন্যজনে পূরণ করবে, অন্যজন অপরজনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলবে। উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে এক স্থায়ী নৈকট্য একমুখিতা একাত্মতা। উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হবে এক পরম গভীর, নিবিড়, সৌহৃদ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক। মানুষের দুই লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করার মূলে যে রহস্য, তা এখানেই নিহিত।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে পরিবারের গুরুত্ব কতখানি তা উপরিউক্ত বিশ্লেষণে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। অতএব, এ পরিবার গঠন চরিতার্থতার জন্য সুষ্ঠু-বিশুদ্ধ-পবিত্র প্রবাহপথ অবাধ ও উন্মুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় এ বিবাহ বন্ধনের বা পরিবার গঠনের এ পবিত্র পথ

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্ধ হয়ে গেলে এ উৎস থেকেই মানব সমাজের যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে, তা অত্যন্ত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পথে প্রবাহিত হতে থাকবে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে এবং গোটা সমাজ সংস্থা ভেঙ্গে পড়বে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও তাতে সন্দেহের অবকাশ খুব সামান্যই থাকতে পারে।

দূর্ভাগ্যবশত পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ জীবন আচরণে ইসলামের সেই নির্দেশনা যথাযথ অনুসৃত না হওয়ায় আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজই ভুগছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে। আর সে ব্যাধির প্রকোপে দিশেহারা হয়ে তারা এর নিরাময় খুঁজছে অধিকতর ব্যাধিগ্রস্থ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার কাছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে মুসলিম দেশ ও সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম নীতিকে ভঙ্গ করে পর্দাহীনতা ও নগ্নতার সয়লাব বইয়ে দেয়া হয়। আর তারই প্রচন্ড আঘাতে মুসলিম দেশ সমূহেও পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছে, কিংবা তাদের টেনে বাইরে নিয়ে এসে পুরুষদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে ইউরোপে যে ব্যাপক নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, প্রাচ্যেও অনুরূপ কাজে একই পরিণতিই দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবে। আজ আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত অথচ মুসলমানদের পরিবার ছিল এক–একটি দুর্গ। আর পারিবারিক জীবন পবিত্র প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা এবং পরম শান্তি ও স্বস্তির কেন্দ্রবিন্দুর সে শুভ ও কল্যাণময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং সুষ্ঠু পরিবার ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবতার যে সকল স্তর রয়েছে এর যত দিক ও বিভাগ রয়েছে কোন খানেই ইসলামের মহান আদর্শ অনুপস্থিত নয়। সে কারণে পরিবার ব্যবস্থায় ইসলামের ধারণা এত সুস্পষ্ট যে, খুঁটিনাটি বিষয়াবলীরও আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সমাধান ইসলামে রয়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও যথার্থভাবে।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম। এর অনুশাসন বাস্তবায়নের যে সকল ক্ষেত্র রয়েছে, পরিবার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্যক্তি জীবনকে দ্বীন কায়েমের প্রথম প্রতিষ্ঠান মনে করে। আল্লাহর সৃষ্টিরূপ এমনভাবে মানুষ লাভ করেছে যে, বালেগ হলেই তাকে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। আর পরিবার দ্বারা গড়ে ওঠে সমাজ। সাথী ভিন্ন সমাজ ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না। সেজন্য মানুষ পরিবার গঠন করতে বাধ্য। পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশে এ ধরণের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে পরিবার ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে তারা আজ দিশেহারা। তারা পরিবারহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে সরকারী তত্ত্বাবধান কেন্দ্রসহ নানা রকম

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা নিয়েও তার কোন ব্যবস্থা করতে পারছে না। এর একটাই কারণ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে "খালিক" হিসেবে এর ভবিষ্যত অবকাঠামো তৈরী করে দিয়েছেন। মানুষের স্বভাব জাতের চাহিদা কি ধরণের ব্যবস্থাদি দ্বারা সমাধান হতে পারে এটা আল্লাহই ভাল জানেন। তাই তিনি মানব কুলে সৃষ্টি থেকেই এ পরিবার প্রথা জুড়ে দিয়েছেন। পরিবার ছাড়া মানুষের দুনিয়ায় বসবাসের সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পথ চলার জন্যে তথা দুনিয়ার জীবনের আবাসন প্রক্রিয়ার কাঠামো হিসেবে পারিবারিক জীবন ঠিক করে দিয়েছেন। পারিবারিক জীবনের আচার অনুষ্ঠান, এর সদস্যদের পরিচিতি, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছেন। এরই ভিত্তিতে ইসলামী শরী'আতে পারিবারিক জীবনের রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। যার কাঠামো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। যে কাঠামোর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সা.)। আল্লাহ প্রদত্ত নবী (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত পারিবারিক বিধি-বিধানের মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। এর ব্যতীক্রমে রয়েছে হতাশা, বঞ্চনা, বিশৃঙ্খলা ও হাহাকার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের মুসলিম পারিবার ও পারিবারিক জীবন শান্তি ও সুখ থেকে বঞ্চিত। একারণেই এখানকার মানুষ আজ কঠিন বিপদের সম্মুখীন। এরূপ অবস্থায় অনতিবিলম্বে আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা না চালালে পারিবারিক জীবনকে চুড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার কোন উপায় থাকবে না। তাই সমাজ ও পরিবারের কল্যাণকামী সব মানুষেরই এদেশের সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ ভিত্তিক পূনর্গঠনের অতীব দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।

মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে, সংঘবদ্ধতা সাহচর্য-সহানুভূতি, স্নেহ ও শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয় তা পরিবার কেন্দ্রিক বসবাসেরই সুফল। পক্ষান্তরে, পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ জীবন আচরণে ইসলামের সেই নির্দেশনা যথাযথ অনুসৃত না হওয়ায় ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উদাসিনতার কারণে আমাদের মুসলিম পরিবার ও পারিবারিক জীবন শান্তি ও সুখ থেকে বঞ্চিত। পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা একটি পরিবারের সদস্যদের পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি ব্যবস্থা করার পরিবর্তে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে কলুষিত করা হচ্ছে।

তাই আমার অভিসন্দর্ভে ইসলামে পারিবারিক কল্যাণ ও পারিবারিক জীবনের রূপরেখা, ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইসলামী পরিবারের সদস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে ইসলামী মনীষীদের মতামত উল্লেখসহ এ সম্পর্কে গবেষকের নিজস্ব প্রস্তাবনা ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে।

"ইসলামে পারিবারিক কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" অভিসন্দর্ভটিকে মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করছি।

প্রথম অধ্যায়: পরিবার: পরিচিতি ও ইতিহাস

পরিবারের পরিচয় ও ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করতে গিয়ে পরিবারের পরিচয়, পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ, পরিবার ও বর্তমান বিশ্বসভ্যতা, পরিবারের বৈশিষ্ট্যসহ এর কার্যাবলী ও শ্রেণি বিভাগের আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামে পরিবার গঠন ব্যবস্থা

এ অধ্যায়ে বিবাহ কী ? ইসলামের বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহের গুরুত্ব বিবাহ সম্পাদনের প্রতি ইসলামের তাগিদ, বিবাহের দেনমোহরের অপরিহার্যতা, বিবাহের সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিসহ ইসলামে তালাক ব্যবস্থার আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

এ অধ্যায়টিতে ইসলামে পারিবারিক জীবনে বৃহত্তর লক্ষ্য মানব বংশ সম্প্রসারণ, পূর্ত-পবিত্র জীবন-যাপন, মানবীয় গুণাবলী ও মানবসভ্যতার লালন ইত্যাদি বিষয়াবলীর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: পারিবারিক কল্যাণ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

পারিবারিক জীবন-যাপনের ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

এ অধ্যায়ে পরিবার পরিকল্পনায় আল্লাহর তা'আলার মূলনীতির বিবরণসহ জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রারম্ভিক ইতিহাস ও এর উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ও এর যুক্তি পর্যালোচনা উল্লেখপূর্বক কুর'আন ও সুন্নাহের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিশ্লেষণসহ গবেষকের নিজস্ব মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনাঃ ইতিহাস ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের পরিকল্পনা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ধারাবাহিক ইতিহাস ও পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহের বিবরণসহ ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রমের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কল্যাণ সাধনে কতিপয় সুপারিশ

এ সর্বশেষ অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কল্যাণ সাধনে বাস্তবমুখী কতিপয় সুপারিশের অবতারণা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যার সমাধান কল্পে গবেষকের নিজস্ব সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর রয়েছে একটি উপসংহার এবং পরিশেষে একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য-উপাত্ত যতটা সম্ভব মূলগ্রন্থসমূহ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের অবর্তমানে ঐগুলোর অনূদিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

গবেষণা কাজে প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অপ্রতুলতা এবং সকল বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিসংখানের অভাব গবেষণা কাজে আমার জন্যে বড় ধরনের অন্তরায় ছিল। এ ছাড়া প্রতিটি বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বের করাও ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গভীরভাবে অধ্যয়নের পর বিষয়বস্তু তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। মহান আল্লাহ আমাকে ও অভিসন্দর্ভের প্রত্যেক পাঠককে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন!

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান অবতীর্ণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, তা অনেকের কাছে মনে হতে পারে– এটি একটি সেকেলে ধর্ম যা বহু শতাব্দী পূর্বের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তার যথার্থতা থাকলেও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার সময়ে তার বাস্তবতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবতা এটাই, সৃষ্টির জন্য যা চিরকল্যাণকর সৃষ্টিকর্তার চেয়ে ভাল জানার কেউ নেই। স্রষ্টার বিধান মানব জাতির দিক দর্শন, গাইডবুক হিসেবে সৃষ্টির প্রতি বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ বিশেষ। ইসলাম সেকাল বা একালের ধর্ম নয়, এটি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার ধারাবাহিক রিসালাতের পরিপূর্ণতা পাওয়া জীবন ব্যবস্থা যা সর্বকালের ও সর্বযুগের মানব জাতির জন্য উপস্থাপিত সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। ইসলামে পরিবার গঠন, পরিবার গঠন ব্যবস্থাপনা এত সুস্পষ্ট যে, এর খুঁটিনাটি বিষয়াবলীরও আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সমাধান এখানে স্থান পেয়েছে। ইসলাম মানবতার ধর্ম । মানব কল্যাণের ধর্ম। ইসলামের পারিবারিক নীতি, ব্যবস্থাপনা, গঠন প্রক্রিয়া এর বাইরে নয়। ইসলামে যে পারিবারিক নীতির সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এক অনুপম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা-ই এ অভিসন্দর্ভে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমেই পরিবারের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরিবার সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পরিবার বিরোধী আধনিক যুক্তিধারার বাস্তবসম্মত জবাব দানের পাশাপাশি পরিবারের বৈশিষ্ট্য শ্রেনীবিন্যাসের বর্ণনার আলোকপাত করা হয়েছে। পরিবার গঠনের মৌলিক উপাদান বিয়ে। বিয়ের গঠন প্রক্রিয়া, বিয়ের উদ্দেশ্য, বিয়ে সম্পাদনসহ পরিবারের এ অবকাঠামোগত দিকগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে।

মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র হচ্ছে সুশৃংখল, বৈধ ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক সূত্রে গাঁথা পূত-পবিত্র পারিবারিক জীবন। মানব বংশের সম্প্রসারণ, নারী-পুরুষের যৈবিক চাহিদা পূরণ, মানব সভ্যতার লালন, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, মানব সন্তানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, তাহ্যীব-তামাদ্দুন, বিবেক-বুদ্ধির উন্নয়ন, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন পরিবার ভিন্ন অন্য কোন অবকাঠামো বা সংস্থার মাধ্যমে সম্ভব নয়, বিধায় অত্র অভিসন্দর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে প্রামাণ্য দলীল ও ক্ষুরধার যুক্তির নিরিখে।

বিয়ে বা নারী-পুরুষের এ যুগল বন্ধন যেন বিশ্ব প্রকৃতির শাশ্বত রূপ। পরিবার গঠন প্রক্রিয়ার এ অমোঘ বিধি শুধু যে শ্রেষ্টজীব মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়; বিশ্ব প্রকৃতির সকল জীবের মধ্যে এ নিয়ম সমভাবে প্রতিফলিত । এ পুত-পবিত্র বন্ধনের ফলে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় নিষ্কলুষ অন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম-ভালবাসা এবং আবেগ উদ্দীপ্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। তাদের মধ্যে অর্পিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যা অত্র অভিসন্দর্ভে স্থান পেয়েছে কুর'আন হাদীসের দলীল সাপেক্ষে অত্যন্ত বলিষ্টতার সাথে।

আমাদের দেশসহ গোটা বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণকে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে রূপ দেয়া হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীদের যুক্তিসমূহ (যেমন-ভূমি সংকট, খাদ্য সংকট, দাম্পত্য সুখ-সাচ্ছন্দে অসুন্তুষ্টি ইত্যাদি) আজ আসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে একে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র বলে অবিহিত করেছেন। ইসলাম ঢালাওভাবে এ জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে সমর্থন করেনা। তবে আল্লাহ পাকের প্রতিপালন ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা ও কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ ব্যতীত একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ তথা স্ত্রী সন্তানের স্বাস্থ্য, স্তন্যদান, সুষ্ঠু প্রতিপালনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ প্রয়োজনে 'আযল বা তদ্রুপ অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বৈধ করেছে। দারিদ্র্য শুধু বাংলাদেশে নয়, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশ্বের চলমান পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এ সমস্যা সমাধানে শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সা.)-এর আনীত "সুদ মুক্ত, যাকাত ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার" বাস্তবায়ন এবং সহায়ক পদক্ষেপসমূহ (যেমন-দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ দান, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সম্ভাবনাময়ী শিল্পসমূহের বিকাশ সাধন, ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক, কর্মমুখী, কারিগরি শিক্ষা চালু, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, কাঙ্খিত পরিবেশে নারীদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি) গ্রহণের মাধ্যমে এদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধানকল্পে কতিপয় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ যেমন- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণতকরণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উৎপাদন ও রপ্তানী বহুমুখী করণ। প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন, যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রমিক রপ্তানি ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অপরাধ ও দুর্নীতিকে বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে ইসলাম 'প্রতিকার' ও 'প্রতিরোধ' মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সমাজে অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার বা তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়ার উপর সর্বাধিক গুরুতারোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী বিধানের পূর্ণ অনুসরণ, তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতির লালন এবং পরকালমুখী জীবন গঠনের আহবান জানানো হয়েছে। মহাবিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অর্থনৈতিক, ও সামজিক জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যে ঐশী-বিধান অবতীর্ণ করেছেন। মানুষ সে বিধানকে বাদ দিয়ে যখন নিজেস্ব চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ দ্বারা অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে শুরু করেছে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কালের আবর্তনের সাথে সাথে সে সমস্যা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষকে সকল মতাদর্শ পায়ে দলে আল্লাহ্র বিধানের দিকে ফিরে আসতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশসহ এ অশান্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে শান্তির ফল্গুধারা।

মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের পারিবারিক ও অর্থ-সামাজিক সমস্যা আমাদেরই সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে আমাদের দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের পারিবারিক ও অর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে যে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা ও দিক -নির্দেশনা প্রদান করেছে, তারই আলোকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে– এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গিকার। মহান আল্লাহ্ আমাদের সাহায়তা দান করুন। আমিন!

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র i

ঘোষণা পত্র.. ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

প্রতিবর্ণায়ন.. iv

সংকেতসূচি v

সূচিপত্র .... vi-ix

ভূমিকা.. ১-৭

প্রথম অধ্যায়: পরিবার: ইতিহাস ও পরিচিতি (৮ - ৪৬)

পরিবারের পরিচয়

পরিবারের উৎপত্তি

পরিবার ও বর্তমান বিশ্বসভ্যতা

পরিবার বিরোধী আধুনিক যুক্তিধারা

পরিবার বিরোধী যুক্তির জাবাব

পরিবারের ভিত্তিস্থাপন

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের বৈশিষ্ট্য

পরিবারের কার্যাবলী

পরিবারের শ্রেণী বিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামে পরিবার গঠন ব্যবস্থা (৪৭ - ১৩৪)

ইসলামে বিবাহ

বিবাহের উদ্দেশ্য

বিবাহের তাগিদ

বিবাহের কুফু (সমতা বিধান)

বিবাহ সম্পাদন

দেন মোহর

যাদের সাথে বিয়ে হারাম

অমুসলিমদের সাথে বিবাহ

মুত‘আ বিয়ে

ছেলে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতার দায়িত্ব

বিয়ের বয়স

বিয়ের রোকন ও শর্তাবলী

বিয়ের সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি

একাধিক বিয়ে

মুহাম্মদ (সা.)-এর একাদিক বিয়ের কারণ ও তাৎপর্য

ইসলামে 'তালাক' ব্যবস্থা

ইসলাম ও তালাক

এক সাথে তিন তালাক প্রসঙ্গ

তাহলীল (হালালা) প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব (১৩৫ - ১৫৯)

পরিবার হলো শান্তি-সুখের আশ্রয়স্থল

পরিবার একটি সুরক্ষিত প্রাকার

পারিবারিক জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য মানব বংশের সম্প্রসারণ

পুত-পবিত্র জীবন-যাপন

মানবীয় গুণাবলীর লালনক্ষেত্র

পারিবারিক জীবন-যাপন প্রাকৃতিক দাবী

মানব সভ্যতার লালনক্ষেত্র

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা

পরিবার সন্তানের জন্য শ্রেষ্ট শিক্ষাগার ও কল্যাণস্থল

ইসলামী পরিবার একটি পবিত্র সংস্থা

পরিবার একটি স্থায়ী সংস্থা

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব

পারিবারিক জীবনে সন্তানে গুরুত্ব

সন্তান-সন্ততির উপর পরিবারের প্রভাব

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পারিবারিক কল্যাণঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (১৬০ - ২৩৩)

পারিবার বিশ্ব প্রকৃতির শাশ্বত রূপ

নব দম্পতির দু'টি জীবনের সার্থক সমন্বয় ও সমঝোতা

পারিবারিক জীবন-যাপন মানব চরিত্রকে নিষ্কলুষ করে

ইসলামী পরিবার পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ

প্রেম ভালবাসা

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

স্বামীর অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর অধিকার
ইসলামী পরিবারে সন্তান, সন্তানের গুরুত্ব ও অধিকার:ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
সন্তানের গুরুত্ব
ইসলামী পরিবারে সন্তানের অধিকার: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
ইসলামী পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
পিতা-মাতার অধিকার: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অধিকার
পঞ্চম অধ্যায়: ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ (২৩৪ - ৩৮৭)
ইসলাম ও পরিকল্পনা
ইসলাম সার্বজনীন ও সর্বকালের ধর্ম
জনসংখ্যার পরিবর্তন
ইসলাম ও জনসংখ্যা পরিবর্তন
পরিবার পরিকল্পনায় মহান আল্লাহর মূলনীতি
জন্মনিয়ন্ত্রণের সূচনা
জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীদের যুক্তির পর্যালোচনা
জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য
জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিণতি
জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি
আল-কুর'আন ও পরিবার পরিকল্পনা
পরিবার পরিকল্পনা ও শিশুহত্যা
জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বপক্ষদলের মতামত
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকদের অভিমত
পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকদের প্রত্যুত্তর
সুন্নাহ ও পরিবার পরিকল্পনা
ইসলামের স্বনামধন্য কতিপয় ফকীহ ও চিন্তাবিদগণের অভিমত
'আযলের' বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ
জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর কতিপয় ইসলামী-চিন্তাবিদগণের ধারণা
বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার পরিকল্পনা
বিংশ শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ
পরিবার পরিকল্পনার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী ইসলামী চিন্তাবিদগণ
বিংশ শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর কনফারেন্স
কুর'আন ও সুন্নাহ অনুসারে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা : ইতিহাস ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ (৩৮৮ - ৪৩৮)

পরিবার পরিকল্পনা পরিচিতি

পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীর ইতিহাস

পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ

মা ও শিশু এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবায় স্যাটালাইট ক্লিনিক কার্যক্রম

মা ও শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কর্মসূচীর রূপরেখা

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কল্যাণ সাধনে কতিপয় সুপারিশ (৪৩৯-৪৭৯)

উপসংহার : .... (৪৮০ - ৪৮২)

গ্রন্থপঞ্জি : .... (৪৮৩ - ৪৯৫)

প্রথম অধ্যায়

পরিবারঃ পরিচিতি ও ইতিহাস

পরিবারের পরিচয়

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করা তার সহজাত প্রবৃত্তি।[১] মানুষের এ স্বভাবগত প্রবণতা অনুযায়ী বৈধ পন্থায় সম্পর্কিত একজন নর ও একজন নারী ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে ওঠে যে জনসমষ্টি তা-ই হলো-'পরিবার'।[২] মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার হচ্ছে একটি চিরন্তন ও শাশ্বত সংগঠন। আর পরিবারই হচ্ছে সমাজের মৌলিক ও আদি প্রতিষ্ঠান। এ পরিবারের সাথেই মানব জাতির সবচেয়ে বেশী ও নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। মূলতঃ পরিবারই হচ্ছে সমাজের ভিত্তি ও সমাজ কাঠামোর মূল অঙ্গ সংগঠন। একটি পরিবার থেকে জন্ম নেয় অনেকগুলো পরিবার। এভাবে অব্যাহত গতিতে বিস্তার লাভ করে পরিবারের ধারা। আর এ ধারাবাহিকতার পরিণামে জন্ম লাভ করে মানুষের বংশ ও জাতি। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"হে মানুষ! তোমাদের আমিই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের সাজিয়েছি জাতি ও গোত্ররূপে, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।"[৩]

পরিবার রাষ্ট্রের প্রথম স্তর, সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। পরিবারের বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভূক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে গঠিত সমাজেরই অপর নাম রাষ্ট্র। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের মূলে নিহিত রয়েছে সুসংগঠিত সমাজ রাষ্ট্র। পরিবার ও সমাজ ওতপ্রোত এবং পারস্পরিকভাবে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনো একটির কল্পনাও অসম্ভব।[৪]

এ প্রসঙ্গে Dr. Ahmed Sharabassy- এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- æSimilarly, the world 'Family' has a broad and deep meaning The family is the first brick on unite in the social structure. The soundness and strength of the social structure depends upon the soundness and strength of the family. To build up on raise a family requires planning and providence. A family generally consists of a husband a wife, children male and female and relatives and kinsmen. All these form a small society, Which by aggregation forms the larger society"[৫]

১। আল-কুর'আন, ২:২১৩ ও ১০:১৯

২। আব্দুস শহীদ নাসিম, *ইসলামের পারিবারিক জীবন*, (ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, -২০১১, পৃ.১১

৩। আল-কুর'আন, ৪৯: ১৩

৪। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, পৃ.৩৩

৫। Dr. Ahmed Sharabassy, ***Islam and family planning,*** Beirut, Lebanon-1917, Vol-ii, p,2

পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ সমাজের ফলশ্রুতি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার ওপর। আবার সুষ্ঠ পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়। তিন তলা বিশিষ্ট প্রাসাদের তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণের পরই সম্ভব, তার পূর্বে নয়। একটি প্রাসাদের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তার ভিত্তির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি এই পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও সমাজের সুসংবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তেমনি নির্ভরশীল।[৬]

মানুষ নিজস্থ প্রয়োজনে অর্থাৎ হিংস্র বন্য পশু থেকে আত্মরক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন- ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অতি আদিম অবস্থায়ও সংঘবদ্ধ জীবন গড়ে তুলেছে। আর মানুষের এ সংঘবদ্ধ জীবনের প্রাচীনতম রূপ হলো পরিবার। সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণাধীন আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড় এবং যে প্রতিষ্ঠান মানব সংগঠন তা-ই পরিবার।[৭]

পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, æ The family is a social group characterized by common residence, economic co-operation and reproduction. It includes adults of both sexes, at least two of whom maintain a socially approved sexual relationship and one of more children, own or adopted, of the sexually cohabiting adults, The family is to be distiguished from marriage, Which is complex of customs centering upon the relationship between a sexually associating pair of adults within the family”[৮]

পরিবার হচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ দল যারা সংগঠিত হয়েছে বিয়ের মাধ্যমে, রক্ত সম্পর্কের কারণে অথবা জন্মসূত্রে। সন্তান প্রজনন ও ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে এ সম্পর্কেগুলো কিছুদিন স্থায়ী হলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একধরণের ঐক্য সংহতি চেতনা ঐ সম্পর্কগুলোকে রক্ষা করে থাকে। আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞানীরাও তাই বলেন, æ The family is a group of defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the proceation and upbringing of children”[৯]

৬। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

৭। মোঃ গাওছুল আজম, ***সমাজবিজ্ঞানের উপাদান***, ঢাকা: মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, মার্চ,২০১২,পৃ.২৭৪

৮। George Peter Murdock, Social Structure, The Free Press, New York-1965, P. 1 Bernard, S, Phillips, Sociology: social Structure and change, The Macmillan Company, London-1969, P.93, Alfred Meclung Lee, (ed) Principles of Sociology, Barnes and noble inc, New York-1965, P.200

৯। R.M. Maciver and C.H. page, Society: ***An Introductory Analysis***, London-1959, chap xi, P.238

"পরিবার হল পরস্পরের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠা ব্যক্তিবর্গের একটি গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীর সদস্যরা হলো পরস্পর আত্মীয়।"[১০]

æ Family is a more on loss durable association of husband and wife with or without children."[১১]

æEncyclopedia Americana - তে পরিবার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হল- æThe term 'family' usually refers to a group of persons retated by birth or marriage (ordinarily parents and thire children) Who riside in the same household. In common usage.The term has been extended to include ancestors (as in family tree). It is sometime used for relatives of one spouse as apposed to those of the other (as in my husband's family) colloquially for unrelated people living in the same household (as in we're just one family). Despite this ambiguity of definition, there is general recognition that social institutions pertaining to marriage, birth, raising children and households of related persons are family."[১২]

আবার কেউ কেউ পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, A group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption; constituting a single household in treating and communicating with each other in their respective roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister."[১৩]

ক্যাথরিন এ্যলেন রাবুজি (Kathryn Allen Rabuzzi) পরিবার সম্পর্কে বলেছেন, æConsequently family is basically a reconciliation of many different opposites: female and male, life and death, ascendants and descendants, kin and offines (relative by marriage) biology and culture freedom and servitude, Corporation and individuality.

১০। Prof, Kingsely Davis, ***Human society***, London-1966, P.241

১১। Meyer.F.Nimkoff, ***Marriage and the family***, Boston-1947, P.6

১২। Encyclopedia Americana, vol. ii, Grolier incorporate- 1980.P.2

১৩। Ernes W.Burgess and Harvey Locke, The family, New York-1945, P. 8
David M. Newman, Sociology, Pine Forge press, London, New Delhi-1997, P.239
Jack Nobbs, Sociology, ***Macmillan Education Ltd***. London-1978, P.45

The differing ways in which family contains these opposites represent diverse systems of order in which family roles are valued according to accepted local religio – cultural belief and custom. Valuation of all members is almost never equal; therefore family as a whole embodies and symbolizes order of a particular sort hierarchy.”[১৪]

“পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিসহ পরিবার নামক গোষ্ঠী পৃথিবীর সর্বত্র বর্তমান। কি বর্ণ, কি বর্বর, কি আদিম বা সভ্য সব সমাজেই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল ও আছে। পরিবার সামাজিক সংগঠন এবং সংস্কৃতিতে প্রভাবিত করে।”[১৫]

পরিবার হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে বৈবাহিক এবং রক্ত সম্পর্কের সূত্রে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান- সন্ততি, পিতা- মাতা, ভাইবোন একত্রে বসবাস করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ব্যতিক্রম নয় । তাই বুঝা যায় পরিবার হলো একটি সামাজিক সংগঠন যা দ্বারা নর-নারী যুক্তিসম্মতভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সন্তান জন্মদানের সুযোগ প্রদান করে এবং রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

পরিবারের উৎপত্তি

সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি ও বুনিয়াদ হলো পরিবার। মানব জীবনের যাত্রা থেকেই এ পরিবার সূত্রের শুভ সূচনা। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমেই এর প্রথম বিকাশ।[১৬]

প্রথম যেমন আদম তেমনি মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে ওঠেছিল হযরত আদম ও হাওয়াকে কেন্দ্র করে। পরবর্তী কালে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এ পারিবারিক জীবন পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ মর্যাদা সহকারেই প্রচলিত ছিল। এ প্রথম পরিবারের সদস্যদ্বয়- স্বামী ও স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছিলেন:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا

“ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে মন চায় তোমরা দু’জনে অবাধে পানাহার কর।”[১৭]

মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম পরিবার যেমন সর্বতোভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার ছিল, তেমনি তাতে ছিল পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এবং তার ফলে সেখানে বিরাজিত ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তি, শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ। এ সূচনাকালের পরও দীর্ঘকাল ধরে এ পারিবারিক জীবন-পদ্ধতি ও ধারা মানব সমাজে অব্যাহত থাকে।

১৪। Kathryn Allen Rabuzzi, æFamily”, ***The Encyclopedia of Religion***, vol-5, New York-1986, P. 277

১৫। Malinowski, ***‘Kinship’ in Encyclopedia Britannica***, London-1974, vol, x, P.177

১৬। সম্পদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম***, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০০, পৃ: ৩৮৫

১৭। আল-কুর’আন, ৭:১৯

অবশ্য ক্রমবিবর্তনের কোন স্তরে মানব সমাজের কোন শাখায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, তা নয়। বরং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোন কোন স্তরে মানব সমাজের কোন শাখায় পতনযুগের অমানিশা ঘনীভূত হয়ে এসেছে এবং সেখানকার মানুষ নানাদিক দিয়ে নিতান্ত পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করতে শুরু করেছে বলে প্রমাণ পাওয় যায়। এ পর্যায়ে এসে তারা ভুলেছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানবীয় কর্তব্য। নবীগণের উপস্থাপিত জীবন-আদর্শকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে একান্ত ভাবে নফসের দাস ও জৈব লালাসার গোলাম হয়ে জীবন-যাপন করেছে। তখন সবরকমের ন্যায়নীতি ও মানবিক আদর্শকে যেমন পরিহার করা হয়েছে, তেমনি পরিত্যাগ করেছে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকেও। এ সময় কেবলমাত্র যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও এ অবস্থা ছিল সাময়িক।[১৮]

হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করার পর তাঁরা দু'জনেই প্রথম পরিবারভূক্ত হয়ে জীবন-যাপন করতে থাকেন। তাঁদের দু'জনের মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে মানব জাতির বিস্তার লাভ করে আসছে এবং ও ধারা কিয়ামত পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুতরাং বলা যায়, পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ক্রমধারা তাদের দু'জন থেকেই উৎসারিত হয়েছে। [১৯]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

" হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের সে মহান প্রভুকে ভয় করো, যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এ দু'জন থেকেই (সারা বিশ্বে) ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ।"[২০]

পরিবারের উৎপত্তি প্রশ্নের সমাধানে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃ বিজ্ঞানীগণ একমত হতে পারেন নি, তারা ও ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন ।

দার্শনিক প্লেটো পরিবারকে একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করেননি। তিনি পরিবার প্রথা উচ্ছেদের পক্ষপাতি। কেননা তাঁর মতে, পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনে সকল অনৈক্যের মূল কারণ। এ পরিবারই মানুষকে শিক্ষা দেয় "আমি" ও "তুমি", "আমার"ও "তোমার"। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে নারী-পুরুষ একই ব্যারাকে বসবাস করবে। রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণাধীনে নর-নারী তাদের চাহিদা মত যৌন লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে বেছে নিবে। তাতে করে তাদের মধ্যে কোন সন্তান জন্ম নিলে, সে সন্তানকে সরকারী নার্সগণ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবে। যাতে পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে এবং সন্তান তাদের পিতা-মাতাকে চিনতে না পারে। ফলে একদিন প্রসূত সকল সন্তানকে সব বাবা-মা নিজের সম্মিলিত সন্তান বলে মনে করতে থাকবে। এতে করে, কোন পিতা-মাত কোন সন্তানকেই নিজের সন্তান বলে দাবী করার অবকাশ পাবে না। এর ফলে রাষ্ট্র সবদিক থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে।

১৮। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

১৯। জাবেদ মুহাম্মদ, *আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম*, (ঢাকাঃ আল-মারুফ পাবলিকেশন, জুলাই-২০১১)পৃ.৫২।

২০। আল-কুর'আন, ৪:০১

অন্যথায় প্রতিটি পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্য পৃথক পৃথক সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেবে এবং রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকা 'আমার' ও 'তোমার' মধ্যে খন্ডিত হয়ে পড়বে। তাই প্রস্তাবিত প্রস্থার বাস্তবায়নে যেমন পরিবার প্রথরি বিলুপ্তি ঘটবে, তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেও কিছু থাকবে না। এর ফলে সমাজের সকল বিভেদ ও অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য বিলীন হয়ে যাবে। চূড়ান্ত পরিণতিতে গোটা রাষ্ট্রই পরিণত হবে একটি মাত্র পরিবারে, আর পরিবারের সদস্য হবে গোটা দেশের সমস্ত মানুষ।[২১]

প্লেটোর ন্যায় আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী এল, এইচ, মর্গান (L.H.Mongan), জে, এল, লুববক (T.L.Lubbock), ফ্রেজার (Frazar) ও (Briffault) প্রমুখ পরিবার যে একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান তা মেনে নিতে চান না। তাদের মতে, পরিবার একটি শাশ্বত ও বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সমাজ বিকাশের ফলশ্রুতি মাত্র। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করেন যে, আদিম পর্যায়ের মানুষ মাত্র মানুষ হওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে। তখন তাদের জ্ঞানের ভান্ডার ছিল শূন্য। তাছাড়া তারা আগুনের ব্যবহার জানত না, শব্দ তৈরীর কোন ভাষা জানত না, অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিনা অস্ত্রে প্রায় প্রকৃতির সাথে লড়াই করত। তখন তাদের বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা ছিল অতি নগণ্য। প্রতিটি জ্ঞানের বিষয়ই তখন পরবর্তী জ্ঞানের ভীত হিসেবে কাজ করত। ফলে আদিম সমাজে কোন পরিবারিক রূপ ছিল না; ছিল কেবলমাত্র বিমিশ্রিত যৌন জীবন।[২২] L.H. Morgan- এর মতে, এ বিমিশ্রিত যৌন জীবন থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে। তিনি বলেন, যতদিন না মানুষ নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে এবং সমাজ সেই নতুন রাস্তার সৃষ্টি করে দিয়েছে, ততদিন প্রাচীন সমাজে এ ধরণের পরিবার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না।[২৩]

সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকান মনীষী লুইস হেনরী মর্গান (জন্ম ১৮১৮-মৃ.১৮৮১) আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান ট্রাইব ইরোকোয়ার একটি প্রশাখা Seneea- দের ভিতর বহুদিন বাস করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং Kinship terminology বিশ্লেষণ দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানব সমাজ অবাধ যৌন মিলনের স্তর থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আজকের একক পরিবারে উন্নীত হয়েছে এবং তার Ancient Society (1877) উৎপত্তি সংক্রান্ত বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা দেন।

২১। প্লেটো, রিপাবলিক, অনু.সবদার ফজলুল করিম,ঢাকা-১৯৭৪, পৃ.২৪১

২২। দ্রষ্টব্যঃ (R.Briffualt, The Mother: A Study of the origins of sentiments and institutions), George Allen and Unwin Ltd. London, 1927,vol-i.

২৩। লুইস হেনরি মর্গান, *আদিম সমাজ, (অনূদিত বুলবুল ওসমান) বাংলা একাডেমী*, ঢাকা-১৯৭৫,পৃ.৩৬৫ Gisbart,op.Cit., pp.85-86

মর্গান মনে করেন পরিবার চারটি ধাপের পর দু'ভাগে বিকাশ লাভ করেছে-

বিমিশ্রিত					একপত্নীক
যৌন জীবন	সগোত্র	গোষ্ঠীগত	জুটি	পিতৃতান্ত্রিক	পরিবার

আমরা আজ যে পরিবার বাস করছি তা ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে। মর্গানের মতে, "আধুনিক একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল।" তিনি আরো বলেন, "সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যৌন জীবন, বিবাহ ও পরিবারের কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে।" মর্গানের পরিবার উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব নিম্নরূপঃ

১. অবাধ যৌনাচারঃ ব্যাকোফেনকে সমর্থন করে মর্গান বলেন যে, আদিতে সমাজ জীবনে অবাধ যৌনাচার বিদ্যমান ছিল। তখন যৌন জীবনের উপর কোন সামাজিক নিয়ম ছিল না। মর্গানের মতে, এটাই ছিল যৌন জীবনের প্রথম স্তর। যৌন জীবনের প্রথম স্তরটিতে ছিল প্রাক বিবাহ ও প্রাক পরিবার জীবন। গোষ্ঠীগত জীবনের আদিকালে যৌন জীবন ছিল অনিয়ন্ত্রিত এবং সেটাই ছিল অবাধ যৌনাচারের যুগ।

২. কনস্যাংগুইন বা রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি পরিবারঃ অবাধ যৌনাচার থেকে মানুষ যখন সংযত জীবন-যাপনের প্রতি গুরূত্ব দিতে শুরু করে তখন থেকেই শুরু হয় এ কনস্যাংগুইন পরিবার । এ পরিবার সৃষ্টি হয় নিজ ভাই ও বোনদের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে। মর্গান বলেন, এ ধরনের পরিবার ছিল প্রাথমিক পরিবার। পলিনেশীয়দের মধ্যেই এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতির বিয়ে হল এ ভাই-বোনদের বিয়ে। আদিম যুগে সর্বত্রই এ রূপ বিয়ে প্রচলিত ছিল। ১৮২৭ সালে আমেরিকান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের জন্য যখন স্যান্ডইচ দ্বীপে অবস্থান নেন তখন সেখানে তারা ভাই-বোনদের মধ্যে এরূপ বিবাহ লক্ষ্য করেন। এ ছাড়া মর্গান-এর উদ্বৃতি আরো প্রমাণযোগ্য যা, তিনি অস্কার পেসেলের মন্তব্যে বলেনঃ

"That at any time and in any place the children of the same mother have propagated themselves sexually." "কালমার্কস উপযুক্ত কনস্যাংগুইন তত্ত্ব সমর্থন করে বলেন, আদিতে বোনই ছিল স্ত্রী আর সেটি নীতিসম্মত ।"

৩. পুনালুয়ান পরিবার দলগত বিবাহ সৃষ্টপরিবারঃ পুনালুয়ান নামটি চয়ন করা হয় হাওয়াইদে পুনালুয়া সম্পর্ক থেকে। পরিবারের পরিবর্তনের এ পর্যায়ে বিশেষ করে যখন আপন ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখনই একদল ভাই আপন হতে পারে, আবার জ্ঞাতি সম্পর্কেরও হতে পারে যখন তা মিলিতভাবে একদল মেয়েকে বিবাহ কারে তখন পুনালুয়ান পরিবার গঠন হয়। অপর পক্ষে আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের একদল বোন যখন একদল পুরুষকে বিবাহ করে তখনই পুনালুয়ান পরিবার গঠন করে। এ পদ্ধতিতে নিজ দলের বিভিন্ন সম্পর্কের ভাইয়েরা অপরের স্ত্রীকে বিয়ে করে। ঐতিহাসিক পর্বেই পুনালুয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকায় লক্ষ্যকরা গেছে। তদুপরি বর্তমান শতাব্দীতে পলিনেশিয়াতে এর অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ পরিবার মর্গান বর্ণিত বন্য দশা ছাড়াও পরবর্তী বর্বর অবস্থার নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে দেখা

গেছে। প্রাচীন ব্রিটেনদের বিবাহ প্রথা লক্ষ্য করে সীজার যে বক্তব্য রেখেছেন, মর্গান তা খুবই গুরুত্বপূর্ন মনে করেন। এ প্রথায় স্বামীরা দশ বারজন করে যৌথভাবে স্ত্রী গ্রহণ করত বিশেষ করে এরা হত পরস্পর ভাই এবং সব ছেলেমেয়েদের যৌথ পিতা।

৪. সিনজাসমিয়ান বা জোড় পরিবারঃ মর্গানের মতে, পুনালুয়ান পরিবার থেকেই সিনজাসমিয়ান পরিবারের উৎপত্তি হয়েছে। 'সিনজাসমিয়ান' কথাটা এসেছে 'সিনডিয়াসমস' থেকে যার অর্থ জোড় লাগান। এক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার যে জোড় দেয়া হয় তাকেই বুঝান হয়েছে। সিনজাসমিয়ান পরিবার হল অস্থায়ী যুগল পরিবার,পরিবারের বিবর্তন ধারায় এক্ষেত্রে একজন পুরুষও একজন স্ত্রীর মধ্যে অস্থায়ী যৌন মিলনে এ পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পরিবারের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে স্বামীর-স্ত্রীর খেয়াল খুশির উপর। আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে ইরোকুয়া ও ইন্ডিয়ান ট্রাইবগুলোর মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে বর্বর দশার নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে তারা সিনজাসমিয়ান পরিবারভুক্ত হয়ে বসবাস করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র সন্তান জন্মাবার পর এ পরিবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেত। তাই মর্গান বলেন, একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের বীজ এখানেই সুপ্ত ছিল।

৫. পিতৃপ্রধান পরিবারঃ বিবর্তনের ধারায় পরিবারের আসল রূপ এখানেই ফুটে ওঠে। পিতৃতান্তিক পরিবারের পিতা বা পুরুষ ব্যক্তিই হচ্ছে পরিবারের সকল ক্ষমতার অধিকারী। এ পরিবারের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ কয়েকজন স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। একজন পুরুষ কয়েকজন স্ত্রী গ্রহণ করে যে পরিবার গঠন করে তাই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা পিতার সূত্র ধরে চলত। রোমান সমাজে এ ধরণের পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

মর্গান বলেন যে, কনস্যাংগুইন পুনালুয়ান পরিবারে পিতার প্রভুত্ব বলতে কিছুই ছিল না। সিনজাসমিয়ান পরিবারে পিতৃপ্রভাব ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠে এবং তা চরম রূপ পরিগ্রহ করে পিতৃপ্রধান পরিবারের উৎপত্তি হয়।

৬. একক বিবাহভিত্তিক পরিবারঃ বর্বর অবস্থার শেষ পর্বে একক বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদ্ভব হয়। আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এর উদাহরণ মিলবে। প্রাচীর যুগে জার্মান পরিবারে, হুমায়রীয় যুগে গ্রিসে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার ছিল। হোমারের কবিতায় পুরুষের সর্বময় কতৃত্বের বর্ণনা রয়েছে। মেয়েরা পুরুষের কথা মেনে চলতে বাধ্য ছিল। রোমান স্ত্রীদের মর্যাদা কিছুটা উন্নত হলেও তারা স্বামীর প্রদানত ছিল। মর্গানের মতে, মেয়েদের আত্নত্যাগ ও দু:খ-দুর্দশার উপরই একক বিবাহভিত্তিক পরিবারের ভিত নির্মিত হয়েছে। আর এ পরিবার প্রথাই জন্ম দিয়েছে আধুনিক পরিবার। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মানুষ একক পরিবারের সুফল ভোগ করে ধন্য হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আজকের এ আধুনিক পরিবারের উৎপত্তি যা বিবর্তন বাদী সমাজবিজ্ঞনীদের ধারণা, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানী মর্গান এই স্বীকৃতি দেন। তবে পরিবারের এ বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের অনেকেই যুক্তিসংগত সমালোচনা করেছেন। হাজার সমালোচনা থাকলোও তার এ তত্ত্ব যুগান্তকারী, জীবিত তত্ত্ব; শ্রেষ্টত্বের দাবীদার।[২৪]

মেক্লেনার, মর্গান, ব্যাকোফেন, লুবক বাস্তয়ান, লিপার্ট, কোহলার উইলকেন প্রমুখ যে অবাধ যৌনাচার তত্ত্ব প্রদান করেছেন Wester Mark তার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আদিম সমাজের মূল বৈশিষ্ট ছিল সংঘবদ্ধতা বা দলবদ্ধতা। তাদের মধ্যে কোন রক্তসম্পর্কিয় বন্ধন ছিল না সত্য কিন্তু তারা শিকার সংগ্রহের জন্যে সংঘবদ্ধ জীবন অনুভব করত। এ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বৃহত্তম জাতি গোষ্ঠী গড়ে তোলে। পরে তারা পরিবার ও বিবাহ প্রথা চালু করে। এ ভাবেই মূলত পরিবার প্রথার উদ্ভব ঘটেছে।[২৫]

আর ব্রিফল্ট তাঁর The mothers গ্রন্থে বলেছেন, "In ancient Soeities pooople were not aware that the offspring has any relation with paternity and in societies which practise promiscuity there is no knowledge of the father of the any child. But mother is known definitely any where. Consequenty, it seems more reasonable to belive that the anmcient family was matriar chal. The patriarchal family originated in these matriarchal families. The importanee of the father increased with the progress of civilization and the development of agriculture."[২৬]

পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে প্লেটোর উপর্যুক্ত মতবাদের সাথে এ্যরিস্টটল যেমন একমত হতে পারেননি, তেমনি উত্তরকালের নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদগণও তাকে সঠিক ও নির্ভুল বলে গ্রহণ করেননি। দার্শনিক এ্যরিস্টটলের মতে, পরিবার একটি মানুষের অতি স্বাভাবিক মানবীয় সংস্থা। কেননা, এর মূল নিহিত রয়েছে মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের গভীর তলে। কোন মানুষই ব্যক্তিগতভাবে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাবলীর পূরণের জন্য তার প্রয়োজন চিরন্তন সহকর্মীর। বলাবাহুল্য স্ত্রীই হতে পারে সে চিরন্তন সঙ্গী। এ কারণে নর-নারী পরস্পরের কাছাকাছি আসে কেবল পছন্দের মাধ্যমেই নয়, নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আবেগের তাড়নায়ও। অতএব, পরিবার প্রথম স্বাভাবিক সমাজ। উপরন্তু, মানুষ গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় তথা দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পুরণের তাড়নায়ও গড়ে তোলে পরিবার ও পারিবারিক জীবন, সুতরাং পরিবার কেবল যৌন ও পাশবিক জৈবিক জীবন রক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, স্বভাবতই এর লক্ষ্য হচ্ছে এক উন্নত, নৈতিক, পবিত্র ও নির্দোষ জীবন-যাপন। প্রকৃত প্রেম-ভালবাসা ও প্রীতি-প্রণয় অল্প সংখ্যক মানুষের খুবই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ পরিবেষ্টনীর মধ্যেই উদ্ভব ও বিকশিত হতে পারে। পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সে অনুপাতে ভালবাসার মাত্রা হ্রাস পায়।

২৪। লুইস হেনরি মর্গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৭৭; মো: গাওছুল আজম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৮

২৫। Wester mark, ***The History of Human manniage***, london -1997,P.234

২৬। উদ্ধৃত, Ram nath Sharma, principles of sociology, J.K. Publishers, West Sussex, U.K-1982, P. 298

২৬। বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (অনু শক্রজিত দাস গুপ্ত ও শর্মিষ্ঠা রায়)*, বাউল মন প্রকাশন, কলিকাতা-১৯৯৮,পৃ.২১২-২১৩

পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে জিসবার্ট বলেছেন, æModern anthropological and sociological research shows neither promiscuity nor group marriage is to

be found in any tipe of society as approved and permanent institutions, while the family is to be found everywhere"[২৭]

তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, ইতিহাসে এমন কোন যুগের সন্ধান মিলে না, যখন মানব সমাজে পরিবার প্রথা অনুপস্থিত ছিল।

নৃ-বিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক (Westermark) ও বলেছেন, "In all propability there has ben no stage in the social history of mankind where marriage has not existed, human marriage apparently being an in heritanee from some ape-like progenitor."[২৮]

পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের উপযুক্ত বিপরীতমূখী মতবাদের ফলে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে কোন মতবাদটি সঠিক তা নির্ণয় করা কঠিন।[২৯] তথাপিও জিসবার্ট (Gisbert) – এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, "The origin of the family is not be sought in any historical contingency, but in the intemate needs of human nature which can only he satisfied in the family. Among these we find the wish for children, the satisfaction of sexual impulse the craving for mutual love and protection, the need of tenderness and devotion and the desire of economic reciprocal help. This is indeed the real of the family."[৩০]

উপরিউক্ত নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের আলোচনায় দেখা যায় পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে তারা সুনির্দিষ্ট কোন মতকে প্রাধান্য দেননি। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষ বিবাহ বা পরিবার গঠন করে কয়েকটি কারণে-যৌনানুভূতি, সন্তান লাভ, স্নেহ, আবেগ, বংশ ও সম্পত্তি রেখে যাওয়ার তাড়না, দুঃখ, বেদনাম হাসি ও আনন্দের সঙ্গী করা। উপরের আলোচনায় আল-কুর'আন তথা ইসলাম সৃষ্টি ও সমাজ সভ্যতার ইতিহাস, বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের সূচনা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাই বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত ও সঠিক ইতিহাস নির্ভর।

২৭। Gisbbert, OP. Cit, P.86

২৮। ***Encyclopadia Amiricana***-vol- ii, p.5

২৯। R.M. Maciver, ***আধুনিক রাষ্ট্র***, পৃ.১৯, উদ্ধৃত মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁইয়া,

৩০। Gisbbert, OP. Cit, P.86

তাই বলা যায়, হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) এর সমন্বয়ে পরিবারের রূপ মানব সমাজের শুভযাত্রা। তাদের বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের স্থায়ী নীতি বিবাহের প্রচলন হয়।

এভাবেই বিবাহের উৎপত্তি ঘটে। এ দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যত পরিবার রয়েছে, সবই আদম-হাওয়ার পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবার কোন কৃত্রিম সংগঠন নয়। পরিবার ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত।আর এ পরিবার ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সামাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। পরিবারের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের কতগুলো গভীর প্রেরণা ও প্রবণতা। তার মধ্যে আছে যৌন আবেগ, রোমান্টিক প্রেম, বংশ গৌরব, গৃহের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত কালিকার ঈর্ষা, বংশের ধারাবহিকতা রক্ষার জন্য নিভৃত আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

পরিবার ও বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা

একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত হয়ে যখন একসঙ্গে জীবন-যাপন করতে শুরু করে তখনি একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ দুয়ের সম্মিলিত ভালোবাসাপূর্ণ যৌন জীবনকে বলা হয় দাম্পত্য জীবন। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। মনের মিল ও পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও বন্ধনকে দুশ্ছেদ্য করে তোলে। এর দ্বিতীয় মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশের ধারা অব্যাহত রাখা। উত্তরাধিকারী উৎপাদন। পূর্ব পুরুষের মৃত্য এবং উত্তর পুরুষের মধ্যবর্তীকালে নিজেকে জীবন্ত করে রাখার স্বাভাবিক প্রবনতা মানুষকে এজন্যে সর্বতোভাবে উদ্যোগী ও তৎপর বানিয়ে দেয়। তখন এ হয় এক চিরন্তন সত্য, এক চিরস্থায়ী বংশ প্রতিষ্ঠান।[৩১]

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্ব প্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান। এ এক চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা, যা কার্যকর হয়ে রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে, প্রত্যেকটি জীব ও বস্তুর মধ্যে! আল্লাহ তা‘আলা কুর’আন মজীদে ইরশাদ করেছেন:

ومن كل شىء خلقنا زوجين

“প্রত্যেকটি জিনিসকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।[৩২]

বস্তুত সৃষ্টিলোকের কোন একটি জিনিসও এ নিয়মের বাইরে নয় এবং একটি ব্যতিক্রমও কোথাও দেখা যেতে পারে না। তাই কুরআন মজীদে দাবি করে বলা হয়েছে:

سبحان الذي خلق الازواج كلها مم تمبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون

“মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিলোকের সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন- উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছূই জানে না।”[৩৩]

৩১। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

৩২। আল-কুর’আন, ৫১:৪৯

৩৩। আল-কুর’আন, ৩৬:৩৬

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ‘বিয়ে’ ও ‘সম্মিলিত জীবন-যাপন’ এবং তার ফলে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা কেবল মানুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ-গাছপালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সূক্ষ্ম ও ব্যপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি

জিনিসও এ থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমনিভাবে রচিত যে, এখানে যত্রতত্র যেমন রয়েছে পুরুষ তেমনি রয়েছে স্ত্রী এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে টানছে। প্রত্যেকটি মানুষ– স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ তীব্র আকর্ষণ এবং এ আকর্ষণই স্ত্রী ও পুরুষকে বাধ্য করে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে সম্মিলিত ও যৌথ জীবন-যাপন করতে। মানুষ অন্তর- অভ্যন্তরে যে স্বাভাবিক ব্যকুলতা, আকুলতা ও সংবেদনশীলতা রয়েছে বিপরীত লিঙ্গের সাথে একান্তভাবে মিলিত হওয়ার জন্যে। তারই পরিতৃপ্তি ও প্রশমন সম্ভবপর হয় ও মধু মিলনের মাধ্যমে। ফলে উভয়ের অন্তরে পরম প্রশান্তি ও গভীর স্বস্তির উদ্রেক হয় অতি স্বাভাবিকভাবে।[৩৪]

বর্তমান পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজ ও সভ্যতায় নারী ও পুরুষ সম্পর্ক মানবীয় নয়, নিতান্ত পাশবিক। পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন-লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে তথায় সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। এর ফলে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার সম্মুখীন। অথচ নারী-পুরুষের মিলন ও একাত্মতাকে সভ্যতার অগ্রগতির কারণ ও বাহনরূপে গণ্য করা হয়েছে চিরকাল। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা পরিবারকে চূর্ণ করে, পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাষ্ট্রকে। অথচ পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রথম ধাপ। দ্বিতল বা চারতলা প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে যেমন দরকার প্রাথমিক তলাগুলোকে প্রথমে নির্মাণ করা এবং অধিকতর মজবুত করে গড়ে তোলা নির্মাণ না করেই উপরের তলা নির্মাণের চেষ্টা পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক তেমনি বর্তমান সভ্যতা সভ্যতার প্রথম স্তর অর্থাৎ পরিবারকে প্রায় অস্বীকার করেই, তার গুরুত্ব হ্রাস করেই গড়ে উঠতে চাচ্ছে। কিন্তু হাওয়ার উপর যেমন প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না, পরিবারকে ভিত্তি না করে ভিত্তি হিসেবে পরিবারকে গড়ে তুলে-সত্যিকারভাবে স্থায়ী কোন সভ্যতা কিংবা মজবুত কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। সুস্থ চিন্তার অধিকারী প্রত্যেকটি মানুষের নিকট একথা অত্যন্ত প্রকট।[৩৫]

পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক পিতিরিম এ. সরোকিন (১৮৮৯-১৯৬৮)[৩৬] বর্তমান দুনিয়ায় পরিবারের গুরুত্ব কম হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন:

৩৪। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

৩৬। পিতিরিম এ. সরোফিন উত্তর-পূর্ব রশিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহন করেন। সরোকিনের পিতা ছিলেন একজন ভ্রাম্যমান প্রতিমা নির্মাতা। তাঁর এগার বৎসর বয়সে অতিরিক্ত মদ্যপান করার কারণে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। গীর্জায় কতিপয় ধর্মযাজকদের কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি গীর্জা পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষক একাডেমীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং "সমাজ ও সংস্কৃতির" উপর পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। এখানেই তিনি তার যুগান্তকারী গ্রন্থদ্বয় Social Mobility (1920) এবং Ontemporary Sociological Theories (1928) লিখেন। ১৯৩০ সালে তিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং প্রথমবারের মত তিনি সেখানে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একদশক কাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। তাঁর বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, Social and Cultural Dynamics (1987) Society, Culture, and Personality (1949) Sociological Theory of Today (1961)।

"আমরা বর্তমানে খাবার খাই হেটেল রেঁস্তোরায়, আমাদের রুটি বেকারী-কনফেকশনারী থেকে তৈরী হয়ে আসে, আর আমাদের কাপড় ধোয়া হয় লন্ড্রীতে। পূর্বে মানুষ আনন্দলাভ ও চিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরে যেত পরিবারের নির্ভৃত আশ্রয়ে; কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার জন্যে চলে সিনেমা-থিয়েটার, নাচের আসর ও ক্লাবঘরের গীতমুখর পরিবেষ্টনীতে পূর্বে পরিবার ছিল আমাদের আগ্রহ উৎসুক্য ও আনন্দ-উৎফুল্লতার কেন্দ্রস্থল, পারিবারিক জীবনেই আমরা সন্ধান করতাম শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের নির্মলতা; কিন্তু এখন পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। হারিয়ে ফেলেছে সকল প্রীতি, মাধুর্য, অকৃত্রিমতা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতা। দিনের বেশির ভাগ সময়ই মানুষ জীবিকার চিন্তায় অতিবাহিত করে। রাত্রিবেলায় অন্তত পরিবারের সব লোক একত্রিত হতো। কিন্তু এখন তার রাত্রিযাপন বিচ্ছিন্নভাবে যার যেখানে ইচ্ছে সেখানে। এখন আমাদের ঘর আরাম বিশ্রামের স্থান নয়, ঘরে রাতদিন অতিবাহিত করার তো এ যুগে কোন কথাই উঠতে পারে না। একটি গোটা রাত্রি এখন লোকেরা নিজেদের ঘরে যাপন করবে তা কেউ পছন্দ করে না।”[৩৭]

তথাকথিত প্রগতিবাদ মানুষের পারিবারিক জীবনকে শেষ করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগৎ থেকে পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর এতে করে তাদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি। মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্যে পরিবার নামক দুর্গের চেয়ে বড় আশ্রয় আর কিছুই নেই। পরিবার ধ্বংসের দ্বারা মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবনে যে চরম অশান্তি নেমে আসে এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেলঃ

১. যৌন জীবনে উশৃঙ্খলা ও অশান্তি নেমে আসে;
২. প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা ও হৃদ্যতা বিদূরিত হয়;
৩. দয়া ও সহানুভূতি দূর হয়ে যায়;
৪. সন্তানের সঠিক লালন-পালন ও সুশিক্ষা হয় না;
৫. সমাজে কোন আদর্শিক ঐতিহ্য গড়ে উঠে না;
৬. বংশধারা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে যায়;
৭. পিতা-মাতার অধিকার বিনষ্ট হয়;
৮. দাম্পত্য জীবনে সুখ মাধুর্য বিলুপ্ত হয়;
৯. সন্তানের প্রতিভা বিকাশে বিঘ্ন ঘটে;
১০. নারীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।[৩৮]

৩৭। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

৩৮। আবদুশ শহীদ নাসিম, ***ইসলামের পারিবারিক জীবন***, ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার-বিবিসি, ডিসেম্বর-১৯৮৬, পৃ. ১৩২

পরিবার বিরোধী আধুনিক যুক্তিধারা

Dhaka University Institutional Repository

যারা পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অস্বীকার করে, তারা কিছু কিছু যুক্তি তার অনুকূলে পেশ করে।তাদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

১. মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাই সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই তার দাবী-স্বভাবের প্রবণতা। পরিবারের সুদৃঢ় পরিবেষ্টনীতে বন্দী করে তার এ আযাদীর হরণ করা জুলুম বৈ কিছুই নয়।

২. পরিবার মানুষের স্বভাবের দাবী নয়। পারিবারিক জীবনে স্ত্রীকে পুরুষের অধীন হয়ে প্রায় ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হয়, অথচ স্বাধীনভাবে থাকা তার মানবিক অধিকার। পারিবারিক জীবনে তার নির্মমভাবে হরণ করা হয়। একমাত্র পুরুষই সেখানে উপার্জন করে, স্ত্রীকে তার জীবন-জীবিকার জন্যে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

৩. আগের কালের রাষ্ট্র বর্তমানের ন্যায় সর্বাত্মক ও ব্যাপক ভিত্তিক ছিল না। তখন মানুষ পরিবেশের মুখাপেক্ষী ছিল। মানুষের জন্যে তা ছিল প্রয়োজনীয়। এখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা থেকে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। কাজেই আগের দিনে পরিবারের প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে তা ফুরিয়ে গেছে।

৪. পূর্বে সম্মিলিত পারিবারিক জীবন (Joint family life) থাকার কারণে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ, কিন্তু সে অবস্থা বদলে গেছে। এ শিশু পালনের জন্যে ডে-কেয়ার, নার্সারী হোম ও কিন্ডারগার্টেন এবং কর্মক্ষেত্র হচ্ছে কারখানা ও অফিস। কাজেই আজ পারিবারিক সম্বন্ধ অপ্রয়োজনীয়। এবং

৫. বর্তমানে রাষ্ট্র শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষের স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্যে যেসব সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছে, পিতা-মাতার পক্ষে তার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আজ পরিবার ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্র থেকেই সব প্রয়োজন অনায়াসেই পূরণ করা যেতে পারে। এতে মানুষের কোনরূপ অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকতে পারে না।[৩৯]

পরিবার বিরোধী যুক্তির জবাব

১. প্রথম যুক্তির জবাব সম্পর্কে বলা যায়, পরিবার সংস্থা মূলত নারী ও পুরুষের সম্মিলিত ও পরস্পরেরর সম-অধিকারসম্পন্ন এক যৌথ প্রতিষ্ঠান। এখানে উভয়ই একত্রে সম্মিলিত জীবন যাপন করে। এ সম্মিলিত জীবনে পুরুষ ঘরের বাইরের কাজ-কর্মের জন্যে দায়িত্বশীল, আর স্ত্রী ঘরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক-ঘরের রাণী। এখানে একজনের ওপর অপরজনের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে যেমন দরকার ইঁটের তেমনি প্রয়োজন চুনা-সুরকি বা সিমেন্ট-বালির। যদি বলা যায়, ইঁট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান; তাহলে জিজ্ঞাস্য হবে কেবল ইঁটই পারবে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করতে? পারিবারিক জীবন প্রাসাদ রচনায় নারী ও পুরুষের ব্যাপারটি ঠিক তেমনি।

৩৯। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

একটি সুন্দর পরিবার গঠনে যেমন পুরুষের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি অপরহার্য নারীর বিশেষ ধরণের যোগ্যতা ও কমপ্রেরণার। যা অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যাবে না।

২. দ্বিতীয় যুক্তির জবাব সম্পর্কে বলা যায়, যে সমাজে নারীর পক্ষে অর্থোপার্জনের সকল দ্বারই চিররুদ্ধ কেবল সে-সমাজ সম্পর্কেই একথা খাটে। কেননা সেখানে নারীর অস্তিত্ব কেবলমাত্র পুরুষের পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতার উদ্দেশ্যেই একান্তভাবে নিয়োজিত থাকে। নারী সেখানে না কোন জিনিসের মালিক হতে পারে, না পারে কোন জিনিসের মত খাটাতে। কিন্তু এখানে আমরা যে সমাজ পরিবারের ব্যবস্থা পেশ করতে যাচ্ছি, তার সম্পর্কে একথা কিছুতেই সত্য ও প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা ইসলাম নারীকে ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার দেয়, মীরাসের অংশও সে আইনত লাভ করে থাকে। কিন্তু নারীর দৈহিক গঠন ও মন-মেজাজের বিশেষ রূপ ও ধরণ রয়েছে, যা পুরুষ থেকে ভিন্নতর। এ কারণে অর্থোপার্জনের কঠিন ও কঠোর কাজের দায়িত্ব তার উপর অর্পন করা হয়নি। পুরুষই তার যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন পুরণের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। বিশেষত ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় নারী এক দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্টিত। অর্থোপার্জনের চিন্তা-ভাবনা ও খাটা-খাটনীর সাথে তার কোন মিল নেই, শুধু তাই নয়, তা করতে গেলে নারী তার আসল দায়িত্ব পালনেই বরং ব্যর্থ হতে বাধ্য।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের আসল কারণ হচ্ছে প্রেম-ভালবাসা, অন্তরের স্বতঃস্ফুর্ত দরদ ও প্রণয়-প্রীতি, যা স্বভাবতই দুজনার মধ্যে বিরাজ করছে। স্বামী-স্ত্রী উভয় পরস্পরের জন্যে যে অপরিসীম ভালবাসা ও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে, পারিবারিক জীবনসংস্থা তারই স্থিতিস্থাপকতা বিধান করে। তারা এ জিনিসকে সাময়িকভাবে একত্রিত হওয়ার ভিত্তি বানাতে কখনো রাজি হতে পারে না। বরং তাদের জীবনে এমন কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উজ্জল হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে, যার পরিপূরণের জন্যে তারা সমগ্র জীবনকে অকাতরে ও ঐকান্তিকভাবে লাগিয়ে দেয়। তারা একটি নবতর বংশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব পালন করে না, তাদের ললন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা দান করে, সমাজের একটি কল্যাণকর অংশে পরিণত করার কাজও তারাই করে। এসব উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীকে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক উর্ধ্বে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

৩. তৃতীয় যুক্তিটি মানবীয় অনুভূতি ও আন্তরিক ভাবধারা ভুল ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। সন্তানের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যের পশ্চাতেও কোন অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ নিহিত রয়েছে বলে ধরে নিলে বলতে হয়, ধনী লোকদের মনে সন্তান কামনা বলতে কিছুই থাকা উচিত নয়। আর সন্তান হলে তাদের জন্যে কোন স্নেহ-মায়াও থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। যে শিশু পঙ্গু, অন্ধ, যার কোন প্রকারের অর্থনৈতিক স্বার্থ লাভের বিন্দু মাত্র আশা থাকে না, বরং বাপ-মায়ের উপর যে কেবল বোঝা হয়েই রয়েছে, এমন সন্তানকে কেন বাপ-মা বুকে জড়িয়ে রাখে? তার খবরাখবরের জন্যে তার সেবা–শুশ্রূষা ও তাকে আদর-যত্ন করার জন্যে পিতা-মাতা কেন সতত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে? সে অনেক টাকা রোজগার করে বাপ-মাকে সাহায্য করবে, এমন কোন আশা কেউ পোষণ করে কি? বিবেকের কাছে এই যুক্তিটি আদৌ টিকে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪. চতুর্থ যুক্তির জবাবে বলতে হচ্ছে, পারিবারিক ব্যবস্থা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ উদ্দেশ্যের বাস্তবিকই যদি কোন গুরুত্ব থেকে থাকে আর মানবতা কল্যাণের জন্যেই তার বাস্তবায়ন জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে এ ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয় যেসব অবস্থা, তা মানবতার পক্ষে কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠান (institution) কায়েম করাই কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না, মানবতার দু:খ দরদ ও যন্ত্রনা-লাঞ্ছনা বিদূরণই হচ্ছে আসল লক্ষ্য। কোন প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধক হলে তার মূলোৎপাটনই বাঞ্ছনীয়। সন্তান ও পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দেয়ার জন্য আজ যে নবপ্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো হয়েছে, পারিবারিক ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কায়েম রেখে সে সব প্রতিষ্ঠানকে কল্যাণকর ভূমিকায় নিয়োজিত করা যায় কিনা, তাও তো গভীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। এ যদি সম্ভবই না হয়, তা হলে বলতে হবে, মানুষ প্রথমে পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তারপরে তার কৃত্রিম ব্যবস্থা হিসেবে শূন্যস্থান পূরণের জন্য মাত্র এ সব প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো হয়েছে। বস্তুত পরিবার ব্যবস্থাকে যথাযথ কায়েম রেখেও এসব প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যৎ মানব বংশের জন্যে কল্যাণকর বানানো যেতে পারে কিংবা পরিবার ব্যবস্থার অনুকূলে এ ধরণের নবতর আরো প্রতিষ্ঠান কায়েম করা যেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. পঞ্চম যুক্তিটি এমন যা পেশ করতে আধুনিক যুগের লজ্জাবনত হওয়া উচিত বলেই মনে করি। বর্তমান যুগে যেভাবে শিশু সন্তানকে লালন-পালন করা হচ্ছে, তার বীভৎস পরিণতি দুনিয়ার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এসব প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিতান্ত পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। আজকের মানুষের হিংস্রতা ও বর্বরতা জঙ্গলের রক্তজীবী পশুকেও লজ্জা দেয়। আজকের মানব সমাজ জাহান্নামে পর্যবসিত হয়েছে। তার একটি মাত্রই কারণ আর তা হচ্ছে, মানুষকে ভালবাসা, দরদ প্রীতি সহানুভূতি প্রভৃতি সুকোমল ভাবধারা থেকে বঞ্চিত করে দিলে তখন আর মানুষ মানুষ থাকবে না, জংগলের হিংস্র জন্তু ও তার মধ্যে কোনপার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না এই কথাটি আজ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। অথচ মানুষের স্বভাবগত এই প্রেম-ভালবাসা, দরদ-প্রীতি স্বাভাবিকভাবে লালিত-পালিত হলে তা মানুষকে ফেরেশতার চেয়েও অধিক মাহিমান্বিত বানিয়ে দিতে পারে। আইনের কঠোর শাসন দিয়ে মানুষকে বন্দী জানোয়ার তো বানানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মানুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মায়ের মমতা ও স্নেহময় ক্রোড়ই তা জাগাতে পারে। মা তার মমতাসিক্ত দৃষ্টি দিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মনুষ্যত্বের এমন উচ্চতর জ্ঞান দিতে পারে, এমন সব মহৎ গুণে তাকে ভূষিত করতে পারে যা এখানকার কোন ট্রেনিং কেন্দ্র আর কোন গবেষণাগারও করতে পারবে না। বস্তুত মা শিশুকে কেবল স্তনই দেয় না, প্রতি মুহূর্তের এমন সাহচার্যে অলক্ষ্যে এমন সব ভাবধারা মগজে বসিয়ে দেয়, যার দরুন এক ক্ষীণ, দুর্বলপ্রাণ শিশু জীবিত থাকে, লালন-পালনে ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ওঠে। মায়ের ঘুমপাড়ানি গান শিশুর চোখে কেবল ঘুমই এনে দেয় না, শত্রুতা, ঘৃণা, হিংসা ও মানসিক কুটিলতাকেও স্নেহ-মমতার নির্মল স্রোতধারায় ভাসিয়ে দেয়।

একটু সহজ দৃষ্টিতে বিচার করলেই দেখা যাবে, পরিবার অতি ক্ষুদ্র ও হালকা একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। তার অবশ্য কিছু বাধ্যবাধকতা আছে, আছে কিছু দাবী ও দায়দায়িত্ব। লালন-পালন ও

সংগঠনের জন্যে তার নিজস্ব কতগুলো নিয়ম-প্রণালীও রয়েছে। যারা পারিবারিক জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত, তারা সেসব সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম। আর তারাই সেসবের মনস্তাত্তিক ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারাকে যথাযথ রক্ষা করে তার লালন-পালনের কর্তব্যও সঠিকভাবে পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যাপক ও ভারী প্রতিষ্ঠান যাকে প্রধানত আইন ও শাসনের ভিত্তিতে চলতে হয়। এখন পরিবারকে ভেঙ্গে দিয়ে যদি গোটা রাষ্ট্রকে একটি পরিবার পরিণত করে দেয়া হয়, তাহলে পরিবারের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক যে আন্তরিকতা ও দরদ-প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত তা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে। রাষ্ট্র পরিবারের আইন বিধানের প্রয়োজন তো পূরণ করতে পারে; কিন্তু নিকটাত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের লোকদের পারস্পরিক আন্তরিক ভাবধারার বিকল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় কোনক্রমেই।

মানুষের প্রকৃতিই এমনি যে, তাকে যতদূর সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে রেখে লালন-পালন করা হবে, তার অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা-প্রতিভা তত বেশি বিকাশ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা লাভ করতে সক্ষম হবে। ক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে পারে। পরিবার ব্যবস্থাকে খতম করে দিয়ে মানব সন্তানকে যদি রাষ্ট্রের বিশাল উন্মুক্ত পরিবেশে সহসাই নিক্ষেপ করে দেয়া হয়, তাহলে তার পক্ষে সঠিক যোগ্যতা নিয়ে গড়ে ওঠা কখনই সম্ভব হবে না। পরন্তু পরিবারকে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের বাইরে যথাযথভাবে রক্ষা করা হলে তার মানব বংশের জন্যে এক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র (Training Centre) হতে পারে, যার ফলে উত্তরকালে তারাই রাষ্ট্রের বিরাট দায়িত্ব পালনের যোগ্যতায় ভূষিত হবার সুযোগ পাবে।

পরিবারের ভিত্তি স্থাপন

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাইবোন প্রভৃতি একান্নভূক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত মানব মণ্ডলিকে পরিবার বলে। স্বাভাবিক নিয়মনীতি অনুসারে যখন একজন পুরুষ ও একজন নারী একসঙ্গে জীবনযাত্রা শুরু করে তখনই তাদের মাধ্যমে একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এখানে নর-নারীর সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। এদুটি সত্তার সম্মিলিত আবেগ, অনুভূতি ও ভালবাসাপূর্ণ যৌনজীবনকে বলা হয় দাম্পত্য জীবন। তাদের দাম্পত্য জীবন-যাপনের মাধ্যমে মানব বংশের সম্প্রসারণ বিস্তৃত হয়েছে। যা মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ।[৪১] আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ.৪১-৪৪

৪১। সম্পাদনা পরিষদ, ***ইসলামিক ফাউন্ডেশন***, প্রাগুক্ত,পৃ৩৮৫

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর তোমরা একে অপরকে যাচনা কর এবং সতর্ক জাতি বন্ধন সম্পর্কে; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।"[৪২]

নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হলো বিয়ে, যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির অবাধ ও নিঃশংক চরিতার্থতা। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এর দ্বিতীয় মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। তথা উত্তরাধিকারী উৎপাদন করা। এটি একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী বংশ প্রতিষ্ঠান। বিয়ে, দাম্পত্য জীবন ও পরিবার গঠন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বাভাবিক বিধান। আর এ জন্যেই মহান আল্লাহ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুর'আনেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়; ومن كل شئ خلقنا زوجين "আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"[৪৩]

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার দুটি ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এ প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূণ্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। পরিবারবিহীন মানবজীবনের কোন স্থিতিশীলতা নেই। পরিবারহীন মানুষ নোঙরহীন নৌকা বা বৃন্তচ্যুত পত্রের মতোই স্থিতিহীন। আর পরিবারের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সমসাময়িক কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবারের ক্ষেত্র ছিল বিশাল ও বিস্তৃত। আর এটাই ছিল সমাজ ও জাতি গঠনের একমাত্র উপায়-উপকরণ। এ কারণেই প্রাচীণকালের গোত্র ছিল অধিকতর প্রশস্ত; এতদূর প্রশস্ত যে নামমাত্র রক্তের সম্পর্কেও বহু ব্যক্তি এক একটি গোত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে পারত। পরিবারের অতি আপনজনদের ন্যায় সে লোকটিরও জীবন, সম্পদ, ইজ্জত-আবরুর রক্ষণাবেক্ষণ করা হত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে।[৪৪] প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিবারের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল।[৪৫]

৪২। আল-কুরআন, ৪:১

৪৩। আল-কুরআন, ৫১:৪১

৪৪। প্রাক্ ইসলামী যুগে আরব সমাজে আপন পুত্রের ন্যায় পালিত পুত্র গ্রহণের রীতি ছিল। ইউরোপ এই সেদিন পর্যন্তও পালিত পুত্রকে আইন সম্মতভাবেই বংশোদ্ভূত সন্তানের সমপর্যায়ভূক্ত মনে করা হত। রোমান সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়েও অগ্রসর। যেখানে জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত পরিবারের অংশ বলে মনে করা হত; মর্যাদা যত কমই হোক না কেন।

৪৫। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের নিকট নিজের জান ও মাল চিরকালই অত্যন্ত প্রিয় সম্পদ। এসবের জন্যেই মানুষ চেষ্টা ও শ্রম করত; সকল প্রকার বিপদ ও ঝুঁকির মোকাবিলা করত এবং তার সংরক্ষণের জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার রক্ষা-ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হত। তাদের প্রিয় জান-প্রাণ সুরক্ষিত রাখার সব উপায় ও পথ অবলম্বন করা হত। মানুষ যখন উপলব্ধি করতে পারল যে, তার জান ও মালের সংরক্ষণ তার পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিপদ-মসিবতে ভারাক্রান্ত সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তার পরিবারই তার একমাত্র আশ্রয়। এ পরিবারই তাকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করছে, তার দুঃখ-দরদ ও বিপদ-মসিবতের বেলায় তার সাথে সমানভাবে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন তার পক্ষে পরিবারের সাথে পূর্ণমাত্রায় জড়িত ও একাত্ম হয়ে থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[৪৬]

কোন ব্যক্তির জন্য তার পরিবারস্থ এক-এক ব্যক্তি যখন অপরিমেয় সাহায্যকারী ও সংরক্ষণকারী হয়, তখন সে নিজেও পরিবার ও পরিবারর প্রত্যেকের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত থাকে, এমনকি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। আর এ ভাবধারা থেকে পরিবারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভাবধারা উৎসারিত হয়; আপন ও পরের মধ্যে পার্থক্য সূচীত হয়। তখন নিজ পরিবারে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সুখ্যাতি প্রচার করা হয়, তাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে গৌরব করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাকে নিজের সৌভাগ্যের বিষয় বলে ধারণা করা হয়। এ হচ্ছে মনের স্বাভাবিক ভাবধারার মূর্ত প্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা বেহেশতে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে বিবি হাওয়া (আঃ) এর মাধ্যমে যে দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনের শুভ সূচনা করেছিলেন কাল পরিক্রমায় সে পরিবার প্রথা আজও স্বমহিমায় ভাস্বর। পবিত্র কুরআনে এটি একটি উত্তম নিদর্শন, চরম বিস্ময়ের ব্যাপার বলে ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে–

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا

"তার নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৪৮]

৪৬। এক আরব কবির উক্তি এখানে তার প্রতিচ্ছবি বহন করে–

لا يسئلون اخاهم حين يندبهم۔ فى النائبات على ما قال برهانا۔ وقربت باقربى وجدك انى۔ متى يك
امر للنكيثة اشهد ۔ وان ادع للجلى اكن من حماتها۔ وان ياتيك لاعداء بالجهد اجهد

"বিপদ-মছিবতে তার ভাই যখন ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে, আওয়াজ তোলে, তখন সে তার এ কাজের কোন যুক্তি খুঁজে বেড়ায় না। আমি নিকট আত্মীয়তার হক আদায় করেছি, তোমার ভাগ্যের শপথ, যখন কোন বিপদের ব্যাপার ঘটবে, তখন আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব। কোন কঠিন বিপদকালে আমাকে ডাকা হলে আমি তোমার মর্যাদা রক্ষাকারীদের মধ্যে থাকব, শত্রু তোমার ওপর হামলা করলে আমি তোমার পক্ষে প্রতিরোধ করব।"

৪৭। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৪৮। আল-কুর'আন, ৩০ : ২১

এভাবে মানুষের জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এতে করে পারিবারিকভাবে এক সাথে বসবাস পারস্পরিক স্নেহ-মমতা-ভালবাসা, সমন্বয়-সমঝোতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে শান্তি ও শৃংখলা, তমুদ্দুন ও সংস্কৃতি। পারিবারিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছে সন্তান-সন্ততি যা কালক্রমে গোটা দুনিয়া জনমানুষে ভরপুর হয়ে যায়। সেই থেকে পারিবারিক জীবন–যাপন মোটামোটিভাবে দুনিয়ার সকল দেশ ও জাতিতেই প্রচলিত। কমিউনিজমের মূল প্রবক্তা ও থিউরী প্রবর্তক কার্ল মার্কস পরিবার প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে সমাজে বাছাই করা নারী-পুরুষের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে রাষ্ট্রীয় দেখাশুনার প্রতিপালনের প্রেসক্রিপশন প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা খোদ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও বাস্তবায়িত হয়নি। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও পারিবারিক প্রথা চালু রয়েছে। অবশ্য সে সব দেশে পারিবারিক জীবনে পবিত্রতা ও মাধুর্য বহাল নেই। স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, তালাকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, সন্তান প্রতিপালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহবোধ ও দায়িত্ববোধ কমে গেছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ ও কর্তব্যপরায়নতা হ্রাস পেয়েছে।[৪৯]

মুসলিম পারিবারিক জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো পরিবারের সদস্যদের জীবনবোধ, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ। এক্ষেত্রে সমান্যতম ব্যতিক্রম ছাড়া একজন মুসলিমের যে, প্রকৃত জীবনবোধ, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য তা আধুনিক সমাজে পরিবর্তন হয়ে গেছে। কুর'আন-হাদীস মোতাবেক জীবনের যে চুড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আল্লাহর বিধানমত জীবন-যাপন তা আজকের মুসলমান ভুলে গেছে। তারা দুনিয়ার প্রতারণার জালে আটকা পড়ে গেছে। ফলে নানা কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির সমাজ জীবনের মাধ্যমে ঢুকে পড়েছে পারিবারিক জীবনে। কুর'আন-হাদীসের আলোকে জীবন-যাপন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে মুসলিম পারিবারিক জীবন।

কুর'আন ও হাদীস নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক করেছে, নারীকে যে মর্যাদা দান করেছে, আজ তা সমাজে নেই। বরং সমাজে আজ চলছে নারী নির্যাতন, নারী অবহরণ, নারীকে নিয়ে দেহ-ব্যবসা, নারী স্ত্রী-হিসেবে পায় না যথার্থ মর্যাদা, মা হিসেবে যথার্থ সম্মান, কন্যা হিসেবে যথার্থ শিক্ষা। এভাবেই অধিকাংশ মুসলিম পরিবার আজ বিপর্যস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানাদি নিয়েই গঠিত পরিবার। সন্তান-সন্ততির মধ্যে এ সম্পর্কগুলো কিছুদিন স্থায়ী হলে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এক ধরণের ঐক্যবোধ ও সংহতি গড়ে উঠে। এ ঐক্য ও সংহতির চেতনা ঐ সম্পর্কগুলোকে রক্ষা করে থাকে। পৃথিবীর সব দেশে সব ধরণের সমাজেই পরিবারের এই ঐক্যবোধের পাঁচটি বিশেষত্ব পাওয়া যায়।

৪৯। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *মু'মিনের পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা: আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২,) পৃ. ৩৬-৩৭

যেমন: (১) যুগল সম্পর্ক; (২) বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী জৈবিক সম্পর্ক সৃষ্টি; (৩) বংশানুক্রমে পরিবারের বিকাশ লাভ; (৪) সাধারণ বাসস্থান বা একই গৃহে অবস্থান ও (৫) একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠীজীবন পরিচালনা।[৫০] তাঁদের মতে, পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া পরিবারের চিন্তাও করা যায় না। তাঁরা এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য পরিবারের মধ্যে সদা বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেন।

১. যুগল সম্পর্ক সাধারণত পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান নিয়ে একটি পরিবার গড়ে উঠে। এইজন্যেই নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক পরিবার ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই রাম নাথ শর্মা বলেছেন,

æ Marrital relation is different counties may be more or less permanent, but the relation between man and woman have some degree of permanency in all cultures with out this, neither can the children be brought up nor can these be any family. Even in societies where polygamy and polyandry are customary the husband-wife relationship does possess some of permanacy.[৫১]

২. বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী সম্পক সৃষ্টি সুখ-দুঃখ নিয়ে মানুষের জীবন। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের আবর্তন সব সময়ই ঘটতে থাকে। ফলে তার প্রয়োজন এমন একজন সঙ্গীর, জীবন সর্বক্ষেত্রে সবসময় ও সর্বরকমের অবস্থায়ই তার সহায় হয়ে থাকবে। মানুষের জীবনধারায় এ এক স্থায়ী মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণের জন্যেই নারী ও পুরুষের মাঝে স্থায়ী বন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ই জীবনের তরে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। স্থায়ী ও বন্ধনের সুযোগে নারী-পুরুষের জীবন সার্থক হতে পারে। বিয়ের বন্ধনই হচ্ছে এক অকাট্য দৃঢ় সত্য। তাই বলা হয় æ The family rests an parmanent marital relations because one main object of it is the astablishment of parmanent sexual relationships. Without marrige there can be family even though there may be several relations. When the relations break up, as in the case of divorce, the family disintegrates. Proper upbringing of children can be expected only when these are permanents canjugal relations,”[৫২]

৫০। Maeives and page, OP.Cit, PP.237-240

৫১। Ram Nath Sharma, ***Prineiples of Soeiology***, J.K. Publishars, West Sussex-Rh12, IJF. U.K-1982, P.290

Dhaka University Institutional Repository

৩. বংশানুক্রমে পরিবারের বিকাশ লাভ পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরাধিকার উৎপাদনের মাধ্যমে বংশের ধারা অব্যাহত রাখা। তাই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা পরিবারের আর একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। তবে এ রক্তের সম্পর্কটি অকৃত্রিম অথবা কৃত্রিমও (real or imaginary) হতে পারে। তাই এ সম্পর্কে রাম নাথ বলেছেন, æ The members of the family are generally the descendants of the same ancestoes. The relation belween adopted children and their parents is accepted as legal but blood relationship means no more than that among the members of familly there ahould exist an attachment of the degree of blood relationships. It is generally believed to be necessary that there should exist no blood relationship between husband and wife.[53]

৪. সাধারণ বাসস্থান একত্রে বসবাস করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। এ স্বভাবজাত প্রবণতাই মানুষকে পরিবারবদ্ধ হয়ে বসবাসের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। সমাজ বিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেন, "পরিবারকে একটি একক জৈব সংস্থা বলা যায়, যার সভ্যগণ একটি সাধারণ বাসস্থানে বসবাস করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে যৌন সম্পর্কের দিক আছে তাকে একটি আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এটা এমন একটি পারস্পরিক নামের পরম্পরা ও পুরুষানুক্রম নির্ণয়ের রীতি, যার দ্বারা যে সকল সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তার নির্ণিত হয়।[৫৪] তদুপরি, রক্ত ও অন্যান্য সম্পর্ক থাকার পরও যদি একই পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে তখন তাদেরকে একই পরিবার বলা সুকঠিন।প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারের কোন সদস্য আলাদা স্থানে বসবাস করতে পারে, তবে পরিবারের সকল সদস্য একই স্থানে একত্রে বসবাস করাটাই স্বাভাবিক। এমনকি যাযাবর পরিবারের সকল সদস্য মিলে একই স্থানে একত্রে বসবাস করে।

৫. একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠীজীবন পরিচালনা আদিম সমাজে পরিবার গড়ে উঠেছিল আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনে। তখনকার সমাজে জৈবিক প্রয়োজনের চেয়ে আর্থিক প্রয়োজনই ছিল বড়। বিবাহিত নব দম্পতি যে পরিবার গঠন করত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা নির্বাহ। কেননা, প্রকৃতিতে খাদ্যের অনিশ্চয়তা তাদেরকে সর্বদা ব্যস্ত রাখত। কৃষি সভ্যতা উদ্ভবের পর থেকে পরিবারকে নানাবিধ আর্থিক কাজ কর্ম করতে হয়। ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজতকরণ,বণ্টন ইত্যাদি কাজ-কর্ম পরিবারের সদস্যদের উপর বর্তায়।

৫২। Ibid, PP.290-291

৫৩। Ibid, P. 291

৫৪। Gisbert, Op:Cit.P.64

রাম নাথের মতে, æThe earning members of the family arrange for the subsistence of the other members. In this way the members of the family are bound in the tios of duties and rights. In different cultures the burden of earning may full on different members. As some places the women go out to work while the men do the domestic chores but the principle that there should be provision in the family for the sustenance of its members is accepted almost every where.”[55]

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-পরিবার একটি যৌনভিত্তিক সংস্থা; বিবাহ প্রথা এই যৌন সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে; এটা বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের নামের তালিকা (Nomenclature) নির্ণয় করে এবং বংশের ধারাক্রম নির্ধারণ করে; মাতা-পিতা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি পরিবারের একটি সাধারণ বাসস্থান থাকে।

এখন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। সমাজে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যত সংগঠন বা সংস্থা আছে তন্মধ্যে পরিবারের তুলনায় সমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আর একটিও নেই। নানা উপায়ে বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে এ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত। এ সংগঠনটিতে কোন পরিবর্তনে সমগ্র সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তনের কম্পন শুরু হয়। নানা ধরনের ও বহু বৈচিত্রময় হলেও সকল পরিবর্তনের মধ্যে এ সংগঠনটির মূল রূপ যেন শাশ্বত। তাই দেখা প্রয়োজন সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এর স্বকীয়তা বা পার্থক্য কোন দিকে।

প্রথমত ঃ এর সর্বজনীনতা। অসংখ্য, কোটি কোটি জীবকোষ নিয়ে যেমন মানবদেহ গঠিত, তেমনি সকল সমাজে, সমাজ বিবর্তনের সকল স্তরে সমাজ সর্ব নিম্নতম স্তরের ক্ষুদ্রতম অসংখ্য একক এ পরিবারগুলো নিয়েই বড় বড় সমাজ গঠিত। প্রতিটি মানুষই কোন না কোন পরিবারের সদস্য ছিল বা আছে।[৫৬]

দ্বিতীয়ত ঃ পরিবারের ভিত্তি হল অপরিমিত আবেগ, এর অভ্যন্তরে প্রতিট সম্পর্কই আবেগপ্রধান। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান যেমন ফুটবল ক্লাব, ব্যায়াম সমিতি, স্কুল-কলেজ, শ্রমিক সংঘ, মালিক সমিতি, সরকার প্রভৃতি মানুষ তৈরী করে নিজের বুদ্ধি ও চিন্তা প্রয়োগ করে, অনেক বিচার-বিবেচনা করে। কিন্তু পরিবার যেন সকল সচেতন বিচার বোধের বাইরে, যেন আবেগের তাড়নায় আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে। শারীরিক ক্ষুধা, সন্তান আকাঙ্খা, মাতৃস্নেহ, পিতার দায়িত্ববোধ-সকল কিছু পরিবারের মধ্যে প্রবল আকর্ষণের স্রোত বহাতে থাকে। এগুলো প্রাথমিক আবেগ। এগুলো পরিপুষ্ট হয় দ্বিতীয় স্তরের আবেগ দ্বারা।

৫৫। Ram Nath Sharma, Op.Cit. P.291

৫৬। আধুনিক কালের কয়েকজন সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভারও পেগ, সোয়ানটন, ম্যালিনোস্কী, র‌্যাডক্লিফ ব্রাউন প্রমুখ মনে করেন যে, পরিবার একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সর্বস্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

যেমন স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সকলের মধ্যে রোমান্টিক ভালবাসা, বংশের গর্ব-অহংকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আকাঙ্খা, অথবা আমার অধিকারে কত সম্পত্তি, কত লোকজন আছে এরূপ ব্যক্তিগত মালিকানার অহংবোধ। এ সবের জোরেও পরিবার ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং সমাজের সকলেই তা মেনে নেয়। এরূপ কতগুলো নিয়ম-কানুন ও নিষেধাজ্ঞা থাকে বলে পরিবারগুলো ভেঙ্গে যেতে পারে না।[৫৭]

তৃতীয়ত ঃ গঠনমূলক প্রভাব। পরিবারই সকল প্রকার উচ্চতর জীবনের প্রথম সামাজিক পরিবেশ। পরিবারের মধ্যে থেকেই ব্যক্তির শরীর ও মনের শত-সহস্র অভ্যাস সকলের অজান্তে ব্যক্তির সংস্কৃতি ও চরিত্র গড়ে তোলে, তার ব্যক্তিত্বের কাঠামোকে রূপ দান করে।

চতুর্থত ঃ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের কাজ-কর্ম অনেক বেশী অপ্রকাশ্য , দূর্ভেদ্য, গোপনীয়তায় নিজেকে ঘিরে রাখে। বাইরের ব্যক্তির প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ- এটাই যেন পরিবারের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে।[৫৯]

পঞ্চমত ঃ পরিবার হল একটি নমুনা বা ক্ষুদ্র মডেল। যাকে অনুসরণ করে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। পরিবারকে সমাজের জনকোষ বলা হয়। সমাজ পরিচালনার পদ্ধতি মানুষ প্রথমে শিখে পরিবার পরিচালনার পদ্ধতি ও রীতিনীতি থেকে। মূলত: সমাজ কাঠামোই কতগুলো পরিবারের সম্মিলন। পরিবার থেকেই সমাজের বিকাশ লাভ ঘটে। যদিও সমাজ তার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি দ্বারা পরিবারের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিবারের কার্যাবলী

সাধারণ পর্যালোচনায় দেখা যায় মানুষ যৌনানুভূতি, সন্তান লাভের বাসনা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনের নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে পরিবার পদ্ধতিতে জীবন যাপন করে থাকে। সমাজ জীবনে মানুষ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু অবধি সেখানে জীবন অতিবাহিত করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পরিবার আয়তনে ক্ষুদ্র সংস্থা হলেও গুরুত্বের বিচারে এর স্থান সবার উপরে। ব্যক্তির আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই বলতে গেলে পরিবারেরই দান। এজন্য বিভিন্ন প্রকারের বহুবিধ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে পরিবার সমাজ জীবনে বিদ্যমান। সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবারের কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

৫৭। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ M.F. Nimkoff, Marriage & the Family ও Encyclopaedia of Americana, Vol-ii, P.2

৫৮। Ram Nath Sharma, Op. Cit., P. 292

৫৯। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারকে দূর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবন যাপন করা নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে দূর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত লোকগণ। দূর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দূর্ভেদ্য, তার ভিতরে জীবন যাত্রা যে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত, পরিবারের পরিবেশ ও অসৎ অশ্লীল জীবনের হাতছানী বা আক্রমণ থেকে তেমনিই সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। বস্তুত: পরিবারস্থ ছেলে-মেয়ের পক্ষে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের তীব্র শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না।

জৈবিক কার্যাবলী (Biological Functions)

পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দু'টি। যথাঃ

(ক) স্বামী স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং

(খ) সন্তান জন্ম দান।

পরিবার যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত সংস্থা। নারী-পুরুষ পরিবার গঠন করলে তাতে তাদের যৌনতৃপ্তির যেমন সুবিধা হয়, তেমনি তারা বৈধভাবে সন্তানও জন্ম দিতে পারে। সুতরাং এ হিসেবে পরিবারকে সন্তান উৎপাদন ও লালন পালনকারী প্রতিষ্ঠানও বলা চলে। পরিবারের এ দু'টি কাজের মধ্যে প্রথমটিতে তেমন পরিবর্তন আসেনি। তবে সন্তান জন্ম দানের কাজ থেকে আধুনিক কিছুসংখ্যক পরিবার বিরত থাকছে। অথবা সন্তান জন্ম দান কাজে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, যাতে সন্তান জন্ম লাভ না করতে পারে বা কম সন্তান জন্ম লাভ করে। তাই বলে আধুনিক যুগে সন্তান জন্ম দানের জৈবিক কাজটি একেবারে পরিত্যক্ত নয়। মানব সভ্যতা তথা সৃষ্টির ধারা বজায় রাখতে এবং সন্তানদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে, শ্রমের চাহিদা মিটাতে সন্তান জন্ম দানের কাজটি বাদ দেয়া যাবে না। অপরপক্ষে সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তনে যে বিকল্প ব্যবস্থারই সৃষ্টি হউক না কেন স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা পরিবারের অন্যতম মৌলিক জৈবিক কাজ। [৬০]

নারী-পুরুষের জৈবিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য অনেক সময় সমাজে ব্যভিচার, অনাচারও হতে পারে। পরিবার গঠনের মাধ্যমে সমাজে শালীনতা রক্ষা হয় এবং আইন ও শৃংখলার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনের দ্বারা একত্রিত হয়ে মানব জাতির যাত্রার স্থায়িত্ব বিধান করে। সুতরাং সমাজকে সুন্দরভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে টিকিয়ে রাখতে হলে একমাত্র পরিবারের মাধ্যমেই যৌন তৃপ্তির দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটা সমাজের ব্যভিচার, অনাচার ও অন্যান্য অপরাধ দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী (Psychological functions)

প্রত্যেক পরিবারের একটি মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা রয়েছে। পরিবারই হল একমাত্র মানসিক যাতনা নিবারণের কেন্দ্রস্থল। পরিবার এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর প্রতি পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আদর-স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি যতটা জৈবিক, তার চেয়ে বেশী মনস্তাত্ত্বিক। মানব শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি হল শিশুর প্রতি মমত্ববোধ।
শিশুর গোসল, খাওয়ানো, পরিচর্যা, চিত্তবিনোদন, ব্যায়াম, আদর এবং সর্বোপরি তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটিও পরিবার করে থাকে। এ সকল কাজে শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতা ও আদর-সোহাগে তথা আবেগময় ভালবাসার কারণেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। আধুনিক সব সামাজিক মনোবিজ্ঞানীই এ কথা স্বীকার করেন যে, ব্যক্তিত্ব গঠনে শিশুর পারিবারিক অভিজ্ঞতা এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। বস্তুত: পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ তথা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে যত্নবান থাকেন। তাই রাম নাথ শর্মা বলেছেন,

---

৬০। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, -১৯৯০, পৃ. ১১২

"The individual receives affection, sympathy, love and psychological security in the family. The relations between man and woman in the family are not exclusively Physical, Profound conjugal affection for each other is generated in husband and wife by working together in the family and by sharing each others joys and sorrows. In the absence of family love and all round development of the child's personality. Ralph Linton has written that merely the satisfaction of bodily needs is not sufficient for the proper development of the infant. Children are in greater need of individual attention love and satisfaction of response."[৬১]

সুতরাং এ কাজগুলো পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। স্নেহের প্রতি আবেগ প্রবণ শিশু, কিশোর, যুবকদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবার যে মনস্তাত্ত্বিক কাজটি পালন করে তার কোন বিকল্প নেই। পিতা-মাতা ও অন্যান্য আপনজনদের কাছ থেকে শিশু-কিশোররা মানসিক খোরাক পায়। মাতাপিতার প্রতি তাদের আকর্ষণের কারণ এখানেই খোঁজতে হবে। [৬২]

রক্ষণাবেক্ষণমূলক কার্যাবলী (Protection and care of the children)

পরিবারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিশুর নিরাপত্তমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। শিশু মাত্রই খুবই অসহায়। সে পরিবারের বাইরের অজানা-অচেনা যে কোন ব্যক্তিকে ভয় পেতে পারে। সন্ধ্যা বা রাতের অন্ধকারকে, বিদ্যুতের চমকে বা প্লেনের শব্দে ভীত হতে পারে। খেলাধূলার সামগ্রী নিয়ে খেলতে গিয়ে, বাড়ীর জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। বিষাক্ত কোন ঔষধ সেবন করে অসুস্থ হতে পারে। এমন অনেক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, যাতে সাথে সাথে জীবন বিপন্ন হতে পারে অথবা ভয়ে বা মানসিক দৌর্বল্যে ভোগতে পারে। তাই পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এ ধরণের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তা বিধান। শহরের দুর্ঘটনা, বিদ্যুতের তারে হাত দেয়া, ব্যস্ত রাস্তায় ছুটাছুটি করা ইত্যাদি দুর্ঘটনামূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করার জন্য পরিবারের কর্তাব্যক্তিসহ বয়স্ক সকল সদস্য ব্যস্ত থাকেন।

৬১। Ram Nath Sharma, Op.Cit. P.303

৬২। এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিককালে শিল্পায়িত দেশসমুহে আর্থিক প্রয়োজনে বা মর্যাদা অর্জনে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীরাও ঘরের বাইরে কাজ করছে। এ কারণে শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র বা নার্সারীতে রাখার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশেও এমনটি সীমিত পরিসরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, নার্সারীতে রাখা শিশুদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে না। তারা কেউবা পরবর্তিতে হীনমন্যতায় ভোগে, কেউবা কিশোর অপরাধী হিসেবে গড়ে উঠে। বস্তুতঃ পরিবারের স্নেহ-শাসনের কোন বিকল্প নেই। তাই নার্সারীর মত কিছু সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেই যে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এমনটি বলা চলে না। তাছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই নার্সারী হচ্ছে একটি খন্ডকালীন সময়ের জন্য শিশু লালন-পালনের এক ব্যবস্থা। কাজ শেষে পিতামাতাকে নার্সারী থেকে শিশুকে পরিবারে ফিরিয়ে আনতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে পরিবারকেই লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে হয়। (মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১)

সুতরাং নার্সারীর তুলনায় পরিবারই শিশুর নিরাপত্তা বিধানে অধিক ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। তাই বলা হয়, æ The human child is the most helpless and weak being. A family is needed in order to mentain its existence and to ensure its co-orninated and balanced development. Its balanced development is achieved with difficulty without the care of the parents and other family members"[৬৩]

অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economical functions)

এটা অনস্বীকার্য যে, আদিম সমাজে পরিবার গড়ে উঠেছিল আর্থিক প্রয়োজনে। তখনকার সমাজে জৈবিক প্রয়োজনের চাইতে আর্থিক প্রয়োজনটাই ছিল বড়। বিবাহিত নব দম্পতি পরিবার গঠন করত তার মূল উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা নির্বাহ। প্রকৃতিতে খাদ্যের নিশ্চয়তা না থাকায় তখন নারী পুরুষ দলবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ, পশু পালন এবং কৃষি কাজ করত। সুতরাং পরিবারই উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল।[৬৪] প্রাচীনকালে মানুষের কার্যাবলীর বেশীর ভাগই পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বিধায় সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণভার থাকত পরিবারের মধ্যে। এজন্য মর্যাদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের মাঝে কার্যসমূহ বন্টন করা হত। পরিবারের পুরুষেরা কৃষি কাজ বা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাইরে কাজ করত এবং মেয়েরো ঘরে থেকে সংসারের তত্ত্বধান ও সন্তান-সন্তুতি লালন-পালন করত।[৬৫] কৃষি সভ্যতা উদ্ভবের ফলে ফসল উৎপাদন, তা প্রক্রিয়াজাতকরণ,বণ্টন ইত্যাদি নানাবিধ কাজ-কর্ম পরিবারের সদস্যদের উপর বর্তায়। মধ্যযুগে কুটিরশিল্পের কাজও পরিবারগুলোই করত। এখনও তাঁতী, কুমার ইত্যাদি পেশাজীবি সম্প্রদায় পরিবার পরিমন্ডলে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। বস্তুত: কৃষি সভ্যতার যুগে পরিবার হচ্ছে একটি উৎপাদনের একক। বর্তমান সময়ের বিবর্তনে অবস্থারও বিবর্তন ঘটেছে। পরিবার কর্তৃক উৎপাদনের অনেক কাজই রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান করে থাকে। পরিবারের সদস্যগণ সে সব স্থানে গিয়ে উৎপাদন সহায়তা করে। ফলে জীবিকার জন্য পারিবারিক সম্পত্তির নির্ভরশীলতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে উন্নতশীল এবং উন্নয়নকামী দেশগুলোতে এ অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক কার্যাবলী (Political functions)

পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্তুতিদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ কাজটি পরিবারের পক্ষেই সম্ভব। পরিবারকে রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করে পরিবারের কর্তাকে রাষ্ট্র প্রধানের সমতুল্য বলা চলে। পরিবারের মধ্যে নিয়ম-শৃংখলা প্রবর্তন, পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা, সহনশীলতা প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যগণ প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে।

৬৩। R.N. Sharma, Op. Cit., P. 304

৬৪। David M. Newman, Op. Cit., P. 239

৬৫। মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, *সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা ও বরিশাল, ১৯৯০, পৃ. ২৬২

৬৬। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রথম শিক্ষা পরিবারেই লাভ করে থাকে। সুতরাং পরিবারের গন্ডিতে সন্তান-সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিয়ম-শৃংখলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। মূলত: পরিবারই সুনাগরিকের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এজন্য পরিবারকে নাগরিক গুণের প্রাথমিক শিক্ষাগার বলা হয়ে থাকে।[৬৬]

সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Socialization & Social Control)

পরিবার সামাজিকতা শিক্ষা দেয়ার প্রধান কেন্দ্রস্থল। তাই পরিবারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা। সমাজের আকাঙ্খিত মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিবার শিশুকে গড়ে তুলে। পরিবারের সদস্য হয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা আমরা প্রথমত: পরিবার হতে লাভ করে থাকি। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, মূল্যবোধ,ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারই সরবরাহ করে থাকে। শিক্ষা আমাদের ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে বাস্তব জীবনের শিক্ষা।

অপরপক্ষে সমাজ কর্তৃক নিন্দিত বা সমাজবিরোধী অনেক কাজ রয়েছে, যা আবার আইন বিরোধী নয়। সমাজ কর্তৃক নিন্দিত বা সমাজ বিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বও প্রথমিকভাবে পরিবারই গ্রহণ করে। সামাজিক অনুশাসন তথা সামাজিক বিধিনিষেধ দ্বারা চঞ্চল মতি শিশু-কিশোরদের ব্যবহার, আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। কেননা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেক সহজ হতে পারে যদি শিশুকালে এবং কৈশোরে পরিবার থেকেই এ ধরণের প্রশিক্ষণ পায়।[৬৭] অতএব পরিবার একাধারে সন্তানদের সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী (Educational functions)

মানুষের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে পরিবার। কেননা পরিবারেই সন্তান-সন্ততিরা জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এজন্য পরিবারকে বলা হয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। আদিকালে এবং মধ্যযুগে মানুষ বিদ্যার্জন করত পারিবারিক মণ্ডলেই। সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার জন্য পরিবারেই অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হত এবং সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত করা হত। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দানের কাজ গ্রহণ করেছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা দানের কাজটি আজও পরিবারই করে আসছে।

পরিবার হতেই সন্তান-সন্ততি গড়ে উঠে এবং তাদের জীবনের রূপ পারিবারিক রূপের বহি:প্রকাশ বলা চলে। পরিবারে সন্তানরা যে শিক্ষা লাভ করে তা তাদের অন্তরে চিরস্থায়ীভাবে দাগ কাটে এবং তাদের উপর প্রবল ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক জীবনে তারা পরস্পর পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নম্রতা, ভদ্রতা, দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি গুনগুলো শিক্ষা লাভ করতে পারে। কেবলমাত্র পল্লীসমাজের নয়, নগর সমাজের পরিবারেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৬৮]

৬৭। মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

এছাড়া পরিবারের সুষ্ঠু পরিবেশে সন্তান-সন্ততিরা তাদের মনোভাবকে আগামী জীবনের পরিকল্পনায় গড়ে তুলে নিতে সুযোগ পায়। সুতরাং দেখা যায় পরিবারই হল শিক্ষা গ্রহণের প্রাণকেন্দ্র।

ধর্মীয় কার্যাবলী (Religious functions)

পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা দান। পরিবার যেমন প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল, তেমনি পরিবার থেকে পরিবারের সদস্যগণ ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকে।[৬৯] যেমন একটি মুসলিম পরিবারের সদস্যগণকে তাদের পরিবারের নিয়ম প্রথা অনুযায়ী চলতে হয় এবং তাদেরকে পরিবারের অন্য সদস্যগণের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। আবার তেমনি হিন্দু ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের ঠিক এভাবে সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। বস্তুত: ধর্ম মানুষকে নীতিবান, সৎ ও সত্যানুসন্ধানী করে তুলে। ধর্ম ব্যাক্তিগত লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবারই উপযুক্ত স্থান, যেখানে সন্তান-সন্ততি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে থাকে। পরিবারই বাড়ীতে বা মক্তবে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। সর্বোপরি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাতা-পিতা বা পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা শিশু-কিশোরদেরকে নিয়ে যান। এতে তারা নিয়ম-শৃংখলা, শিষ্টাচার ও নীতিবোধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং উদারনীতির অধিকারী হওয়ার শিক্ষা পায়।

চিত্তবিনোদনমূলক কার্যাবলী (Recreational functions)

পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে অবসর যাপন এবং চিত্তবিনোদনের কাজ। মানব জীবনে অবসর যাপন এবং চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। কেননা, কাজের ফাঁকে অবসরে বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে ক্লান্তি এবং একঘেঁয়েমিপনা দূর হয়। এজন্য বলা হয় বিশ্রাম কাজেরই অংগ। পরিবারের সদস্যগণ, অবসর সময়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের কর্মজীবনের বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে এবং জীবনের একঘেঁয়েমী ভাব দূর করতে পারে; যেমন-ছেলেমেয়েরা পরিবারে খেলাধুলা করে; বয়স্করা পরিবারে গল্প গুজব করে অবসর সময় কাটিয়ে থাকে।[৭০]

বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় দেখা যায়, গ্রামীণ পরিবেশে যখন মানুষ অবকাশ পায়, তখন তারা কবিগান, পালাগান, যাত্রা, পরিবারের পরিসরে কেচ্ছাকাহিনী এবং পুঁথি পড়ার আয়োজন করে আনন্দ বিনোদন করে থাকে।

৬৯। David M. Newman, Op. Cit., P. 239

৭০। মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অবসর কাটানোর জন্য ঘোড়ার দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগ লড়াই, নৌকা বাইছ, লাঠিখেলা, কাবাডি এবং অন্যান্য খেলাধূলাসহ গ্রামীণ মেলা, বাৎসরিক শিরনী এবং অন্যান্য অনেক পার্বন পালন করে থাকে। হাট-বাজারে গল্প-গুজব এবং বিভিন্ন স্থানে আড্ডা মেরে, রেডিও ও বিদ্যুতায়িত গ্রামে টেলিভিশন দেখেও মানুষ আজকাল চিত্তবিনোদনের কাজ সেরে থাকে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, তাসবিহ্ পাঠ, প্রার্থনা করা, কুর'আন পাঠ ইত্যাদি মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিত্তের প্রশান্তি আনয়নে সাহায্য করে।

শহরে আকাশের সময় হচ্ছে বিকেল, রাত, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির দিন। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের পরিবার জন্মদিন ও বিবাহ-বার্ষিকী চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। রেডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার, টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার ইত্যাদি অবসর যাপন এবং চিত্তবিনোদনের অন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ক্লাব, পার্ক, সিনেমা, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি শহরের অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত। শহরের জনসংখ্যার তুলনায় এ সবের সংখ্যা অবশ্য কম। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বনভোজন শহরবাসীদের অবকাশ কাটানো এবং চিত্তবিনোদন করতে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক সময় অত্যন্ত সীমিত পরিসরে শিক্ষা ভ্রমনেরও ব্যবস্থা করে থাকে। শিক্ষা-ভ্রমন সময় কাটানো ও চিত্তবিনোদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সেমিনার, সম্মেলন, খেলাধুলা, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা, গ্রন্থমেলা, রপ্তানীমেলা ইত্যাদিও শহরে অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের উৎস হিসেবে কাজ করে। পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ সব অবসর বিনোদনমূলক কাজে তার সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে বা তার অনুমতি দান করে।

উল্লেখিত কার্যগুলো সময় ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হলেও পরিবারের গুরুত্ব কোনদিন হ্রাস পাবে না। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সমাজের সকল সমস্যা পরিবার থেকেই উদ্ভব হয় এবং উহার সমাধান একমাত্র পরিবারের কার্যাবলীর মাধ্যমেই সম্ভবপর হতে পারে। তাই দেখা যায়, পরিবারের সামাজিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার সামাজিক গুণাবলীর সূতিকাগার। মা-বাবা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের আপত্য স্নেহে লালিত-পালিত শিশু আদেশ-আনুগত্য, দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা, আদব-কায়দা, নিয়ম-শৃংখলা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করে থাকে। এসব গুণাবলী সামাজিক মূল্যবোধের মৌলিক উপাদান। তাই মীর্জা মুহাম্মদ হুসাইন, ড. জে. এইচ. ওল্ডহামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ”The family is a school of character providing on education in sympathy and understanding in self control and co-operation. It is a training ground in responsibility and mutual obligation and builds the disposition, which fits its members to particepate in the wider life of the community.”[৭১]

৭১। উদ্ধৃতঃ Mirza Mohmmad Hossain, ***Islam and Socialism***, Ashraf, Lahore-1947, পৃ. ১৮৭

আবার একটি সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার ব্যবস্থা খুবই অপরিহার্য। বরং বলা যায়, সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য পরিবারই হচ্ছে প্রথম স্বাভাবিক বীজকেন্দ্র। এর ফলে যদিও একজন নাগরিক পরিবার কেন্দ্রিক এবং সাধারণ সমাজ বিমুখ হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তবুও ক্ষতির পরিমাণ পরিবার ধ্বংস করার অনিবার্য পরিণতির তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক কম।[৭২] সুতরাং শিল্প প্রসার, নগর প্রসার, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার, তাদের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা, গৃহের বাইরে অবসর যাপনের সুযোগ ও ইচ্ছা বৃদ্ধি এসব কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা, পরিবার হল নৈতিক ও মানসিক প্রয়োজনের ফসল। পরিবার চিরকালই ছিল। পরিবার বিশ্ব জগতের নিয়ম-শৃংখলা ও গতি-প্রকৃতির অন্তর্গত। এ্যারিস্টটলের মতে, যা ছিল, যা আছে তা প্রকৃতির প্রয়োজন আর প্রকৃতির প্রয়োজন বলেই তা নীতিসম্মত ও স্বাভাবিক। ফলে পরিবার থাকা প্রয়োজন, থাকা উচিৎ এবং চিরকাল থাকবেও।[৭৩] সুতরাং পরিবার ব্যবস্থার অবলোপের চিন্তাধারাকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বিশ্বের মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মানবোচিত গুণরাজির অব্যাহত স্রোতধারার স্বার্থে পরিবারের অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য।

পরিবারের শ্রেণী বিভাগ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরিবার একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সমাজের সর্বস্তরে এর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে পরিবারের গঠন বা প্রকৃতি সব দেশে সব সমাজে এক রকম নয়। দেশ ও সমাজভেদে পরিবারের বিভিন্ন রূপ ও গঠন দেখা যায়। মানব সমাজের বিভিন্ন অংশে ও ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে আমরা অনেক ধরণের পরিবার দেখতে পাই। এজন্য সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিবারের শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করেছেন। যেমন, প্রথমতঃ বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবারকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১। এক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamious family);

2। বহুস্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polygynous family);

৩। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (Family based on group marriage);

৪। বহুস্বামী বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polyandrous family);

* যে পরিবারে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দু'জনে যৌথভাবে বসবাস করে তাকেই এক বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আধুনিক সভ্য সমাজের সর্বত্র এর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।

* একজন পুরুষের সাথে একাধিক স্ত্রীলোকের বিয়ের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে উঠে তাকে বহুস্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

৭২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৮
৭৩। Mirza M. Hossain Op.Cit.,P.220

* একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে উঠে তাকে বলা হয় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। কতিপয় আদিম সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন।[৭৪]

* যে সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে পরিবার গঠন তার করে নাম বহুস্বামী বিবাহভিত্তিক পরিবার।

একপত্নীক পরিবার আধুনিক যুগে অনেক জনপ্রিয়। একপত্নীক পরিবার অধিক জনপ্রিয় হলেও সভ্য জগতে বহুপত্নীক পরিবার কোন কোন ক্ষেত্রে আইনানুমোদিত এবং অপেক্ষাকৃত শ্রেয়: মনে করা হয়। এমনকি বর্তমান শতাব্দীতেও একপত্নীক পরিবারের পাশাপাশি বহুপত্নীক পরিবার বিরাজ করছে।

A.W.Green – এর ভাষায়, æ Among the polygynous Siuai of Southern Bougainville, for example, an anthropologist census disclosed 210 monogamous families, 26 families of two wives and 8 families of three wives or more.”[75]

সমাজ বিজ্ঞানী কোনিং বলেন যে, বহু পত্নীক পরিবার অনেকটা প্রচলিত। এস্কিমোদের সমাজে, এশিয়ার যাযাবর লোকদের মধ্যে, আফ্রিকা ও আমেরিকার কৃষিজীবি উপজাতিদের সমাজে বহুপত্নীক পরিবার লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজেও বহুস্ত্রী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার অজানা নয়।[৭৬]

তবে বহুপতি বিবাহ ভিত্তিক পরিবার সভ্য সমাজে অনুপস্থিত। এমনকি আদি সমাজেও এর উদাহরণ বিরল।[৭৭] তবে উত্তর ভারতের জনাগার বাওয়ার থেকে ক্যাংরা উপত্যকা ও হিন্দুকুশ পর্যন্ত অঞ্চলে Polyandry লক্ষ্য করা গেছে বলে জানা যায়। ঐ এলাকাকে Polyandrous belt বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ভারতে টোডা এবং পলিনেশিয়ার মারকুইসানদের মধ্যে কয়েক ভাই মিলে একই স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ রয়েছে বলে নৃ-বিজ্ঞানীগণ উল্লেখ করেছেন।

৭৪। উল্লেখ্য যে, পরিবারের বিবর্তন ধারায় দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল বলে মর্গান তার পরিবারের উৎপত্তি তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। মর্গান কথিত কনস্যাংগুইন এবং পুনালুয়ান পরিবার দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবারেরই উদাহরণ। (Ram.Nath. Sharma, Op. Cit., P. 299)

৭৫। A.W. Green, Sociology, ***An analysis of life in modern society***, (ed) Mcgraw Hill. Inc. USA-1964, P.397

৭৬। গ্রামীণ মুসলিম সমাজে ধনী কৃষক পরিবারে বহুস্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার লক্ষ্য করা যায়। প্রায়ই ধর্মীয় সমর্থনের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয়ে প্রতাপশালী ধনী ব্যক্তিরা গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার বলয় বৃদ্ধি করতে কখনও বা প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হবার কারণে অথবা প্রথম স্ত্রীর পুত্র সন্তান না হবার কারণে অথবা সম্পত্তির লোভে অথবা নেহায়েত পছন্দ বা সুখের কারণে এমনটি ঘটে থাকে। বড় বা ধনী কৃষি পরিবারে কাজ কর্মের লোকের প্রয়োজনেও অনেকে বহুস্ত্রী গ্রহণ করে থাকে।

৭৭। A.W. Green, বলেন, æ Polyandry is found nowhere in the higher reachers of civilization and it is extremly rare among the preliterate ples,”(Sociology,P.394)

এরুরো (ভেনিজুয়েলা) এবং মালয় পেনিনসুলার কিছু উপজাতির মধ্যে স্ত্রী লোকের সংখ্যা কম হওয়ায় বহু স্বামী বিবাহ লক্ষণীয়। তবে এসব ক্ষেত্রে মূলতঃ একবিবাহ ভিত্তিক পরিবার রীতিই দেখা যায় । তবে স্ত্রীকে অন্যত্র যৌন সম্পর্কের অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র।[৭৮]

দ্বিতীয়ত ঃ ক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবারকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Matriarchal Family)

পরিবার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার প্রশ্ন রয়েছে। এ ক্ষমতা ও নেতৃত্ব যদি মা বা স্ত্রী বা বয়স্ক মেয়েদের উপর ন্যস্ত হয় তবে তার নাম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। প্রাচীনকালে অনেক দেশে পরিবারের রূপ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এরূপ পরিবারের মায়েরাই পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন। মায়ের দিক থেকে বংশ নির্ণয় হত। পরিবারের ধরণ এরূপ হলে সমাজে মায়ের স্থানই প্রধান হয় এবং মাকে কেন্দ্র করেই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠে। বর্তমানে ভারতেও অনেক পরিবারে মাকেই পরিবারের কর্ত্রী মনে করা হয় এবং মায়ের নাম ও পরিচয়ে বংশের সকলের পরিচয় দেয়া হয়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক পার্বত্য উপজাতি, মালাবার, কোচীন এবং আসামের অনেক উপজাতির মধ্যে এরূপ পরিবার এখনও আছে। এখনো আফ্রিকার কোন কোন আদিম সমাজে রাজ্য শাসন করে কেবল মেয়েরাই। সে রাজ্যে রাজার কোন অস্তিত্ব নেই। এক রাণীর মৃত্যু হলে সে স্থলে অন্য কোন স্ত্রীলোক ক্ষমতায় বসে। রাণীর মেয়েই সিংহাসনের একমাত্র দাবীদার হয়ে থাকে, ছেলে সম্পত্তির মালিক হবে না। ব্যাকোফেন (Bachofen) এবং ব্রিফল্টের (Briffault) মতে, মানব সমাজে প্রথমে মাতৃপ্রধান পরিবারের আর্বিভাব ঘটে। তাঁদের মতে, আদিম সমাজে সন্তান-সন্ততির পুরো পরিচয় জানার সুযোগ ছিল না। কারণ আদিম সমাজ ছিল বিবাহহীন অবাধ যৌনাচার ভিত্তিক। মাতাকে অবশ্যই সন্তান জন্ম দানের কারণে চিহ্নিত করা যেত। তা তাঁদের মতে, সন্তান- সন্ততিকে নিয়ে মাতাই প্রথম পরিবার জীবনের সূত্রপাত করে। মাতা ও সন্তানের এহেন পরিবারে মাতাই সে পরিবার প্রধান হিসেবে পরিবারের নেতৃত্ব দেবে, এটাই স্বাভাবিক। এজন্য মাতৃপ্রধান পরিবারকে Mother right বা মাতৃঅধিকার পরিবার এবং Matriarchy বা মাতৃতন্ত্র বলা হয়। এ অবস্থায় নেতৃত্ব ও সম্পত্তির মালিকানা মেয়েদের হাতে ন্যস্ত এবং উত্তরাধীকারী সূত্রে মাতার নেতৃত্ব ও সম্পত্তি মেয়েতে গিয়ে বর্তায়।[৭৯]

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব মানব সমাজে ছিল কিনা এ ব্যাপারে অনেক নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানী সন্দেহ পোষণ করেছেন।

৭৮। Gisbert, Op.Cit.PP.70-71.

৭৯। Ram.Nath. Sharma, Op. Cit., P. 298.

যেমন- Samuel Koenig বলেন, æ At present, authorities agree that a real matriarchate probably never existed. It is true that the matrilineal family existed in numerous primitive societies but this does not by any means imply rule by the mother, for under such a system women may actually be in a vary subordinate position. On the other hand, in a patriarchy, where men are definitely in authority, the woman may enjoy many rights and privileges."[80]

নৃ-বিজ্ঞানী লুই (Lowie) এ ধারণাকে সমর্থন করেননি। কেননা, তাঁর মতে, কোন সমাজে এর অস্তিত্ব মিলেনি। তবে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ইরোকুয়া মহিলারা গোত্র প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে এবং গোত্র প্রধানের মনোনয়ন দিতে পারত। এছাড়া আরো কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করত।[৮১] অপরদিকে ওয়েষ্টারমার্ক (Westermark) বলেন যে, আদিকাল থেকেই পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতেই ন্যস্ত হয়ে আসছে। তিনি অবাধ আদিম সমাজের কথিত যৌনাচার তত্ত্ব সমর্থন করেননি এবং তাঁর মতে, মানব সমাজের সর্বযুগে এবং সর্বকালে নির্দিষ্ট স্বামী-স্ত্রীসহ এক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, পুরুষের মধ্যে সম্পত্তি অর্জন করার প্রবণতা রয়েছে বিধায় পরিবারের পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। অধিকন্তু পুরুষের মধ্যে সৃজনশীলতা এবং দুঃসাহসিকতার কারণে পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।[৮২] Metta Spencer- মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্বকে মোটেই স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, আসল মাতৃতন্ত্র পৃথিবীর কোন সমাজেই নেই।[৮৩]

A.W. Green এর মতে, বাস্তবে সব সমাজে পুরুষের হাতে পরিবারের নিয়ন্ত্রণভার ছিল; এমনকি তথাকথিত মাতৃপ্রধান পরিবারেও স্ত্রীর শাসন বরাবরই তার ভাই কিংবা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের হাতে ন্যস্ত ছিল।[৮৪]

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

যে পরিবারে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয় এবং পুরুষ মানুষকে পরিবারের কর্তা বলে স্বীকার করা হয় তাকেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সকল দায়িত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। এ পরিবারে পিতাই হচ্ছেন সম্পত্তির মালিক ও প্রশাসক।

৮০। Samuel Koenig, Sociology, P. 134.

৮১। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ R.H. Lowie, ***Primative Society***, Routledge, London-1960.

৮২। এ চিন্তাধারা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভের জন্য দ্রষ্টব্য- Edward Westermarck, The History of Human Marriage, London-1891.

৮৩। æIn fact, true matriarchy is unknown among all the sociteis in the world. æMetta Spencer, Foundations of Modern Sociology, New Jarsey-1979, P.340

৮৪। A.W. Green, Op. Cit., P. 351.

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ভাই-বোনেরা তার অধীনস্থ পরবিারের সদস্য। পিতার অবর্তমানে তার ক্ষমতা অর্পিত হয় বড় পুরুষ সন্তানের উপর। ফলে পরিবারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার জন্য পুরুষই দায়ী থাকে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এ ধরণের পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য সমাজ বিজ্ঞানী স্যার হেনরী মেইন বলেছেন যে, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই আদিম পরিবার ছিল। আমরা প্রাচীন রোমে সর্বপ্রথম আদর্শ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বিদ্যমানতার প্রমাণ পাই; যেমন-রোমান প্যাট্রিয়ার্ক কেবলমাত্র পরিবারের প্রধান ছিলেন না, তার অধীনস্থ লোকজনের নিকট তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু শাসক এবং প্রধান উপদেষ্টা। আইনের চোখে তাঁকেই পরিবারের বৈধ প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হত। পরিবারের লোকজনের উপর তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বলবৎ ছিল। ফলে, প্রাচীন রোমে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল।

আবার রোমান পিতা ছিলেন বিশ্বস্ত স্বামী, পরিশ্রমী ও সৎ। তিনি স্ত্রীকে খুব কমক্ষেত্রে তালাক দিতেন। স্ত্রী ছিলেন তার সাহায্যকারী এবং পরামর্শ করার সাথী। রোমান আইন রোমান পিতাকে এ ক্ষমতা প্রদান করেছিল।[৮৫]

তৃতীয়ত ঃ বিবাহোত্তর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে সমাজ বিজ্ঞানীগণ তিনভাবে ভাগ করেছেন।

(ক) পিতৃবাস ঃ পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব-দম্পতি প্রথা অনুযায়ী স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে। এরূপ পরিবারকে পিতৃবাস বলা হয়।

(খ) মাতৃবাস পরিবার ঃ এরূপ পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পাত্র স্বীয় পৈতৃক বাসস্থান বা পৈতৃক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাত্রীর পরিবারভূক্ত হয়ে বসবাস করে। তাই এটাকে মাতৃবাস পরিবার বলা হয়।

(গ) নয়াবাস পরিবার ঃ মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে দম্পতির কেহই নিজস্ব পিতৃগৃহে বসবাস না করে সম্পূর্ণরূপে তাদের বাড়ীতে বসবাস শুরু করে। এরূপ পরিবারকে মাতৃবাস পরিবার বলে।[৮৬]

চতুর্থত ঃ বংশ মর্যাদা এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পিতৃসূত্রীয় পরিবার ঃ যে পরিবারের সন্তানগণ পিতার ধারায় সম্পত্তি এবং বংশ নাম বা বংশমর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করে তাকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। অর্থাৎ পরিবারের অধিকারের সূত্র অনুযায়ী পরিবারের সন্তানগণ সে অধিকার ভোগ করে থাকে; যেমন মাতা যদি এক জাতির অন্তর্ভূক্ত হয় এবং পিতা যদি অন্য জাতির অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে এ প্রকার পরিবারে পিতার জাতির উপাধি ও বংশমর্যাদা অনুযায়ী সন্তানদের বংশ মর্যাদা নিরূপণ করা হয়।

৮৫। Gisbert, Op.Cit.PP.74-75.

৮৬। কিছু সমাজে অবশ্য 'দ্বিবাস প্রথা' রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমাজ নব দম্পতির উপর বসবাসের বিষয়টিকে ছেড়ে দেয়। তারা ইচ্ছা করলে পিতৃ বা মাতৃ যে কোন আবাসে বসবাস করতে পারে। উল্লেখ্য যে, বিবাহোত্তর আবাস বংশ বা সম্পত্তি উত্তরাধিকারের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়।

(খ) মাতৃসূত্রীয় পরিবার ঃ অন্যদিকে পরিবারের সদস্যগণ যদি মায়ের বংশমর্যাদা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। অবশ্য এ জাতীয় পরিবারে মা, মামা ও নানাকে পিতা, চাচা ও দাদার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। সাধারণত পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় নীতি পরিলক্ষিত হয়। অপরপক্ষে, মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে মাতৃসূত্রীয় নীতি লক্ষ্য করা যায়। নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পৃথিবীর প্রায় ১৫% ভাগ পরিবার মাতৃসূত্রীয়। মাতৃসূত্রীয় পরিবারে পিতার ক্ষমতা মাতার চেয়ে বেশি মনে করার কারণ নেই।[৮৭]

পঞ্চমত ঃ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) বহির্গোত্র বিবাহ ভিত্তিক পরিবার (exogamous family) এবং (খ) অন্তর্গোত্র বিবাহ ভিত্তিক পরিবার (endogamous family)। প্রথমটির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক বিধি অনুসারে অব্যশই স্বীয় গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধরণের পরিবারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক বিধি অনুযায়ী অবশ্যই স্বীয় গোত্রে বিবাহ করতে হয়। বহির্গোত্র বিবাহের অন্যতম কারণ হল অজাচারের (Incest) উপর নিষেধাজ্ঞা (Taboo) আরোপ।[৮৮]

নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে, আদিম সমাজে অজাচার (Incest) বন্ধ করতে সর্বপ্রথম বহির্গোত্র বিবাহের প্রচলন শুরু হয়।[৮৯] অন্তর্গোত্র বিবাহের কারণ হল, নিজ গোত্রের মধ্যে তথাকথিত রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা।[৯০]

ষষ্ঠত ঃ কোন পরিবার যখন সমাজে একটি সংগঠন হিসেবে বিরাজমান, তখন সে পরিবারকে যৌথভাবে অন্যান্য পরিবারের সাথে বসবাস করতে দেখা যায়। আবার শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিসহ বাস করতে দেখা যায়। সুতরাং সংখ্যা ও সদস্য অনুযায়ী পরিবারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

---

৮৭। Metta spencer, Op. Cit, P. 340. (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, যেহেতু পরিবার পিতৃসূত্রীয়, অথবা মাতৃসূত্রীয় যে কোন একটি রূপ নেয়, সেহেতু উত্তরাধিকার, বংশ এবং জাতি সম্পর্ক (Kinship) একসূত্রীয় (Unilateral) বা একটি ধারায় (পিতা বা মাতার) লক্ষ্য করা যায়। তবে পাশ্চাত্যের সমাজ এবং বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে মাঝে মধ্যে মাতা এবং পিতা উভয় ধারায় দ্বিসূত্রীয় (bilaterl) জাতি সম্পর্ক দেখা যায়। হিন্দু সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের দিক থেকে বলা যায় যে, পিতৃসূত্রীয় নীতিই প্রাধান্য পায়। কেননা, সাধারণত হিন্দু মেয়েরা বাবার সম্পত্তি উত্তক্ষাধিকার সূত্রে পায় না। সম্পত্তি কেবল পিতৃধারায় পুত্র সন্তান পায়। মুসলিম সমাজে বাবা ও মায়ের সম্পত্তি পুত্র ও কন্যা সন্তানেরা পেয়ে থাকে। তাছাড়া সন্তান-সন্ততি বাবা এবং মায়ের উভয় বংশ বা কূলকে সমভাবে গুরুত্ব দেয়। তবে পিতার বংশ নামটিই কার্যত গৃহিত হয়। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পিতৃপ্রধান, পিতৃবাস এবং পিতৃসূত্রীয় পরিবার, একই সমাজে একই সাথে বর্তমান। অর্থাৎ প্রায় ক্ষেত্রেই পিতৃপ্রধান পরিবার সাধারণত একাধারে পিতৃবাস এবং পিতৃসূত্রীয় রূপ নেয়। তবে এ নিয়মটি সব ক্ষেত্রে হতেই হবে এমন কথা নেই। (মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত.পৃ.১০৫)

৮৮। এখানে উল্লেখ্য যে, অজাচারের (Incest) বলতে বুঝায় আপন ভাই-বোন, মা-বাবা এবং এমনি অতি নিকট এমন সব ব্যক্তির সঙ্গে যৌনসম্পর্ক যা সমাজ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ বা যার উপর নিষেধাজ্ঞা (Taboo) আরোপিত।

৮৯। The Encyclopadia Americana.Vol-11. P-2

৯০। অনেকেই নিজ গোত্র বা বংশের তথাকথিত কৌলিণ্য রক্ষার জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে নিজ গোত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আমাদের সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে এ ধরণের প্রথা কেউ কেউ অনুসরণ করে থাকেন। যেমন-হিন্দু সমাজে স্বজাতি বর্ণের মধ্যেই বিবাহ বাঞ্চনীয়। মুসলিম সমাজে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই, যাকে অন্তর্গোত্র বা বহির্গোত্র বলা চলে। (মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত.পৃ.১০৮)

(ক) একক পরিবার (Nuclear family)

যখন পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে একক ভাবে বসবাস করে, তখন তাকে একক পরিবার বলে। একক পরিবার স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। একক পরিবার চিরন্তন সামাজিক দৃষ্টির বিষয়ীভূত সংগঠন।[৯১] মূলতঃ দেখা যায় যে, এ একক পরিবার থেকেই সকল পরিবারের উদ্ভব হয়েছে এবং যে কোন পরিবার স্ত্রী ও পুরুষকে নিয়ে গঠিত হয়। আর আধুনিক যুগে একক পরিবারের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন, আধুনিক ব্যক্তিত্ববাদ বা Individualism- এর ক্রিয়াশীলতার কারণেই একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৯২]

(খ) যৌথ পরিবার (Joint family)

যৌথ পরিবার একক পরিবারের তুলনায় আকারে বড়। এখানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান- সন্ততি, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, ও নাতি-নাতনীসহ সকলে একত্রে বসবাস করে। সুতরাং যে পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ একত্রে বসবাস করে সাধারণত তাকেই যৌথ পরিবার বলা হয়। যৌথ পরিবারের ধর্ম ও সম্পত্তি এক। যৌথ পরিবারের বন্ধন দৃঢ় হওয়ার পেছনে পরিবারের কর্তার বা পিতার বিষয় একটি প্রধান বিষয়। যৌথ পরিবার অনুন্নত সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'প্রত্যেক লোককে যৌথ পরিবারের ক্ষমতা অনুযায়ী গ্রহণ এবং প্রত্যেক লোককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান'- এ নীতির ভিত্তিতে যৌথ পরিবার পরিচালিত হয়। বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক সমাজে এই পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, কৃষিভিত্তিক পরিবারে জনশক্তি একটি প্রধান উপাদান। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক কার্যের সুবিধা হয়। উপমহাদেশের হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত পরিবারগুলো তিন থেকে চার প্রজন্ম পর্যন্ত একত্রে বসবাস, কাজকর্ম এবং জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।[৯৩] বিষয় সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক কার্যের সুবিধা ভিন্ন পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হওয়ার পেছনে ধর্মের দান অপরিসীম।[৯৪] তবে আধুনিক শিল্পের প্রসারতা, নগরের পত্তন ও ব্যক্তিস্বার্থ প্রসারের সাথে সাথে যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন ও শিক্ষা প্রসারের ফলে যৌথ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাচ্ছে।

যৌথ পরিবার অনুন্নত দেশ ও কৃষিভিত্তিক সমাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক যুগে যান্ত্রিক ও শিল্পোন্নত হওয়ার ফলে পারিবারিক যৌথ ব্যবস্থা টিকে সম্ভব হচ্ছে না। আর সে কারণেই উন্নতশীল ও উন্নয়নকামী দেশগুলোতে বিশেষ করে শিল্পোন্নত সমাজে এর ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছে এবং একক পরিবারের প্রধান্য বেড়ে যাচ্ছে।

৯১। R.H. Lowie, Op.Cit. PP. 66-67.

৯২। T.B. Bottomore, Sociology, Blackie and Son Ltd. 2nd ed. India-1970. P.170

(খ) বিস্তৃত পরিবার (Extended family)

এ জাতীয় পরিবার যৌথ পরিবারেরই একটি প্রকারভেদ। এ পরিবারের অন্তর্গত হয় স্বামী স্ত্রী, বিবাহিত পুত্রগণ ও তাদের পরিবার, অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রী। অনেকে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিবার কথাটি উপমহাদেশের পরিবার প্রথা সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, অন্যত্র একে বিস্তৃত পরিবার (Extended family) বলা হয়। কারণ, ভারতীয় প্রথায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও পরিবার বিভাগ সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও বিধি-নিষেধ আছে, যা অন্যত্র নেই।[৯৫]

পরিবারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত পর্যলোচনার আলোকে বলা যায় যে, হাতে গোনা দু'চারটি উদাহরণ ব্যতীত বহুপত্নীক পরিবারের চেয়ে একপত্নীক পরিবারই সর্বজনীন পরিবার। আধুনিক বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই একক পরিবার প্রাধান্য পেয়ে আসছে। তবে একক পরিবার যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে গেলেও মূল পরিবারের সাথে সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক কারণে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে যায়।

একপত্নীক পরিবার গঠনই ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। তবে স্বামী বা স্ত্রীর ব্যক্তিগত অসুবিধা, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, ব্যাধি ও অবক্ষয় রোধের ব্যবস্থা হিসেবে অনেক সময় বহুপত্নীক পরিবারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এজন্য ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে বহুপত্নীক পরিবারকে অনুমোদন করেছে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "তোমরা যদি আশংকা কর যে, য়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার, আর যদি আশঙ্কা করা যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে"।[৯৬]

৯৩। See. Sir Henry Maine, Ancient Law.(Everyman edition), P.154. (As soon as a son is born, he acquires a vested interest in his father's substance, and on attaining years of discretion he is even, in certain contingencies, permitted by the letter of the law to call for a partition of the family estate. As a fact, however, a division rarely takes place even at the death of the father, and the property constantly remains undivided for several generations, though every member of every generation has a legal right to an undivided share in it. The domain thus held in common is sometimes administered by an elected manager, but more generally, and in some provinces always, it is managed by the eldest agnate by the eldest representative of the eldest line of the stock.)

৯৪। T.B. Bottomore, Op.Cit. PP. 171-172

৯৫। P,N.Prabhu, Hindu Social Organization, Second ed, Bombay-1954 P.219

৯৬। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই ইসলাম প্রধান্য দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষকে পরিবারের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী- "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।[৯৭]

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞান ইসলামের ও নীতিকে সমর্থন করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। A.W. Green এর ভাষায়, æ The Physiology of the adult female makes her periodically helpless. During her long periods of Pregnancy and nursing, others must supply some of her needs."[৯৮]

আদিম সমাজেও পুরুষ প্রধান পরিবার ছিল। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পরিবার ব্যবস্থায়ও তাই ছিল। যেমন æThe Greco-Roman family was traditionally. One of strong male domination, Propety ownership and religious authority centered in the husband and father or patriarch"[৯৯]

ইসলামের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগে আরবদেশে যৌথ পরিবারের প্রচলন ছিল না। পুত্র সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক ও উপার্জনক্ষম হলে তার উপর নিজস্ব পরিবারের দায়িত্বের বোঝা ন্যস্ত করা বাঞ্চনীয়। কারণ, এতে তার মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা লোপ পায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভাই-বোনের অহেতুক মনোমালিন্য এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদের সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস পায়। সর্বোপরি, পরিবারস্থ সকল সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ ও সচেতনতার বিকাশ ঘটে।

তাই বলে, ইসলাম পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি গুরুত্বানুযায়ী দায়িত্ব পালনকে অবহেলা করেনি, বরং সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলোর যথার্থ উন্মেষ সাধনের জন্য ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।[১০০]

৯৭। আল-কুর'আন, ৪: ৩৪
৯৮। A.W. Green, Op.Cit. PP. 351
৯৯। Ibid, P. 357.
১০০। মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভুইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.১১-১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামে পরিবার গঠন ব্যবস্থা

ইসলামে বিবাহ

পরিবার গঠনের জন্যে বিবাহ[১] একটি মৌলিক উপাদান। এ পরিবারের মূল ভিত্তি গঠিত হয় একজন পুরুষ ও একজন নারীকে কেন্দ্র করে, উভয়ের জুটি গঠনের মধ্য দিয়ে। নর-নারীর এ জুটি বাঁধার বিষয়টি বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন বর্ণে, বিভিন্নরূপে সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে কিছু এমন নিয়মও আছে যা রীতিমত অশ্লীল ও মানবতা বিবর্জিত। একমাত্র ইসলামই প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি বাস্তবধর্মী, মননশীল, ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা যাতে পুরুষ নয় প্রভু, আর নারীও নয় দাসী, ইসলামে উভয়কে দেয়া হয়েছে স্বাধীনভাবে জুটি নির্ধারণের অধিকার। সে অধিকার প্রয়োগের পদ্ধতিকে করা হয়েছে মার্জিত ও সুসমাদৃত।

একই পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি ইসলামে আছে, কিন্ত এক পুরুষের একসঙ্গে এক পত্নীই পছন্দনীয়। সকল স্ত্রীর সঙ্গে সম-আচরণ করতে হবে এই শর্ত জুড়ে দিয়ে পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও সীমিত যে করা হয়েছে তা অবশ্যই বলা যেতে পারে।

বল প্রয়োগে বিবাহ বা গোপন বিবাহ ইসলামে সিদ্ধ নয়। তরুণ-তরুণী, চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-লতা বা আকাশ-বাতাস সাক্ষী রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। বিবাহে মানুষ সাক্ষী থাকতে হয় স্বামীকে অবশ্যই মোহরানা[২] দিতে হবে। আর্থিক এবং পারিবারিক প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব থাকবে একমাত্র স্বামীর উপর। স্ত্রী যদি পারিবারিক আয়ের সাথে কিছু সংযোগ করতে চায়, তবে তা হবে ঐচ্ছিক এবং পরিবারে তা হবে অন্নদান স্বরূপ। সন্তান-সন্ততির সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব পিতা-মাতা উভয়ের। তাদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রবৃদ্ধির দায়িত্ব পিতা-মাতা উপর। যারা সন্তানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও শিক্ষাগত অধিকার পূর্ণ করতে পারবে না, তাদের উচিত বিবাহ বিলম্বিত করা।

১। বিবাহ-আরবী النكاح শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে-শাদী, বিবাহ। আভিধানিক অর্থ দলিত করা, সংযুক্ত করা। ইসলামী পরিভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নারীর সারা শরীর আস্বাদিত হওয়ার 'আকদ'- কে বিয়ে বলা হয়। (জাবেদ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮)

২। মোহরানা-'এনায়া' গ্রন্থে 'মোহরানা' বলতে কি বুঝায় তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়:

انه اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة البضع اما بالتسمية او بالعقد-

"মোহরানা বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বুঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর উাপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।"(المختار على الدر المختار در খ.২, পৃ.৪৫২)

বিয়ের ক্ষেত্রে মোহরানা দেয়া ফরয বা ওয়াজিব। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে:

مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে যৌন-স্বাদ গ্রহণ কর, তার বিনিময়ে তাদের 'মোহরানা' ফরয মনে করেই আদায় কর। (আল-কুর'আন, ৪:২৪)

সন্তান-সন্ততির জন্যে মায়ের দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা অপরিসীম। সন্তানের ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং বিবেচনা পিতা-মাতার প্রাপ্য। বাবা-মায়ের বয়স যখন বাড়তে থাকে এবং তারা স্বীয় উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিপালনে সমর্থ না হয় তারা কিভাবে চলবেন? ইসলামের নির্দেশ হলো, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি থাকলে তারাই পিতা-মাতার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুধুমাত্র আর্থিক ব্যয় নির্বাহই করবে না, তাদেরকে মানসিক সুখ-শান্তি প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানও সন্তানেরই দায়িত্ব। বয়স্ক, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী বলে পিতা-মাতাকে কোন মুসলিম পরিত্যাগ করতে পারেনা। যদি কোন কুলাংগার তা করে, দেশের আইন তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা মুসলিম পরিবার ব্যবস্থার মধ্যেই অঙ্গীভূত আছে। তা'আলা

বিবাহ একটি মৌলিক প্রথা

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বিবাহ হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায়, একমাত্র বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্ভোগ ইসলাম অনুমোদন করে না। বিবাহ ছাড়া অন্য কোন পথে নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিবাহ হলো আল্লাহর নবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ এবং সুন্নাহ। বিবাহ হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশে ও সমর্থনে শরী'আত মুতাবিক এমন এক সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে দু'জনের একত্রে বসবাস ও পরস্পরে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরুপে বৈধ হয়ে যায়। বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি এ নেয়ামত দিয়েছিলেন বিপুলভাবে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও আল্লাহ তা'আলার এ বিশেষ নেয়ামতের দান থেকে বঞ্চিত থেকে যান নি। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন ঃ

اربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح و السواك والختان-

"চারটি কাজ নবীগণের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য; তা হচ্ছেঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিবাহ করা, মিছওয়াক করা ও খাতনা করানো।"[৪]

কুর'আন মজীদেও এ বিবাহ ও স্ত্রী গহণের ব্যবস্থাকে নবী-রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা 'আর-রায়াদ' এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

" হে নবী! তোমার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের স্ত্রী সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"[৫]

৩। আবদেল রহিম উমরান, ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, অনু: শামসুল আলম, ইংরেজী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ (Family planning in the legacy of Islam) টি জাতিসংঘ তহবিলের আর্থিক সাহায্যে রাউটলেস লন্ডন ও নিউইয়র্ক কর্তৃক মুদ্রিত ও এর অনুবাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই, ই, এস ইউনিট ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের যৌথ প্রকাশনা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ.২৫

৪। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি., বিবাহ অধ্যায়, হাদীস নং-৫৩২

৫। আল-কুর'আন, ১৩:৩৮

কুর'আনের অন্যত্র বয়স্ক ছেলে-মেয়ে ও দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যেসব ছেলেদের স্ত্রী নেই এবং যেসব মেয়েদের স্বামী নেই তাদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও।"[৬]

যারা বিবাহ করার সামর্থ রাখে না তাদেরকে দিয়েছেন ধৈর্যধারণের বিকল্প উপদেশ। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

" যাদের বিবাহের সামার্থ নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"[৭]

উপরে উদ্ধৃত প্রথম আয়াতটিতে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক মুরুব্বীদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের আরবী ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ای زوجوا من لا زوج له من الاحر والحرائر- ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم

" তোমাদের স্বাধীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার যার স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও। আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যেও যাদের বিয়ের যোগ্যতা রয়েছে, তাদেরও বিয়ে দাও।"[৮]

সারকথা, খানাপিনা যেভাবে মানব জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন, আহার নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা তেমনই। আর এ কারণেই কুর'আন ও হাদীসে নির্দেশসূচক শব্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিবাহের আহবানকে। বিয়ের যোগ্য হয়েছে কেউ যাতে অবিবাহিত ও অকৃতদার হয়ে থাকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করাই ইসলামের লক্ষ্য। কেননা, অকৃতদার জীবন কখনই পবিত্র ও পরিতৃপ্ত জীবন হতে পারে না। অবশ্য যে লোক বিয়ে করতে সমর্থ নয়, তার কথা স্বতন্ত্র।

চিরকুমার থাকা ইসলামী প্রথা নয়। শখ-তামাশা এবং ফ্যাশন হিসেবে চিরকুমার-চিরকুমারী থাকা ইসলামে নিন্দনীয় ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের আতিশয্যে মহানবীর (সা.) কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ঠিক করলেন যে তাঁরা বেশী সময় নামাযে কাটাবেন। তারা সূফী হবেন, যৌন সম্ভোগ চিরতরে ত্যাগ করবেন একাধিক্রমে রোযা রাখবেন ইত্যাদি। এ খবর রাসূল (সা.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁদের সতর্ক করলেন।

৬। আল-কুর'আন, ২৪:৩২

৭। আল-কুর'আন, ২৪:৩৩

৮। আল্লামা জামালুদ্দীন আল কাশেমী, ***মাহাছিনুত তা'বীল*** , বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি.খ.১২, পৃ.৪৫১

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

وجاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبى صلى الله عليه وسلم يسئالون عن عبادته، فلما اخيروا كانهم تقالوها، فقالو: اين نحن من رسول الله-قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر فقال احدهم: اما انافانى اصلى الليل ابداً- وقال اخر وانااصوم الدهر ولاافطر- وقال لاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج- قجاء رسول الله وقال: انعم قلتم كذا كذا وما والله انى لاخشاكم الله، واتقاكم الله- ولكنى اصوم وافطر، واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى،

" সাহাবীদের মধ্য হতে ৩ ধরণের লোক রাসূল (সা.)-এর বাসস্থানে এলেন এবং তাঁর জীবনধারা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদেরকে তা বলা হলো। মনে হল তাঁরা খুব খুশী হন নি। (তাঁরা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা শুনবেন রাসূল (সা.) ইবাদত বন্দেগীতে আরও বেশী সময় ব্যয় করেন।)

অত:পর তাঁরা বললেন, "রাসূল (সা.) এর সাথে কি আমাদের কোন তুলনা হয়? তাঁকে তো আল্লাহ সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি যা করেছেন বা করবেন সে সম্পর্কে আল্লাহর ক্ষমা নিশ্চিত।"

অত:পর একজন বলল, "আমি ঠিক করেছি যে, আমি সারা রাত ধরে বাকী জীবন এবাদত করব।" আর একজন বলল, "আমি একাধিক্রমে রোযা রাখব।" অপরজন বলল, "আমি নারী সংগ পরিত্যাগ করব এবং জীবনে কখনও বিয়ে করব না।" (তাঁরা নবীর (সা.) সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন।) যখন রাসূল (সা.) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাদের কথা শুনলেন, তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরই কি সেসব লোক যারা এ ধরণের কথা বলেছো? তাঁদের কথা শুনার পর নবী (সা.) বললেন" আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং অধিকতর তাকওয়া অবলম্বন করি। তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি- আমি রোযা ভংগ করি। আমি সালাত আদায় করি। আমি নিদ্রা এবং আমি বিয়ে করি।" যারা আমার সুন্নাহ বা পথ পরিত্যাগ করবে তারা আমার অনুসারী নয়।"[৯]

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী[১০] লিখেছেন:

৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়া, তা.বি, খ.২য় পৃ. ২০৮

১০। বদরুদ্দীন আইনী: নাম: বদরুদ্দীন, উপনাম আবু মুহাম্মদ। পিতার নাম: আহমদ। তিনি আইনাতাবী নামক স্থানে ৭২৫/১৩২৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কায়রোতে যান এবং সেখাই বাড়ী ঘর করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থ "উমদাতুল কারী" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৮৫৫/১৪৫১ সনে মারা যান। 'উমদাতুল কারী, খ.১ম,পৃ.২-৮

وفيه ان النكاح من سنة النبى صلى الله عليه وسلم وزعم المهلب انه من سنن الاسلام وانه لارهبانية فيه۔ وان من تركه راغبا عن سنة النبى صلى الله عليه وسلم فهو مذموم مبتدع ومن كرمه من اجل انه اوفق له واعون على العبادة فلا ملامة عليه ۔ وزعم داؤد من تمعه انه واجب ۔

"উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে করা নবীর সুন্নাত বিশেষ। মনীষী মাহলাব বলেছেন: বিয়ে ইসলামের অন্যতম রীতি ও বিধান। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন অবকাশ নেই। যে লোক রাসূলের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাসের কারণে বিয়ে পরিত্যাগ করবে, সে অবশ্যই ভর্ৎসনার যোগ্য বিদ'আতী। তবে যদি কেউ এজন্য বিয়ে না করে যে, তাহলে তার নিরিবিলি জীবন ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া সহজ হবে, তবে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। ইমাম দাউদ জাহেরী এবং তার অনুসারীদের মতে বিয়ে করা ওয়াযিব।" [১১]

বস্তুত স্বভাবের দাবী, মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রবণতার স্বাভাবিক প্রকাশ, মানব সমাজের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত জরুরী। এ জন্যে রাসলে কারীম (স:)সমাজের যুবক-যুবতীদের সম্বোধন করে বলেছেন:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

"হে যুবক সমাজ! তোমাদের যারা বিয়ের সামর্থ রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য কেননা, বিয়ে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী, যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে। যেহেতু রোযা হবে তার ঢাল স্বরূপ।"[১২]

সংসার জীবনযাত্রা এবং বিবাহের উপর মহানবী(স:) কর্তৃক এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা সত্তেও বিবাহ প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর ফরযে আইন করা হয়নি। অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত বা অন্যান্য কারণে বিবাহ বিলম্বিত করতে পারে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেন, বিবাহ বন্ধনে কেহ জীবনে মোটেও আবদ্ধ না-ও হতে পারে, যদি সংগত কারণ থাকে আল্লাহ্র দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দার নিকট ইসলামের অমিয় বানী পৌঁছবার জন্যে জন্মভুমি ত্যাগ করেছেন, মানব সেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন, অবিশ্বাসীদের দ্বীনের পথে এনেছেন, বিয়ে শাদী করে সংসারী হবার সময় তাঁরা পারিবারিক জীবনে স্বাদ-আস্বাদন করেননি।[১৩]

১১। বদরুদ্দীন আইনী, ***উমদাতুল কারী*** , (বৈরুত: দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাম আল- আরাবী, তা,বি) খ.২য়,পৃ.৬৫

১২। শায়খ ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ আব্দিল্লাহ্ আল-খতীব আত-তিবরিযী, ***মিশকাতুল মাসাবিহ,*** বৈরুত:আল-মাতাবুল ইসলামী, কিতাবুন নিকাহ, ১৪০৫/১৯৮৫,খ.১ম, পৃ.২৯৬

১৩। আবদেল রহিম 'উমরান, প্রাগুক্ত,পৃ.২৯

বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ কোন মামুলি সম্পর্ক নয়। এটা কোন সাময়িক বা অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি। আল-কুর'আনে বিবাহকে বলা হয়েছে "দৃঢ় প্রতিশ্রুতি"

وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"তাঁরা (নারীরা) তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছে একটি পবিত্র এবং দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।" [১৪]

বিবাহ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা ইসলামি ধারণা হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পাশ্চাত্য লেখকগণ বিবাহকে নারী-পুরুষের একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক মনে করে। এই সম্পর্কের অভ্যন্তরে কেহ অতি সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং বের হয়ে আসতে পারে। তারা অবশ্য বলে থাকে যে, ইসলামেও অতি সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব। কিন্তু ইসলামের এই বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতিটি বাস্তব সত্য নয়, ইহা অনুমতি মাত্র। অনুমতি থাকা সত্তেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ইসলামে অতি জঘন্য অভ্যাস হিসেবে বিবেচিত। যদি কোন উপায়ান্তর না থাকে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে, আল্লাহর নবী এ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

ابغض الحلال عند الله الطلاق

"অবশ্যই বৈধ বিষয় সমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিবাহ।[১৫]

আরো উল্লেখিত হয়েছে ঃ

تزوجوا ولاتطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات-

"বিবাহ করো কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ করো না, অবশ্যই আল্লাহ্ এটা পছন্দ করেন না যে নারী পুরুষ শুধুমাত্র বিবাহের স্বাদ গ্রহণ করুক।[১৬]

দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মে বা সমাজে বিবাহের তেমন কোন গুরুত্ব-স্বীকার করা হয়নি। খ্রিষ্টধর্মে বিয়েকে একভাবে নিষেধই করে দেয়া হয়েছিল। মার্টিন লুথার সর্বপ্রথম বিয়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে, বিয়ে হচ্ছে সম্পূর্ণ দুনিয়াদারীর কাজ। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতের নেতৃস্থানীয় লোকেরা একে ধর্ম সম্পর্কহীন একটি কাজ মনে করতেন। বিয়ের পক্ষে তারা কোন স্পষ্ট রায় দেননি। কিন্তু বিয়ে করা যে মানুষের-স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই-স্বভাবের একটি প্রচণ্ড ও অনমনীয় দাবী, তারা দুনিয়ার সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। গ্রীক বিজ্ঞানী জালিনুস বলেছেন ঃ

"প্রজনন ক্ষমতার ওপর আগুন ও বায়ুর প্রভাব রয়েছে, তার স্বভাব উষ্ণ ও সিক্ত। এর অধিকাংশই যদি অবরূদ্ধ হয় তবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবরূদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে নানা ধরনের মারাত্মক রোগ জন্মাতে পারে। কখনো মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের ভাব সৃষ্টি হয়, কখনো হয় পাগলামীর রোগ। আবার মৃগী রোগও হতে পারে। তবে প্রজনন ক্ষমতার সুস্থ বহিস্কৃতি ভাল স্বাস্থের কারণ হয়। বহু প্রকারের রোগ থেকেও সে সুরক্ষিত থাকতে পারে ।"[১৭]

১৪। আল-কুর'আন, ৪:২১

১৫। আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আসআস, সুনানে আবু দাউদ, দিল্লী, মাকতাবা রশীদিয়া, তা.বি. তালাক অধ্যায়, হাদীস নং-২০২১

১৬। প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০২২

১৭। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত , পৃ. ৮৪

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নাফিসী বলেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

وقد يستحيل المنى إلى طبعية سمية ويرسل ايرسل الى القلب والدماغ بنحارا دريا سميا يوجب الغش والصرع نحوهما۔

"শুক্র প্রবল হয়ে পড়লে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে বসে। দিল ও মগজের দিকে তা এক প্রকার অত্যন্ত খারাপ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত করে দেয়, যার ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ প্রভৃতি ধরণের ব্যাধির সৃষ্টি করে ।"[১৮]

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দিহ্লভী [১৯] বিয়ে না করার অনিষ্টকারিতা সম্পার্কে লিখেছেন :

اعلم ان المنى اذاكثر تولده فى البدن صعد بخاره الى الدماغ۔

"জেনে রেখো শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব বেশী হয়ে যায়, তখন তা বের হতে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়। " [২০]

কিন্ত বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বিয়ের গুরুত্বকে নষ্ট করে দিয়েছে, পারিবারিক জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। পাশ্চাত্য মনীষীদের বিচারে ইউরোপীয় সমাজে বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতার কতগুলো কারণ রয়েছে, কারণগুলো নিম্নোক্তভাবে নয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. বিয়ে ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্মের অননুকূল দৃষ্টি ;

২. আধুনিক সভ্যতার চোখ ঝলসানো চাকচিক্য ও ব্যাপক কৃত্রিমতা;

৩. শিল্প বিপ্লবোত্তর নারী স্বাধীনতার আন্দোলন;

৪. নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল ধারণা ;

৫. নারী-পুরুষের সাম্য ও সমানাধিকারের অবৈজ্ঞানিক দাবী;

৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ববোধ না থাকা;

৭. পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভাবধারা এবং নৈতিকতা ও মানবাধিকারের পতন ;

৮. পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতা, সুস্থতা ও সফলতা লাভের জন্যে অপরিহার্য নিয়ম বিধানের অভাব এবং

৯. সাধারণভাবে জনগণের ধর্মবিমুখতা ও ধর্মদ্রোহিতা।[২১]

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৯। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.): বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) ১৭০৩ খৃ. ২১ ফে. বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফর নগর জেলার ফুলাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত রহীমিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ রহীমিয়া মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে ঐ মাদ্রাসায়ই অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, হুসন-আল আক্বীদাহ, দিওয়ান-ই-শাহ ওয়ালীউল্লাহ উল্লেখযোগ্য। ক্ষনজন্মা এ মহামানুষটি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ২২ আগষ্ট শনিবার ইন্তিকাল করেন।

২০। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লভী ; ***হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,*** (দিল্লীঃ কুতুবখানা রাশীদিয়া , ১ম সং, ১৩৭৩ হি.) খ. ১, পৃ. ১০৯

২১। মাওলানা আব্দুর রহীম , প্রাগুক্ত , পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে ও পরিবার সম্পূর্নরুপে একটি চুক্তির ফল । নারী নিজেকে বিয়ের জন্যে উপস্থাপিত করা এবং পুরুষের তা গ্রহন করা এই 'ঈযাব ও কবুল দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে দাম্পত্য জীবন যাপন শুরু করার সুযোগ লাভ করে থাকে। এতে করে স্বামী- স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতগুলো অধিকার নির্দিষ্ট হয় দুহাজার বছরের ধারাবাহিক ও ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সমাজ বিয়েও পরিবারকে অতখানি স্থান ও মর্যাদা দিতে পারেনি, যতখানি চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম দিয়েছে।[২২]

বিবাহের উদ্দেশ্য

বিয়ে বা বিবাহিত জীবন-যাপনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। দুনিয়ার কোন কাজই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পাদিত হয়নি। পবিত্র কুর'আনে বিয়ের উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। কুর'আনের বিয়ে সম্পর্কিত আয়াত সমূহকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, কুর'আনের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য নানাবিধ। এর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় নৈতিক চরিত্র পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের গভীর প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক জীবন যাপন করে সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন-পালন ও ভবিষ্যত সমাজের মানুষ গড়ে তোলা।[২৩] নিন্মোক্ত আলোচনায় সেই উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরা হলো ঃ

১. নৈতিক চরিত্র পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখা

বিবাহের মত পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রের এক দুর্জয় দুর্গ–পরিবার রচিত হয় এবং অবাধ যৌনচর্চার মত চরিত্রহীনতার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায় আর বিয়ের উদ্দেশ্যও এই যে তার সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের দুর্গকে দুর্জয় করতে হবে এবং অবাধ যৌন চর্চা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

"তোমরা মেয়েদের অভিভাবক মুরুব্বীদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে কর, অবশ্য অবশ্যই তাদের দেন-মোহর দাও, যেন তারা তোমাদের বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপতিত না হয়।"[২৪]

সাধারণ দৃষ্টিতে এ আয়াত থেকে বিয়ের উদ্দেশ্য জানা যায়। আর তা হচ্ছে বিয়ে করে পরিবার দুর্গ রচনা করা, জ্বেনা-ব্যভিচার বন্ধ করা, গোপন বন্ধুত্ব করে যৌন স্বাদ আস্বাদন করার সমস্ত পথ বন্ধ করা। আর এ সব কেবল বিয়ে করে পারিবারিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই সম্ভব।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২৪। আল কুর'আন, ৪: ২৫

ইমাম রাগিব (মৃত-৫০২/৯১০) লিখেছেন :

وسمى النكاح حصنا لكونه حصنا لذويه عن تعاطى القبح-

"বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা তা স্বামী-স্ত্রীকে সকল প্রকার লজ্জাজনক কুশ্রী কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতোই বাঁচিয়ে রাখে।"[২৫]

নারী পুরুষ কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই পরস্পর মিলিত হবে। তাহলেই উভয়ের চরিত্র ও সতীত্ব পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা পাবে। দুর্গ যেমন মানুষের আশ্রয়স্থল, শত্রুর আক্রমন থেকে বাচাঁর নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, বিয়ের ফলে রচিত পরিবারও তেমনি স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের পক্ষে একমাত্র রক্ষাকবচ। মানুষ বিবাহিত হলেই তার চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষা পেতে পারে অবশ্যই যদি সে পরিবার সুরক্ষিত দুর্গের মতোই দুর্ভেদ্য ও রুদ্ধদ্বার হয়। মোটকথা, নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ ও পবিত্রতা সতীত্বের হেফাযত হচ্ছে বিয়ের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য।[২৬]

নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন ঃ

"যে লোক কিয়ামতের দিন পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবার বাসনা রাখে, তার কর্তব্য হচ্ছে স্বাধীন মহিলা বিয়ে করা।"[২৭]

বিয়ে হচ্ছে চরিত্রকে পবিত্র রাখার একমাত্র উপায়। বিয়ে না করলে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে পাপের পংকিল আবর্তে পড়ে যেতে পারে যেকোন দুর্বল মুহূর্তে। বাস্তবিকই যে লোক তার নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখতে ইচ্ছুক, বিয়ে করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই, কেননা, এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে সে এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করতে পারবে। নিম্মোক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়।

তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা হলো ঃ

১. যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায় । (আজকাল বলা যায় যে, কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণ আদায় করতে দৃঢ়সংকল্প;)

২. যে লোক বিয়ে করে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়।

৩. যে আল্লাহর পথে জিহাদে আত্মসমর্পিত।"[২৮]

২৫। আবুল কাসিম আল হুসায়ন ইবন্ মুহাম্মদ আর রাগিব আল ইসফাহানী, ***আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন,*** বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফা, তা.বি, পৃ. ১০৮

২৬। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২৭। মূল আরবী : من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائ، ابن ماجه

২৮। মূল আরবী :

Dhaka University Institutional Repository

ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذى يريد لاداء والنكاح الذى يريد العفاف والمجاهد الذى فى سبيل الله ترمذى، نساىٔ ابن ماجه

বস্তুত নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা কিছুমাত্র সহজসাধ্য কাজ নয় বরং এ হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা, এজন্যে প্রকৃতি নিহিত দুস্প্রবৃত্তিতে যৌন লালসা শক্তিকে দমন করতে হবে। আর এ যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে লোক পাশবিকতার নিম্নতম পংকে নেমে যাবে। কাজেই যদি কেউ এ থেকে বাঁচতে চায়, আর এ বাঁচার উদ্যেশেই বিয়ে করে স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই লাভ করবে। আর আল্লাহর এই সাহায্যেই সে লোক বিয়ের মাধ্যমে স্বীয় নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে সফলকাম হবে।

কেবল মাত্র বিয়ের মাধ্যমেই যে সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা যেতে পারে, কুর'আন মজীদে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের পোশাক স্বরূপ আর তোমরা হচ্ছ তাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ।"[২৯]

পোশাক যেমন করে মানব দেহকে আবৃত করে দেয়, তার নগ্নতা কুশ্রীতা প্রকাশ হতে দেয় না এবং সব রকমের ক্ষতি-অপকারিতা থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্যে ঠিক তেমনি। কুর'আন মাজীদেই পোশাকের প্রকৃতি বলে দেয়া হয়েছে এ ভাষায় ঃ

قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوأتكم

"নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে পোশাক নাজিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে।"[৩০]

পূর্বোক্ত আয়াতে স্বামীকে স্ত্রীর জন্যে পোশাক বলা হয়েছে। কেননা, তারা দুজনই দুজনের সকল প্রকার দোষ ক্রটি ঢাকার ও যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি সাধনের বাহন। ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী বলেন ঃ

جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه ان يظهر منهما سوء كما ان اللباس ستر يمنع ان يبوامنه الشواة-

"পোশাক বলতে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে আর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মনে করা হয়েছে। কেননা, এ স্বামী ও স্ত্রী একদিকে নিজে নিজের জন্যে পোশাক স্বরূপ আবার প্রত্যেকে অপরের জন্যেও তাই। এরা কেউ কারো দোষ জাহির হতে দেয় না যেমন করে পোশাক লজ্জাস্থানকে প্রকাশ হতে দেয় না।"[৩১]

২৯। আল কুর'আন, ২:১৮৭

৩০। আল কুর'আন, ৭:২৬

৩১। আবুল কাসিম আল হুসায়ন ইবন্ মুহাম্মদ আর রাগিব আল ইসফাহানী, ***মুহসিনুত তা'বিল***, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, তাবি, খ.৩, পৃ. ৪৫২

২. গভীর প্রশান্তি ও স্থিতিলাভ

বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দাবী পূরণ এবং যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি ও স্থিতিবিধান। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"এবং আল্লাহর একটি বড় নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে জুড়ি গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন তোমরা সে জুড়ির কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রেম ভালবাসা ও দরদ–মায়া ও প্রীতি-প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। "[৩২]

এ আয়াতে জুড়ি গ্রহনের বা বিয়ে করার উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয়েছে: যেন তোমরা সে জুড়ির কাছে থেকে পরম পরিতৃপ্তি ও গভীর শান্তি–স্বস্তি লাভ করতে পার। তার মানে, স্বামী–স্ত্রীর মনের গভীর পরিতৃপ্তি শান্তি-স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। আর এ বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব ভালবাসা জন্ম নিতে পেরেছে। উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আলূসী (র.) [৩৩] বলেন।(মৃ;১২৭০/১৮৫৩)

ای جعل بینکم بالزواج الذی شرعه لکم توادا وترحما من غیر ان یکون بینکم مسابقه معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاكف من قرابه او رحم

"তোমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামীর–স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব–প্রেম-প্রণয় এবং মায়া-মমতা দরদ-সহানুভুতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অথচ পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল তেমন কোন পরিচয়, না নিকটাত্মীয় বা রক্ত সম্পর্কের কারণে মনের কোনরূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক।"[৩৪]

হযরত হাওয়া (আ.) ও হযরত আদমের যখন প্রথম সাক্ষাত হয়, তখন হযরত আদম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ من انت (তুমি কে?) তিনি বললেনঃ

حواء خلقنى الله لتسلن إلى واسلن اليك

"আমি হাওয়া আমাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্য যে, তুমি আমার নিকট পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করবে। আর আমি পরিতৃপ্ত ও শান্তি লাভ করব তোমার কাছ থেকে।"[৩৫]

অতএব এ থেকে আল্লাহর বিরাট সৃষ্টি ক্ষমতা ও অপরিসীম দয়া অনুগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা আল আ'রাফ এর নিমোক্ত আয়াতেও এ কথাই বলা হয়েছে গোটা মানব জাতি সম্পর্কে ঃ

৩২। আল-কুর'আন, ৩০:২১

৩৩। আলূসীঃ তাঁর পূর্ণ নাম: আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আস-সায়্যিদ মাহমুদ আল-আলূসী। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ও সূক্ষ্মদর্শী আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন বাগদাদের মুফতী এবং ইরাকবাসীদের বিভিন্ন যুগ-জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দু।রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরুল কুর'আন আল আযীম ওয়াস সাবউল মাসানী নামক তাফসীর গ্রন্থ তাঁর জগৎবিখ্যাত রচনা। তিনি ১২৭০/১৮৫৩ সনে ইন্তিকাল করেন।
(তাফসীর রূহুল মা'আনী-এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)।

৩৪। আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আল আলূসী, ***তাফসীর রূহুল মা'আনী***, মিসর: তাব'আতুল মুনীরিয়্যাহ, খ.২১, পৃ.৩১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"সেই আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র মানবাত্মা থেকে এবং তার থেকেই বানিয়েছেন তার জুড়ি যেন সে তার কাছে পরম সান্তনা ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে।"[৩৬]

এখানে পরম শান্তি ও তৃপ্তি বলতে মনের শান্তি ও যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি চরিতার্থতা বুঝানো হয়েছে। বস্তুত মনের মিল, জুড়ির প্রতি মনের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং যৌন তৃপ্তি হচ্ছে সমগ্র জীবন ও মনের প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি লাভের মূল কারণ। তা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে চরম অতৃপ্তি ও অশান্তির ভিতরে জীবন কাটিয়ে দেয়া। মনের প্রশান্তি ও যৌন তৃপ্তি যে বাস্তবিকই আল্লাহর এক বিশেষ দান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্যে ঈমানদার স্ত্রী পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে এ প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিকে আল্লাহর সন্তোষ এবং তারই দেয়া বিধান অনুসারে লাভ করতে চেষ্টা করা। এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এই দুনিয়ায় মানুষের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব যেমন এক স্বাভাবিক ব্যাপার, জুড়ি গ্রহনের প্রয়োজনীয়তাও তেমনি এক প্রকৃতিগত সত্য, এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এজন্যে প্রথম মানুষ সৃষ্টি করার পরই তার থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন। এ জুড়ি যদি বানানো না হতো, তাহলে প্রথম মানুষের জীবন অতৃপ্তি আর একাকীত্বের অশান্তিতে দুঃসহ হয়ে উঠত। আদিম মানুষের জীবনে জুড়ী গ্রহণের এ আবশ্যকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি। প্রথম মানুষ যুগলের ন্যায় আজিকার মানব দম্পতিতে ও স্বাভাবিক ভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী । আজিকার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে লাভ করে মনের প্রশান্তি ও যৌন তৃপ্তি, পায় কর্মের প্রেরণা। একজনের মনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ ভারাক্রান্ততা অপরজনের নির্মল প্রেম-ভালবাসার বন্যাস্রোতে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়। একজনের নিজস্ব বিপদ-দুঃখও অন্যজনের নিকট নিজেরই দুঃখ ও বিপদরূপে গণ্য ও গৃহীত হয়। একজনের যৌন লালসা-কামনা উত্তেজনা অপরজনের সাহায্যে পায় পরম তৃপ্তি, চরিতার্থতা ও স্থিতি।[৩৭]

এসব কথা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের সে স্ত্রী হোক কি পুরুষ যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি লাভ এবং তার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে জুড়ি গ্রহণ বা বিয়ে ও বিবাহিত জীবন। যৌন উত্তেজনা মানুষকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই সময় পুরুষ নারীর দিকে এবং নারী পুরুষের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ে। তখন এক জন অপর জনের নিকট স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের দরুন মনোবাঞ্ছা পুরণের নিয়ামক হয়ে থাকে। এজন্যে রাসুলে কারীম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, এরূপ অবস্থায় পুরুষ যেন স্বীয় বিবাহিত স্ত্রীর কাছে চলে যায়। তিনি বলেছেন ঃ "কোন নারী যখন তোমাদের কারো মনে লালসা লাগিয়ে দেয়, তখন সে যেন তার নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় উত্তেজনার উপশম করে নেয়। এর ফলে সে তার মনের আবেগের সান্তনা লাভ করতে পারবে এবং মনের সব অস্থিরতা ও উদ্বেগ মিলিয়ে যাবে।"[৩৮]

৩৬। আল-কুর'আন, ৭:১৮৯

৩৭। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পৃ.৮৯

৩৮। মুল আরবী ঃ

اذا احدكم المجيبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها- فان ذلك يرد مافى نفسه- مسلم

ইমাম নববী[৩৯] -এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

انه ليستحب لمن رأى امراة فتحركت شهوته ان ياتى امراته فليواقعها فليعدفع شهوته تسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو يصدره

"যে লোক কোন মেয়েলোক দেখবে এবং তার ফলে তার যৌন প্রবৃত্তি-উত্তেজিত হয়ে উঠবে, সে যেন তখন তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে তার যৌন উত্তেজনা সান্তনা পাবে, মনে পরম প্রশান্তি লাভ করবে, মন-অন্তর তার মনবাঞ্চতা ও কামনা-লাভ করে এককেন্দ্রীয়ভূত হতে পারবে।"[৪০]

৩. বিয়ে বা বিবাহিত জীবনের তৃতীয় উদ্দেশ্য বংশ বিস্তার

বিয়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো মানব জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তার দ্বারা অব্যাহত রাখা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করো এবং সতর্ক থাকো জাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[৪১]

কুর'আন মজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فالئن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم-

"এখন সময় উপস্থিত, স্ত্রীদের সাথে এখন তোমরা সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই তোমরা সন্ধান কর।"[৪২]

৩৯। ইমাম নববী (র.): তাঁর পূর্ণনাম মহিউদ্দিন আবূ যাকারিরা ইয়াহইয়া ইবনে শারফ হুরানী আন নববী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহারের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ফিকহ শাস্ত্রবিদ। তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনটাকে ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন চির কুমার। তিনি বিনা বেতনে দামিস্কে দারুল হাদীস আশরাফীয়ার শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থ শরহুন নববী, সহীহ হাদীসের সংকলন রিয়াযুস সালিহীন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দামিস্কের নাওয়া গ্রামে ৬৭৬/১২৭৭ সনে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (সুয়ূতী, তাবাকাতুল হুফফায, (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহাবী , (১৩৯৩/১৯৭৩) পৃ. ৫১০)

৪০। মহীউদ্দিন আবূ যাকারিয়া, আন্ নববী, ***শরহে সহীহুল মুসলিম***, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৩৯২/১৯৭২, খ.১ম, পৃ.৪৪৯

৪১। আল-কুর'আন, ৩:১

৪২। আল-কুর'আন, ২:১৮৬

এখানে যে مباشرت "মুবাশিরাত"-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার মানে হচ্ছে الصاق بالشرة بالشرة একজনের শরীরের চামড়ার সাথে অপরজনের দেহের চামড়াকে লাগিয়ে দেয়া, মিশিয়ে দেয়া। আর এর লক্ষ্যগত অর্থ হচ্ছে الجماع الذى يستلزمها স্ত্রী সহবাস-সঙ্গম, যার জন্যে-স্বামীর দেহের চামড়াকে স্ত্রীর দেহের চামড়ার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। আর "আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন" বলে দুটি কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে রমযানের মাসের রাত্রি বেলায় স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি দান। কেননা, এ আয়াত সেই প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সন্তান লাভ। কেননা, স্ত্রী-সহবাসের মূল লক্ষ্য হলো সন্তান উৎপাদন। যেহেতু এ-ই তার ফল, তার পরিণতি। তাই লওহে মাহ্ফুযে যে সন্তান তোমার জন্যে নির্ধারণ করে রাখা-হয়েছে, স্ত্রী-সহবাসের ফলে তাই পেতে চাওয়া উচিত তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। অনুমতি প্রাপ্ত এ স্ত্রী-সহবাসের মূলে নিছক যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি আর লালসার চরিতার্থ তাই কখনো স্ত্রী-সহবাসের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এ জন্যে যে ধরণের যৌন-উত্তেজনা পরিতৃপ্তির ফলে সন্তান লাভ হয় না যেমন পুংমৈথুন বা হস্তমৈথুন তাকে শরী'আত হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর যে ধরণের স্ত্রী-সহবাসের ফলে লাভ সম্ভব হয় না কিংবা সন্তান লাভ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে কিংবা স্ত্রী-সহবাস হওয়া সত্ত্বেও সন্তান হতে পারে না, শরী'অতে তাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৪৩]

এজন্যেই নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, অতএব, তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যেভাবে তোমরা চাও পছন্দ কর।"[৪৪]

এ আয়াতে স্ত্রীদেরকে কৃষি ক্ষেত বলা হয়েছে। অতএব, স্বামীরা হচ্ছে এ ক্ষেতের চাষী। চাষী যেমন কৃষিক্ষেতে শ্রম দেয় ও বীজ বপন করে ফসলের আশায়, তেমনি স্বামীদেরও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রী সহবাস করে এমনভাবে বীজ বপন করা, যাতে সন্তানের ফসল ফলতে পারে সন্তান লাভ সম্ভব হতে পারে।

কুর'আনের উপরোক্ত দৃষ্টান্তমূলক কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। চাষী বিনা উদ্দেশ্যে কখনো কষ্ট স্বীকার করে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে জমি চাষ করে না, কেবলমাত্র মনে খোশ–খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কেউ এ কাজে উদ্যোগী হয় না। এ কাজ করে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আর তা হচ্ছে ফসল লাভ। কুর'আনের ভাষায় স্বামীরাও তেমনি উদ্দেশ্যপূর্ণ চাষী–সন্তান ফসলের চাষাবাদকারী। স্ত্রীদের যৌন অঙ্গ হচ্ছে তার কাছে চাষের জমিস্বরূপ আর স্ত্রীর যৌনাঙ্গে শুক্র ঢুকানো হচ্ছে চাষীর জমিতে শস্য বীজ বপন করার মতো। চাষী যেমন এই সমস্ত কাজ ফসলের আশায় করে, স্বামীদের উচিত সন্তান লাভের আশায় স্ত্রী-সঙ্গম করা। কেবল যৌন স্পৃহা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এ কাজ হওয়া উচিৎ নয়। বরং এই সন্তান-ফসল লাভের উদ্দেশ্যেই বিয়ে করতে হবে।

৪৩। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত পৃ. ৯০

৪৪। আল-কুর'আন, ২:২২৩

স্ত্রী গ্রহণ ও তার সাথে সঙ্গম করতে হবে। অতএব, বিবাহের একটি চরমতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ।[৪৫] এ কথাই আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

"এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য কাজ কর।"[৪৬]

অর্থাৎ এ স্ত্রী সহবাস দ্বারা সন্তান লাভ করার আশা মনে মনে পোষণ করতে থাকো।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীলোক কেবল মাত্র যৌন লালসা পরিতৃপ্তির মাধ্যম বা উপায় নয়, স্ত্রী-গ্রহন ও তার সাথে মিলে পারিবারিক জীবন-যাপনের এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যের সন্তান লাভ-ভবিষ্যৎ মানব বংশকে রক্ষা করা হচ্ছে অন্যতম। মানব সমাজের কুর'আন ভিত্তিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন-যাপন করার ফলেই দুনিয়ায় মানব জাতির এই বিপুল বিস্তার সম্ভব হয়েছে। মানব বংশের এ ধারা বৃদ্ধির স্থায়িত্বের জন্যেই বিয়ে করাকে এক অপরিহার্য কাজ বলে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। বিয়ে ব্যতীত নারী-পুরুষের যৌন মিলন হারাম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, তা মানুষের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে যেমন মারাত্মক, তেমনি তার ফরে মানব বংশের পবিত্রতা রক্ষা ও সুষ্ঠুভাবে ভবিষ্যত সমাজ গঠন বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। ইসলামে বিয়ে হচ্ছে নারী-পুরুষের এক স্থায়ী বন্ধন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মিলন এমন কোন ক্রীড়া নয়, যা দু'দিন খেলা হল, তারপর যে যার পথে চম্পট দিয়ে চলে গেল।[৪৭]

এ জন্যে কুর'আন বিবাহিতা-স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের নিকট থেকে শক্ত ও দৃঢ়-প্রতিশ্রুতি গ্রহন করেছে।"[৪৮] ইসলামে বিয়ে এমনই দৃঢ় প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব অনুষ্ঠান। এ প্রতিশ্রুতি সহজে ভঙ্গ করা যেতে পারে না।

বিবাহের তাগিদ

মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্যতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রধান উপায় বিবাহ। বিবাহ একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। এ কারণেই অনিন্দ্য সুন্দর বাসর জান্নাতে বসেও যখন হযরত আদম (আ.)অতৃপ্তিতে ভোগছিলেন তখনই হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেন তার জীবন সঙ্গীনী রূপে নর-নারীর যুগল বাঁধনে শুরু হল মানব জীবন। রক্ত-মাংসে সৃষ্টি এ মানুষের মধ্যে যে প্রভূত জৈবিক চাহিদা জমে উঠে বয়সের পরতে পরতে তা একান্তই বাস্তব। সুতরাং ক্ষুধা যিনি দিয়েছেন, সে ক্ষুধা নিবারণের পথও দেখাবেন তিনি, আর তা হল বিবাহ। বিবাহের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

৪৫। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১
৪৬। আল-কুর'আন,২:২২৩
৪৭। মুহাম্মদ আব্দুর মাওলানা রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২
৪৮। আল-কুর'আন, ৪:২১

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

"আর তোমরা তোমাদের এমন ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দাও যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই। আর তোমাদের বিয়ের যোগ্য দাস দাসীদের বিয়ে দাও।" ৪৯

উপরোক্ত আয়াতে-الْأَيَامَى উদ্ধৃত শব্দের ব্যাখায় বলা হয়েছে:

يقال ذلك للمرأة التى لازوج لها والرجل الذى لا زوجة له وسواء كان قد تزوج ثم فارق اولم يتزوج واحد منهما

'আয়ামা' বলতে বুঝায় এমন মেয়েলোক, যাদের স্বামী নেই এবং সেসব পুরুষ যাদের স্ত্রী নেই, একবার বিয়ে হওয়ার পর বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে এরূপ হোক কিংবা আদৌ বিয়েই না হওয়ার ফলে।[৫০]

নারীকে পুরুষ হতে সৃষ্টি করে বিয়ের ব্যবস্থা করা আল্লাহর নিদর্শন। নারী-পুরুষের জন্য তৃপ্তিদায়ক বস্তু। তৃপ্তি বহাল রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম ভালবাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً .

"এবং আল্লাহর একটি বড় নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা যেন তোমরা যেন তাদের কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রেম, ভালবাসা ও প্রীতি-প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৫১] ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে সমর্থন করে না। বৈবাহিক ব্যবস্থাই ইসলামের কাম্য। আবার ইসলাম বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্ভোগও অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'আলা বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী-রাসূলগণের প্রতি এক বিশেষ দান বলে উল্লেখ করেছেন। আল কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"আপনার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্যে স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।"[৫২] অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

"এবং আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্যে পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।"[৫৩]

৪৯। আল-কুর'আন, ২৪:৩২
৫০। বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৮
৫১। আল আল কুর'আন, ৩০:২১
৫২। আল কুর'আন, ১৩:৩৮
৫৩। আল কুর'আন, ১৬:৭২

বিয়ে করা নবীর সুন্নাত। ইসলামের অন্যতম রীতি ও বিধান। এ রীতি-বিধান পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে মহানবী (সা.) হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, "বিয়ে করা আমার রীতি ও স্থায়ী কর্মপন্থা। অতএব যে ব্যক্তি এ সুন্নাত ও রীতি অনুযায়ী আমল করবে না, সে আমার দলভূক্ত নয়।[৫৪]

বিয়ে মানুষের স্বভাবের দাবী; মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রবণতার স্বাভাবিক প্রকাশ মানব সমাজের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত জরুরী। এজন্যে মহানবী (সা.) বলেছেন, "হে যুব সম্পদায়! তোমাদের যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টি আনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন ক্ষুধাকে অবদমিত করে।"[৫৬]

যৌবন বয়স যেহেতু যৌন সম্ভোগের জন্যে মানুষকে উন্মুখ করে দেয়, এ কারণে তার দৃষ্টি যে কোন মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় পড়ে যেতে পারে। এ জন্যে রাসূলে করীম (সা.)-এ বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে করতে তাগিদ করেছেন। বিয়ে করলে আর চোখ যৌন সুখের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াবে না এবং বাহ্যত তার কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। এ কারণে মহানবী (সা.) যদিও কথা শুরু করেছেন যুবক মাত্রকেই সম্বোধন করে কিন্ত শেষ বিয়ের এ তাগিদকে নির্দিষ্ট করেছেন এমন যুবক-যুবতীদের জন্যে, যাদের বিয়ের সামর্থ রয়েছে। বিয়ের সামর্থ মানে রতিক্রিয়া, যৌন সম্ভোগ, স্ত্রী-সঙ্গম। আর যারা যৌবন বয়সেও নানা কারণে। স্ত্রী সহবাসে সামর্থ রাখে না, যারা রতিক্রিয়া ও স্ত্রী-সঙ্গমেও অক্ষম, তাদেরকে রাসূল(সা.)বলেছেন রোযা রাখতে। যেন তার যৌন উত্তেজনা দমিত হয়, দমিত হয় তার বীর্য শক্তির দাপট। [৫৬]

ইসলামের প্রতি নিবেদিত সাহাবাদের কয়েকজন মনস্থ করলেন যে, তারা অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাবেন, তারা সূফী হবেন, যৌন সম্ভোগ চিরতরে ত্যাগ করবেন, একাধিক্রমে রোযা রাখবেন ইত্যাদি। এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তষ্ট হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "তোমরা কি এ ধরনের কথা বলো নি? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, আমি তোমাদের চেয়ে বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি, তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি, রোযা ভঙ্গও করি, নামায পড়ি, শুয়ে নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। এই হচ্ছে আমার নীতি আদর্শ। অতএব, যে ব্যক্তি আমার এ নীতি মানবে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।"[৫৭]

৫৪। আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলী, ***আল-বায়হাকী, আস্সুনানুল কুবরা,*** দার আল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুতঃ লেবানন-১৯৯৪,খ.৭, পৃ.৭৭

৫৫। শায়খ ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল-খতীব আত্ তিবরিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৫৬। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

৫৭। অলি আল দ্বীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৭

উপরোক্ত আলোচনাতে প্রমানিত হয় যে, বিয়ে করা নবীর সুন্নাত বিশেষ।" বিয়ে ইসলামের রীতি ও বিধান, যে লোক রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাসের কারণে বিয়ে পরিত্যাগ করবে, সে অবশ্যই ভৎসনার যোগ্য বিদ'আতি। তবে যদি কেউ এজন্যে বিয়ে না করে যে, তাহলে তার নিরিবিলি জীবন ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া সহজ হবে, তবে তাকে দোষ দেয় যাবে না।"[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

খানাপিনা যেভাবে মানব জীবনের অপরিহার্য উপাদান, আহার-নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তি-তর্কের উদ্ধে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা তেমনই। আর এ কারণেই কুর'আন ও হাদীসে নির্দেশ সূচক শব্দ দিয়ে মানুষকে বিয়ের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইসলামে কুমারত্বের কোন অবকাশ নেই।"[৫৯] হযরত ওসমান ইবন মায'উনকে নবী (সা.) নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে অনুমতি দেননি, তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইবাদতে মশগুল থাকতে বলেছেন। এ মর্মে মহানবী (সা.)-এর বানী ঃ

عن سعد بن ابى وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا-

সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাছ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ওসমান ইব্‌ন মায'উনকে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম।"[৬০]

বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, "তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহর সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। (১) যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। (২) যে লোক বিয়ে করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যেতে চায়।[৬১] বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি পূত-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন আযাদ নারীর প্রণয়বদ্ধ হয়।" [৬২] বস্তুতঃ বিবাহের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা আল্লাহর সমীপে পবিত্র হয়ে ওঠার পথ পায়। বিবাহের পবিত্র ছোঁয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করে। নবীজীর আদর্শের রৌশনীতে আলোকিত হয়ে ওঠে তার কর্মময় জীবন।

৫৮। বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৬

৫৯। মুহাম্মদ 'ইবন হাম্বল, মুসনাদ, ***দারু ইহইয়া ইততুরাসিল আরবী,*** বৈরুত: লেবানন-১৯৯৩, খ.৪, হাদীস নং-২৮৪৫

৬০। অলি আল-দ্বীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৮১

৬১। আবদুর রহমান আহমদ ইব্‌ন নাসাঈ, বৈরুত: ***দারুল কুতুবুল ইলমিয়া***-১৯৯৫, হাদীস নং- ৩১৬৬
মূল আরবী:
عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم المكاتب الذى يريد الاداء والنكاح الذى يريد العفاف والمجاهد فى سبيل الله

৬২। মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ, ***আস সুনান ইবনু মাজা,*** দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপু, হাদীস নং-১৩৫
মূল আরবী: من ارد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন সে দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অত:পর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।" [৬৩]

মানবিক প্রাকৃতিক চাহিদার কারণেই মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অথচ শরী'আতে এটাকে পুরো দীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ শরীরিক, মানুসিক চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর করে এর উপর। কেননা, সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে অবশ্য কাম্য,যে মানবিক ও

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্রিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন তার অধিকাংশটাই উৎসারিত বৈধ যৌন মিলনের মাধ্যমে, যার ভিত্তি হলো শুধুমাত্র বিবাহ।[৬৪] বিবাহ বহির্ভূত নর-নারী, সহঅবস্থান, সহবাস ব্যভিচারের শামিল। আর ব্যভিচার ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শিক সকল মাপকাঠিতেই একটি জঘন্য অপরাধ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সকল ধর্ম ও সকল দেশেই এটি অন্যায় বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলাম এ অপরাধকে সর্বাধিক ঘৃণিত বিবেচনা করে।

বলার অপেক্ষা রাখে না নারীর সতীত্বের হিফযত ও খিয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রজন্মের পবিত্রতা। নারীর গর্ভেই জন্ম নেয় রাজা-রানী, গবেষক-পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে সকল মনীষী। অনাগত প্রজন্ম যেন একটি সুরক্ষিত পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে সেজন্যেই বিয়ের ব্যবস্থা। এতে সুনির্ধারিত পিতামাতার শাসন-স্নেহে সন্তান মানুষ হওয়ার সুযোগ লাভ করবে, মানব বংশের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এ এক কুদরতি ব্যবস্থাপনা। পক্ষান্তরে ব্যভিচার নারীকে মর্যাদার আসন থেকে পতিত করে। বিয়ে বহির্ভূত সন্তানরা পৃথিবীতে পা রাখে পিতৃ পরিচয়হীন ঘৃণার পাত্র হয়ে। ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এর কঠিন শাস্তি বিধান করেছে ইসলাম। এ অপরাধ কাজ যেমন জঘন্য, শাস্তি ঠিক তেমন কঠোর। ব্যভিচারী নারী-পুরুষের একশ'টি বেত্রাঘাত অবস্থাভেদে পাথর মেরে প্রাণনাশের শাস্তি বিধান করেছে ইসলামী শরী'আত। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, পাপের উৎসমূল চিরতরে বন্ধ করে দেয়া।[৬৫]

ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত আযাদ ব্যক্তি হয় তাহলে তার শাস্তি বিধান সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছেঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"ব্যভিচারিনী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক।"[৬৬]

বিবাহিত নারী-পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাত করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।[৬৭]

৬৩। অলি আল-দ্বীন মুহাম্মদ,প্রাগুক্ত,খ.২, পৃ.২৬৮
মূল আরবী: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فى النصف الباقى-
৬৪। সম্পাদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** প্রাগুক্ত,পৃ.৩৮৯
৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৫
৬৬। আল-কুর'আন, ২৪:০২
৬৭। বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (রহ.) ***আল-হিদায়া,*** মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০০, খ.২, পৃ.৩৫৪

ইসলামী হুকুমত এসব শাস্তি কার্যকর করবে। কোন ব্যক্তি নয়।এগুলো সবই আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। এগুলো এমন মহান বৈশিষ্ট্য যার পরশে একটি মানুষ এমনিতেই সুস্থ হয়ে যায়। অধিকন্ত যে যৌন শৃংখলার শিকার তা চরিতার্থ করার উপযুক্ত পাত্রও তার রয়েছে, এরূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নি:সন্দেহে গুরুতর অপরাধ। আল্লাহর আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা ও বিদ্রোহের শামিল। তাই এর শাস্তিও বিধান করা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক।

এ জঘন্য অপরাধ থেকে বাঁচার জন্যে আল-কুর'আন ও সুন্নাহর বর্ণনার ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, বিয়ের সামর্থের সঙ্গে প্রবল কামোন্মাদনা থাকলে বিয়ে ফরয। অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকলে ওয়াজিব এবং সাধারণ অবস্থায় বিবাহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।[৬৮]

বিয়ের হুকুম নির্ভর করে ব্যক্তির শারিরীক, মানসিক, আর্থিক অবস্থার উপর। তাই বিয়ের হুকুম সকলের ক্ষেত্রে একই রকম নয়। বরং বিয়ে-শাদী ব্যক্তি ভেদে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ বলে বিবেচিত।

ফরয : বিয়ে করা ফরয হয় চার শর্তে, ১. যদি কেউ বিয়ে না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে বলে নিশ্চিত আশংকা থাকে, ২. ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্যে রোযা রাখতেও সে অক্ষম, ৩. বাঁদী গ্রহণের সুযোগ নেই এবং ৪. বৈধ পন্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ফরয।

ওয়াজিব : বিয়ের প্রবল আকর্ষণ আছে, ব্যভিচারে আক্রান্ত হওয়ারও ভয় আছে কিন্ত ব্যভিচারে পড়ে যাবে এমন বিশ্বাস নেই, অধিকন্ত হালাল অর্থে স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ করতে সক্ষম, এমন ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ : বিয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে, কিন্ত এ কারণে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই, এমন ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

হারাম : যদি ইয়াকীন ও বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে যে, বিয়ে করলে তাকে অন্যয়ভাবে অন্যের প্রতি যুলুম ও নিপীড়ন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে তা হলে এক্ষেত্রে বিবাহ করা হারাম। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্য হলো রিপুকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে পুণ্য অর্জন করা।

মাকরুহ : যদি বিবাহের কারণে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচার করবে বলে ভয় হয় তা হলে বিয়ে করা মাকরুহ তাহ্‌রীমী।

মুবাহ : বিয়ের ঝোক আছে, তবে না করলে ব্যভিচারী হয়ে পড়বে এমন আশংকা নেই এটাই মুবাহ। এ ক্ষেত্রে যদি নিজেকে পাপ মুক্ত রাখা কিংবা বংশ বৃদ্ধির নিয়্যত করে তা হলে বিয়ে করা সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। এখানে মুবাহ ও সুন্নাতের পার্থক্য নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।[৬৯]

৬৮। ***ইসলামী বিশ্বকোষ*** ১৪শ খন্ড, পৃ.১০৩; ***ম'জামুল ফিকহিল হাম্বলী***, খ. ২, পৃ. ৮০; ***ইলমুল ফিকহ***, পৃ.২৮০

৬৯। সম্পাদনা পরিষদ, ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম***, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৬

বিবাহে কুফু (সমতা বিধান)

"কুফু" মানে المساواة والمماثلة 'সমতা ও সাদৃস্য'। অর্থাৎ বর ও কনের 'সমান সমান হওয়া' একের সাথে অপরজনের সামঞ্জস্য হওয়া। এ সামঞ্জস্যতা বলতে বংশ, ইসলাম, স্বাধীনতা, ধার্মিকতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার সমতুল্যতা বুঝায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন দু'জন নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হোক, যাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেম-ভালবাসার পরিবেশ গড়ে ওঠার আশা

করা যায়। এমন দু'জন নারী পুরুষকে 'কুফু' বলে যারা মুসলিম, বংশ মর্যাদায় সমান, স্বাধীন এবং পেশা, দ্বীনদারী, আর্থিক সংগতি ইত্যাদি পরস্পর সমপর্যায়ের। বিয়ের উদ্দেশ্য যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মনের প্রশান্তি লাভ, উভয়ের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করা। কাজেই উভয়ের মধ্যে যাতে সমতা-সামঞ্জস্যতা রক্ষা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যাতে এ মিলমিশ লাভের পথে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টির সামান্যতম কারণ না ঘটতে পারে, তার ব্যবস্থা করা একান্তই কর্তব্য। সমতার ব্যাপারে মূলত লক্ষণীয় হচ্ছে দ্বীন। মুসলমান সকলেই পরস্পরের জন্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই মুসলমান মেয়ে কাফেরের নিকট বিয়ে দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"সেই মহান আল্লাহই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর বংশ ও শশুর-জামাতা হিসেবে সম্পর্ক করেছেন। আর আপনার প্রতিপালক বড় শক্তিমান।"[৭০]

এ আয়াতটিকে এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বংশ ও শশুর-জামাতার সম্পর্ক এমন জিনিস, যার সাথে 'কুফু'র ব্যাপারটি সম্পর্কিত।[৭১]

মূলত 'কুফ' গণ্য হবে দ্বীন পালনের ব্যাপারে। কাজেই মুসলিম মেয়েকে কাফেরের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।[৭২]

'কুফু' হিসেব হবে দ্বীনদারীর দৃষ্টিতে। আর এ হিসেবেই কোন মুসলিম মেয়েকে কোন কাফের পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যাবে না ইজমা'র সিদ্ধান্ত এই।

এ ইজমা'র ভিত্তি উদ্ধৃত হয়েছে কুর'আন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

৭০। আল-কুর'আন, ২৫:৫৪

৭১। বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ.৩
মূল আরবী: غرضة من ايراد هذه الاية لاشارة الى ان النسب والصهر مما يتعلق بهما حكم الفائة

৭২। প্রাগুক্ত, মূল আরবী: الاكفاء التى بالاجماع هى ان يكون فى الدين فلا يحل للمسلمة ان تزوج بالكافر-
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল সায়য়ানী লিখেছেন ঃ
والكفاة فى الدين معتبرة فلا يحل تزويج مسلمة بكافر-

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে, পক্ষান্তরে ব্যভিচারী নারীকে অনুরূপ ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। মু'মিনের জন্যে তা হারাম করে দেয়া হয়েছে।[৭৩]

ব্যভিচারী মোটামুটিভাবেও ঈমানদার নয়। যদিও তাকে মুশরিক বলা যায় না।[৭৪]

ঈমানই ব্যভিচারী পুরুষ স্ত্রীকে বিয়ে করতে ঈমানদার লোকদের বাধা দেয়-নিষেধ করে। যে তা করবে সে হয় মুশরিক হবে, নয় ব্যভিচারী। সে ধরণের ঈমানদার সে নয় অবশ্যই , সে ধরণের ঈমান এ ধরণের বিয়েকে নিষেধ করে, ঘৃণা জাগায়। কেননা জ্বেনা-ব্যভিচার বংশ নষ্ট করে আর জ্বেনাকারীর সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপনে পাপিষ্ঠের সঙ্গে একত্র বাস-সহবাস করা অপরিহার্য হয়। অথচ আল্লাহ এ ধরণের সম্পর্ক-সংস্পর্শকে চিরদিনের তরে নিষেধ করে দিয়েছেন।

অন্য কথায় ব্যভিচারী পুরুষ ঈমানদার মেয়ের জন্যে এবং ব্যভিচারী নারী ঈমানদার পুরষের জন্যে 'কুফু' নয়। কেননা স্বভাব-চরিত্র ও বাস্তব কাজের দিক দিয়েও দুশ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, এ দুয়ের মধ্যে মনের মিল, চরিত্র ও স্বভাবের ঐক্য হওয়া, হৃদয়ের সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া, নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং প্রাণের শান্তি ও স্বস্তি লাভ যা বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য কখনো সফল হবে না।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

"মুমিন কি কখনও ফাসিকদের সমান হতে পারে? এরা সমান নয়।[৭৫]

মুমিন ও ফাসিক এক নয়, এদের মধ্যে কোন রকমের সাদৃশ্য ও সমতা নেই। অতএব, মুমিন স্ত্রী বা পুরুষ কখনই ফাসিক বা কাফির স্ত্রী পুরুষের জন্যে 'কুফু' নয়।

উপরোক্ত আয়াতের সমর্থনে রাসূলে করীমের নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখযোগ্য: "দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যভিচারী তারই মতো দণ্ডপ্রাপ্তা ব্যভিচারিনী ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।"[৭৬]

চরিত্রহীনা নারী চরিত্রবান পুরুষদের জন্যে বিবাহযোগ্য হতে পারে না, তেমন চরিত্রবান পুরুষ চরিত্রহীনা নারীর জন্যে বিবাহযোগ্য হতে পারে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্যে। আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্যে।[৭৭]

৭৩। আল-কুর'আন, ২৪:৩
৭৪। আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাশেমী, প্রাগুক্ত, খ.১১,পৃ.৪৪৪৩
মূল আরবী : ان الزانى ليس بمؤمن مطلق الايمان وان لم يكن مشركا
৭৫। আল-কুর'আন, ৩২:১৮
৭৬। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মাসনাদ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৮/১৯৭৮ মূল আরবী ঃ
الزانى المجلود لا ينكح الا مثله -
৭৭। আল-কুর'আন, ২৪:২৬

ইমাম ইবন তাইমিয়া (র.) বলেন, চরিত্রহীনা মেয়ে চরিত্রহীন পুরুষের জন্যে, তাই চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক চরিত্রবান পুরুষের জন্যে বিবাহযোগ্য হতে পারে না। কেননা তা কুর'আনে বর্ণিত চূড়ান্ত কথার খেলাফ। অনুরূপভাবে সচ্চরিত্রবান পুরুষ সচ্চরিত্রবতী মেয়েদের জন্যে। অতএব, কোন চরিত্রবান পুরুষই কোন চরিত্রহীনা মেয়ের জন্যে বিয়ের যোগ্য হতে পারে না। কেননা, তাও কোর'আনে বিশেষ ঘোষণার পরিপন্থী।[৭৮]

সারকথা এই যে, নেককার পুরুষ কেবলমাত্র নেককার স্ত্রীলোকই গ্রহণ করবে, বদকার ও চরিত্রহীনা নারী নয়। কেননা, তা তার জন্যে কুফু নয়। এমনিভাবে কোন নেককার চরিত্রবতী মেয়েকে বদকার চরিত্রহীন পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না। কেননা, তা তার জন্যে কুফু নয়।

বিবাহ সম্পাদনে কি কি বিষয়ে "কুফু" বিবেচ্য বিষয় হবে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) এর মতে, কেবলমাত্র দ্বীনদারীর দিক দিয়েই-"কুফু" বিচার করতে হবে, অন্য কোন দিক দিয়ে নয়।[৭৯]

আল্লামা খাত্তাবী-এর মতে কুফু কেবলমাত্র দ্বীনদারীর দিক দিয়েই লক্ষণীয় ও বিবেচ্য আর ইসলামী জনতা সকলেই পরস্পরের কুফু।[৮০]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (র.) বংশীয় কুফুর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন, তাঁদের দলীল নিম্মোক্ত হাদীস: -العرب بعضهم اكفاء بعض والموالى بعضهم اكفاء بعض

"আরবের লোকেরা পরস্পরের জন্যে কুফু। আর ক্রীতদাসেরাও পরস্পরের কুফু।"[৮১]

উপরোক্ত সনদ ও শুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। কেননা এর সনদে একজন বর্ণনাকারী এমন রয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম ইবন আবূ হাতিম তাকে অপরিচিত লোক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন -هذا كذب لا اصل له

"হাদীসটি মিথ্যা তার কোন ভিত্তি নেই।"[৮২]

ইমাম দারে-কুত্নী বলেছেন: لا صح له "হাদীসটি সহীহ নয়"। ইব্ন আব্দুল বারবয় বলেছেন هذا منكر موضوع "এ হাদিসটি গ্রহণ অযোগ্য।" এটি কারো নিজস্ব রচিত।[৮৩]

৭৮। আবুল কাসিম আল হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আর রাগিব আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত,খ.১১, পৃ.৪৪৭৪
৭৯। মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, করাচী: ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, তাবি, খ.৬, পৃ.২৬২ মূল আরবী ঃ وقد جزم بان الاعتبار الكفاية مختص بالدين
৮০। আল্লামা খাত্তাবী, *মাআলিমুস সুনান*, বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া সুন্নাতিন নববীয়া, তাবি, খ.৩, পৃ.১৮০
৮১। আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, খ.৪, পৃ.২৯০
৮২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮
৮৩। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আস-সান'আনী, *সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম*, ৪র্থ সং, কায়রো: মুস্তাফা আল-বাবিল হালাবী, ১৩৭৯/১৯৬৫, খ.৩, পৃ.১২৭

আল্লামা শাওকানী এ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন: اسناده ضعيف" এ হাদীসের সনদ দুর্বল।"[৮৪]

হাদীসটিকে যদি সহীহ বলে ধরা যায় তবে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরবের সাধারণ অধিবাসী যদিও পরস্পরের জন্যে 'কুফু', কিন্তু ক্রীতদাস তাদের জন্যে 'কুফু' নয়। কিন্তু এ কথা কুর'আন ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের খেলাফ। কুর'আনের ঘোষনা, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকি আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তোমাদের সকলের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত।'[৮৫] এতে যেমন বংশের দিক দিয়ে মানুষের পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি, তেমনি পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাকওয়া-আল্লাহ্‌ভীরুতা, দ্বীনদারী ও

Dhaka University Institutional Repository

পরহেযগারীকে। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস الناس كلهم ولد ادم "সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান।" এখানেও মানুষে মানুষে বংশের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য স্বীকার করা হয়নি। দ্বিতীয় হাদীস:

الناس كاسنان المشط لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى-

"মানুষ চিরুনীর দাঁতের মতই সমান, কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কেবল পার্থক্য হতে পারে তাকওয়ার কারণে।"

ওপরের আলোচনা থেকে 'কুফু'র ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং জানা গেছে যে, মানুষে মানুষে তাকওয়া, দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র ছাড়া অপর কোন দিক দিয়েই পার্থক্য করা উচিৎ নয়, কুফ'র বিচারও কেবলমাত্র এ দিক দিয়েই করা যেতে পারে।আর এটাই ইসলামের আদর্শিক দৃষ্টিকোণ।

এই আদর্শিক দৃষ্টিকোণের বাইরে বাস্তব সুবিধে অসুবিধের বিচার ও বিয়ের ব্যাপারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, বিয়ে বাস্তবভাবে দাম্পত্য জীবন-যাপনের বাহন। এজন্যে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যথাসম্ভব সার্বিক ঐক্য ও সমতা না হলে বাস্তব জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে ইসলামে বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গিও যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে গণ্য ও গ্রাহ্য। ইসলামের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীও এর অনুকূলে মত জানিয়েছেন। ইমাম খাত্তাবী তাই লিখেছেন ঃ

الكفاءة معتبرة فى قول اكثر العلماء باربعة اشياء- بالدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من اعتبر فيهما السلامة من العيوب والسيار فيكون جماعها ست خصال-

"বহুসংখ্যক মনীষীর মতে চারটি বিষয়ে কুফুর বিচার গণ্য হবে: দ্বীনদারী, আযাদী, বংশ ও শিল্প-জীবিকা। তাদের অনেকে আবার দোষত্রুটিমুক্ত ও আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়েও কুফু'র বিচার গণ্য করেছেন। ফলে কুফু'র বিচারে দাড়াল মোট ছয়টি গুণ।"[৮৬]

৮৪। মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৬৩

৮৫। আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

৮৬। আবূ সুলাইমান হামাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস সুনান*, বৈরুত : আল-মাকতাবা আল ইলমিয়া, ১৯৮১, খ.৩, পৃ.২০৭

হানাফী মাযহাবে কুফু'র বিচারে বংশমর্যাদা ও আর্থিক অবস্থাও বিশেষভাবে গণ্য। এর কারণ এই যে, বংশমর্যাদার দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রী পার্থক্য হলে যদিও একজন অপরজনকে ন্যয়ত ঘৃণা করতে পারে না, কিন্ত একজন অপরজনকে যে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে অসমর্থ হতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে একজন যদি হয় ধনীর দুলাল আর গরীবের সন্তান হলেও যদিও সেখানে ঘৃণার কোন কারণ থাকে না, কিন্ত একজন যে অপরজনের নিকট যথেষ্ট আদরনীয় না-ও হতে পারে, তাই বা কি করে অস্বীকার করা যেতে পারে? এসব বাস্তব কারণে দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বংশমর্যাদা, জীবিকার উপায় ও আর্থিক অবস্থার বিচার হওয়াও অন্যায় কিছু নয়।

বিবাহ সম্পাদন

যখন কোন মুসলমান পুরুষ বা নারী বিয়ে করতে মনস্থ করবে তখন তাকে তার জীবন সঙ্গীকে সঠিকভাবে নির্বাচন বা বাছাই করবে। সুখী দাম্পত্য জীবন বা স্থায়ী ঘর গড়ার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রত্যেক নারী-পুরুষই যেন তার জীবন সঙ্গী বাছাই করার ক্ষেত্রে ইসলাম নির্ধারিত মাপকাঠি নির্ধারণ করে নেয়। এ ক্ষেত্রে যেন বৈষয়িক ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রধান প্রলুব্ধকারী বস্তু না হয়ে যায়, বরং বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে:

১. দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়া

পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের ব্যাপারে ইসলাম সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে দ্বীনদারী, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর। পবিত্র চরিত্রের লোকেরা পবিত্র চরিত্রের জুড়িই গ্রহণ করবে।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

"নোংরা চরিত্রের নারী নোংরা পুরুষের জন্যে এবং চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীন নারীর জন্যে। আর পবিত্র চরিত্রের নারী চরিত্রবান পুরুষের জন্যে এবং চরিত্রবান পুরুষ পূত চরিত্রের নারীর জন্যে।"[৮৭]

আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনেক অবনতি ঘটেছে। বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পরকালের চিন্তার চাইতে পার্থিব চিন্তা তাদের বড় হয়ে উঠেছে। তাই মুসলমান সমাজে পাত্র বা পাত্রী সন্ধানের ব্যাপারে দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে দুনিয়াবী শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য পাচ্ছে। এটা মুসলমানদের জন্যে বড় দুর্ভাগ্যের কারণ। যারা কেবলমাত্র ধন-সম্পদ বা রূপ সৌন্দর্যের দিক বিচার করে কাউকে বিয়ে করেন এবং দ্বীন বা তাকওয়ার প্রতি লক্ষ্য করেন না, তাদের দাম্পত্য জীবন খুব কম ক্ষেত্রেই সুখকর হয়ে থাকে। কারণ দুনিয়াবী কামনা-বাসনার সীমাহীন অতৃপ্তি সব সময়ই তাদের দংশন করতে থাকে।

৮৭। আল-কুর'আন, ২৪:২৬

আর এ ধরণের দম্পতিদের দ্বারা ইসলামী পরিবারও গঠিত হয় না। কুর'আন মজীদ এ ব্যাপারে আরেকটি উত্তম মূলনীতি দিয়েছে। তা হচ্ছে প্রকৃত মুমিন নারী যদি দাসীও হয়ে থাকে, তবে মুশরিক অপরূপ সুন্দরীর চেয়ে সে অনেক উত্তম ঃ

لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"জেনে রেখো! ঈমানদার দাসী মহিলা ও মুশরিক নারী তুলনায় অনেক ভাল; সে তোমার যতই পছন্দসই ও মনলোভা হোক না কেন।"[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

এমনি করে মুমিন মহিলাদেরকে রূপের অধিকারী ঈমানহীন মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ঈমানদার দাস হলেও তাকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে:

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

কুর'আন মজীদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে বংশ গোত্র বানানো হয়েছে কেবল পরিচিতির জন্যে। তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রসর হলে যে কোন বংশ বা গোত্রের লোকই হোক না কেন সে হবে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে পরহেযগার লোকেরাই আল্লাহর নিকট সবচাইতে সম্মানিত।"[৯০]

হ্যাঁ, তবে বংশ বা গোত্র ঈমান, শিক্ষা সভ্যতা ও তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রসর হলে নি:সন্দেহে সে বংশ গোত্র উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং পাত্র বা পাত্রী সন্ধানকালে এসব দিক থেকে মর্যাদাবান বংশ বা গোত্রের সন্ধান অবশ্যই করা যেতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক, ঈমান ও তাকওয়াবিহীন বংশমর্যাদা দাম্পত্য জীবনে কেবল লাঞ্ছনাই বয়ে আনে।

বস্তুত, ঈমানদার ব্যক্তিকে এমন ঈমানদার মহিলা বিয়ে করতে হবে, সে কেবল নিজেই ঈমানদার হবে না, বরং স্বামীকেও ঈমানের পথে চলতে সাহায্য করবে। একবার সাহাবায়ে কিরাম বললেন : সর্বোত্তম পুঁজি কি তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তবে তা অর্জনের জন্যে অবশ্যই আমরা চেষ্টা সাধনা চালাতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "সর্বোত্তম পুঁজি হলো আল্লাহর স্মরণে সিক্ত যবান, শোকরগুজার অন্তর এবং এমন মু'মিন স্ত্রী, যে হবে স্বামীর দ্বীন ও ঈমানের সাহায্যকারী।"[৯১]

৮৮। আল-কুর'আন, ২:২২১
৮৯। আল-কুর'আন, ২:২২১
৯০। আল-কুর'আন, ৪৯:১৩
৯১। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮১
মূল আরবী: افضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه

বিশেষত কনে বাছাই করার সময় ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ একটি গুণের যাচাই করে দেখা আবশ্যক। সে গুণটি হচ্ছে কনের দ্বীনদার ও ধার্মিক হওয়া। এ সম্পর্কে নবী (সা.) এরশাদ করেছেন : "চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয়, (১) তার সম্পদের প্রতি (২) তার বংশ মর্যাদার প্রতি (৩) তার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি এবং (৪) তার দ্বীনদারীর প্রতি। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই গ্রহণ কর। সুখ-শান্তিতে থাকো।"[৯২]

ধার্মিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন কনে পাওয়া গেলে তাকে স্ত্রী রূপে বরণ করা উচিত। তাকে বাদ দিয়ে অপর কোন গুণ সম্পন্ন মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়। এটাই নবী করিম (সা.) এর নির্দেশ। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কনে সম্পর্কে প্রথম যে বিষয়টি জেনে নেয়া উচিত তা হল কনের

ধার্মিকতা। ধনাঢ্য সদ্বংশজাত ও সুন্দরী-রূপসী হওয়াও কনের বিশেষ গুণ। এর যে কোন একটি থাকলেই একজন মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্ত ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ প্রধান নয়।

কেননা চারটি গুণের মধ্যে ধার্মিকতার গুণটি যার মধ্যে নেই, তার মধ্যে অন্য গুণ যতই থাক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য কনে নয়। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, "তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা তাদের রূপ-সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপদগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে বিয়ে করবে না। কেননা, ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে কর নারী দ্বীনদারীর গুণ দেখে। মনে রাখবে, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।[৯৩]

"উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায়, সর্ব পর্যায়ে ধার্মিক লোকদের সাহচার্য অতি উত্তম। কেননা, ধার্মিক নেককার নেককার লোকদের সঙ্গী-সাথীগন তাদের চরিত্র, উত্তম গুনাবলী ও ধরণ-ধারণ, রীতিনীতি ও চাঁল-চলন থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। বিশেষ করে স্ত্রী-ধার্মিক হওয়াটা খুবই প্রয়োজন এবং এদিক থেকে যে ভাল নেককার সেই উত্তম। কেননা, স্ত্রী-হচ্ছে তার জীবন সাথী, সেই তার সন্তানের জননী, গর্ভধারনী, সে.ই তার ধন সম্পদ ঘর বাড়ী ও তার নিজের রক্ষনাবেক্ষণের একমাত্র দায়িত্বশীল ও আমানতদার।[৯৪]

৯২। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***সহীহ আল-বুখারী***, (কলিকাতা রশিদ হোসাইন এণ্ড সন্স-১৯৭৩), কিতাব আন-নিকাহ, আল ইফফা-ফী আল-দীন অনুচ্ছেদ, পৃ.৭৬২, মিশকাত আল-মাসাবিহ, হাদীস নং-৩০৮২ মূল আরবী:

عن ابى هريرة رصى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسنها ولجمالها ولدينها فطفرت بذات الدين تربنت يداك

৯৩। আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলী, আল-বায়হাকী, মূল আরবী,

لاتنكح النساء لحنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن فعليه يطغيهن وانكحهن هن للدين ولامة سوداء ذات الدين افضل-

৯৪। সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-কাহলানী, সুবুলুস সালাম, ***ইয়াহইয়া আত্ তুরাছুল আরাবী***, বৈরুত : লেবানন-, ১৯৮০, খ.৩য়, পৃ.১০৯

মূল আরবী:

ان مصاحبة اهل الدين فى كل شئ هى لاولى لان مصاحبهم يستفيد من اخلاقهم وبركتهم وطرافهم ولاسيما الزوجة فهى اولى من يعتبر لانها ضجيعته وام اولاده امينته على ماله ومنزله وعلى نفسها

অন্য একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, "দুনিয়ার সবকিছুই সম্পদ, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে, নেক চরিত্রের স্ত্রী।"[৯৫]

"স্ত্রী যদি নেক চরিত্রের না হয়, তাহলে সে হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বেশী খারাপ সামগ্রী।"[৯৬]

"নেককার, পরহেযগার, আল্লাহভীরু ও পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী যে তার স্বামীর জন্যে সর্বাবস্থায় কল্যাণকামী, তার ঘরের রাণী এবং তার আদেশানুগামী তাকেই নেক চরিত্রের স্ত্রী মনে করতে হবে।"[৯৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে পরিস্কার হলো যে ঃ

১. বর ও কনে অনুসন্ধানকালে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত তাদের ঈমান, দ্বীনদারী, তাকওয়া ও নৈতিক চরিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

২. ঈমান ও দ্বীনদারীর সাথে সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদাও তালাশ করা যেতে পারে।

৩. কিন্ত ঈমান ও দ্বীনহীন সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদা এগুলোর কিছুই বিয়ের ব্যাপারে মুমিনের কাম্য হওয়া উচিত নয়।

৪. নেককার স্ত্রী দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ।

৫. দ্বীনদার চরিত্রবান স্ত্রী জুড়ি গ্রহণ না করলে দাম্পত্য জীবনে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

৬. দ্বীনদার পাত্রী রূপ সৌন্দর্যহীন হলেও উত্তম।

৭. মুমিন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই কাফির, মুশরিক ও ব্যভিচারী চরিত্রহীন জুড়ি গ্রহণ করতে পারে না।

২. বিয়ের পূর্বে কনে দেখা

দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ, প্রেম-ভালবাসা ও সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধির জন্যে বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া উচিত। সভ্যতা ও শালীনতা সহকারে বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নিলে স্ত্রী সম্পর্কে মনের খুঁতখুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, থাকবে না কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ। শুধু তাই নয়, এর ফলে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং সেই স্ত্রীকে পেয়ে সে সুখী হতে পারবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"তোমরা বিয়ে কর সেই মেয়েলোক, যাকে তোমার ভাল লাগে যে তোমার পক্ষে ভাল লাগে।"[৯৮]

৯৫। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মাসনাদ, প্রাগুক্ত, মূল আরবী: ان الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

৯৬। বুলুগুল আমানি ফী শরহে ফতহুর রাববানী । মূল আরবী: انها سىء المتاع لو لم تكن صالحة

৯৭। প্রাগুক্ত, মূল আরবী: النقية المصالحة لحال زوجها فى بيته المطيعة لامره

৯৮। আল-কুর'আন, ৪:৩

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পূর্ণ হালাল। কেননা কোন মেয়ে পছন্দ কিংবা কোন মেয়ে ভাল হবে তা নিজের চোখে দেখেই আন্দাজ করা যেতে পারে।[৯৯] নবী করীম (সা.)"বিবাহ ইচ্ছুক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছো, সে বলল, দেখিনি, তখন তিনি বললেন, যাও, তাকে দেখে নাও।"[১০০] "তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।"[১০১] উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) অত:পর বলেন, রাসূলের কথা শুনে "আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাকে আমি গোপনে দেখে নেয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে শুরু করি। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে এমন কিছু

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট ও উদ্ধুদ্ধ করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে অতঃপর তাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করি।”[১০২]

হযরত জাবির একটি গাছের ডালে বসে থেকে প্রস্তাবিত কনেকে দেখে নিয়ে ছিলেন।[১০৩]

অতঃএব, পূর্ণ সভ্যতা ও শালীনতা সহকারে এবং শরী‘আতের সীমার মধ্য থেকে কনেকে বিয়ের পূর্বে দেখা বাঞ্চনীয়। এতে করে তার হবু স্ত্রী সম্পর্কে মনের দ্বিধা–দ্বন্ধ ভাব ও সন্দেহ দুর হয়ে যাবে। এর ফলে হবু স্ত্রীর প্রতি আকষর্ণ জাগবে এবং স্ত্রীকে পেয়ে সুখী হতে পারবে। অধিক প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা লাভের জন্যে ইস্তিখারা করাও সুন্নত। [১০৪]

বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখার এই অনুমতি, এই আদেশ যে কোন দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক, সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনের জন্যে ইসলামের এক মহা অবদান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে রাখা আবশ্যক যে এই অনুমতি বা আদেশ কেবল মাত্র বিবাহেচ্ছু বরের জন্যেই নয়, এই অনুমতি প্রস্তাবিত কনের জন্যেও সমান ভাবেই প্রযোজ্য, তারও অধিকার রয়েছে, যে পুরুষটি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাকে দেখার।

৯৯। আল্লামা আলূসী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.১৯২
মূল আরবী: ان فيها اشارة إلى حل النظر قبل النكاح لان الطيب انما يعرف بهـ

১০০। মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, ***নাইলুল আওতার***, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৯৩, খ.২, পৃ.৩৪০
মূল আরবী : ان النبى صلى قال الرجل تزوج امرأة انظرت اليهما قال لا قا ل اذهب فانظر اليها

১০১। আল্লামা আলী আদ্ দীন আত্ তিবরিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৭৩
মূল আরবী : اذا خطب احدكم المراة فان استطاع ان ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

১০২। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, ***সুনানে আবূ দাউদ,*** দিল্লী। মাকতাবা রাশীদিয়া, তা.বি
মূল আরবী :
فخطبت جارية فكنت ائحياء لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكادها وتزوجها فتزوجها

১০৩। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ***মাসনাদ,***

১০৪। মুহাম্মাদ শাকুর ফারুকী, ***উলুমুল ফিক্হ,*** ভারত: মাকতাবায়ে ফারুকীয়া, তাবি, পৃ.৬৮১-৬৮২

কেননা, যে প্রয়োজনের দরুন এই অনুমতি, তা কনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমানভাবে সত্য ও বাস্তব। এ পর্যায়ে হযরত ওমর(রা)এর উক্তি প্রনিধানযোগ্য–“তোমরা তোমাদের কন্যাদের কুৎসিৎ অপ্রীতিকর পুরুষের নিকট বিয়ে দিও না। কারণ নারীর অংশ পুরুষের জন্যে আকর্ষণীয়, পুরুষের সে সব অংশই আকর্ষণীয় হয় কন্যাদের জন্যে। অতএব, তাদেরও অধিকার রয়েছে বিয়ের পূর্বে বরকে দেখা। “[১০৫]

আলোচিত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিয়ের পূর্বে বর–কনে পরস্পরকে দেখলে উভয়ের মধ্যে প্রেম–প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ের হাদীস সমূহ শুধু দেখার অনুমতি অকাট্য ও স্পষ্টভাবে দেয় বটে, কিন্ত তার কোন পরিমাণ মাত্রা বা সীমা নির্দেশ করে না। তবে কনে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা এবং বিয়ে করা না করা সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়

Dhaka University Institutional Repository

যতখানি এবং যেভাবে দেখলে,ততখানি এবং সেভাবে দেখা অবশ্যই জায়েজ হবে। আর এর পরিমান হতে পারে, মুখমন্ডল, হস্তদয় ও পায়ের পাতা, এর চেয়ে বেশী নয়। কারণ মুখমন্ডল দেখলেই মেয়ের রূপ–সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব। আর হস্তদয় দেখলেই শরীরের গঠন আকৃতি বুঝা সম্ভব এবং পায়ের পাতা চলার গতি বুঝিয়ে দেয়। [১০৬]

৩. বিয়ের প্রস্তাব

ইসলামের উপস্থাপিত পারিবারিক রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুনের দৃষ্টিতে বিয়ের প্রস্তাব বর কনে যে কারো পক্ষ থেকেই পেশ করতে পারে। এমন কি ছেলে কিংবা মেয়ের পক্ষও স্বীয় মনোনীত বর বা কনের নিকট সরাসরিভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে, ইসলামী শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই। উপরন্ত হাদীসে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে এ কাজ যে সঙ্গত তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (সা.) জুলাইবাব নামক এক সাহাবীর জন্যে এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব কন্যার পিতার নিকট পেশ করেন। কন্যার পিতা তার স্ত্রী অর্থ্যাৎ কন্যার মার মতামত জেনে এর জবাব দেবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এ বিয়েতে স্পষ্ট অমত জানিয়ে দেয়। কন্যাটি আড়াল থেকে পিতা-মাতার কথোপকথন শুনতে পায়। তার পিতা যখন রাসূল (সা.) নিকট এ বিয়েতে মত নেই বলে জানাতে রাওয়ানা হয়ে যাচ্ছিলেন তখন মেয়েটি পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বললঃ

اَتُرِيْدُوْنَ ان نردوا على رسول الله امره- ان كان رضيه لكم فانكحوه

"তোমরা কি রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে চাও? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্যে পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়েকে সম্পন্ন কর।"[১০৭]

১০৫। ফিকহুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ২৫

১০৬। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, ***আদর্শ পরিবার***, ২য় সং রাজশাহী : আল-ইসলাম কম্পিউটার্স, পৃ. ৪২

১০৭। 'আল্লামা আহমাদুল বান্না, ***বুলুগুল আ'মানী শরহে মুসনাদে আহমাদ***, বৈরুত; দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, তা.বি., খ. ১৬, পৃ. ১৪৭

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মেয়ে নিজে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল এবং পিতামাতার নিকট তার মতামত যা গোপন বা অজ্ঞাত ছিল, যথাসময়ে সে তা জানিয়ে দিতে এবং নিজের পিতামাতার সামনে প্রস্তাবকে গ্রহন করার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি দিতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। আর এতে বস্তুতই কোন লজ্জা শরমের অবকাশ নেই।

সচ্চরিত্র পুরুষের নিকট নারী সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে।

আনাস (রা.) বলেন, "একজন নারী রাসূলের নিকট এসে নিজেকে তার সামনে পেশ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করেন?"[১০৮]

সাহল (রা.) বলেন, একজন মহিলা রাসূল (সা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করল। রাসূল (সা.) তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি তার উঠিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তার শরীরের উপর চিন্তার দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন, অতঃপর দৃষ্টি নিচু করে নিলেন। মেয়েটি ভাবল, তিনি তার বিষয়ে কোন সিদ্ধন্ত নিবেন না, তাই মেয়েটি বসে পড়ল। সাহাবীগণের মধ্য হতে একজন সাহাবী দাঁড়ালেন এবং বললেন, আপনি তাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে না করলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেন। রাসূল (সা.) লোকটিকে বললেন, তোমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও এবং অন্বেষণ কর কিছু পাও কিনা? লোকটি গেল, অতঃপর ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম! কিছুই পেলাম না। রাসূল (সা.) বললেন, যাও একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আস। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আল্লাহর কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার একটি লুঙ্গী আছে আমি তাকে অর্ধেক দিব।

রাসূল (সা.) বললেন, তুমি অর্ধেক লুঙ্গী দিয়ে কি করবে? তুমি পড়লে তার হবে না, আর সে পড়লে তোমার হবে না। শেষ পর্যন্ত লোকটি বসে পড়ল। দীর্ঘ সময় বসে থেকে বলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রাসূল (সা.) তাকে চলে যেতে দেখে তাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কুর'আনের কিছু জান? সে বলল আমি ওমুক ওমুক সূরা জানি। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি যাও কুর'আনের বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিলাম, তুমি তাকে কুর'আন শিখিয়ে দাও।" [১০৯]

অন্যদিকে কনের পিতা পছন্দ মত ছেলের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। আর ছেলে পক্ষও কিংবা ছেলে নিজেও বিয়ের প্রস্তাব প্রথমত কন্যা পক্ষের নিকট পেশ করতে পারে। শরী'আতে এতে কোন আপত্তি নেই কিংবা কারো পক্ষেই কোন লজ্জা শরমেরও কারণ নেই। হযরত উমর (রাঃ) কন্যা হাফসা (রাঃ) বিধবা হলে তাঁর পূর্নবিবাহের জন্যে তিনি [হযরত উমর] প্রথমে হযরত ওসমান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষত করেন এবং হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে তার নিকট সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন। তখন হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, এ সম্পর্কে আমার মতামত শীগগীরই জানিয়ে দেব।

১০৮। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৭ মূল আরবী ঃ
عن انس رضي قال جاءت امراة الى رسول الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله الك بى حاجة-

১০৯। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী প্রাগুক্ত, খ. ২য় পৃ.৭৬৮

কয়েকদিন পর তিনি বললেন, আমি বর্তমানে বিয়ে করা সম্পর্কে চিন্তা করছি না। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্ত তিনি এ ব্যাপারে মতামত জানানো থেকে বিরত থাকলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত নবী করীম (সা.) নিজেই নিজের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব হযরত উমরের নিকট প্রেরণ করেন।[১১০]

তবে বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেয়া যাবে না। অর্থ্যাৎ কোন মেয়ে বা ছেলে সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, কোথাও তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে বা কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছে, তাহলে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন প্রস্তাবই এক্ষেত্রে উত্থাপন করা যাবে না। কেননা, এতে করে সমাজে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব সহজেই জেগে উঠতে পারে। এজন্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সর্তকতা

অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। নবী করীম (সা.) এ সম্পর্কে বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন অপর ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ না করে। যতক্ষণ না সে নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, কিংবা তাকে নতুন প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেবে।[১১১]

শাহ্ ওয়ালীওল্লাহ দেহলভী (র.) [১১২] (জন্ম ১৭০৩ খ্রী:/১১১৪হি. মৃ. ১৭৬২/১১৭৩ হি.) বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়ার অপকারিতা এবং তা নিষেধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন সেই মেয়ের মনেও তার প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয় এবং এর ফলে উভয়ের ঘর-সংসার গড়ে ওঠার উপক্রম দেখা দেয়। এ সময় যদি সে মেয়ের জন্য অপর কোন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে তাহলে প্রথম প্রস্তাবককে তার মনের বাসনায় ব্যর্থ মনোর করে দেয়া হয়, তার অধিকার থেকে করে দেয়া হয় বঞ্চিত, এতে করে তার প্রতি বড়ই অবিচার ও জুলুম করা হয়, তার জীবন করে দেয়া হয় সংকীর্ণ।"[১১৩]

১১০। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ.১৪৮

১১১। আবূ দাউদ আল সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, অনু: ই.ফা.বা, খ. ৩য়, কিতাব আন-নিফাহ, পৃ.১৮৭
হাদীস নং–২০৭৬ মূল আরবীঃ لايخطب احدكم على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له
বুখারী শরীফে এ হাদীসের ভাষা নিম্নরূপঃ لايخطب الرجل خبطة اخيه حتى ينكح او يترك
কেউই তার ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেবে না যতক্ষণ না সে বিয়ে করে ফেলে অথবা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে।

১১২। তাঁর নাম শাহ ওলী উল্লাহ, তাঁর পিতার নাম শাহ আবদুর রহীম। তিনি ১১১৪ হিঃ সনের (১৭০৩ খ্রীঃ ১১ই ফে.) রোজ বুধবার বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফর নগর জেলার ফুলাত গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহন করেন। মাতুলালয় ফুলাতে জন্মগ্রহন করলেও শাহ ওয়ালী উল্লাহর শৈশব কেটেছে দিল্লীতে। তাঁর বয়স পাঁচ বছরে পদার্পণ করলে শাহ ওয়ালী উল্লাহর পিতা তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত রহীমিয়া মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অপরিসীম মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৫ বছর বয়সেই শাহ ওয়ালী উল্লাহ হিন্দুস্থানে প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্ত করে ঐ মাদ্রাসায়ই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৭ বছর বয়সে তাঁর পিতার ইন্তেকাল হলে মক্কায় পবিত্র কা'বা মদীনায় নবীজীর রওজা হতে পরিপূর্ণ মানসিক শক্তি অর্জনের জন্যে তিনি হেজায গমন করেন। সুদীর্ঘ ১৪ মাস হেজাযের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমন করে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হঠাৎ করে দিল্লীতে চলে আসেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত রহীমিয়া মাদ্রাসায় পুনরায় শিক্ষাদান শুরু করেন। এ মহান কর্মেই তিনি তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি বহু গ্রন্থ প্রনয়নে খেদমত করেছেন। অবশেষে তিনি ১৭৬২ খ্রী. ২২ আগষ্ট ইন্তিকাল করেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ আরো লিখেছেন, "বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করা" সম্পর্কিত উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই আমাদের মত হচ্ছে যে, এ কাজ হারাম। ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদেরই এ মত। আল-মিনহাজ কিতাবে বলা হয়েছে- বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর যদি তা গৃহীত হয়ে থাকে, তবে তার উপর অপর কারো প্রস্তাব দেয়াও সম্পূর্ণ হারাম। তবে উভয় পক্ষের অনুমতি নিয়ে নতুন প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। কিংবা সে প্রস্তাব যদি প্রত্যাহার করা হয়, তা হলেও দেয়া যায়। আর যদি প্রথম প্রস্তাবের কোন জবাব না দেয়া হয়ে থাকে, প্রত্যাখ্যানও না করা হয়, তখন নতুন প্রস্তাব দেয়া বাহ্যত হারাম হবে না।[১১৪]

আবার কোন পুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীর বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতেও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোন নারী অপর বোনের বর্তন খালি করে দিয়ে বসার জন্যে তার তালাক চাবে না। কারণ, সে তো তাই পাবে যা তার জন্যে অদৃষ্টে আছে।"[১১৫]

৪. কনের মতামত

ইসলামই নারী জাতিকে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে। তার অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানবিক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করেছে। নারীকে যে কোন ব্যাপারে চুক্তিপত্র সম্পাদন করারও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায় নারী তার স্বীয় দেহ সমর্পণ অর্থ্যাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সে তার পছন্দ অপছন্দের অধিকার থাকবে তা বলাই বাহুল্য। একজন সুস্থ প্রাপ্তা বয়স্কা রমণীকে তার পছন্দসই পাত্রের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ইসলাম প্রদান করেছে। সুতরাং পুরুষের যেমন কনে বাছাই করার অধিকার আছে, নারীরও তদ্রুপ বর বাছাই করার অধিকার রয়েছে। তার সম্মতি ব্যতীত তার অভিভাবক তার বিয়ে দিতে পারবে না, বরং নিজ পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ের অধিকার তার আছে। নারীর মতামতের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার কারোর অধিকার নেই।[১১৬]

১১৩। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, ***হুজাতুল্লাহিল বালিগা,*** কায়রোঃ দারুত তরাছ, তাবি, খ. ২য়, পৃ.১২৪

১১৪। তবে ফিকহের দৃষ্টিতে এখনে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হল প্রথম দ্বিতীয় এই উভয় প্রস্তাবকারীই যদি অসৎচরিত্রের লোক হয় এবং দ্বিতীয় প্রস্তবকারী দ্বীনদার ও নেক চরিত্রের হয় তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব সম্পূর্ণ বৈধ ও সঙ্গত। (আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, ***হিদায়াতুল মুজতাহিদ,*** মিশর; আল মাকতাবা আল-কুল্লিয়া আল-আজহার, ১৯৬৯, খ,২য়, পৃ.৩)

১১৫। অপর বোনের তালাক হওয়ার অর্থ হলো, তার উপর অত্যাচার চালানো এবং তার জীবিকা বিনষ্ট করা। আর একে অন্যের জীবিকা বিনষ্ট করাই হল দেশের ধ্বংসের কারণসমূহের অন্যতম। অথচ প্রতিটি ব্যক্তিই তার যোগ্যতানুযায়ী মহান আল্লাহ তার জন্যে যা সহজ করে দিয়েছেন, তদানুযায়ী স্বীয় জীবিকা নষ্ট করবে না এটা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। (শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ২য়, পৃ. ৩০৬)

১১৬। আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩২, ২৪০

মহানবী (সা.) বলেছেন, "বিধবার বিয়ে তার স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। আর কুমারীর সম্মতি ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ যে আল্লাহর রাসূল! তার সম্মতি কি ভাবে জানা যাবে? তিনি বললেন, তার চুপ থাকাই তার সম্মতি।"[১১৭] পিতা তার কন্যার অনুমতি ছাড়াই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছেন এমন বিয়ে রাসূলে করীম (সা.) ভেঙ্গে দিয়েছেন।

"এক ব্যক্তি তার কুমারী মেয়েকে তার বিনা অনুমতিতে বিয়ে দেন। বিয়ের পর মেয়েটি নবী (সা.) এর নিকট এসে অভিযোগ দায়ের করে। তিনি তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করে দেন।"[১১৮]

কুমারী কন্যা তার বিয়ের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী। তার মতের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া বা তার সম্মতি- অনুমতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা তার পিতা বা অভিভাবকের জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

মোটেই সমীচীন নয়। নবী করীম (সা.) বলেনঃ "স্বামী পাওয়া মেয়ে তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্না। আর কুমারী কন্যার কাছ থেকে তার নিজের ব্যাপারে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।"[১১৯] "এক যুবতী মেয়ে নবী করীম (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানাল যে, তার পিতা পিতার ভাইয়ের পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছে। কিন্ত এ বিয়ে তার পছন্দ নয়। তখন নবী করীম (সা.) এ বিষয়ে কয়সালা করার ইখতিয়ার তাকে দিলেন। মেয়েটি বললঃ আমার পিতা যে আত্মীয়তা তরেছে সে তা কার্যকর করেছে কিন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি নারীকুলকে জানিয়ে দেব যে, ان ليس للاباء من لام شئ মেয়েদের ব্যাপারে বাপদের কিছু করার ইখতিয়ার নেই।"[১২০] মেয়ের জন্যে দ্বীনদার চরিত্রবান সমমানের ছেলের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলে তার বিয়ে বিলম্বিত করার পিতার কোন অধিকার নেই। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ "তিনটি ব্যাপারে বিলম্বিত করা জায়েজ নয় (১) নামায তার সময় হয়ে গেলে। (২) জানাযা লাশ উপস্থিত হলে। (৩) বিয়ে–যোগ্য মেয়ের বিয়ে যদি সমান মানের প্রস্তাব পাওয়া যায়।[১২১]

তিনি আরো বলেছেন ঃ "যার দ্বীনদারী ও চরিত্র তোমাদের পছন্দমত হবে তার কাছে বিয়ে দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে চরম অশান্তি ও বিরাট বিপর্যয় দেখা দেবে।"[১২২]

১১৭। ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাব আন্ নিকাহ, খ. ২, পৃ. ৭৭১

১১৮। ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন আলী আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ, ***সুনান আন্-নাসাঈ***, কিতাবুন্ নিকাহ, খ.২য়, পৃ. ৮০২
মূল আরবী পাঠঃ ان رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستاذنها فاتت النبى صد ففرق بينهما- এব্যাপারে আরো একটি হাদীস হলোঃ আসসার বংশীয় খিদামের বিধবা কন্যা খাসসা বর্ণনা করেন, তার পিতা তাকে এমন এক বিয়ে দিয়ে ছিলেন- যাতে তার মত ছিল না, অতঃপর নবী করীম (সা.) কে এটা জানালে তিনি এই বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। (বুখারী, কিতাব আন্ নিকাহ, অনুচ্ছেদ-৪৩)

১১৯। ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাব আন্ নিকাহ, খ. ২, পৃ. ৭৭২ মূল আরবী পাঠঃ الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها واذنها هماتها-

১২০। ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ ইযাযিদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাজাহ (র.), ***সুনান ইবন মাজাহ*** দিল্লীঃ মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, কিতাবুন নিকাহ, খ. ১, পৃ. ৭০২

১২১। ইমাম আবূ ঈসা আত্ তিরমিযী, আল-জামি আত্ তিরমিযী, দিল্লীঃ আসাহহুল মাতাবি, কিতাবুন নিকাহ, খ. ২, পৃ. ৮০২
মূল আরবী পাঠঃ ثلاث لا يؤخرنّ الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت ولايم اذا وجدلها كفْأ

১২২। প্রাগুক্ত, মূল আরবী পাঠঃ
اذا اتاكم من ترضون ديه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه فكن فتنة فى الارض وفساد كبير-

পাত্র নির্বাচনে নারী অধিকার ইসলামে সর্বজন স্বীকৃত। বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি আবশ্যক, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কিন্ত শুধুমাত্র নারী সম্মতিক্রমেই বিবাহ বৈধ কিনা এবং অভিভাবকের মত প্রয়োজন কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্বাধীন, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্কার বিয়ে তার সম্মতিক্রমে সংঘটিত হবে। যদিও কোন অভিভাবক এ সংঘটন সম্পন্ন না করে। নারী কুমারী হোক কিংবা অকুমারী। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, নারীর সম্মতিতে বিবাহ সম্পাদিত হতে পারে, তার অভিভাবকের সম্মতির উপর এর বৈধতা নির্ভর করবে। অপর পক্ষে ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, নারীদের ভাষ্যে বিয়ে কোন পর্যায়েই

সংঘটিত হবে না। কেননা, বিয়ে হয়ে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। আর বিয়ে তাদের উপর ন্যস্ত করলে সে উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।[১২৩]

এই হলো সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক বিধান ও দৃষ্টিকোণ্। নারী পুরুষের জীবনের বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বিয়ে। ইসলাম তাতে উভয়কে যে অধিকার ও আজাদি দিয়েছে তা বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিপুল অবদান, সন্দেহ নেই। আধুনিক ছেলেমেয়েরা তাদের বিয়ের ব্যাপারে মা-বাবা গার্জিয়ানদের কোন তোয়াককাই রাখে না। তাদের কোন পরোয়াই করা হয় না। বিয়ে নিজের পছন্দেই ঠিক এ কথার সত্যতা অস্বীকার করা হচ্ছে না, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক যুবক-যুবতীরা যৌবনের উদ্দাম স্রোতের ধাক্কায় অবাধ মেলা-মেশার গডডালিকা প্রবাহে পড়ে দিশেহারা হয়ে যেতে পারে এবং ভাল-মন্দ, শোভন-অশোভন বিচার শুন্য হয়ে যেখানে সেখানে আত্মদান করে বসতে পারে। তাই উদ্যম-উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক বিচার-বিবেচনারও বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, বিয়ে কেবলমাত্র যৌন প্রেরণা পরিতৃপ্তির মাধ্যম নয়; ঘর, পরিবার, সন্তান, সমাজ, জাতি ও দেশ সর্বোপরি নৈতিকতার প্রশ্নও তার সাথে গভীরভাবে জড়িত। তাই বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পিতা বা অলীর মতামতের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কেননা, সাধানণত অলী পিতা-দাদা নিজেদের ছেলেমেয়েদের কখনো অকল্যাণকামী হতে পারে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পিতামাতার মতের গুরুত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না।

৫. বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচার

বিয়ে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যারা সমাজেরই লোক বিবাহিত হয়ে পরস্পরে মিলে দাম্পত্য জীবন-যাপন করতে ইচ্ছুক, কাজেই তাদের ঐক্য ও মিলন সৃষ্টি ও সুষ্ঠু মিলিত জীবন-যাপনের পশ্চাতে সমাজের আনুফূল্য ও সমর্থন-অনুমোদন একান্তই অপরিহার্য। এসব কারণেই ইসলাম গোপন ও লুকোচুরি বিয়েকে পছন্দ করে না। এ অনুষ্ঠানকে ইসলাম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করার পক্ষপাতি। যে সমাজে হবে সে সমাজের প্রতিটি লোকের বৈবাহিক এ সম্পর্কের খবর জানা উচিত।

১২৩। বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, (অনুঃ আবূ তাহের মিছবাহ), *আল-হিদায়া,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, খ. ২, পৃ. ১৯

সমাজের দৃষ্টিতে বিয়ে যেমন খোদায়ী বিধি সম্মত হতে হবে, তেমনি তা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতও হতে হবে। গোপনীয় বিয়েকে অসমর্থন জানানো হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে পুরুষদের সম্পর্কে কলা হয়েছেঃ -محصنين غير مسفحين "বিবাহের বন্ধনে স্ত্রী গ্রহণ করবে, জ্বেনাকারী হিসেবে নয়।"[১২৪]

নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃمحصنت غير مسفحت ولامتخذات اخدان

"বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুরুষদের সাথে মিলিত হয়ে; জ্বেনাকারিণী কিংবা গোপনে প্রণয় বন্ধুত্বতাকারিণী হয়ে নয়।"[১২৫]

বিয়ের অনুষ্ঠান যাতে করে ব্যাপক প্রচার লাভ করে তার নির্দেশ এবং উপায় বলতে গিয়ে রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضوبوا عليه بالدفوف-

"এ বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর, তা মসজিদে সম্পন্ন কর এবং ব্যাপক একতারা বাদ্য বাজাও।"[১২৬]

মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র। মহল্লার ও আশে পাশের মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার মসজিদ জমায়েত হয়ে থাকে। এখানে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে তারা সহজেই এতে শরীক হতে পারে, আপনা-আপনিই জেনে যেতে পারে অমুকের ছেলে আর অমুকের মেয়ে আজ বিবাহিত হচ্ছে এবং স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এতে করে সামাজিক সমর্থন সহজেই লাভ করা যায়। এছাড়া মসজিদ হচ্ছে অতিশয় পবিত্র স্থান, বিয়েও অত্যন্ত পবিত্র কাজ। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ইবদতের জায়গা, বিয়েও আল্লাহর এক অন্যতম প্রধান ইবাদত, সন্দেহ নেই। এরূপ ইবাদতপূর্ণ পবিত্র কাজটি মসজিদে সুসম্পন্ন হওয়াই বাঞ্চনীয়।

দ্বিতীয়ত, বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় "দফ" [১২৭] বা একতারা বাজাতে বলা হয়েছে। এ বাদ্য নির্দোষ। রাসূলে করীম (সা.) বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় এ বাদ্য বাজানোর শুধু অনুমতিই দেননি, সুস্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছেন। যদিও তা বাজানো ওয়াজিব নয়; কিন্তু সুন্নাত। বিশেষত এজন্যে যে, নবী করীম (সা.) চুপেচাপে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়াকে অদৌ পছন্দ করতেন না। এমনি একটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শুনে নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করেন:

فهل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغنى-

"তোমরা সে বিয়েতে কোন মেয়ে পাঠাও নি, সে বাদ্য বাজাবে আর গান গাইবে।"[১২৮]

১২৪। আল-কুর'আন, ৪:২৪

১২৫। আল-কুর'আন, ৪: ২৫

১২৬। ইমাম আবূ ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত,খ. ১ পৃ. ৭০৫

১২৭। 'دف' টি ইংরেজী হচ্ছে Tambourine খঞ্জনি বা তম্বুরা এক মুখী ঢোল। যা আওয়াজ করে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যম। দফ বাজিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এমন গান গাইবে যা যৌনাচার বা অশ্লীলতার দিকে মানুষকে উত্তেজিত করে না। ইসলামের প্রতি প্রেরণাদায়ক এবং যুদ্ধাভিযানের বীরত্ব ব্যঞ্চক গৌরব গাঁথা ও গান দফ বাজিয়ে পরিবেশন করা বিয়ের মজলিসের একটি পছন্দনীয় কাজ। এতে একাধারে সকলে বিয়ের কথা জানতে পারবে, ইসলামী জীবন-বিধান উদ্বুদ্ধ হবে এবং বড় বাদ্যযন্ত্রের ভয়াবহ আওয়াজ থেকে রক্ষা পাবে। (মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮২)

১২৮। আল্লামা শাওকানী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত খ. ৬, পৃ. ৩৩৮

রুবাই বিনতে মুওয়ায (রা.) বলেন, আমার যখন বিয়ে হচ্ছিল তখন নবী করীম (সা.) আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমার বিছানায় আসন গ্রহন করলেন। তখন ছোট ছোট মেয়েরা 'দফ' বাজাচ্ছিল আর গান করছিল। এ সময় একটি গায়িকা মেয়ে গান বন্ধ করে বলল: 'সাবধান' এখানে নবী করীম (সা.) উপস্থিত হয়েছেন, কাল কি হবে, তা তিনি জানেন। এ কথা শুনে নবী (সা.) বললেনঃ "এসব কথা ছাড়ো, বরং তোমরা যা বলছিলে, তা বলতে থাকো। তোমরা যুদ্ধ-সংগ্রাম ও বীরত্বের কাহিনী সম্বলিত যেসব গীত-কবিতা পাঠ করছিলে ও গাইতেছিলে, তাই করতে লেগে যাও।"[১২৯]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রচারের উদ্দেশ্যে একতারা বাদ্য বাজানো আর এ উপলক্ষ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নির্দোষ, ঐতিহাসিক কাহিনী ও জাতীয় বীরত্বব্য গীত-গজল গাওয়া শরী'আতের খেলাফ নয়। কিন্তু তাই বলে এমন সব গীত-গান গাওয়া কিছুতেই জায়েজ হতে পারে না যাতে অন্যায়-অশ্লীলতার প্রচার হয়, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, রূপ সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

একতারা বাদ্য বাজানোর জন্যে আদেশ করার মূলে একটি ভাল দিক রয়েছে আর তা হল, বিয়ে এবং গোপন বন্ধুত্ব-ব্যভিচার উভয় ক্ষেত্রেই যখন যৌন স্পৃহার পরিতৃপ্তি ও নর-নারী উভয়ের সম্মতি সমানভাবে বর্তমান থাকে, তখন উভয়ের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই পার্থক্য করার মত কোন জিনিসের ব্যবস্থা করার আদেশ দেয়া একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেন বিয়ে সম্পর্কে কারো কোন কথা বলবার না থাকে এবং না থাকে কোন গোপনীয়তা।[১৩০]

বিয়ের অনুষ্ঠানে 'ঢোল' খঞ্জান বাজানো ও অনুরূপ কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো জায়েয হওয়া সম্পর্কে সব আলেমই একমত। আর বিয়ে অনুষ্ঠানের সাথে তার বিশেষ যোগের কারণ হচ্ছে এই যে, এতে করে বিয়ের কথা প্রচার হবে ও এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর তার ফলেই বিয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৩১]

৬. অলীমার অনুষ্ঠান

বিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে অলীমার [১৩২] জিয়াফত করা। এ অনুষ্ঠান মেয়ে পক্ষেরও যেমন করা উচিত, তেমনি করা উচিত ছেলে পক্ষেরও।

১২৯। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, খ. ২, পৃ. ৫১৪৭ মূল আরবী পাঠ:
قالت الربيع معوذ بن غفراء جاء النبى صد فدخل حبن بنى على فلجس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جوير بان لنا يضر بن الدف ويندبن من قتل من ابائ يوم بدر اذ قالت احداهن وفينا نبي يعلم مافى غد فقال دعى هذه وقولى مالذى كنت تقولين۔

১৩০। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, ***হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,*** প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ৭০২ মূল আরবী:
وفى ذالك مصلحة وهى ان النكاح والسفاح لما تفقا فى قضا الشهوة ورضا الرجل والمراة وجب ان يؤمر لشئ يتحقق به الفرق بينهما بادى الرامى بحيث لايبقى لاحد فيه كلام ولاخفاء۔

১৩১। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ***ওমদাতুল কারী,*** প্রাগুক্ত, খ. ২০ পৃ. ১৫০ মূল আরবী পাঠ:
اتفق العلماء على جواز اللهوفى وليمة النكاح كضرب الدف وشبه وخصة الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشر فتشبت حقوقه وحومته

১৩২। 'অলীমা' শব্দের অর্থ একত্রিত করা। বিয়ে উপলক্ষে অত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের একত্র করে যে শুভেচ্ছা ভোজের আয়োজন করা হয়, তাই হচ্ছে অলীমা। আর শরী'আতের দৃষ্টিতে অলীমা'র জিয়াফত বলতে বুঝায়: وهى طعام يصنع عند العرس يدعى اليه الناس۔ 'বিয়ে অনুষ্ঠানের সময়কালীন আয়োজিত খানা যার জন্যে লোকদের দাওয়াত দেয়া হয়। (মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫৭)

ইসলামে এ অলীমা-জিয়াফতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূল করীম (সা.) অলীমার রীতি ইসলামী সমাজে বিশেষ ভাবে চালু করেছেন। রাসূলে করীম (সা.) যয়নব বিন্‌তে জাহশকে বিয়ে করার পর নিজ হাতে বকরী যবাই করে অলীমা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এবং উপস্থিত সকলকে তৃপ্তি সহকারে আহার করান। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ

اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى زينب بنت جحش فاشبع الناس خبزا ولحما۔

"রাসূল করীম (সা.) যখন যায়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে ঘর বাঁধলেন, তখন তিনি লোকদেরকে রুটি ও গোশত খাইয়ে পরিতৃপ্তি করে দিয়েছিলেন।"[১৩৩]

তিনি যখন হযরত সাফীয়া (রা.) কে বিয়ে করে ছিলেন, তখন খেজুর দিয়ে অলীমার জিয়াফত করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম খায়বর ও মাদীনার মাঝখানে একাদিক্রমে তিন রাত অবস্থান করেছিলেন। তার মধ্যে একদিন সাহাবাদের অলীমার দাওয়াত দিলেন। এ দাওয়াতে না ছিল গোশত না ছিল রুটি। বরং রাসুলে করীম (সা.) সকলের সামনে খেজুর ছড়িয়ে দিলেন। হযরত সফীয়ার বিয়ের অলীমা এমনি অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল।[১৩৪]

হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ বিয়ে করলে রাসূলে করীম (সা.) তাকে বলেন ঃ

بارك الله لك اولم ولو بشاة

"আল্লাহ্ এ কাজে তোমাকে বরকত দিন, একটি বকরী দিয়ে হলেও অলীমা জিয়াফত কর।"[১৩৫]

হযরত আলী (রা.) যখন ফাতিমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তখন নবী করীম (সা.) বলেছিলেন ঃ لابدّ للعروس من وليمة "এ বিয়ের অলীমা অবশ্যই করতে হবে।"[১৩৬]

হাফিজ আজুরী মুহাম্মদ বিন হুসাইন হতে এই মর্মে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন ফাতিমার বিবাহ যখন আলী (রাঃ) এর সাথে হয়, তখন আল্লাহর নবী (সা.) বিলালকে চার পাঁচ মুদ গম ও উট যবেহ করতে আদেশ দেন। বিলাল তা-ই করলেন। উপস্থিত জনগণ দলে দলে খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাতে আল্লাহর নবী বরকতের দু'আ করলেন এবং তার বিবিগণের মধ্যে বন্টনের অনুমতি দেন।[১৩৭]

অলীমা অনুষ্ঠান করা 'সুন্নাহ' অলীমা করা হচ্ছে একটি অধিকারের ব্যাপার, একান্ত কর্তব্য। ইসলামের স্থায়ী নীতি। যাকে এ জিয়াফতে শরীক হওয়ার দাওয়াত দেয়া হবে, সে যদি তাতে উপস্থিত না হয়, তা হলে সে নাফরমানী করল।[১৩৮]

১৩৩। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত,

১৩৪। আল্লামা শাওকানী, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩২১

১৩৫। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত,

১৩৬। আহমাদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮৩

১৩৭। শাইখ আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী, ***তাযবীজে রাহমানী বা ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি ও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন***, ঢাকা: তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২য় সং–২০০৩. পৃ. ২৭

১৩৮। ইমাম তাররানী, মূল আরবী পাঠ:

الوليمة حق وسنة فمن دعى ولم يجب فقد عطى۔

অলীমা জিয়াফতের আকার কি হবে, কত হবে এতে ব্যয়িত অর্থের পরিমান; তা শরী'আতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তবে একথা মনেরাখা আবশ্যক যে, ব্যক্তির সামর্থ এবং মনের উদারতা অকৃপণতা অনুপাতেই তা করতে হবে। আল্লামা শাওকানী বলেন, "সচ্ছল অবস্থার লোকের পক্ষে একটি বকরী জবাই করে খাওয়ানোই হচ্ছে অলীমার কম-সে-কম পরিমাণ।"[১৪০] অলীমার জিয়াফতে কত বেশী খরচ করা হবে, এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই বলেই বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ

করেছেন। আর কমেরও শেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায় না। যার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ও সহজ, তা করাই যথেষ্ট। তবে স্বামীর অর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী এ কাজে অর্থ ব্যয় হওয়া বাঞ্চনীয়, তাতে সন্দেহ নেই।[১৪১] অলীমার জিয়ফত করা স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী হওয়া উচিত এবং তা তরা উচিত এবং তা করা ওয়াজিব বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচারের উদ্দেশ্যে।

রাসলে করীম (সা.) বিয়ে করে অলীমার জিয়াফত করেননি এমন ঘটনা আমার জানা নেই।[১৩৯]

অলীমা জিয়াফত করার অনেক কল্যাণ ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে। আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী দু'টো কল্যাণের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছেঃ

التلطف باشاعة النكاح اذ لابد من لاشاعة لئلا يبقى محل لوهم الواهم فى النسب-

"এতে করে খুব সুন্দরভাবে বিয়ের প্রচার হয়ে যায়। কেননা বিয়ের প্রচার হওয়া এ কারণেও জরুরী যে, তাদের কোন সন্তান হলে তার সদজাত হওয়া ও তার বংশ সাব্যস্ত হওয়ার কোন সন্দেহকারীর সন্দেহ তরার কোন অবকাশ যেন না থাকে।"[১৪২]

আর দ্বিতীয় কল্যাণ হচ্ছে: স্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সদাচরণ প্রকাশ করা। তিনি বলেন ঃ

فان صرف المال لها جمع الناس فى امرها يدل على كرامتها وكونها دات بال عنده-

নববধুর জন্যে স্বামী যদি অর্থ খরচ করে ও তার জন্যে লোকদের একত্রিত করে, তবে তা প্রমাণ করবে যে, স্বামীর নিকট তার খুবই মর্যাদা রয়েছে এবং সে তার স্বামীর নিকট রিতীমত সমীহ করার যোগ্য।"[১৪৩]

ইসলামে বিয়ে উপলক্ষে অলীমার জিয়াফতের গুরুত্ব এতখানি যে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে এ দাওয়াত কবুল না করার ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। বরং এ দাওয়াতে হাজির হওয়াকে শরী'আতে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েজে। নবী (সা.) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যদি বিয়ের অলীমায় নিমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন এ দাওয়াত কবুল করে ও উপস্থিত হয়।"[১৪৪]

১৩৯। আল্লামা সানয়ানী ফাহলানী, ***সুবুলুস্ সালাম,*** প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৩ মূল আরবী পাঠ:
لا اعلم انه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة-

১৪০। আল্লামা শাওকানী, ***তাইলুল আওতার,*** প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ২২৩ মূল আরবী পাঠ:
اجمعوا على انه لاحد لاكثر مايؤلم به واما اقله فكذالك ومهما تير اجز أو المستحب انها على قدر حال الزوج-

১৪১। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ওমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, খ. ২০ পৃ. ১৫৪ মূল আরবী পাঠ:
وهى على قدر الامكان والوجوب لاعلان النكاح-

১৪২। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১৪৩। প্রাগুক্ত,

১৪৪। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ***মুসনাদ*** মূল আরবী পাঠ: اذا دعى احدكم الى وليمة عريس فليجب-

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে: "তোমাদের কেউ অলীমার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে সে যেন অবশ্যই তাতে যায়।"[১৪৫]

হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের কেউ কোন খাবার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে তার সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত তারপর খাওয়া তার ইচ্ছাধীন।"[১৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুরায়ার হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ: " যে লোক অলীমার দাওয়াতে শরীক হয় না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।"[১৪৭]

হযরত ইবন ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "অলীমার দাওয়াতে যদি তোমরা নিমন্ত্রিত হও তবে অবশ্যই তাতে শরীক হবে।"[১৪৮]

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অলীমার দাওয়াত হলে তা কবুল করা এবং তাতে শরীক হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ওয়াজিব, কোন কোন ফিকহ্‌বিদ অলীমার দাওয়াত এবং সাধারণ খাবার দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মধ্যে ইবন আবদুল বারর, কাযী ইয়াজ, ও ইমাম নববী একমত রায় দিয়েছেন যে, অলীমার দাওয়াতে হাজির হওয়া ওয়াজিব। আর ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম হাম্বলী (র.) সহের অধিকাংশ মনীষীর মতে এ হচ্ছে ফরযে আইন, আবার কেউ কেউ 'ফরযে কিফায়া'ও বলেছেন।[১৪৯]

অলীমার ভোজে ধনী-দরিদ্র সকলকেই দাওয়াত করতে হবে। গরীবদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত দেয়া ইসলামের রীতি নয়। রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ "নিকৃষ্টতম ভোজ হলো সেই অলীমার ভোজ, যেখানে কেবল ধনী লোকদের দাওয়াত দেয়া হয়, আর বাদ দেয়া হয় গরীব লোকদের।"[১৫০]

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে: "অলীমার সেই খানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট, যেখানে যারা আসবে তাদের তো নিষেধ করা হবে বা দাওয়াত দেয়া হবে না, আর দাওয়াত দেয়া হবে কেবল তাদের, যারা তা কবুল করে না বা আসবে না।"[১৫১]

এ হাদীসে দু'টো থেকে প্রমাণিত হলো যে, অলীমার জিয়াফত বেছে বেছে কেবল ধনীলোকদের দাওয়াত দেয়া আর গরীব লোকদের দাওয়াত না দেয়া বড় অন্যায়। বরং কর্তব্য হচ্ছে, ধনী-গরীব নির্বিশেষে যতদূর সম্ভব সব শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রন করা। যেখানে কেবল ধনী বন্ধু বা আত্মীয়দের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের জন্যে প্রবেশ নিষেধ করে দেয়া হয়, সেখানকার খানায় আল্লাহর কোন রহমত-বরকত হতে পারে না।

১৪৫। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***সহীহ বুখারী***, মূল আরবী পাঠ:
اذ ا دعی احدکم الی ولیمة فلیانها۔

১৪৬। সহীহ মুসলিম, মূল আরবী পাঠ: اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب ان شان طعام ان شاء ترك۔

১৪৭। সহীহ বুখারী, মূল আরবী পাঠ: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله۔

১৪৮। সহীহ মুসলিম, মূল আরবী: اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها۔

১৪৯। শায়খ কাযী মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আশ্‌ শাওকানী ***তাফসীরে ফাতহুল কাদীর***, বৈরুত: আলামুল কুতুব, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ৩২৬

১৫০। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২ হাদীস নং-৫১৫৭ মূল আরবী পাঠ: شر الطعام الوليمة تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء

১৫১। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, মূল আরবী পাঠ:
شر الطعام طعام الوليمة لمنعها من ياتها ويدعى اليها من ياباها۔

বরং সেই খানা হয়ে যায় নিকৃষ্টতম। এজন্যে যে, আল্লাহর নিকট তো গরীব-ধনীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই; কিন্ত অলীমার দাওয়াতকারী ব্যক্তি বিয়ে করে কিংবা নিজের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্ফুর্তিতে মেতে গিয়ে ধনী-গরীবের মাঝে আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

বিয়ের উৎসবে আর অলীমার জিয়াফতে কেবল যে বয়স্ক পুরুষদেরই দাওয়াত দেয়া হবে এমনটা করা ঠিক নয়। বরং তাতে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য থেকে মেয়েলোক ও শিশুদেরও নিমন্ত্রন করতে হবে। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন ঃ

"নবী করীম (সা.) এক বিয়ের উৎসবে বহু মেয়েলোক ও ছেলেমেয়ে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাদের দেখে খুবই আনন্দ বোধ করে তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশার্থে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন এবং বললেন তোমরাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়জন।"[১৫৪]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন,

وفيه احتحسان شهود النساء والصبيان للاعراس لانها شهادة لهم علينا ومبالغة فى الاعلان بالنكاح

"এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিয়ের উৎসবাদিতে মেয়েলোক ও শিশুদের উপস্থিত হওয়া বা করা খুবই ভাল ও পছন্দনীয়। কেননা, এ সব উৎসবইতো হচ্ছে আমাদের পরস্পরের নিকট আসার উপলক্ষ। আর এ কাজে বিয়ের প্রচারকার্যও পুরা মাত্রায় সুসমপন্ন হয়ে থাকে।"[১৫৩]

'মাহর' (দেন মোহর)

দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের পূর্বে একজন পুরুষের তার স্ত্রী ও ভবিষ্যত বংশধরদের ভরণ পোষণ করার মত আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করতে হয়। মুসলিম পরিবারে পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণ ছাড়াও বিয়ের জন্যে আর্থিক সচ্ছলতা অপরিহার্য। কারণ বিবাহবন্ধন উপলক্ষ্যে স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীকে নগদ অর্থ, সোনা-রূপা বা স্থাবর সম্পতির আকারে নির্ধারিত মাহর আদায় অবশ্যই আদায় করতে হয়। মাহরবিহীন বিয়ে ইসলামে বৈধ নয়। 'মাহর' বলা হয় সেই মূল্যকে যা বিয়ের সময় বরের পক্ষ থেকে কনেকে বিনিময় স্বরূপ দেয়ার ওয়াদা করা হয়। 'মাহর' বলতে এমন অর্থ সম্পদ বুঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।[১৫৪]

সাধারণ কথায় ইসলামী নিয়ম অনুসারে মুসলিম পরিবারের বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদনকালে নির্ধারিত এবং বর কর্তৃক স্বীকৃত ও কনেকে প্রদেয় অর্থ বা সম্পত্তিকে দেনমোহর [১৫৫] হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৫২। সহীহ বুখারী, মূল আরবী পাঠ: ابصر النبىصد نساءً وصبياناً مقبلين من عرس تمبنا فقال لهم احب الناس الىّ-

১৫৩। আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২০ পৃ. ১৬২.

১৫৪। জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ***আদ দুররুল মানসুর,*** বৈরুত: দারুল মা'আরিফা তাবি; খ. ২ পৃ. ৪৫২

১৫৫। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীন রেজিষ্ট্রারকৃত সরকারী নিকাহ্ নামা ফরমে মাহরকে দেনমোহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম নারীর সামাজিক নিরাপত্তায় দেনমোহরের ভূমিকা খুবই গুরুত্ববহ। দেনমোহর স্বামীর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে পুরুষকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন: ان تبتغوا باموالكم-

"নিজেদের সম্পদের 'বিনিময়ে' তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।"[১৫৮]

দেনমোহর পরিশোধ করা কুর'আন মজীদে অপরিহার্য ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে যে স্বাদ গ্রহন কর তার বিনিময়ে অপরিহার্য ফরয হিসেবে তাদের দেনমোহর পরিশোধ কর।"[১৫৭]

আল্লামা জামালুদ্দীন কাশেমী উক্ত আয়াতের তাফসীর করেছেন নিম্মোক্ত ভাষায়:

اى لمتعتم به من المنكوحات بالجماع فاعطوهن مهورهن كاملة فريضة من الله عليكم ان تعطوا المهرتاما۔

"তোমরা পুরুষেরা বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহন করেছ, তার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্ত দেনমোহর পুরোপুরি তাদের নিকট আদায় করে দাও, আদায় কর এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।"[১৫৮]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"এবং মেয়েদের অলি-গার্জিয়ানদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো এবং তাদের দেনমোহর প্রচলিত নিয়ম এবং সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।"[১৫৯]

এ আয়াতদ্বয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে দেনমোহর দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। এজন্যে 'দেনমোহর' হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। প্রথম আয়াতে 'আজাদ ও স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করা সম্পর্কে নির্দেশ এবং দ্বিতীয় আয়াতে দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর দুজায়গায়ই বিয়ের বিনিময়ে দেনমোহর দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ মাহরকে বিনিময় হিসেবে ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময় সূচক ও একটি জিনিসের মোকাবিলায় আর একটি জিনিস দানের কারবারের মতোই ধরে নিয়েছেন।[১৬০]

১৫৬। আল-কুর'আন, ৪: ২৪
১৫৭। আল-কুর'আন, ৪: ২৪
১৫৮। আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী, প্রাগুক্ত,খ. ৫, পৃ. ১১৮৭
১৫৯। আল-কুর'আন, ৪: ২৫
১৬০। আল্লামা ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুর'আন*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, তাবি, খ. ১ পৃ. ৩১৭

'দেনমোহর' স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোন প্রকার দান নয়। বরং এটা স্ত্রীর আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার 'স্বামী তার এ অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে না। এমনকি দেনমোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত নিজেকে স্বামী থেকে দূরে রাখার অধিকার ইসলামী শরী'আত নারীকে প্রদান করেছে। বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু

Dhaka University Institutional Repository

না দিয়ে তার কাছে যেতেও নবী করীম (সা.) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিয়ে করার পর তার নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (সা.)(منعه حتى يُعطيها شيأ তাঁকে কিছু জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট যেতে তাকে নিষেধ করলেন।"[১৬১] আল্লামা শাওকানী (র.) লিখেছেন: "নবী করীম (সা.) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ও তার কিছু-না-কিছু আগে ভাগে দেবার জন্যে স্বামীকে আদেশ করেছেন।"[১৬২]

বাংলাদেশ ধর্মীয় এ বিধানটিকে "মুসলিক বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯"; "মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১"; "মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন-১৯৭৪"; 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫"; ইত্যাদি প্রনয়নের মাধ্যমে আইনগত বাধ্যবাধকতার কাঠামোগত রূপ প্রদান করা হয়েছে।[১৬৩]

সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অথচ সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান পরিবারের মূল যোগসূত্র বিবাহের অন্যতম ইসলামিক শর্ত 'দেন মোহর'। মূল আরবী 'মাহর' যাকে হিব্রু ভাষায় 'মোহার' এবং সিরীয়তে 'মাহরা' বলা হয়, এবং বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে বিবাহে কন্যার প্রাপ্ত যৌতুক। এর অন্য অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্ব, উপহার বা চুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং স্বেচ্ছাকৃত দান, যা স্ত্রী নিজস্ব সম্পত্তির হিসেবে গণ্য।[১৬৬] 'মাহর' প্রকৃত অর্থে একটি প্রাচীন আরবীয় সংস্কৃতি। পৌত্তলিক আরবেও বিবাহে দেনমোহর কে একটি আবশ্যক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হত। দেনমোহর পরিশোধ করার পরই শুধু যথার্থ রীতিসিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হত। দেনমোহর বিহীন বিবাহ বন্ধনকে খুবই জঘন্য এবং অবৈধ সম্পর্ক বলে গণ্য হরা হত; আরব্য রমণীরা একে মর্যাদা হানির বিবেচনা করত এবং ঘৃণার সাথে এমন বিবাহ পরিত্যাগ করত।[১৬৭]

১৬১। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯০

১৬২। আল্লামা শাওকানী, ***নাইলুল আওতাব***, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১৯

১৬৩। দ্রষ্টব্যঃ The dissolution of Muslim Marriage Act. 1939 (VII of 1939); The Muslim Family Laws Ordinance 1961 (Viii of 1961); The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act. 1974 (LXII of 1974); The Family Court Ordinance, 1985 (XVIII of 1985).

১৬৪। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ***সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ***, ঢাকাঃ- ১৯৮২ খ. ২, পৃ. ২৪৯-২৫০

১৬৫। প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৫৬

ইসলামে আবির্ভাবের পূর্বে আরবে দেনমোহর হিসেবে নির্ধারিত অর্থ সম্পদ কনের অভিভাবক, অর্থাৎ পিতা, ভাই প্রমুখের হাতে প্রদান করা হত। যেহেতু 'মাহর' ছিল বিনিময় মূল্য হিসেবে বিবেচিত। বিবাহ উপলক্ষ্যে এ সময় কনে নিজে যা পেত তা ছিল সা'দাক, দেনমোহর কোন

অংশই তাকে দেয়া হত না। তবে ইসলামের আভির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে সম্ভবত; দেনমোহর আংশিক কনেকে দেয়া শুরু হয়।[১৬৬]

স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ স্বামীর উপর ইসলামী আইন দেনমোহর পরিশোধের বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করেছে। যা এতই গুরুত্ববহ যা বিবাহের সময় বির্ধারিত না[১৬৭] হলেও আইন পরবর্তীকালে তা নির্ধারণের ব্যাবস্থা রেখেছে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, "মাহর" নির্ধারণ করা না হলেও বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আভিধানিক অর্থে নিকাহ্ বা বিবাহ হলো মিলন ও দাম্পত্য বন্ধন।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর বিদ্যমানেই তা সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর "মাহর" শরী'আতের বিধানে ওয়াজিব সম্পর্কিত স্থানের মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সুতরাং নিকাহ্ শুদ্ধ করার জন্যে "মাহর" উল্লেখের প্রয়োজন নেই।[১৬৮] আর যদি কেউ 'মাহর' নির্ধারণ না করে কিংবা 'মাহর' না দেয়ার শর্ত নির্ধারণ করে কোন মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে সে 'মাহরে মিছেল'[১৬৯] পাবে, যদি স্ত্রীর সাথে মিলন হয়ে থাকে কিংবা স্ত্রী রেখে মারা যায়।

ইমাম শাফে'ঈ (র.) বলেন, সহবাসের পূর্বে মৃত্যুর বেলায় স্বামীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর মিলনের বেলায় শাফে'ঈ মাযহাবের অধিকাংশ মাশায়েখের মতে 'মাহর' ওয়াজিব হবে। তার প্রমাণ হচ্ছে 'মাহর' হল সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর নিজস্ব হক। সুতরাং সূচনাতেই সে না নেয়ার মত ব্যক্ত করতে পারে, যেমন পরবর্তীতে রহিত করার ক্ষমতা রাখে।

১৬৬। Reubon Ley, ***The social Structure of Islam Cambridge*** University Press, London-1979. P.114

১৬৭। গাজী শামছুর রহমান, ***পারিবারিক আদালত আইন,*** খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ৪৩-৪৪

১৬৮। বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, ***আল-হিদায়া,*** প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৭

১৬৯। "মাহরে মিছিল" বলতে এমন মেয়েলোকের 'মাহর' বুঝানো হয়েছে, যে তার অনুরূপ এবং অনুরূপ মহিলাটি স্ত্রীর পিতার বংশীয় হতে হবে। আর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে তুল্যতা বিবেচিত হবে।
ক) বয়স অর্থাৎ প্রচলিতভাবে যে বয়স গৃহীত;
খ) রূপ, সুতরাং পিতৃবংশীয় ঐ মহিলা সমতুল্য হবে যে রূপে ও রঙে তার সমকক্ষ;
গ) সম্পদ ঘ) শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা, সভ্যতা-ভদ্রতা, সততা ইত্যাদি।
ঙ) স্থান ও কাল
চ) কুমারিত্ব

স্বামী যদি স্ত্রীকে মিলনের পূর্বে তালাক দেয় তা হলে সে 'মাত'আ'[১৭০] পাবে।

কেননা আল্লাহ্ বলেন, "যদি তোমরা স্ত্রী লোকদের স্পর্শ না করে ত্বালাক প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদের কিছু সংস্থান করে (মাত'আ) দেবে, বিওবান

তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী।"[১৭১] আয়াতে বর্ণিত আদেশবাচক শব্দের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত 'মাত'আ' ওয়াজিব।

ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, যদি 'মাহর' নির্ধারিত না করেই কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর উভয়ে কোন 'মাহর' নির্ধারণে সম্মত হয় তাহলে স্ত্রী উক্ত নির্ধারিত 'মাহর' পাবে, যদি স্বামী তার সাথে মিলিত হয়ে থাকে কিংবা তাকে রেখে মারা যায়। আর মিলিত হওয়ার পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দেয় তবে সে 'মাত'আ' পাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)- এর প্রথম অভিমত অনুযায়ী উক্ত নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক পাবে। ইমাম শাফে'ঈ (র.)-এরও এ মত। কেননা, এটা নির্ধারিত 'মাহর' হয়ে গেছে। কুর'আনের ভাষ্য (نصف مافرضتم) অনুযায়ী তার অর্ধেক পাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারীদের পক্ষ থেকে দলীল উপস্থাপন করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, এ নির্ধারণ অর্থ হলো, আক্‌দের মাধ্যমে যা ওয়াজিব হয়েছে তা নির্ধারণ করা, আর তা হচ্ছে 'মাহরে মিছিল'। আর 'মাহরে মিছিল' কখনো অর্ধেক হয় না। সুতরাং যা 'মাহরে মিছিলের' স্থলবর্তী করা হয়েছে তাও অর্ধেক হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও শাফে'ঈ (র.) যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, সেখানে আক্‌দের মধ্যে নির্ধারণ উদ্দেশ্য। কেননা, নির্ধারণের এ অর্থ প্রচলিত।[১৭২]

দেন মোহর পরিমান কি হওয়া উচিত, ইসলামী শরী'আতে এ সম্পর্কে কোন অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দিষ্ট করে কোন পরিমাণও ঠিক করে দেয়া হয়নি।

১৭০। "মাত'আ" বলতে তিনটি কাপড়কে বুঝায় (১) ওড়না (২) জামা এবং (৩) চাদর। ইমাম কুদুরী (র.) এর মতে, "মাত'আ" স্ত্রীর অবস্থার বিবেচনায় হবে। ইমাম কারখী (র.) এ মত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর মতে, "মাত'আ 'মাহরে মিছলের স্থলবর্তী'। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আল্লাহর বানী على الموسع قدره-এর উপর আমল হিসেবে স্বামীর অবস্থাই বিবেচ্য হবে। তবে তা "মাহরে মিছিলের অর্ধেকের বেশী হতে পারবে না, আবার পাঁচ দিরহামের কমও হবে না। (মারগিনানী, আল-হিদায়া, পৃ. ৩)
ইবন আববাস (রা.) বলেন, 'মাতআ'র সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে গোলাম, নীচে হচ্ছে চাঁদী এবং সর্বনিম্নে হচ্ছে কাপড়। অর্থ্যাৎ স্বামী ধনী হলে গোলাম দিবে। আর যদি গরীব হয় তবে কমপক্ষে তিনটি কাপড় দেবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর উক্তি এই যে, যদি মাত'আ বা উপকারী বস্তু নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তবে তার বংশের নারীদের যে 'মাহর' রয়েছে তার অর্ধেক প্রদান করবে। ইমাম শাফে'ঈ (র.) বলেন, কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। বরং কমপক্ষে যে জিনিসকে 'মাত'আ' অর্থ্যাৎ উপকারের বস্তু বা আসবাবপত্র বলা হয় ওটাই যথেষ্ট হবে। আমার মতে, ঐ কাপড়কে 'মাত'আ' বলে যে কাপড়ে নামায পড়া জায়েজ হয়ে থাকে। (হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (র.), ***তাফসীর ইবনে কাসীর***, অনুঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ৬৬২)

১৭১। আল-কুর'আন, ২:২৩৬

১৭২। আল-মারগিনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

তবে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রী মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষেরও তাতে সহজেই রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শরী'আত উভয় পক্ষকে পূর্ণ আজাদি দিয়েছে বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) যা বলেছেন, তা নিম্মোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ

নবী করীম (সা.) দেন মোহরের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি এ কারণে যে, একারণে লোকদের আগ্রহ-উৎসাহ ও ঔদার্য প্রকাশ করার মান কখনো এক হতে পারে না। বরং বিভিন্ন যুগে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক অবস্থা এবং লোকদের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পন্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্যে সর্বকাল যুগ-সমাজ-স্তর অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচি উৎসাহ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হিসেবে একটি পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাস্তব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন করে কোন সুরুচিপূর্ণ দ্রব্যের মূল্য সর্বকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না দেয়া অবৈজ্ঞানিক ও হাস্যকর। কাজেই এর পরিমাণ সমাজ, লোক ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশীও হতে পারে আবার কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দর কষাকষি করাও আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। তার পরিমাণ এমন সামান্য ও নগন্য হওয়াও উচিত নয়, যা স্বামীর মনের উপর কোন শুভ প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। যা দেখে মনে হবে যে, দেনমোহর আদায় করতে গিয়ে স্বামীকে কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, সে জন্যে তাকে কোন ত্যাগও স্বীকার করতে হয়নি। তার মতে, দেনমোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং সেজন্যে সে রীতিমত চিন্তিত ও উদিগ্ন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ এমনও হওয়া নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।[১৭৩] এজন্যে নবী করীম (সা.) একদিকে গরীব সাহাবীকে বললেন: التمس ولوخاتما من حديد "কিছু না-কিছু দিতে চেষ্টা করো। আর কিছু না পারলে দেনমোহর বাবদ অন্তত লোহার একটি আঙ্গুরীয় দিতে পারলেও সেজন্যে অবশ্যই চেষ্টা করবে।"[১৭৪]

আর নি:স্ব দরিদ্র সাহাবী তাও দিতে পারেন নি, তাকে তিনি বলেছেন:

قد زوجتك بما معك من القران

"কুর'আন শরীফের যা কিছু তোমার জানা আছে তা তুমি তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে– এই বিনিময়েই আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।"[১৭৫]

১৭৩। দ্রষ্টব্য: মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১.

১৭৪। মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭৭০-৪৭৭১

১৭৫। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৭১

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, "সাবধান! তোমরা নারীদের দেনমোহরের পরিমাণ বাড়িও না। কেননা, তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এরং আখিরাতে নেকির বিষয় হত, তবে তোমাদের অপেক্ষা সে ব্যাপারে নবী করীম (সা.)-ই বেশী উপযোগী ছিলেন, কিন্ত তিনি ১২ উকিয়ার (সাড়ে বার উকিয়া সমান পাঁচশত দিরহাম) বেশী দিয়ে তার কোন বিবিকে বিবাহ্ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।" জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, সে তার স্ত্রীর 'দেনমোহর' এক অঞ্জলী ছাতু বা খেজুর যে তাকে (স্ত্রী) বৈধ করে নিয়েছে।[১৭৬] 'দেনমোহর' স্বর্ণাকারেও পরিশোধ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ জনৈক মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাকে দেনমোহর হিসেবে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিলেন। নবী করীম (সা.) তার মুখমন্ডলে বিয়ের খুশির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন তখন সে বলল, "আমি একজন মহিলাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বিয়ে করেছি।"[১৭৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে 'মাহর' সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মতামতও কিছুটা ফুটে উঠেছে। বিবাহ হল বর এবং কনের অভিভাবকদের মধ্যে একটি পবিত্র চুক্তি বা আক্দ, আর মাহর বা সা'দাক হচ্ছে এর অপরিহার্য অঙ্গ। এটি বর পক্ষ হতে কনেকে প্রদেয় বাধ্যতামূলক স্ত্রীর ধন। মাহর স্বরূপ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ একে কার্যত: পন্যমূল্য অথবা স্ত্রীর প্রতি দাবী বা অধিকার অর্জনের বিনিময় হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ, তাঁদের মতে, মাহর চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত বিক্রয় মূল্যের সামর্থক। পক্ষান্তরে অন্যদের মত হচ্ছে, 'মাহর' স্ত্রীর সম্মানের প্রতীক অথবা স্ত্রীর নিজের প্রাপ্য অর্থের একটি আইনসঙ্গত জামানত হিসেবে বিবেচিত।[১৭৮]

শাফে'ঈ মাযহাবের ইমামগণ 'মাহর' এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, বিয়ে হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিনিময়মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপর জনকে নিজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। একে অপরের থেকে যেটুকু উপকার লাভ করে তাই হচ্ছে অপরজনের বিনিময়। আর মাহর এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তা পুরুষের উপর অবশ্য দেয় ফরয করে দিয়েছেন। এজন্যে সে বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর উপর খানিকটা অধিকার সম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে।[১৭৯]

প্রচলিত মুসলিম আইনে 'মাহর' হচ্ছে স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার। স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর সম্মানার্থে আইন কর্তৃক আদিষ্ট কর্তব্য। তবে 'মাহর' প্রকৃতার্থে শুধু বিনিময়মূল্য নয়।

১৭৬। অলা-আল-দীন মুহাম্মদ, *মিশকাত আল-মাসাবিহ.* (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮০) খ. ৬, হাদীস নং-৩০৬৬

১৭৭। মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, ***সহীহুল বুখারী,*** অনু: ই.ফা.বা., কিতাব আল নিকাহ, হাদীস নং-৪৭৭২।

১৭৮। আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আল আরাবী, *আহকাম-আল-কুর'আন,* দারুল ফিকর, বৈরুত: লেবানন-১৯৫৭, খ. ১, পৃ. ৩১৭

১৭৯। ইনষ্টিটিউট ফর 'ল' এন্ড ডেভেলোপমেন্ট, পারিবারিক আইন, ১৯৮১, পৃ. ৬

'মাহর' নির্ধারণ করা হবে এমন অর্থ বা সম্পত্তি যা আইনের নীতি বহির্ভূত হবে না।[১৮০] পাশাপাশি 'মাহর' হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কনের নিজস্ব সম্পত্তি বা প্রাপ্য। এটি কোন অবস্থাতেই কনের বাবা-মা বা অভিভাবক পাবে না। যদি প্রাথমিককালে আরবে ক্রীতদাসীকে বিবাহ করলে তার মুক্তির জন্যে বিধান ছিল।[১৮১] প্রায়োগিক দিক থেকে, স্বামী কর্তৃক তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'মাহর' স্ত্রীর জন্যে একটি রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে 'মাহর' কে বিচ্ছেদকালীন সময়ে স্ত্রীর নিরাপত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত: সমাজে অন্যায় প্রতিরোধকারী। মাহরের পুরো অংশ আদায়ের পরই স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। কাজেই তালাকের আগেই তাকে 'মাহর' আদায়ের কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হয়। তবে 'মাহর' আদায়ে একজন পুরুষের পক্ষে যতটা কষ্টদায়ক একজন মহিলার বেলায় এই তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ তার চেয়েও মর্মন্তদ। তাই 'মাহর' বলা যায় দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা স্বরূপ। এক্ষেত্রে মাহরের অর্থ পুরোপুরি আদায় হলে নিরাপত্তা বাড়বে। স্ত্রী হিসেবে তিনি এই 'মাহর' অর্থকরী কার্যক্রমে খাটাতে পারবেন অথবা গচ্ছিতা রেখে নিজের নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করতে পারবেন।[১৮২]

ইসলামী আইনে দেনমোহরকে স্ত্রীর কাছে স্বামীর দেনা বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলে স্ত্রীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে এবং স্বামীর তালাকের উপর বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিম নারী জানে যে, তালাক দেয়া মাত্র স্ত্রী সম্পূর্ণ 'মাহর' দাবী করতে পারে। সুতরাং তালাকের ব্যাপারে তাকে সবসময় সংযত থাকতে হয়।[১৮৩] বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কাবিন নামায় (বৈবাহিক চুক্তিপত্র) যে পরিমাণ অর্থ উল্লেখ থাকে সে পরিমাণ অর্থই দেনমোহর সংক্রান্ত মামলায় দাবী করা যায়। এক্ষেত্রে বিবাদী কাবিন নামার লিখিত অর্থের পরিমাণ ঠিক নয় বলে অস্বীকার করলেও আদালত স্ত্রীর দাবীকে গ্রাহ্য করে থাকে। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারা বিবাদীকে বাধা প্রদান করে।[১৮৪]

'মাহর' বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামী আইন অনুসারে বিয়ের 'মাহর' যাই হোক না কেন, বৈবাহিক পক্ষদ্বয়ের মধ্যে তা স্বীকৃত এবং স্বামী তা যথাযথভাবে স্ত্রীকে পরিশোধ করতে বাধ্য। অপর দিকে অনির্দিষ্ট 'মাহর' হচ্ছে বিয়ের সময় সেখানে মাহরের পরিমাণ বা অংক নির্দিষ্টভাবে স্ত্রীর পিতার দিকের সমপর্যায়ের মহিলার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত 'মাহরকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ

(ক) মূয়াজ্জল বা আশু বা 'তলবী মাহর'

(খ) মু'অজ্জল বা বিলম্বিত বা 'স্থগিত মাহর'

১৮০। হাবিবা খাতুন, ***ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার***, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৩১ সংখ্যা, জুন-১৯৮৮, পৃ. ৫১

১৮১। হাবিবা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৮২। শাহিন আক্তার, ***নারী ও আইন***, বাংলাদেশে মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ৯-১৮

১৮৩। গাজী শামছুর রহমান, ***নারী-প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য,*** এসোসিয়েশন কর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (আশা), ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ১০৬

১৮৪। Rafiqul Huda Chowdhury and Nilufer Rahman Ahmed, Female Status in Bangladesh, BIDS, 1980, P. 26

আমাদের প্রচলিত আইন অনুযায়ী- 'তলবী মাহর' স্বামী তাৎক্ষণিকভাবে দিতে বাধ্য তার 'স্থগিত মাহর' স্ত্রীকে তালাক দিলে বা স্বামীর মৃত্যু হলে তখন আদায় করতে হয়। সত্যিকার অর্থে বৈবাহিক শর্ত অনুসারে 'মাহর' নির্ধারণের সাথে সাথে 'মাহর' স্বামীর এমন একটি বাধ্যতামূলক ঋণে পরিণত হয় সে স্ত্রী কর্তৃক দাবী উত্থাপনের পর যদি স্বামী তা প্রদানে ব্যর্থ হন তবে স্ত্রী ঐ স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকৃতি পর্যন্ত জানাতে পারেন।[১৮৫]

মানবাধিকার সংরক্ষণ, নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক সমঅধিকার বাস্তবায়ন এবং মানবিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করণ বর্তমান সভ্য যুগের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে নারীর 'মাহর' ব্যবস্থার পর্যাপ্ত ও সঠিক অনুশীলন বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। দম্পত্তি, পরিবার, সমাজ ও সরকার সকলেরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। কেননা বিবাহিত নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পারিবারিক কাঠামো সুদৃঢ় রাখে, নিরাপদ থাকে শিশু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

"মাহর" মূলত একটি বৈবাহিক চুক্তি। 'মাহর' পরিশোধ না হওয়া বৈবাহিক চুক্তি ভঙ্গেরই নামন্তর। তাই 'মাহর' ব্যবস্থার সুষ্ঠু অনুশীলন সুনিশ্চিত করে নিজেদের পবিত্রতা ও সংহতি রক্ষা করা আজ আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

যাদের সাথে বিয়ে হারাম

মানব বংশের স্থিতি ও বৃদ্ধি এবং মানব মনের স্বাভাবিক প্রশান্তি ও স্বস্তি একান্তভাবে নির্ভর করে স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনের উপর। কুর'আন মজীদ এ মিলনকে সমর্থন করেছে এবং তাকে জরুরী বলে ঘোষনা করেছে। এ মিলন স্পৃহাকে অস্বীকার করা, উপেক্ষা করা কিংবা নির্মূল করে দেয়া কুর'আনে দৃষ্টিতে মানবতার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ এক আমার্জনীয় অপরাধ সন্দেহ নেই। কিন্ত নারী-পুরুষের এ যৌনমিলন স্বাধীন, সেচ্ছাচারী ও বল্গাহীন করে ছেড়ে দেয়নি। বরং এ জন্যে জরুরী সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং নির্ধারিত করে দিয়েছে কতক বিধি-নিষেধ। কিছু কিছু নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে এজন্যে হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। এ সীমা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ বংশ, আত্মীয়তা-সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়িত্ব, পবিত্রতা, পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক উন্নত ও পবিত্র সমাজ পরিবেশ গঠন করার জন্যে একান্তই জরুরী। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে বিয়ে। কিন্ত সে বিয়েকেও যথেচ্ছ হতে দেয়া যায় না কোনক্রমেই। সমাজ-পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও স্থিতির জন্যে যেমন দরকার হচ্ছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন মিলনের, তেমনি জরুরী হচ্ছে ইসলাম অরোপিত এ সীমা, বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণ মাত্রায় ও বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করে চলা।

কুর'আন মজীদ যেসব মেয়ে-পুরুষের মাঝে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ করে দিয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে তিনটি: বংশ সম্পর্ক, দুধপানের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক।

১৮৫। Ibid, p. 26

১. বংশ সম্পর্কের কারণে মা-বাপের দিক দিয়ে যেসব আত্মীয়তার উদ্ভব তা মোটামুটি সাতটি: মা, ঐরস্যজাত কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও বোনঝি। যে কোন পুরুষের পক্ষেই তার এ ধরনের আত্মীয়া মহিলাকে বিয়ে করা চিরদিনের জন্যে হারাম।[১৮৬] কুর'আন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

"বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের মা,[১৮৭] তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইয়ের কন্যা ও বোনের কন্যা।"[১৮৮]

বর্ণিত আয়াতের আলোকে দেখা যায়, এখানে ১৪ প্রকার নারীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার প্রত্যেকটি বিধান ও প্রকৃতি সর্বাঙ্গীনভাবে এক নয়। কোনটি স্থায়ীভাবে আজীবনের জন্যে নিষিদ্ধ, কোনটি সাময়িক সময়ের নিষিদ্ধ। যে সব বাধার কারণে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের বাধা হচ্ছে বংশগত। এর ফলে মা, মায়ের মা, নানীর মা, অনুরূপ দাদী, বাবার দাদী তদুর্ধ্ব মহিলাগণ। নিজের আপন বোন, কিংবা শুধু বাপের ঔরস্যজাত অথবা শুধু মায়ের ঔরস্যজাত বোন। অনুরূপ ভ্রাতুষ্কন্যা, ভাগিনেয়ী, ও তদনিম্নগণ, খালা, ফুফু প্রমুখের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। এতে তারা যত ধাপই উপরের বা নিচের হোক।

২. দ্বিতীয় প্রকার ভিত্তি হচ্ছে, রিদায়ী বা দুগ্ধপানজাত। এর ফলে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ তারা হলেন,

---

১৮৬। ফিকহের পরিভাষায় এ সব মহিলাদেরকে 'মাহারিম' বা 'মুহাররামাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, মুসলিম ব্যক্তির জন্যে এরা চিরকালের হারাম কোন সময় ও কোন অবস্থাতেই তারা হালাল নয়, এদের বিয়ে করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কের দিক দিয়ে পুরুষটিকে 'মুহাররম' বলা হয়। (আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালালা হারামের বিধান, অনু: মাওলানা আবদুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, পৃ. ২৫০)

১৮৭। 'মা' বলতে এমন সব মেয়েলোক বুঝায় যার সাথে প্রকৃত মা এবং বাবার দিক দিয়ে জন্ম ও রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আর এ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় দাদী ও নানী থেকে। অতএব তাদের বিয়ে করা হারাম। আর 'কন্যা' বলতে এমন সব মেয়েও বুঝাবে, যাদের সাথে স্বীয় ঐরস্যজাত কন্যা বা পুত্রের দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে। আর 'বোনের' মধ্যে শামিল সেসব মেয়েও, যার সাথে বাপ কিংবা মা অথবা উভয়ের সমন্বয়ে সম্পর্ক হতে পারে। ফুফু বলতে এমন মেয়েলোকও বুঝায়, যে বাবার কি তার বাবার মানে দাদার বোন। আর খালার মধ্যে এমন সব মেয়েলোকও শামিল যার সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে মা কিংবা দাদার দিক দিয়ে। বোনঝি বলতে এমন সব মেয়েই বুঝায়, যাদের মায়ের সাথে রক্তের দিক দিয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। এ মোট সাত পর্যায়ের মেয়েলোক ও পুরুষলোক পরস্পরের জন্যে "মুহাররম"। এদের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। এ কথা সর্বজন সমর্থিত কোন মতভেদ নেই এতে। কেননা, কুর'আন حرمت عليكم বলে এদেরকেই স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। (মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭)

১৮৮। আল-কুর'আন, ৪: ২৩

দুধ মা,[১৮৯] দুধবোন, দুধ কন্যা প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে বংশ সম্পর্কের কারণে যাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ দুধ পানের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ বলে সব ফিকহবিদ একমত পোষণ করেন। অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী আপন মায়ের সমান পর্যায়ে গণ্য হবে। অতএব বংশের দিক দিয়ে ছেলের প্রতি হারাম যাকে যাকে বিয়ে করা, দুগ্ধদায়িনীর পক্ষেও সে সে হারাম। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'দুধ পানে সে সে হারাম হয়ে যায় যে যে হারাম হয় জন্মগত সম্পর্কের কারণে।"[১৯০] এ সম্পর্কে কুর'আন মজীদে দুধ মা, দুধ বোন উভয় সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"এবং তোমাদের স্তন্যদায়িনী মা-দের এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[১৯১]

৩. তৃতীয় প্রকার ভিত্তি হচ্ছে বৈবাহিক সূত্রে বিবাহ হারাম। এরা চার শ্রেণীর নারী।

১. পিতার স্ত্রী, দাদার স্ত্রী, নানার স্ত্রী, যতই উর্ধ্বতন হোক। এ সম্পর্কে কুর'আন মজীদে সুস্পষ্ট নিষেধ বানী উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"তোমাদের পিতারা যাকে যাকে বিয়ে করেছে, তাকে তাকে তোমরা বিয়ে করো না।"[১৯২]

২. পুত্র বধু, পুত্রের পুত্র বধু যতই নিম্নতর হোক। এদের বিয়ে করা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"তোমাদের আপন ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরও হারাম করা হয়েছে।"[১৯৩]

এদের বিয়ে করা হারাম শুধুমাত্র বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেই সঙ্গম কার্য না হলেও। কিন্তু পালকপুত্র যার সঙ্গে রক্ত ও দুধের কোন সম্পর্ক নেই তার স্ত্রীকে বিয়ে করা জায়িয আছে।

১৮৯। ছেলে বা মেয়ে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় যদি অপর কোন মহিলার দুধ পান করে তবে সে মহিলা হবে তার দুধ মা, তার স্বামী হবে দুধ বাপ। এই দুধ মা ও বাপের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন দুধ পানকারী পুরুষের বা নারীর জন্য হারাম যেমন হারাম প্রকৃত মা বোনের সাথে বিয়ে। অনুরূপভাবে দুধ বোনের সাথে বিয়েও হারাম। (আল্লামা ইবনে রুশদ আল কুরতবী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৩২)

১৯০। হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত (মুসলিম শরীফ, খ. ১, পৃ. ৪৬৬) এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) সব সময় বলতেন, তোমরা দুধ পানের কারণে তাকে হারাম মনে করবে। যাকে হারাম মনে কর বংশের কারণে। (মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৮৬৭) ইবনে আববাসের বর্ণনা মতে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "রেহেমী সম্পর্কের কারণে যে হারাম হয় দুধ পানের কারণেও সে হারাম হয়। (মুসলিম শরীফ, খ, ২, পৃ. ৪৬৭)

১৯১। আল-কুর'আন, ৪: ২৩

১৯২। আল-কুর'আন, ৪: ২২

১৯৩। আল-কুর'আন, ৪: ২৩

যদি তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী মৃতা হয় তবে ইদ্দাত শেষান্তে বিয়ে কার জায়িয হবে। আল্লাহর নবী (সা.) স্বীয় পালক পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে তালাকের পর আল্লাহর আদেশে বিয়ে করে ছিলেন।[১৯৪]

৩. স্ত্রীদের মা হারাম। এদের হারাম সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: امهات نساءكم

"তোমাদের স্ত্রীদের মা'দেরও হারাম করা হয়েছে।"[১৯৫]

এতে গণ্য হবে স্ত্রীর মা, স্ত্রীর নানী, স্ত্রীর দাদী, বংশ সূত্রে আর দুধ সূত্রে হোক। স্ত্রীর সাথে বিবাহ হলেই এরা হারাম, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হোক বা না হোক। এটা সংখ্যগরিষ্ট উলামাগণের সিদ্ধান্ত।[১৯৬]

৪. সে সমস্ত স্ত্রীদের কন্যাগণ হারাম যাদের সাথে সঙ্গম হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে সঙ্গম হয়েছে, তাদের কন্যাগণ তোমাদেন প্রতি হারাম করা হয়েছে। আর যদি সঙ্গম না হয় তাহলে তাদের কন্যাকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই।"[১৯৭]

উপরযুক্ত চারজনের মধ্যে দু'জন হারাম হয়ে যায় বিয়ের 'আকদ' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা হচ্ছে, পিতার স্ত্রী পুত্রের জন্যে ও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্যে, আর একজন হারাম হয় স্ত্রী সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে সে হচ্ছে স্ত্রীর অপর এক স্বামীর নিকট থেকে নিয়ে আসা কন্যা।[১৯৮]

আর দ্বিতীয় অস্থায়ী ও সাময়িক। যেমন স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি ইত্যাদি। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রী এসব নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করা ও একত্রে এক স্থায়ী স্ত্রীত্বে বরণ করা ইসলামে হারাম। এ কথা ভিত্তি হচ্ছে নিম্মোক্ত আয়াত: وان تجمعوا بين الاختين

"এবং দু'জন সহোদর বোনকে একত্রে স্ত্রীরূপে বরণ করা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ।"[১৯৯]

১৯৪। শায়খুল হাদীস আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৯৫। আল-কুর'আন, ৪: ২৩

১৯৬। শায়খুল হাদীস আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করল, তার সাথে সঙ্গম হোক বা না হোক উক্ত স্ত্রীর মাকে বিয়ে করা তার জন্যে বৈধ নয়। (বিদাইয়া, খ.২, পৃ. ৩৪)

১৯৭। আল-কুর'আন, ৪: ২৩

১৯৮। আল্লামা ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩
মূল আরবী পাঠ:
فهؤ لاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد وهو تحريم زوجات الاباء والابناء وواحدة بالدخول وهو ابنة الزوجة۔

১৯৯। আল-কুর'আন, ৪: ২৩

এভাবে যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা একজন পুরুষের পক্ষে হারাম তাদের সংখ্যা দাঁড়াল নিম্নরূপ:

ক) বংশ ও রক্তের সম্পর্কের কারণে সাতজন। তারা হচ্ছে: মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি।

খ) দুগ্ধপান ও বৈবাহিক কারণে মোট সাতজন: তারা হচ্ছে: দুধ মা, দুধ বোন, স্ত্রীর মা, স্ত্রীর পূর্ব পক্ষের কন্যা ও দু'বোন একত্রে বিয়ে করা, পিতার স্ত্রী এবং ফুফু ভাই-ভাইঝি একত্রে বিয়ে করা।

ইমাম তাহভী (র.)[২০০] বলেছেন, এ কয়জনকে বিয়ে করা যে কোন পুরুষের পক্ষে স্থায়ী ও সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ বিষয়ে কারো কোন মতভেদ নেই।[২০১]

সধবা বা অপরের স্ত্রী-(যতক্ষণ না সে বিধবা হয়) বিয়ে করা হারাম। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:

والمحصنات من النساء-

"এবং স্বামীওয়ালী মুরক্ষিতা মহিলাদের বিয়ে করা হারাম।"[২০২]

এখানে 'মুহসানাত' বলতে সেসব মেয়েলোক, যাদের স্বামী বর্তমান যারা বিবাহিতা।[২০৩]

উপরে উল্লেখিত মহিলাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোক বিয়ে করা জায়েজ–সম্পূর্ণ হালাল। যার প্রমাণ নিম্নোল্লিখিত আয়াত:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

এ হারাম মুহাররম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোকই বিয়ে করার জন্যে তোমাদের হালাল করে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল মোহরানা দিয়ে সুরক্ষিত বিবাহিত জীবন-যাপনের লক্ষে গ্রহণ করবে, উচ্ছৃঙখল যৌন লালসা পূরণের কাজে নয়।[২০৪]

২০১। তাঁর পূর্ণ নাম আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সালামাহ ইবন আবদুল মালিক ইবন সালমাহ সুলাইম ইবন সুলাইমান ইবন জনাব। তাঁর উপনাম আবূ জা'ফর। ইমাম তাহভী (র.) মিসরে জন্মগ্রহন (২৩৯/৮৫৩) করেন এবং এখানেই ইন্তিকাল (৩২১/৯৩৩) করেন। তাঁর নিজস্ব বাসস্থান তাহা গ্রামের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে তাহাভী বলা হয়। তিনি হানাফী মাযহাবের ইমাম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। যদিও তিনি তার প্রাথমিক জীবনে শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতার কারণে তৎকালীন মিসরের শাসক খুমারাওয়ায়হও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যেসকল শিক্ষাকগণের কাছ থেকে হাদীস শিখেন ইবরাহীম ইবন আবী দাউদ (র.), আবূ আবদুর রহমান আন্-নাসা'ঈ, আহমাদ ইবন আবূ ইমরান (র.) উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীস, ফিকহ তারীখ প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মুশকিলুল আসার, সুনানুশ শাফি'ঈ, সহীহুল আসার, আত তারীখুল কাবীর, মুখতাসরুত তাহাভী উল্লেখযোগ্য। ইমাম তাহভী (র.) বিরাশি বছর বয়সে যুল-কা'দাহ ৩২১/২৪ অক্টোবর, ৯৩৩ সালে বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন। (দ্রষ্টব্য: ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম (থিসিস গ্রন্থ), ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

২০২। ইমাম শাওকানী, ***ফতহুল কাদীর***, খ. ১, পৃ. ৪০৮

২০৩। আল-কুর'আন, ৪: ২৪

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের সাথে বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে অমুসলিমগণ দুভাগে বিভক্ত। আহলে কিতাব এবং যারা আহলে কিতাব নয়। আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ 'আহলে কিতাব' হিসেবে গণ্য। যেমন, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান। কুর'আন শরীফে এ দু'সম্প্রদায়কে 'আহলে কিতাব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুর'আনের ভাষ্য: أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

"এখন তোমরা একথা বলতে পার না যে, কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি দলকে।"[২০৫] অর্থ্যাৎ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে।

মহান আল্লাহ মুসলিম পুরুষদেরকে কেবল 'আহলে কিতাব' নারী বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। কুর'আন মজীদ ইরশাদ হয়েছে: -وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্যে বৈধ করা হল।"[২০৬]

মুসলমানদের জন্যে 'আহলে কিতাব' নারী বিবাহ করা বৈধ হলেও কোন মুসলিম নারীর কোন 'আহলে কিতাব' পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। তবে স্থান কাল, পাত্র ভেদে তা মুসলমানদের জন্যে অপছন্দরীয় বলে ফকিহগণ মত প্রকাশ করেছেন।[২০৭]

যারা আহলে কিতাব নয় তারা মুশরিক এবং কাফির তা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক। এই পর্যায়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, অগ্নিউপাসক সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত।

কাদিয়ানীরা মুশরিক না হলেও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত অনুযায়ী কাফির। তাদের সাথে মুসলিম নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আল্লাহ তা'আলা চিরতরে সর্বোতভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন।

যেমন, আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

"মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে না। মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। মুশরিক পুরুষরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমরা (তোমাদের নারীদের) বিবাহ দিবে না। মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম।"[২০৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

"তোমরা মুসলমানরা কাফির মেয়েকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ রেখো না।"[২০৯]

২০৪। আল্লামা শাওকানী, ফতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৪১৩
২০৫। আল-কুর'আন, ৪: ২৪
২০৬। আল-কুর'আন, ৫: ৫
২০৭। আলমারগিনানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯
২০৮। আল- কুর'আন, ২:২২১
২০৯। আল- কুর'আন, ৬:১০

মুত'আ বিয়ে

মুত‘আ অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষ সাময়িক বিয়ে। এ বিয়ে ইসলামে নিষিদ্ধ। হযরত আলী (রা.) হযরত ইবন আব্বাসের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) মুত‘আ ও গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ খায়বার যুদ্ধের সময় নিষিদ্ধ করেছেন।[২১০] আল মাজুরীর বয়াত দিয়ে ইমাম নববী (র.) বলেছেন, প্রাক্ ইসলাম যুগে আরব সমাজে মদ্য পানের ন্যায় সাময়িক বিয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে মদ্য পান যেমন নিষিদ্ধ ছিল না; তেমনি সাময়িক বিয়েও নিষিদ্ধ ছিল না। দু'একটি হাদীসে তারই উল্লেখ পাওয়া যায়। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয় নবী (সা.) এ কু-প্রথা এবং সকলে যাতে এ নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে সেজন্যে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তা ঘোষনা করেন। প্রথমে তা খায়বরে নিষেধ করা হয়। তারপর ব্যাপক অবগতির জন্যে মক্কা বিজয়ের পরে এবং বিদায় হজ্জে তা পুনরায় ঘোষণা করা হয়। কোন কোন স্থানে এ নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম করলে হযরত ওমর (রা.) কঠোরভাবে শাসিয়ে বলেন, এরূপ ঘটনা দেখা গেলে মুত‘আকারী স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে ব্যভিচারীর অপরাধে অপরাধী হিসেবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। অতএব, সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মুত‘আ বিয়ে রহিত এবং ‘ইজমা’ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, মুত‘আ বিয়ে হারাম।[২১১]

এ ঘোষণার পরে মুত‘আ বিয়ে সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে পড়ে এবং এর উপরই সব সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর সর্বসম্মত সিদ্দান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় হযরত ওমর (রা.) সকলকে মুত‘আ যে, চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ হয়েছে তা সম্মকরূপে বুঝিয়ে দেন এবং সকলে তা বিনা দ্বিধায় গ্রহন করেন ও মেনে নেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ধর্মের একটি বিধান রহিত করে দেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এটা বিনা বাক্যে মেনে নেন।[২১২]

ইমাম যু‘ফারের (মৃঃ ১৫৮ হিঃ) মতে, দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়য়ের জন্যে বিয়ে সম্পাদিত হলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে কিন্তু সময় নির্ধারণের শর্ত অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হয়ে তা স্থায়ী বিয়েতে পরিণত হবে।[২১৩]

ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পিতামাতার দায়িত্ব

ছেলে মেয়েদের সুষ্ঠু লালন-পালনের যেমন দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতার, তেমনি তাদের যৌন প্রয়োজন পূরণ করে তাদের নৈতিক স্বাস্থ্য, রক্ষার দায়িত্বও পিতামাতার। এজন্যে বিয়ের বয়স হলেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং এ দায়িত্ব প্রথমত তাদের পিতামাতার। আর তাদের অবর্তমানে অন্য অভিভাবকের। নবী করীম (সা.) বলেছেন :

২১০। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ-এর নিকাহ আল-মুত‘আ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭৬৭

২১১। আল-মারগিনানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬

২১২। মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি, *নসরুল বারী শরহে সহিহুল বুখারী*, খ. ২, গুজরাটঃ ১৪১০ হিঃ পৃ. ২৮৪

২১৩। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, ঢাকা-১৯৮২ খ. ২, পৃ. ২৬৮-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزوجه وان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه-

'যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তার উচিত তারজন্যে ভাল নাম রাখা এবং তাকে ভাল আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া। আর যখন সে বালেগ পূর্ণ বয়স্ক ও বিয়ের যোগ্য হবে, তখন তাকে বিয়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা, বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, আর এ কারণে যদি সে কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার গুণা তার পিতার উপর বর্তাবে।[২১৪]

উক্ত হাদীসে প্রথমত ছেলে মেয়ের ভাল নাম রাখা ও তাকে ভাল আদব–কায়দা শেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপরই বলা হয়েছে যে, ছেলে সন্তান–ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলেই অনতিবিলম্বে যদি বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, তার বিয়ের ব্যাপারে যদি পিতামাতা অভিভাবক কোনরুপ অবহেলা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে আর তার ফলে তার বিলম্বিত হওয়ার দরুন যদি তার দ্বারা কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে সে গুনাহের দায়িত্ব থেকে পিতামাতা বা অভিভাবক কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না।

তার গুনাহের শাস্তি তার পিতাকে ভোগ করতে হবে। কেননা, এ ব্যাপারটি তারই ত্রুটি ও অবহেলার দরুন হতে পেরেছে। [২১৫]

হযরত ওমর (রা.) ও আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে জানা যায় নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

" তাওরাতের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, যার কন্যা বারো বছর বয়সে পৌছেছে আর তখনো যদি বিয়ের ব্যবস্থা না করে, এর ফলে যদি সে কোন গুনাহ করে বসে তবে এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে। " [২১৯]

এ দুটি হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, সন্তান বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সেই সঙ্গে বয়স্ক ছেলেমেয়েরও কর্তব্য হবে এজন্যে নিজেকে সর্বোতভাবে প্রস্তুত করা। [২১৮]

"অপর এক হাদীসে এরচেয়ে আরো কঠোর বাণী উচ্ছারিত হয়েছে। রাসূল করীম (সা.) পিতা মাতাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

اذا خطب اليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه – ان لا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فارعريض

২১৪। আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯০, নিকাহ অধ্যায়, হাদীস নং-৪৩১০

২১৫। মাওলানা ইদরীস কান্ধোলুভী, *আত'তালিকুস সাবিহ*, খ, ৪.পৃ. ২০

২১৬। মূল আরবী পাঠ: اي جزاء اثمه عليه لقصيره

২১৭। প্রাগুক্ত, মূল আরবীপাঠ:

في التوارة مكتوب من بلغت ابنته اثني عشرة سنة ولم يزوجها فاصابت انما فاثم ذلك عليه-

২১৮। মাওলানা আবদুর রহীম,প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৫.

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের নিকট যদি এমন কোন বর বা কনের বিয়ের প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ করো তাহলে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন কর। যদি তা না করো তাহলে জমিনে বড় বিপদ দেখা দেবে এবং সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।" [২১৯]

অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে বর বা কনের শুধু দ্বীনদারী ও চরিত্রই প্রধানত ও প্রথমত লক্ষণীয় জিনিস। এ দিক দিয়ে বর বা কনেকে পছন্দ হলে ও যোগ্য বিবেচিত হলে অন্য কোন দিক বড় বেশী দৃষ্টিপাত না করে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করা কর্তব্য।

যার দ্বীনদারী তোমরা পছন্দ করো, সে ছেলের বা মেয়ের সাথে যদি তোমরা বিয়ে সম্পন্ন না করো বরং তোমাদের দৃষ্টি উদগ্রীব থাকে ধন–মাল ও সম্মান– সম্ভ্রম সম্পন্ন কোন বর বা কনের সন্ধানে যেমন দুনিয়ার লোকেরা করে থাকে তাহলে বহু সংখ্যক মেয়ে স্বামীহীনা এবং বহু সংখ্যক পুরুষ স্ত্রীহীনা অবিবাহিত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর এরই ফলে জ্বেনা-ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে দেখা দেবে এবং সমাজে দেখা দেবে নানারুপ ফিতনা-ফাসাদ ও বিপদ-বিপর্যয়।"[২২০]

বিয়ের বয়স

ইসলামে বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত বয়স নেই। যে কোন বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া যেতে পারে। যেমন, এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) এর বিয়ের উল্লেখ করা যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬ বছর। আর যখন তিনি তার সংসারে যান তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, 'রাসূলে করীম (সা.) যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ৬ বছর আর আমাকে নিয়ে যখন ঘর বাঁধেন আমি তখন ৯ বছরের মেয়ে।"[২২১]

নবী করীম (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে বিয়ে করেছিলেন যখন তিনি ছোট ছিলেন, তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।[২২২]

নবী করীম (সা.) নিজে যখন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ছয় কিংবা নয় বছর বয়সে বিয়ে করলেন তখন এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামে ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্যে কোন নিম্নতম বয়স নিধারণ করা হয়নি, যে কোন বয়সের ছেলেমেয়েকে যে কোন সময় অনায়াসেই বিয়ে দেয়া যেতে পারে। ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার ছোট্ট মেয়েদের বিয়ে দেয়া বৈধ।

২১৯। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত্‌ তিরমিযী, ***জামিউত তিরমিযী***, দিল্লী: মাকতাবা রশীদিয়া, তা.বি., নিকাহ অধ্যায়, হাদীস নং- ২১২০

২২০। মাওলানা ইদরীস কান্ধেলুভী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৬
ان لم تزوجو من ترضون دينه بل نظرتم الى صاحب مال وجاه كما هو شيمة ابناء الدنيا يبقى اكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة فيكثر الزنى وتقع الفتنة

২২১। ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৫১ মূল আরবী পাঠ ঃ
زوجنى رسول الله لست سنين وبنابى وانا ابنة تسع سنين

২২২। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৭৭ মূল আরবী পাঠ ঃ ان النبى تزوج عائشة وهى صغيرة وكان عمرها ست سنين

যদিও সে মেয়ে দোলনায় শায়িত শিশু হোক না কেন। তবে তাদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়েয হবে না, যতক্ষণ তারা যৌনসঙ্গম কার্যের জন্যে পূর্ণ যোগ্য এবং পুরুষ গ্রহণ ও ধারণ করার সামর্থ সম্পন্ন না হয়।[২২৩]

কোন কোন মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে আইন প্রণয়ন করে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফিক্হ শাস্ত্রের কোন কোন কিতাবে ৯ বছর বয়সে বিয়ে হতে পারে বলে উল্লেখ হয়েছে। অবশ্যই কি কারণে এবং কোন যুক্তিতে এ বয়স নির্ধারিত হলো তার বিশেষ কোন ব্যাখ্যা নেই। ঐ সমস্ত কিতাবে অতি অল্প বয়সে বিয়ের কারণে মেয়েদের যেন অসুবিধা না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে সহবাসে রক্তপাত হয় এবং অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় তার জন্যে স্বামীকে দায়ী করা হবে এবং এ ধরণের সহবাসকে অসৎ চরিত্রতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অল্প বয়সের কারণে ক্ষতিকর সহবাসকে 'ইফদা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৪]

পিতার পক্ষে ছোট্র মেয়েকে বিয়ে দেয়ার বৈধতা সম্পর্কে সমস্ত মুসলমানই একমত। তবে এ ব্যাপারে কোন বয়স নির্দিষ্ট করা চলে না। কারণ সব মেয়েই স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও দৈহিক শক্তি সামর্থের দিক দিয়ে সমান হয় না, বরং বিভিন্ন রকম ও প্রকারের হয়ে থাকে। এমনকি বংশগোত্র পরিবারিক জীবন মান ও আবহাওয়ার পার্থকের দরুন মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। এ জন্য কোন এক নীতি বা কোন ধরাবাঁধা কথা এ ব্যাপারে বলা যায় না এবং বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করে আইন জারী যুক্তি সঙ্গত নয়।[২২৫]

উল্লেখ্য যে, বিয়ে বলতে যদি শুধু 'আকদ' তথা বিয়ের সংঘঠনকে বুঝানো হয়, আর এতে যদি ঘর বাঁধার চিন্তা না থাকে তবে যে কোন বয়সে তা হতে পারে। এমনকি পিতার অভিভাবকত্বে দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিয়েও হতে পারে। ইসলামে তা নিষিদ্ধ বা অশোভনও নয়। হ্যাঁ যদি বিয়ে বলতে স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলন ও তদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বুঝায় তাহলে তা যে ছেলে মেয়ের পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পূর্বে আদৌ সম্ভব হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। পবিত্র কুরআনে বিবাহ যোগ্য হওয়ার সুনিদিষ্ট বয়স উল্লেখ করা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে, "য়াতীমদিগকে যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দের বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে।"[২২৬]

'বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে।[২২৭] তাফসীর কারকগণ এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন, যে, রুপ-সৌন্দর্য কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা কল্যাণকারীতার দৃষ্টিতে যে যে মেয়ে তোমাদের নিজেদের পক্ষে ভাল বোধ হবে তাদের বিয়ে কর।[২২৮]

২২৩। আল্লামা বদরুদ্দী আইনী, পাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৭৮ মূল আরবী পাঠ ঃ
اجمع العلماء انه لا يجوز للاباء تزويج الصغار من بناتهم وان كن فى المهد الا انه لا يجوز لازواجهن البناء بهن الا اذا صلحن للوطء واحتملن الرجال

২২৪। আবদেল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২২৫। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২২৬। আল-কুর'আন, ৪;৬

২২৭। আল-কুর'আন, ৪;৩

২২৮। আল্লামা কাসেমী, ***সুহসিল তা'বিল***, খ. ৪, পৃ.১১০৪

উপরে বর্ণিত আয়াতে ভাল লাগার অর্থ হল মেয়ের পরিপক্কতা আসা। ফল যেমন পরিপক্ক হলে ভাল লাগে, তেমনি মানব শিশুর ক্ষেত্রেও পরিপক্কতা আসলেই ভাল লাগে। এক্ষেত্রে বয়সের পরিপক্কতার পাশপাশি নর-নারী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও মানসিক পরিপক্কতা প্রয়োজন। মোটকথা বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবন শুরুর পূর্বে নারীকে পরিপূর্ণ নারী ও পুরুষকে পরিপূর্ণ পুরুষ হতে হবে।[২২৯]

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়ার বাস্তব কোন উপকার নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রে ছোট বয়সের বিয়ে ছেলে মেয়েদের নিজেদের জীবনে কিংবা উভয় পক্ষের অভিভাবকদের জীবনে নানা প্রকারের জটিলতারই সৃষ্টি করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। কেননা, বিবাহিত ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে নিজেদেরকে এমন এক বিয়ে বন্ধনে দেখতে পায়, যেখানে তাদের মতামত নেয়া হায়নি। আবার অনেক বিবাহিত ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে তাদের মন, মেজাজ ও স্বভাব-চরিত্রে এমন ব্যবধান দেখতে পায় যার ফলে দাম্পত্য জীবনের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই থাকে না। এমনকি উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যেও যথেষ্ট তিক্ততা এবং শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে প্রবল বিরোধ ও প্রকাশ্য শত্রুতা দেখা দেয়। সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের শিকার হয়ে অনেক সময় অভিভাবকগণই নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার হিসেবে তাদের ছেলেমেয়ের অত্যন্ত ছোট বয়সে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করলেও ইসলাম এ ধরণের কাজকে খুব ভাল কাজ বলে কখনই স্বীকার করেনি।

পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখ-শান্তির দৃষ্টিতে এ কাজ কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। যুক্তিসঙ্গত কারণেই বর্তমান সমাজ এ কাজকে কেউই ভাল ও শোভনীয় বা সমর্থনীয় মনে করতে পারছে না।[২৩০]

২২৯। মুহাম্মদ আববাসউদ্দিন, ***মেহেদী পাতার রং মাখানো হাতে কোরআনের উপহার***, ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, ১৯৯৩, পৃ.২

২৩০। ছোট বয়সের বিয়েতে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক হলো অল্প বয়স্ক বালিকার সাথে যৌনমিলন উভয়ের জন্যে সুখপ্রদ নাও হতে পারে। যৌনাঙ্গে ব্যথা, বেদনা, ক্ষত এবং তৎনিত রক্ষপাত যৌন আনন্দকে বিনষ্ট করে দেয়। তাছাড়া গর্ভধারণের বয়সে উন্নীত হবার পূর্বেই অল্পবয়সী বালিকার গর্ভসঞ্চারিত শিশু এবং মা উভয়ের জন্যেই বিপদজনক হতে পারে। নববিবাহিত দম্পতি তাদের মামাজিক দায়িতা পালনে সক্ষম কিনা তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। বিবাহের সাথে সাথে এসে যায় নানাবিধ সামাজিক দায়িত্ব। মায়ের বাড়ীতে থাকা কালে মেয়েরা সাধারণত: পারিবারিক কাজে এতটুকু অংশ গ্রহণ করে না। কিন্ত স্বামীর সংসারে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করতে পারলে শাশুড়ির গঞ্জনার শিকার হতে হয়। কম বয়সের তরুণেরা স্বল্প কারণে ক্রুদ্ধ হয়, ঘাত প্রতিঘাতে লিপ্ত হয়। কম বয়সী ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হলে আল-কুর'আনে যে, শান্তি ও সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে তা বিপর্যস্ত হতে পারে। তাছাড়া ইসলামের নির্দেশ হলো বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন ও অবাধ সম্মতি। কম বয়সী মেয়েদের পক্ষে কোন ছেলেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলে তার ভবিষ্য তা জীবনে সুখ-শান্তি কতটুকু হবে তা অনুধাবন করা কষ্টকর। তাতে অসহায়ের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় অভিভাবকদের মতামতের উপর। দাম্পত্য জীবনে এবং শশুরালয়ে সংঘাত সৃষ্টি হলে তার জন্যে দায়ী করে অভিভাবকদের। এরুপ অনেক ক্ষেত্রেই সংঘাত বিবাহ বিচ্ছেদের পরিণতি লাভকরতে পারে। (আবদেল রহির উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১)

উল্লেখ্য, ইসলামে ছোট বয়সের ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিতে নির্দেশ করা হয়নি। কিংবা সেজন্যে উৎসাহও দেয়া নি। বরং এ কাজ যদি কোন পিতা বা অভিভাবক করেই ফেলে নানা বৈষয়িক ও সামাজিক কারণে করা অপরিহার্য মনে করে, তবে এ কাজকে ইসলাম অনুমোদন করেছে মাত্র। তাই বলে বিয়ের একটি বয়স নির্দিষ্ট করা এবং তার পূর্বে বিয়ের অনুষ্ঠানকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করে না। কেননা, এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ সুস্পষ্ট। ইসলাম ব্যাপারটিকে উন্মুক্ত রেখেছে। আর সমাজ সংস্থার শান্তি শৃংঙখলার দৃষ্টিতে সর্বত্রই তাই থাকা উচিত। বিয়ে-শাদী সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ আদেশ উপদেশ দাবী করে যে, পূর্ণ বয়সে ও কার্যত যৌন সঙ্গমে সক্ষম হওয়ার পরেই বিয়ে সম্পন্ন হওয়া উচিত। তবে তার পূর্বে বিয়ে সম্পন্ন করা বিষেধও করা হয়নি। কেননা, ব্যাপারটি পিতা, অভিভাবক ও সমাজের সাধারণ অবস্থার উপর অনেকখানী নির্ভর করে।[২৩১]

তাই একথা বলা যায় যে, বিয়ের কোন বয়স নির্দিষ্ট করে দেয়া, তার পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ এবং তারজন্যে দন্ডদান করা ইসলামের পরিপন্থী। মানবীয় নৈতিকতার দৃষ্টিতেও একাজ অত্যন্ত অসমীচীন। ইসলামের কোন ফিকহবিদই এ বিষয়টি সমর্থন করেন নি।

বিয়ের রোকন ও শর্তাবলী

সাধারণভাবে সকল মাযহাবের ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে, নিকাহ বা বিয়ের রোকন দু'টি। (ক) প্রস্তাব (ইজাব) ও (খ) গ্রহণ (কবুল)। বিবাহের পক্ষদ্বয় নারী ও পুরুষের বা তাদের অভিভাবক অথবা প্রতিনিধিদের ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিয়ে হয়।[২৩২] ইজাব অথবা কবুল মৌখিক অথবা লিখিত আকারেও হতে পারে। সাথে সাথে এ দুটি মিলিত হওয়াও অবশ্যক। অর্থাৎ একই মজলিসে বা একই স্থানে উভয়টি সম্পন্ন হতে হবে। ইজাব-কবুলের শব্দাবলী-সুস্পষ্ট অর্থবোধক হতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ অতীতকালের হতে হবে। যেমন প্রথম পক্ষ বলল, 'আমি নিজেকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম' দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য, 'আমি কবুল করলাম' [২৩৩] অথবা এমন দু'টি বাক্য যোগেও বিয়ে সংগঠিত হতে পারে যার একটি হবে অতীত বাচক, আর অন্যটি হবে ভবিষ্যত বাচক। যেমন এক পক্ষ বলল, " আমাকে তুমি বিয়ে কর। অপর পক্ষ বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম।"[২৩৪] উল্লেখ্য যে, বালিগা ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন নারী-পুরুষের স্বেচ্ছায় সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ হয় না।[২৩৫] এছাড়া শুদ্ধ হওয়ার জন্যে আরো কিছু বিষয় আবশ্যক যাকে বিয়ের শর্ত বলা হয়ে থাকে। বিয়ের শর্ত দু'ধরণের ১. সাধারণ শর্ত এবং ২. বিশেষ শর্ত

২৩১। মাওলানা আবদুল রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

২৩২। মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ, ***তুহফাতুল ফুকাহা,*** মাউকাউল ইসলাম মদীনা, সৌদি আরব: খ. ২, পৃ ১১৮; আবু বকর বিন মাসউদ বিন আহমাদ আল ফাসানী আলাউদ্দিন, বাদায়ী উসসানায়ী কি তারতীবিশ শরায়ী, মাউকাউল ইসলাম, মদীন, সৌদি আরব: ১৪১১, খ. ৫, পৃ.৩১৪; যাইনুদ্দীন বিন ইব্রাহীম বিন নাজিম আল মিসরী, আল বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক, মাউকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদি আরব: ১৯৯৩, খ. ৭, পৃ. ৪৫৬; আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ শায়েখ নিজামুদ্দীন, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, মাউকাউল ইসলাম,মদীনা, সৌদিআরব: তাবি, খ.৬, পৃ. ৪১৪; আনওয়ারুদ্দেরায়া শরহে বেকায়া, প্রাগুক্ত. পৃ. ১১৩

২৩৩। শায়খ আবুল হাসান আহমাদ আল-কুদুরী, আল-কুদুরী, ঢাকা: এমদাদীয়া লাইব্রেরী, তাবি, কিতাবুন নিকাহ, পৃ.২৪৮

২৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯

২৩৫। ইমাম আল মারগিনানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩; ফাতওয়া-ই- আলমগীরী, খ.১, পৃ. ৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

১. বিয়ের সাধারণ শর্ত হলোঃ

(ক) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যে সব নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করেছেন বর কনের মধ্যে পারস্পরিক সে সম্পর্ক থাকতে পারবে না। বর কনে মুহারবামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, গায়রে মাহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

(খ) উভয়ের মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা থাকতে পারবে না।

২. বিশেষ শর্ত হলোঃ

(ক) বিয়েতে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি অপরিহার্য। উভয়জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء

"তোমরা দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে আর যদি দু'জন সাক্ষী না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী রাখবে। যেমন তোমাদের সুবিধা তেমনিই করবে।"[২৩৮]

ইমাম মালিক (র.) সাক্ষীর পরিবর্তে সাধারণ ঘোষণাকে শর্ত সাব্যস্ত করেন। তা দফ বাজিয়ে হোক না কেন।

(খ) কনে মুহাররামত ভূক্ত না হওয়া।

(গ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ হলে তার অভিভাবকের সম্মতি;

(ঘ) কুফুর বাইরে বিয়ে হলে কুমারী কনে অভিভাবকের সম্মতি;

(ঙ) অভিভাবক স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করলে তার প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রকৃতিস্থ হওয়া;

(চ) মাহর নিদিষ্ট হওয়া

(ছ) বিয়েকে কোন সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ না করা;

(জ) বরওকনের স্বেচ্ছা সম্মতিসহ ইজাব-কবুল নিজ কানে শোনা, তবে অভিভাবক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে তা নিজ কানে শোনা অবশ্যক নয়।

ইমাম শাফে'ঈর (র.) মতে, সাক্ষীগণের সৎ ও বিশ্বস্ত হওয়া ও শর্ত। তবে ইমাম আবূ হানিফা (র.) এর মতে, এর বাধ্যবাধকতা নেই।[২৩৭]

বিয়ের সুন্নাত সম্মত পদ্ধতি

ইসলামী আইনে বিবাহকার্য ও বিবাহ অনুষ্ঠান একটি পবিত্র ও ইবাদতের অনুষ্ঠান। বিবাহেচ্ছু পক্ষদ্বয় সম্মত হওয়ার পর প্রকাশ্য মজলিসে আকদ অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্চনীয়। মহানবী (সা.) বলেন, "তোমরা বিবাহের প্রচার করবে, বিবাহকার্য মসজিদে সম্পন্ন করবে।"[২৩৮]

সুতরাং আমাদের পূর্বোল্লিখিত পর্যালোচনার সারবত্তার আলোকে বলা যায়, বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর পূর্বে বর কনে উভয় পক্ষ বা তাদের আত্নীয় স্ব-জনের উচিত একে অপরের স্বভাব চরিত্র, বংশ তথা সামগ্রিক অবস্থা সার্বিকভাবে অবগত হওয়া। তবে কনের ধর্মপরানয়তার প্রতি বিশেষ দৃষ্ঠিদানের উপদেশ দেয়া হয়েছে ইসলামে।

২৩৬। আল-কুর'আন, ২:২৮২
২৩৭। আল-মারগিনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫
২৩৮। অলি আল-দ্বীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

এ প্রেক্ষিতে বর কনে একে অপরকে দেখে নেয়ার বৈধতা রয়েছে। অধিক প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা লাভের জন্যে ইস্তেখারা করা সুন্নাত।[২৩৯] বর ও কনে উভয় পক্ষে বিয়ের প্রস্তাব গৃহীত হলে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিয়ের দিন ক্ষণ ধার্য করতে হবে। জুম'আর দিন মসজিদে আনাড়ম্বরভাবে বিয়ে সম্পন্ন করা উত্তম।

বিয়ের মজলিসে অন্য লোক থাকলে কনেকে সেখানে উপস্থিত করা যাবে না, বরং তার অভিভাবক কিংবা পরিণত বয়স্কা ও সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন হলে তার স্বেচ্ছায় নির্বাচিত উকিল তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। বিয়ে সম্পাদনে বয়স্ক কনের সম্মতি অপরিহার্য। কনের অভিভাবক বা উকিল কিংবা তার অনুমতি ক্রমে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বিয়ের সুন্নাত খুতবা পাঠ করবেন। খুতবা শ্রবন করা মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে কর্তব্য। অত:পর খুতবা পাঠকারী নির্দিষ্ট দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে বর হতে সম্মতি গ্রহণ করবেন।

ইজাব-কবুলের প্রাক্কালে বরের সামনে কনের পিতার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যাতে সমবেত লোকজন সহজে বুঝতে পারেন কোন মহিলার সাথে বরের বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সময় মাহরও উল্লেখ করতে হবে। 'মাহর' সকলের সামর্থ অনুসারে হওয়া জরুরী। অত:পর বিয়ের খুতবা পাঠ করবে। নবী করীম (সা.) প্রতিটি বিবাহে খুতবা দিয়েছেন বর ও কনের জন্যে দু'আ করেছেন। উভয়ের জন্যে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ কল্যাণের দু'আ করেছেন। রাসূল করীম (সা.) বিবাহের পর বর ও কনেকে মোবারকবাদ করেছেন এমন অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

عن هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ الإنسان اذا تزوج قال بارك لله لك و بارك عليك و جمع بينكما فى الخير -

"আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) যখন কোন বিবাহিত লোককে মোবারকবাদ জানাতেন তখন বলতেন আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত রাখুন।"[২৪০]

বিয়ের রোকন ও শর্তাবলী পূর্ণরুপে পালন করেই দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলা ইসলামী আদর্শের দাবী। আর এর মাধ্যমেই বৈবাহিক সম্পর্ক বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বিয়ে দ্বারা নর-নারীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর পরে স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ গৃহে অবস্থান করার জন্যে বাধ্য করতে পারে। ইহা ব্যতীত সে তার দৈহিক সান্নিধ্য এবং শরী'আতের বিধানের অধীনে তার অন্যান্য সেবা গ্রহণের অধিকার রাখে। অপর পক্ষে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে গ্রাসাচ্ছাদন ও সামর্থ অনুসারে বাসস্থান লাভ করবে। তাছাড়া তার 'মাহর' নগদ বা পরবর্তী কালে যে কোন সময় আদায় করার অধিকার রাখে। অনুরুপ বিবাহ জনিত নিষিদ্ধতা (হুরমাত-ই-মুসাহরাত), সন্তান উৎপাদন, সন্তানের পিতৃ পরিচয় প্রতিষ্ঠা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্তানের উত্তরাধিকার দাবী উত্যাদিও বিয়ের ফলবিশেষ। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর এবং স্ত্রী-স্বামীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় না, বরং তাদের স্বত্বাধীন সম্পদসমূহ বিয়ের পরও পৃথক থাকতে পারে।

২৩৯। আবদুশ শাকুর ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮১-৬৮২

২৪০। *সুনানুত তিরমিযি*, প্রগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৪১; সুনানে আবি দাউদ প্রাগুক্ত, খ.৬ পৃ.৭; আহমাদ বিন হুসাইন বিন আলী আল বায়হাকী, ***সুনানে কুবরা***, মাউকাউল ইসলাম, মদীনা, সৌদি আরব: তাবি, খ. ৭, পৃ. ১৪৮

এতদসত্ত্বেও স্ত্রী-স্বামীর মালিকানা হতে সামর্থ অনুযায়ী গ্রসাচ্ছাদন দাবী করতে পারে। যদি স্বামীর সে ক্ষমতা না থাকে তবে এ অক্ষমতা আদলতের মাধ্যমে বিয়ে বাতিল করার একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত সাবস্ত হতে পারে।[২৪১]

বিয়ে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিয়ের রোকন ও শর্তাবলীর কোন একটি অপূর্ণ থাকলে যেমন সাক্ষীবিহীন বিয়ে তা শরী'আতের ভাষায় 'ফাসিদ বিবাহ' নামে পরিচিত, এ অবস্থায় বিয়ে বহাল থাকে না। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ একান্ত বাস হয়ে থাকলে 'মাহর' ও সন্তানের পিতৃ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বিয়ে সংশোধন যোগ্য। যেমন সাক্ষীবিহীন বিয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ পরিবর্তন কালে সাক্ষী নিয়োগ করা হলে উক্ত বিয়ে বিশুদ্ধ হবে। বিয়ে অনুষ্ঠান কালে বিয়ের এমন কোন শর্ত বাদ পড়লে যা পরে সংশোধন যোগ্য নয় সেরূপ বিয়েকে বাতিল বিয়ে বলে। যেমন, দুই মাহরাম আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে, কোন নারীর স্বামী বিদ্যমান তাকা অবস্থায় তাকে বিয়ে করা।[২৪২]

একাধিক বিয়ে (Polygamy)

এক পুরুষের একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী নিয়ে দাম্পত্য জীবন-যাপনকে বহুবিবাহ (Polygamy) প্রথা বলা হয়। কোন কোন সমাজে একই নারীর একই সঙ্গে একাধিক স্বামী থাকার প্রথাও আছে। কোন পুরুষের যদি এক সাথে একধিক স্ত্রী তাকে তবে তাকে বহুপত্নিত্ব (Polygoony) বলা হয়। অনুরূপভাবে কোন নারীর যদি এক সঙ্গে একাধিক স্বামী থাকে তবে তাকে বলা হয় বহুপতীত্ব (Polyandry)। আর এই প্রথা যদি পুরুষ ও নারীর মিশ্রণ হয় তবে সে ক্ষেত্রে তা হবে গোষ্ঠী বা দলগত বিবাহ। The Encyclopaedia Americana-তে বহু বিবাহের (Polygamy) সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে এভাবে, "Polygamy is the form fo marriage that person to have more than one husband or wife. Although monogamy,the union of one husband and one wife at the same time, is the most common form of marriage, polygamy has been known to exist at various times in certain societies. Today plural marriage is seen in some parts of the world, including Subsaharan Africa. There are two types of polygamy-polyandry and polygyny. polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When the husbands of a woman are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal polyandry. polygyny exsts when a man has two or more wives at the same time. If the wives are by preference sister the marrige form is called sororal polygyny. Since polygynous mfrriages were called polygamy in Mormon Society, polygamy has often been confused with polygyny, particularly in the United states."[২৪৩]

২৪১। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ শ খন্ড, পৃ.১০৪

২৪২। সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ই.ফা.বা, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৪০১

২৪৩। The Encyclopaedia Americana, International Edition, Vol-22, Grolier Incorporated, U,S, A.P. 365.

অপরদিকে Encyclopaedia Britanica- তে বহুবিবাহ (polygamy) সম্পর্কে বলা হয়ছে,

"polygamy marriage is more than one spouse at a time-either polygyny, marriage with more htan one woman, or polyandry marriage with more than one man. The term polygamy is often used, however, as a synonym for polygyny, which appeare once to have been common in most of the world. Nowere, howover has it been the exclusive form of marriage, "[২৪৪]

পৃথিবীর বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, বহুবিবাহ প্রথা সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজে প্রচলিত ছিল।

এ সকল গবেষকের অন্যতম আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন, প্রাচীনকালে মানব সমাজে দলগত বিবাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী পরিবারের একদল ভাইয়ের স্ত্রীরা ছিল তাদের সকলের স্ত্রী এবং একদল বোনের স্বামীরা ছিল তাদের সকলের স্বামী। দু'টি ক্ষেত্রেই বিবাহ ছিল দলগত। বহুস্বামী ও বহুস্ত্রী প্রথা যা ক্ষুদ্রতর পরিধিতে সারা পৃথিবীর আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মাঝে এ প্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে।[২৪৫]

Encyclopaedoa Britanica- তে এই তথ্যের সমর্থনে বলা হয়েছে, "As an institution polygamy exists in all parts of the world "[২৪৬]

গোটা দুনিয়ার সভ্য ও অর্ধসভ্য জাতিসমূহে বিশেষ করে আরব ও ইহুদীদের মাঝে এর প্রচলন ছিল বেশী। ইহুদীদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যার উপর কোন রকমের বিধি নিষেধ আরোপিত ছিল না। যার যত খুশি স্ত্রী রাখার স্বাধীনতা ছিল।[২৪৭]

খৃষ্টান সমাজেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। ইঞ্জিল বিতরণকালে বহুবিবাহ সাধারণভাবে স্বীকৃত ও অনুশীলিত হয়েছিল। এটা ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিকভাবে স্বীকৃত ছিল, এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তিই ছিল না। ইঞ্জিল বহু বিবাহকে নিষিদ্ধ করেনি, একে বিধিবদ্ধও করেনি, এমনকি এর উপর কোন নিয়ন্ত্রণও আরোপ করেনি। খৃষ্টান সমাজের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ S.T. Augustine- একাধিক বিয়ের মাঝে কোন অনৈতিকতা বা পাপ খোঁজে পাননি। তাঁর মতে, যে দেশে বহু বিবাহ একটি আইনানুমোদিত অনুষ্ঠান সেখানে এটি কোন অপরাধ নয়।[২৪৮]

২৪৪। Encyclopaedia Britanica, 15th Edition. Vol-9, P.579

২৪৫। লুইস হেনরি মর্গান, *এনসিয়েন্ট সোসাইটি*, কলিকাতা: রেনুকসাহ, ১৩৯৫ বাং, পৃ. ৪৩

২৪৬। Encyclopaedia Britanica, 14th Edition, Vol. xiv, P. 949

২৪৭। হাফেজ শহীদুল্লাহ ফারুক, *বিশ্বনবীর (সা.) জীবনী,* ঢাকা: আল হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৫

২৪৮। আহমদ মনসুর, *বহুবিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.),* তাসনিম পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৩১

রোমান সাম্রাজ্যে বহুবিবাহের আইনগত স্বীকৃতি ছিল না, তবে লোক সমাজে প্রচলিত ছিল। এ কারণে জাষ্টিনিয়ান আইন প্রণয়ন করে এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, কিন্তু কার্যত ব্যর্থ হন।[২৪৯]

ইসলামপূর্ব যুগে সমগ্র জাজিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) জুড়ে বহু বিবাহের নামে নারীর উপর চলছিলো অশ্লীলতা ও অত্যাচারের ঘৃণ্য স্টিমরোলার। সে যুগে বিবাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বা সীমা ছিল না। ততকালে এক একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী অসংখ্য নারীকে বিয়ে করত এবং আরো অনেককে দাসী বানিয়ে রাখতে পারত।[২৫০]

ইসলাম অন্ধকার যুগের এই উচ্ছৃংখল, নীতিজ্ঞান বিবর্জিত প্রথা অসংখ্য নারীকে বিয়ে করার উপর একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয় কঠোর শর্তাধীনে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম একটি মাত্র বিবাহের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামের একাধিক বিয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয় তা হচ্ছে ঃ

وان خفتم الاتقسطوافى اليتمى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع- فان خفتم الاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا-

"তোমরা যদি আশংকা কর যে, য়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।[২৫১]

আয়াতে 'বিয়ে করবে' শব্দ দ্বারা যদিও বাহ্যত আদেশ বোঝায়, প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দান, নির্দেশ প্রদান নয় এবং তা করা ওয়াজীব বা ফরজ নয়, বরং তা অনুমতি মাত্র আর তাও কঠিন শর্তাধীন।

ইসলামের এই অনুমতির পেছনে রয়েছে মানবিক ও নৈতিক কারণ। আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এই আয়াতটি নাযিল হয় ওহুদ যুদ্ধের পর। এ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হন এবং তারা অনেক বিধবা ও য়াতীমকে রেখে যান। তদুপরি ছিল যুদ্ধবন্দী বহু নারী। যে সব মুসলমান তখন বেঁচেছিলেন বিধবা, এতীম ও যুদ্ধবন্দী নারীদের যতাযোগ্য তত্ত্বধানের দায়িত্ব স্বভাবতঃই তাদের উপর অর্পিত হয়। বিবাহ ছিল ঐ সকল বিধবা ও এতীমদের নিরাপত্তা বিধানের উত্তম পন্থা। এ প্রসঙ্গেই পবিত্র কুর'আন এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে এবং এতীমদের ন্যায় অধিকার সংরক্ষণ করার ও অধীনস্থদের প্রতি সবচেয়ে বেশী মানবতাবোধ এবং দয়া-মায়ার সঙ্গে দেখার নির্দেশ প্রদান করেছে।[২৫২]

২৪৯। হাফেজ শহীদুল্লাহ ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২৫০। আহমদ মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২৫১। আল-কুর'আন, ৪ঃ৩

২৫২। A.Z.M. Shamsul Alam, Family Volues, Bangladesh Co-operative Book society Limited, Dhaka-1995, P. 189; হামমুদাহ আবদালাতি; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী উল্লেখিত আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে-

"If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, two or three, or four, but if ye fear that ye sahll not be able to deal justly (With them), then only one, or that which your right hands possess. That will be more suitable, to prevent you from doing injustice "[২৫৩]

এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে- অজ্ঞতার যুগে আরবে এতীম বালিকাদের অর্থ-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের লোভে তাদের আশ্রয়দাতা অভিভাবকরাই তাদেরকে বিয়ে করত, কিন্ত তাদের প্রতি সুবিচার করত না। একদিকে তাদের মাহর খুবই কম নির্ধারিত হত। অপরদিকে অভিভাবকরা প্রায় সময় অন্য নারীকে বিবাহ্ করে এতীম মেয়েদেরকে তাদের ধনসম্পদ ও সুখ-সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত করত। এ সকল অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, পিতৃহীন অসহায় আশ্রিতা মেয়েরা যদি তোমাদের পক্ষে বৈধ হয় তবে তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বা দোষের কিছুই নয়। তবে তাদের সাথে স্ত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান সহকারে সুবিচার এবং তাদের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যদি তোমাদের মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ হয় তবে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর না। এর পরিবর্তে অন্যান্য বৈধ রমণীদের মধ্য হতে তোমাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দু'টি, তিনটি অথবা সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার।

এরূপ অবস্থায়ও যদি তোমাদের মধ্যে আশঙ্কা বা সন্দেহ হয় যে একাধিক বিবাহ করে স্ত্রীগণের প্রতি সমতা বিধান ও ন্যায় বিচার করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একটি বিবাহ করবে। আর যদি তোমরা একটি স্ত্রীরও উপযুক্ত ভরণ-পোষণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে না পার সেরূপ ক্ষেত্রে যে নারী তোমার আয়ত্বাধীন দাসী কিংবা যুদ্ধবন্দী কেবলমাত্র তাকেই পত্নীত্বে বরণ করে নিবে। এটি অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী। এ কথার মর্ম এই যে, পিতৃহীন আশ্রিতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে কিংবা একাধিক বিয়ে করলে অন্যায়-অচিার হওয়ার সম্ভাবনা যেরূপ প্রবল, একটি মাত্র বিবাহ করলে অথবা দাসীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলে তদ্রুপ কোন আশঙ্কাও থাকবে না।

মহান আল্লাহ তাই একাধিক বিয়ে করে অন্যায় অবিচারের অভিশপ্ত হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষ তথা অশান্তির অনলে নিপতিত হওয়ার চাইতে একটিমাত্র বিয়ের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এর ফলে পরিবার ও সমাজে অন্যায়-অবিচার, হিংসা বিদ্বেষ, কলহ প্রভৃতি অনেক প্রকার অশান্তি লোপ পাবে। সুতরাং দেখা যায়, ইসলামে একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে যখন শরী'আত মোতাবেক সকলের সাথে সমান আচরণ এবং সকলের অধিকার সমানভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। অন্যথায় এক স্ত্রীকে নিয়েই জীবন নির্বাহ করতে হবে এবং এটিই ইসলমের সুস্পষ্ট নির্দেশ।[২৫৪]

২৫৩। Abdullah Yusuf Ali, ***Translation of the Holy Quran with commentary***, Kingdom of Saudi Arabia-1413H. P.206

২৫৪। আহমদ মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭-৭৮

বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে চারের অধিক স্ত্রী বর্জন করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং রাসূলের (সা.) কথা অনুযায়ী তাঁরা চারজন স্ত্রীকে রেখে বাকীদের ত্যাগ করেছিলেন। যেমন-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, গাইলান ইবনে সালামা আস-সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি জাহেলী যুগে বিবাহ কলেছিলেন। তারাও তাঁর সাথে মুসলমান হন। নবী (সা.) তাঁকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নির্দেশ দেন।[২৫৫]

এ হাদীসসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, উপরের আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন মুসলমানই চারের অধিক স্ত্রী রাখেননি। এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জাহিলি যুগের সীমাহীন বহুবিবাহের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করে বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং কঠোর শর্তাধীনে সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখা অনুমোদন করেছেন। কিন্ত কেউ যদি স্ত্রীদের প্রতি সমান আচরণ, সমান ভরণ-পোষণ এবং সমান অধিকার দিতে অপারগ হয় বা আশঙ্কা বোধ করে তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম একজন স্ত্রীকে নিয়েই থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছে। প্রয়োজনীয় শর্ত পালন না করে কেউ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তবে সেটি তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে বিবেচিত হবে এবং তা হবে কুর'আনের নির্দেশের সুস্পষ্ট লংঘন। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

"The unrestricted number of wives of the `Times of Ignorance` was now strictly limited to a maximum of four, provided you could treat them with equality."[২৫৬]

পবিত্র কুর'আনের একই সূরার শেষপ্রান্তে বলা হয়েছে,

ولن تستطيعو ان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيما۔

"এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার কখনই করিতে পারিবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়িওনা ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না; যদি তোমরা নিজদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৫৭]

২৫৫। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আততিরমিযী, প্রাগুক্ত, অনু. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০২, ২য় খন্ড, পৃ.৩০৩

২৫৬। Abdullah Yousuf Ali-op-Cit, P. 206

২৫৭। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

ড. রাশাদ খলিফা এ আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে,

You can never be equitable in dealing with more than one wife. Therefore, do not be so biased as to leave one of them hanging. If you correct this situation and maintain righteousness, God is forgiver, most merciful."[২৫৮]

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "যে লোকের দু'জন স্ত্রী এবং সে তাদের মধ্যে একজনকে অপর জনের উপর অগ্রাধিকার দেয় সে কিয়ামতের দিন তার পড়ে যাওয়া বা ঝুঁকে পড়া পার্শ্ব টানতে টানতে উপস্থিত হবে।[২৫৯]

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মানবিক ও নৈতিক ব্যবস্থা মাত্র এবং তাও সুবিচার (আদল), সমান মানে ও সমান প্রয়োজনে সবার অধিকার আদায় করার কঠিন শর্তাধীন করা হয়েছে।[২৬০] অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী স্বামীকে তার উপর অর্পিত সকল কর্তব্য পূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সমতা সহকারে যথারীতি আদায় করতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বাস-সামগ্রী, খাদ্য, সঙ্গদান, প্রেম-ভালবাসা, হাসি-খুশিব্যবহার, কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি সব বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে সকল স্ত্রীর অধিকার আদায় করা স্বামীর কর্তব্য।

সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, সংখ্যা ও পরিমাণ ইত্যাদির দিক দিয়ে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করার কথা এখানে বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকার সাম্য ও প্রয়োজনানুপাতে দরকারী জিনিস পরিবেশনের কথা। কেননা, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের প্রয়োজন, রুচি ও পছন্দ একই ধরনের নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী পরিবেশন করাই বিধান।

কেননা, (আদল) সুবিচার ও সমতার অর্থ শুধু পরিমাণ বা মাত্রা-সাম্য নয়, বরং তার সঠিক অর্থ হচ্ছে সবার প্রতি সমান খেয়াল রাখা, যত্ন নেয়া এবং প্রত্যেকের দাবী যথাযথভাবে পুরণ করা। এশর্ত পূরণ করতে পারবে না বলে যদি কেউ আশংকা করে এবং আত্মবিশ্লেষণ করে যদি বুঝতে পারে যে একাদিক স্ত্রী গ্রহণ করলে 'আদল' সুবিচারের এশর্তটুকু পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তাহলে তার উচিত আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী একজন স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হওয়া। আয়াতের শেষাংশে একথা বলা হয়েছে, 'তোমরা ইনসাফ সমতা রক্ষা করতে পারবে না বলে যদি ভয় কর, তবে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করবে'। বস্তুত: জুলুম ও অবিচারের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ হচ্ছে অধিক কার্যকর ও অনুকূল ব্যবস্থা।

২৫৮। Dr. Rasad Khalifa, Quran: The Final Testament, Islamic Production, U.S.A. 1989, P-99.

২৫৯। উদ্বৃতঃ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (অনূঃ মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম) ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৫, পৃ. ২৫২-২৫৩

২৬০। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী বলেন, আয়াতে যে সুবিচারের কথা বলা হয়েছে, তা প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্ত দু'জন নারীকে একই রূপে ভালবাসা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমি (আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী) মনে করি উপরোক্ত আয়াতের শর্তারোপ করে একটি মাত্র বিয়ের প্রতিই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৬১] আরো পরিস্কার করে বলা যায়, ইসলাম বহু বিবাহের গোড়া পত্তন করেনি বরং তাকে নির্ধারিত ও সীমিত করেছে। তদ্রুপ ইসলাম বহুবিবাহের নির্দেশ দেয়নি বরং শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে মাত্র। এ প্রয়োজন যখন থাকবে না অথবা একাধিক স্ত্রীর প্রতি যখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আশঙ্কা বোধ হবে তখন এক স্ত্রীর মধ্যেই সীমিত থাকতে হবে।

তাই স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলাম এক বিয়ের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছে। আজকের বিশৃংখল সমাজের জন্যও ইসলামের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত উপযোগী। যেহেতু একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা বিধানের ব্যাপারটা ব্যক্তির একান্তই বিবেকের ব্যাপার আর প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির অন্তরেই আল্লাহ, আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর বিধান পালনের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বিদ্যমান। তাই কোন মু'মিনই আল্লাহর বিধানের লংঘন হবার আশঙ্কা আছে এমন কাজে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে দ্ব্যর্থহীনবাবে বলা যায় যে, একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করে প্রকারান্তরে ইসলাম এক বিয়ের প্রতি মানবজাতিকে নির্দেশ করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একাধিক বিয়ের তাৎপর্য

সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাহমাতুল্লিল 'আল-আমীন[২৬২] রূপে আভির্ভূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পঁচিশ বছর বয়সে সর্বপ্রথম বিয়ে করার পূর্বে তিনি কোন নারীর সংস্পর্শে আসেননি। রাসূল (সা.)-এর বিবাহসমূহ মানবীয় চাহিদার জন্য ছিল না; বরং তা ছিল তাঁর মধুর চরিত্র, দয়া-মায়া, উদারতা, ধৈর্য-সহ্য, শিষ্টাচারিতা, মহত্ব এবং নবুয়তের চমৎকার নির্দশন স্বরূপ। তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর চরিত্রের জন্য সমগ্র আরব ভূ-খন্ডে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলে পরিচিত ছিলেন এবং এই নিষ্কলুষ চরিত্র ও বিশ্বস্ততার জন্য তাকে 'আল-আমীন' (পরম বিশ্বস্ত) খেতাবে ভূষিত করা হয়।

তারপরও পাশ্চাত্যের কিছু লেখক হযরতের বহুবিবাহ সম্পর্কে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যম্যলকভাবে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্ত সত্যিকারভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সা.)-এর সমগ্র জীবনকে পর্যালোচনা করলে সম্পূর্ণভাবে এর বিপরীত চিত্রই দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. ওসমান গনির বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, তিনি বলেন- "তবে সমস্ত বির্তকের এককথায় উত্তর, হযরত তাঁর জীবনে যা কিছুই করেছেন শুধু বিবাহই নয়, সমস্ত কিছুই করেছেন এক ইসলামের সেবায়, মানবতার জন্য, মনুষ্যত্বের উন্নতির জন্য। এর বাইরে তিনি সমগ্র জীবনে এক পাও ফেলেননি। যারা হযরতের বিয়ে নিয়ে নানা কটাক্ষ করে, মাতামাতি করে তারা আর যাই করুক হযরতের জীবনকে একদিনের জন্যও মর্মে মর্মে অনুধাবন করেনি বা করতে সক্ষম হয়নি।

২৬১। Abdullah yusuf Ali, Op.Cit.P.274
২৬২। আল-কুর'আন, ২১:১০৭

যে বা যারাই হযরতের জীবনকে একবার অনুধাবন করতে পেরেছে, সে বা তারাই শতবার শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়েছে তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি পদক্ষেপে।"[২৬৩]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথম বিয়ে করেন ২৫ বছর বয়সে, তাও ৪০ বছরের বিধবা বিবি খাদিজাকে যার ইতিপূর্বে দু'টি বিয়ে হয়েছিল। R.A. Nicholson বলেন, His (Muhammad) marriage to Khadija an elderly widow of considerable fortune, which took place when he was about twenty five years of age."[২৬৪]

এই প্রৌঢ়া মরণীর সাথে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর যৌবনের উজ্জ্বলতম সময়গুলেঅ ব্যয় করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর্যন্ত অথ্যন্ত সুন্দরভাবে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করেছিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।[২৬৫]

তাঁদের এই ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে এমন কাথা শোনা যায়নি বা মুহাম্মদ (সা.)-এর চিরশত্রুও একথা বলতে পারেনি যে, তিনি নিজ স্ত্রী খাদিজা (রা.) ব্যতীত অন্য কোন রমণীর প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হয়েছেন। এমনি পূত-পবিত্র ছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র।

ইসলাম ধর্ম যখন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছিল তখন নতুন ধর্মের প্রচার না করার বিনিময়ে মক্কার কুরায়শরা রাসূল (সা.) কে ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য ও মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে দান করতে চেয়েছিল। আল্লাহর রাসূল (সা.) ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখান করেছিলেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর চরম শত্রুও তাঁর নিস্কলুষ চরিত্রের উপর বিন্দুমাত্র কালিমা লেপন করতে পারেনি; বরং তাঁর কট্টর সমালোচক Sir William Muir পর্যন্ত হযরতের নিষ্কলুষ উন্নত চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

"Our authorities all agree in ascribing to the youth of Mohammad a modesty of deportment and purity of manners rare among the people of Mecca, His virtue is said to have been miraculously preserved."[২৬৬]

বিবি খাদিজা (রা.) ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাকী বিয়েগুলো করেচিলেন জীবনের শেষ ১০ বছরে। এ সময়ের প্রত্যেকটি বিয়েকেই খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে সবকটা বিয়েই করেছেন শুধু বিয়ের জন্য নয়, বরং পেছনে ছিল মহৎ কারণ। কোথাও শত্রুতা কমানো , কোথাও বা দু'দলের মধ্যে মিলন ঘটনো, কোথাও বা বিধবাকে রক্ষা করা, কোথাও বা আদর্শ স্থপনকরা ইত্যাদি। [২৬৭]

২৬৩। ড. ওসমান গনি, মহানবী (ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস. ১ম খণ্ড), মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৬,পৃ. ৩৮৯

২৬৪। R.A. Nicholson, A literary History of the Arab, india-1994, P.184.

২৬৫। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, ***দ্য স্পিরিট অব ইসলাম,*** (অনুঃ ড. রশীদুল আলম), কলকাতা-১৯৮৭, পৃ. ৩২৮।

২৬৬। Sir Williiam Muir, the life of Mohamet, Voice of India-1994, P. 148.

২৬৭। ড. ওসমান গনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, ইসলামের প্রথম চতুষ্টয়কে খলিফা তিনি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের দু'জনকে কন্যা দান করলেন এবং বাকী দু'জনের কন্যা গ্রহণ করলেন-অর্থাৎ

সকলকে নিয়ে যেন একটি পরিবার গঠন করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) ও হাফসা (রা.) কে বিয়ে করার গূঢ় কারণ ইহাই।[২৬৮]

এভাবেই তাঁর বিয়েগুলো এক একটা কারণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল যে কারণের মূলেই ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসার।

নিম্নে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বহুবিবাহের তাৎপর্য বিস্তারিত আলোচনা করা হল

১। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পঁচিশ বছর বয়সে বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে যিনি দু'বার বিধবা হয়েছেন এবং খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর । বিবি খাদিজার সাথে আল্লাহর রাসূলের দাম্পত্য জীবনের সময়কাল ছিল ২৫বছর। নবী করিম (সা.)-এর এই সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর্যন্ত যৌবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্তগুলো শুধুমাত্র একজন প্রৌঢ়া বিধবা রমণীকে নিয়ে অতিবাহিত করা কি তাঁর নিষ্কলুষ, উন্নত, অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্রের পক্ষে রায় প্রদান করে না? এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ Hammudah Abdalti বলেন,

æHis first marriage at this unusually late stage in that area was to lady Khadeejah, an old twice-widowed lady who was fifteen years senior to him. She herself initited the contract, and he accepted the proposal in spite of her older age and in spite of her being twice-widowed At the time he could have quite easily found many prettier girls and much younger wives, if he were passionate or after things physical.[২৬৯]

বিবি খাদিজার (রা.) সাথে রাসূল (সা.)-এর সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনের এক চমকপ্রদ, যুগান্তকারী ঘটনা। বিবি খাদিজার গর্ভে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ছয়জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। যার মধ্যে দুইজন পুত্র সন্তান ও চারজন কন্যা সন্তান। হযরত খাদিজা (রা.) এর জীবদ্দশায় রাসূল (সা.) অন্য কোন বিয়ে করেননি এবং কোন রমণীর প্রতি আকৃষ্টও হননি।

২। হযরত খাদিজার (রা.) ইন্তেকালের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা.) এ দুই শিশু কন্যা নিয়ে তিনি খুবই কষ্ট কর পড়েন অসুবিধায়। অপরদিকে সাকরানের বিধবা স্ত্রী সাওদা বিনতে জোমাআও ইসলাম গ্রহণের কারণে আত্মীয়-স্বজন কারো নিষ্ট আশ্রয় না পেয়ে এতিম পুত্র সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। অধিক বয়সের ফলে প্রায় বৃদ্ধা মহিলাকে পূর্বের সন্তানসহ ইসলামের শেষ নবী গ্রহন করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এতে একদিকে সাওদা ও তাঁর এতিম পুত্রের মাথা গুজার ঠাঁই হয়েছিল, অন্যদিকে হযরতের (সা.) দুই শিশু সন্তানেরও যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।[২৭০]

২৬৮। গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৪০৫।

২৬৯। Hammudah Abdalati, Islam in Focus, Al-Madina printing & publication co, Jeddah-1973, P. 175.

২৭০। আহমদ মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

৩। রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর সবচাইতে ঘনিষ্ট ও নিকটজন, যদিও তাঁদের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক ছিলনা। তৎকালীন আরবের রক্ত

সম্পর্কহীন মুখে ডাকা ভাইয়ের মেয়েকে কেউ বিয়ে করত না এবং এটি ছিল একটি কুসংস্কার। এ কুসংস্কারকে ভেঙ্গে আয়েশাা (রাঃ)-এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর একজন অতি বিষক্ষন্ত বন্ধু, পরম নিকট আত্মীয় ও দ্বীনী ভ্রাতা। হযরত আয়েশার (রা.) বিয়ের মাধ্যমে এ বন্ধন আরো সুদৃঢ় ও গভীর হয়েছিল এবং আবূ বকর (রা.) ও তাঁর পরিবার মহা আনন্দিত হয়েছিলেন।

৪। মহানবী (সা.) হযরত উমরের (রা.) কন্যা হাফসাকে বিয়ে করেছিলেন এই কারণে যে, রাসূল (সা.) উমরকে প্রচণ্ড রকম ভালবাসতেন। এই নিবিড় ভালবাসাকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত উমর (রা.) কন্যা হাফসাকে বিয়ে করেন। মিশরের প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক Muhammad Husayn Haykal তাঁর রচিত The lifi of Muhammad নামক গ্রন্থে এই বিয়ের ফলে রাসূল (সা.)-এর সাথে হযরত উমরের যে গভীর নৈকট্যের সম্পর্ক রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বলেন,

"The prophet`s marriage to hafsah increased Ibn al Khattab`s attachment to him."[২৭১]

৫। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পঞ্চম স্ত্রী ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ)। উহুদের যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হওয়ার ফলে মদীনার প্রায় অর্ধেকের মত নারী নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় বৈধব্য জীবন যাপন করছিল। এরূপ অসহায় রিক্তদ নারীদের মধ্যে যয়নব বিনতে খুযায়মাও (রা.) নিঃসঙ্গ বৈধব্য জীবন যাপন করছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর জগৎসংসার ছিল তার কাছে অর্থহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন। বেঁচে থাকার জন্য ছিলনা কোন আকুলতা এবং ছিল না কোন প্রকার অবলম্বন। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল (সা.) যয়নবকে (রা.) সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদা দানের জন্য এবং সর্বোপরি তাঁকে সমাজে পুনর্বাসিত ও সাহায্য করার জন্য ৪০০ দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে তাঁর কাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহানবী (সা.)-এর সমালোচক পাশ্চাত্য সমাজ যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত নির্যাতিত অসহায় বিধবা নারীদেরকে বিবাহের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করত, তবে আজকের মত পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের মাত্রা এতটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছত না এবং এই মাত্রা বহুগুণে লোপ পেত। এ প্রসঙ্গে S,M,Madani বলেন ঃ

২৭১। Muhammad Husayn Haykfl, The life of muhammad, Cresent publishing co. India-1990, P.251.

æThe world at large and Europe in particular, may take advantage of this Islamic position and try to accommodate millions of widowed and

unmarrid women and check and eradicate the vice in which Europe in particular is engulfed."[২৭২]

৬। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সা.) এর ষষ্ঠ স্ত্রী। উম্মে সালামার স্বামী আবূ সালামা উহুদ যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হন। যে আঘাতের কারণে পরবর্তীতে তিনি ইন্তেকাল করলে স্ত্রী উম্মে সালামা চার জন সন্তানসহ নিঃসহায়, দুঃখ দুর্দশার মধ্যে বৈধব্য জীবন-যাপন করছিলেন। উম্মে সালামা আল্লাহর নিকট তার স্বামীর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি দান করার জন্য প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে রাসূল (সা.) কে তাঁর স্বামী হিসেবে নির্বাচিত করেন। উম্মে সালামাকে বিয়ে করার মাধ্যমে একদিকে উম্মে সালামার মর্যাদা সুউচ্চ করা হল এবং এই বিয়ের মাধ্যমে চারজন পুত্র কন্যাসহ এক অসহায় বিধবাকে আশ্রয় প্রদান করা হল।

৭। রাসূল (সা.) এর সপ্তম স্ত্রীর নাম হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ। এ বিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা বেশী মাতামাতি করেন। যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ নিজে উদ্যোগী হয়ে পবিত্র কুর'আনের সুরা আহযাবের ৩৭ ন'র আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে রাসূল (সা.) সাথে যয়নব (রা.)-এর বিয়ে সুসম্পন্ন করেন। এই বিয়ের মাধ্যমে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা হালাল হয় এবং জাহেলী যুগের সকল প্রকার কুসংস্কারের মূলোৎপাটিত হয়। বস্তুত: আল্লাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশে এই বিয়ে কার্যকর হয়। যেমন পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكى لايكون فلى المؤمنين حرج فىأزواج أدعيا ئهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا

"অতপর যায়দ যকন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদিগের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আশে কার্যকরী হইয়াই থাকে।[২৭৩]

৮। রাসূল (সা.) এর অষ্টম স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে হাবীবা (রা.)। তাঁর পূর্বের স্বামী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার ফলে ইসলাম ধর্ম মতে তাদের মধ্যকার বিয়ে ভেঙ্গে যায়। উম্মে হাবীবা ছিলেন ইসলামের চিরশত্রু আবূ সুফিয়ানের কন্যা।

২৭২। S.M Madani, ***The Family of the Holy Prophet***, Adam publishers & Distributors, Delhi: India-1984, P.130

২৭৩। আল-কুর'আন, ৩৩ঃ৩৭

এই বিয়ের মাধ্যমে রাসূল (সা.) গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। রাসূল (সা.) উম্মে হাবীবাকে বিয়ে করার পর আবূ সুফিয়ানের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এক

সময় আবূ সুফিয়ান ইলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই বিয়ের মাধ্যমে আবূ সুফিয়ানের সাথে বহু যুগের শত্রুতার চির অবসান হয়। সুতরাং এই বিয়ে ছিল রাসূল (সা.)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বাস্তব প্রকাশ মাত্র।

৯। রাসূল (সা.)-এর নবম স্ত্রী নাম ছিল হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস। জুয়াইরিয়া ছিলেন বনী মুস্তালিক গোত্রের প্রধানের কন্যা। এই গোত্রের সাথে মুসলমানদের চিরশত্রুতা ছিল এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। যুদ্ধবন্দী হিসেবে গোত্র প্রধান হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়াকে মদীনায় নিয়ে আসা হলে রাসূল (সা.) মুক্তিপণপ্রদান করে জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেন। এই বিয়ের ফলে জুয়াইরিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হল এবং বনু মুস্তালিক গোত্রের সাথে মুসলমানদের চিরশত্রুতার অবসান হল।

১০। রাসূল (সা.) এর দশম স্ত্রীর নাম ছিল সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতব (রা.) যার জন্ম হয়েছিল মদীনার ইহুদী গোত্রে। এ গোত্রের সাথে মুসলমানদের শত্রুতা ছিল এবং খায়বার অভিযানে এই ইহুদী গোত্র সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধবন্ধী সাফিয়াকে একজন সাধারণ সাহাবী নিতে চাইলে সাফিয়া যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সাহাবীদের অনুরোধে সাফিয়াকে বিনাপণে মুক্তি দিয়ে অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত নারীদের সাথে যেতে বলা হলে সাফিয়া না গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা.) তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে রাসূল (সা.) সাফিয়াকে বিয়ে করার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদাকে মহিমান্বিত করেন। এটি ছিল রাসূল (সা.) এর নিতান্তই মানবিকতাপূর্ণ একটি মহৎ কাজ। এছাড়া এই বিয়ের মাধ্যমে মক্কা ও মদীনার ইহুদীদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইহুদীদের শত্রুতা অনেকাংশে প্রশমিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, “ইহুদী রমণী সাফিয়াকে খায়বর অভিযানের সময় মুসলমানরা বন্দী হিসেবে এনেছিল। তাঁকেও মুহাম্মদ (সা.) উদারতার সঙ্গে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তার সনির্বন্ধ অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাঁকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন।[২৭৪]

১১। রাসূল (সা.) এর একাদশ স্ত্রী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ইহুদী বানু নাজীর গোত্রের মেয়ে রেহনা বিনতে শাময়ূন (রা.)। মুসলমানরা বানু নাজীর ও বানু কুরায়যা গোত্রের স্থানসমূহ যখন দখল করে তখন তাকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হায়। তখন তিনি ছিলেন বিধবা। রাসূল (সা.) আরবের ইহুদী গোত্র সমূহের সাথে শান্তি স্থপন তথা সারা আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠান লক্ষে রেহানাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। রেহানা হযরত (সা.) এর দাওয়াত সানন্দে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁকে মুক্তি দিয়ে ৪০০ দিনারের বিনিময়ে মাহাম্মদ (সা.) বিয়ে করেন। এই বিয়ের ফলে মক্কা ও মদীনার ইহুদীদের সাথে আরও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরতের এ বিয়ে সম্পর্কে ইবনে সা’আদের বক্তব্যকে S.M. Madani বর্ণনা করেছেন এভাবে,

---

২৭৪। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩২

æThe well known historian Ibn-e-Sad has tried to prove that after libertion her (Rehanah) the Holy prophet (s.) marriad her and asked her to

pbserve purdah like his other wives, and she lived thereofer like them. Hafiz-ibn-I-Hazar also agreed with Ibn-e-Sad."[২৭৫]

১২। রাসূল (সা.)-এর দ্বাদশ স্ত্রী ছিলেন মায়মুনা বিনতে হারিস। রাসূল (সা.)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে দু'দু'বার তাঁর বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর ৫১ বছরের বৃদ্ধা অবস্থায় বৈধব্য জীবন যাপন করছিলেন। সম্পর্কে তিনি বীর যোদ্ধা হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের আত্মীয়া ছিলেন। হযরত মায়মুনাকে বিয়ে করার মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর চাচা ইবনে আব্বাস ও মহাবীর খালিদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন যার শুভ প্রভাব হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, মায়মুনাকে মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় ও পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল তাঁর বয়স। এই বিয়ে আত্মীয়ার অবলম্বন হিসাবেই শধু কাজ করেনি, অধিকন্ত এ বিয়ের মাধ্যমে ইসলাম লাভ করেছিল ইবনে আব্বাস ও খলিদ বিন ওয়ালিদের মত ব্যক্তিদ্বয়কে।[২৭৬]

১৩। মহানবী (সা.) এর ত্রয়োদশ স্ত্রী ছিলেন বিধবা খৃষ্টান মহিলা মারিয়া কিবতিয়া।[২৭৭] তাঁর বিবাহ সম্পর্কে ড. ওসমান গনি বলেন, "আবসিনিয়ার বাদশা খৃষ্টান বিধবা মহিলা মরিয়মকে দাসীরূপে হযরতের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠান। তখনকার দিনের নীতি অনুযায়ী কোন রাজা-বাদশার উপহার অন্যকে দেওয়া সেই বাদশার প্রতি অবমাননা দেখান। তাই হযরত মরিয়মকে নিজ পত্নীত্বে বরণকরে আবিসিনিয়ারাজের সঙ্গে এক অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধন স্থাপন করেন।[২৭৮]

মহানবী (সা.) খৃষ্টান ওইহুদীদের সাথে ভালবাসা ও সম্প্রতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে খৃষ্টান ও ইহুদী মহিলাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া সে সময়ে ঐ মহিলাদের বিবাহ করার অন্য কোন কারণ ছিল না। হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিত দুর্গত মানব-জাতির ত্রাণকর্তা রহমাতুল্লিল 'আলামীন মহানবী (সা.) ভিন্নগোত্রে বিয়ের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজের ভাবী মিলনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।[২৭৯] এক্ষেত্রে পবিত্র কুর'আনের ঘোষণা ছিল,

والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى اخدان-

"এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মাহর প্রদান কর বিবাহের জন্য প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে।"[২৮০]

২৭৫। S.M Madani, Op.Cit., P.79
২৭৬। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩২
২৭৭। ড. ওসমান গনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩, Encyclopaedia of Seerah, (Muhammad), Seerah Foundation, Landon, Vol. II, Part01, P.207
২৭৮। ড. ওসমান গনি, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩
২৭৯। ড. ওসমান গনি, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩
২৮০। আল-কুর'আন, ৫:৫

বিবি খাদীজা (রা.) এর জীবদ্দশায় অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করেননি। পরবর্তী ১০ বছরে শুধুমাত্র ইসলাম প্রচার ও বিশ্ব-সমাজের

মিলনের সহায়ক হিসেবে মহানবী (সা.) বাকী বিয়েগুলো করেছিলেন। অষ্টম হিজরী সনে যখন মহানবী (সা.) এর বয়স ৬০ বছর তখন একাধিক বিবাহ সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, "তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, য়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই তিন অথবা চার; আর যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা (বিবাহ করিবে) তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীকে ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"[২৮১] তৎকালীন আরবে মেয়েদের কেনাবেচা হত। ধনীরা অর্থের বিনিময়ে সুন্দনী রমণীদের কিনে নিয়ে খুশিমত ব্যবহার করত, অথচ তাদের স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হতো না। এ কারণে তখনকার দিনের নারীদের প্রতি চলত অমানুষিক নির্যাতন। তাছাড়া সেযুগে যতখুশি নারীকে বিয়ে করা যেত বিশেষ করে কোন কোন বিত্তবান ব্যক্তির সংসারে শতাধিক স্ত্রী থাকত এবং তাদের সকলের নাম জানা দূরের কথা দেখে চেনাও কষ্টকর হত।[২৮২] নারীর প্রতি এ উদাসীনতা, নারীত্বের প্রতি এহেন অবমাননা ইসলাম বরদাশত করেনি। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করল, তোমরা স্বধীন নারীদের বিয়ে কর, কিন্তু চারের অধিক নয়। কেউ চারের অধিক স্ত্রীও রাখতে পারবে না। "তখন সকলেই বাধ্য হল চারটি স্ত্রী রেখে অন্যদের ছেড়ে দিতে যাতে তারা স্ত্রী জীবনের যথার্থ স্বাদ বা মর্যাদা পায়।"[২৮৩]

তবে হযরতের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। কেননা, তাঁর বা নবীর স্ত্রীগণ ছিলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মাতা)। সুতরাং তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে আর কারো পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি যদি তাঁর স্ত্রীদের ছেড়ে দিতেন তা ছিল মিলনের সেতু রচনা করা। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর প্রতি কুর'আনের নির্দেশ অবতীর্ণ হল সে নির্দেশের কারণে তিনি স্ত্রীদের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারেন নি।[২৮৪]

لايحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا

"ইহার পর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদিগের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে যদিও উহাদিগের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে, তবে তোমার অধিকারভূক্ত দাসীদিগের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ম দুষ্টি রাখেন।"[২৮৫]

২৮১। আল-কুর'আন, ৪ঃ৩
২৮২। ড. আবদেল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৮৩। ড. ওসমান গনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
২৮৪। ড. ওসমান গণি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
২৮৫। আল-কুর'আন, ৩৩ঃ৫২

সুতরাং সৃষ্টি জগতের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিবাহিত জীবন পর্যালোচনা করে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হামমুদাহ আবদালাতির মত বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ

(সা.) অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর ও সংযত জীবন-যাপন করতেন । দিনের বেলায় তিনি ছিলেন সে সময়কার ব্যস্ততম মানুষ, যুগপৎ রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান বিচারপতি, প্রশিক্ষক আর রাতের বেলায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও খোদানিষ্ঠ ব্যক্তি। প্রত্যেক রাতের এক থেকে দুই তৃতীয়াংশ সময়ই তিনি নিবিষ্ট থাকতেন নামাযে এবং আল্লাহর ধ্যানে।[২৮৬] তাঁর গৃহে আসবাবপত্র বলতে ছিল কয়েকটি মাদুর, পানির জগ, কলস এবং এ ধরনের কিছু সাধারণ জিনিসপত্র, যদিও তিনি ছিলেন গোটা আরব ভূ-খন্ডের একচ্ছত্র বাদশাহ ও শাসনকর্তা। তাঁর জীবন ছিল এত কঠোর ও অনাড়ম্বর যে, একবার তাঁর স্ত্রীগণ কিছু বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দের জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তাঁরা সে কাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দ কোন দিন পাননি।[২৮৭]

মহানবী (সা.)-এ পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় সুন্দর আদর্শরূপে।[২৮৮]

রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীগণের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ এমন চমৎকার আচরণ করেছেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে অনুপস্থিত। এভাবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তিনি নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসকল বিয়ের মাধ্যমে রাসূল (সা.) বর্ণ, শ্রম, প্রথা, গোত্র ও জাতিগত অহংকার ও ধর্মীয় সকল বিদ্বেষের মূলোৎপাটন করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সাম্যের বাণী প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি তার প্রকৃত মর্মার্থ বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এ সমস্ত গুণরাজি ও তাঁর সুদূর প্রসারী প্রভাব প্রত্যক্ষ করে প্রখ্যাত আমেরিকান অমুসলিম গবেষক মাইকেল এইচ. হার্ট মানব সভ্যতার সূচনা থেকে এ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের ১০০ জন শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামকে শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন -

"My choice of Mohammsd to lead the list of the world`s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religions and secular levels ----- It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Mohammad to be considered the most influential single figure in human history."[২৮৯]

২৮৬। আল-কুর'আন, ৭৩:২০

২৮৭। আল-কুর'আন, ৩৩:২৮

২৮৮। (لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة) আল-কুর'আস, ৩৩:২১

২৮৯। Michael H. Hart. The 100: A ranking of the most influential persons in history, citadel press, Secaucus, New Jersey-1987, PP.-33-40

অর্থাৎ "পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে হতে আমি মুহাম্মদরে নাম সর্বপ্রথমে নির্বাচিত করেছি যা কতক পাঠককে বিস্মিত করতে পারে এবং অন্যরা করতে পারে নানারূপ প্রশ্ন।

কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব এই উভয় জগতেই সর্বোচ্চভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। এটি হচ্ছে অতুলনীয় সেই পার্থিব ও ধর্মীয় সমন্বয়ের (সুদুরপ্রসারী) প্রভাব যার জন্য মুহাম্মদকে আমি মানব ইতিহসের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী একক ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছি।”

ইসলামে ‘তালাক’ ব্যবস্থা

পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মার্মান্তিক ব্যাপার। ‘তালাক’ হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। ইসলামে তালকের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পারিবারিক জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বাঁচাবার জন্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে ভাঙ্গন দেখা দেয়, পরস্পরে মিলে-মিশে শান্তি প্রিয় ও মাধুর্যমন্ডিত জীবন-যাপন যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, পারস্পরিক সম্পর্ক যখন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে পড়ে, উভয়ের শুভ মিলনের যখন আর কোন আশাই না থাকে, ঠিক তখনই এ চূড়ান্ত পন্থা অবলনের ব্যবস্থা। এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায় মাত্র। কিন্তু তাই বলে ‘তালাক’ দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইসলাম বরদাশত করেনি। ‘তালাক’ ব্যবস্থার সঠিক পন্থা পবিত্র কুর’আন ও হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ইসলাম পূর্ব যুগের তালাক সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন জাতি ও সভ্যতার কোথাও কোথাও তালাকের ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রে বিয়ে এক চিরস্থায়ী বন্ধন-বিশেষ এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে স্থায়ী রাখাই কর্তব্য।

হিব্রু ভাষাভাষী জাতিগুলোর মধ্যে তালাকের ব্যবস্থা ছিল। স্বামী সাধারণ ও সামান্য কারণেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত ।অনুরূপভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীরও অধিকার ছিল তালাক গ্রহণের । প্রাচীন রোমান সমাজে বিয়ে যেমন একটি সাধারণ পারিবারিক ব্যাপার ছিল, তেমনি তালাক প্রদান ও গ্রহণে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না । স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই তালাক দানের অধিকারী ছিল। আর সে জন্য কোন বিচারক বা আদালতের নিকট হাযির হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। [২৯০]

পূর্ববর্তী ঐশী শরী‘আতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মুসা (আঃ) এর শরী‘আতে তালাকের বিধানসমূহ পাওয়া যায়। বর্তমান প্রচলিত তাওরাতে পুরুষকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং ‘তালাক’নামা দিতে হবে লিখিতভাবে। তাওরাতে বলা হয়েছে “যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করে এবং পরে তার মধ্যে কোন প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখতে পায় আর সে জন্য সে স্ত্রী তার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয় তবে সে পুরুষ তার জন্য এক ‘তালাকনামা’ লিখে হাতে দিবে এবং আপন বাড়ী থেকে তাকে বিদায় করতে পারবে। যখন সে ঘর হতে বের হয়ে যাবে তখন সে অপর পুরুষের স্ত্রী হতে পারবে।

২৯০। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

আর ঐ দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাকে ঘৃণা করে এবং তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে আপন বাড়ী হতে বিদায় করে দেয় সে তার অসুচী হওয়ার পর তাকে পূনরায় বিয়ে করতে পারবে না । কারণ তা সদা প্রভূর নিকট ঘৃর্ণাহ কর্ম।” (২য় বিবরণ-২৪ঃ১-৩)।

এতে বুঝা যায় মূল ইহুদী ধর্মে পুরুষের তালাকের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, যদিও পরবর্তীকালে বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে ইহুদী পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে এ অধিকারের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।[২৯১]

বর্তমান বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) তালাকের অনুমতিকে খুবই সীমিত করে দিয়েছেন এবং স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত না হলে তাকে ‘তালাক’ দেয়া অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন ।

অর্থাৎ মূল খৃষ্ট ধর্মে পুরুষের ‘তালাক’ দেয়ার কোন এখতিয়ার ছিল না। কেবল স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে সে গীর্জার বিচারালয়ে তালাকের দাবী পেশ করতে পারত । কিন্ত কালক্রমে ব্যভিচারের অপরাধ ছাড়াও তালাকের দাবী উত্থাপনের জন্য আরো অধিক কারণসমূহ বিভিন্ন যুগে স্বীকার করে নেয়া হয়। তবে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ‘তালাক’ দেয়ার এখতিয়ার কেবল গীর্জার নিকটই ছিল। ১৮৫৭ খ্রী. ইংল্যান্ডের বৈবাহিক মোকদ্দমা আইন এই এখতিয়ার গীর্জা আদালতের পরিবর্তে একটি সাধারণ আদালতের নিকট অর্পণ করে। পরে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে তালাকের কারণসমূহের তালিকা আরো বর্ধিত করা হয়, এমনকি বর্তমানে ‘তালাক’ লাভের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সমানভাবে ব্যাপক ও বিস্তারিত ভিত্তিসমূহ সহজলভ্য করে দেয়া হয়েছে।[২৯২]

তমাশার যুগেও আরব সমাজে ‘তালাক’ প্রথা প্রচলিত ছিল। আরব সমাজে কেবল পুরুষের জন্যই এ অধিকার সংরক্ষিত ছিল, সে যখন ইচ্ছা করত বিয়ের বন্ধন শেষ করে দিত। নবী করীম (সা.)-এর আর্বিভাবের পূর্বে আরবে এ প্রকার তালাকের রেওয়াজ সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল।[২৯৩] অর্থাৎ বিয়ের কারণে নারীর উপর যে অধিকারসমূহ হয়েছে তা তৎক্ষণাৎ ও চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করতে পারত ।

ইসলাম ও তালাক

ইসলাম বিয়েকে একটি সুখী দাম্পত্য জীবন এবং স্থায়ী শান্তির দৃঢ় ভিত্তিরূপে গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। যেহেতু মানবীয় আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং কখনও কখনও তা অকল্পনীয়ও । এ কারণে ইসলাম জীবন সম্পর্কে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে তাতে সর্বপ্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুকাবিলার জন্য কার্যকর ব্যবস্থার অনুমতিও রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে অতি পবিত্র একটি চুক্তি। এ জন্য বিবাহের শোভন, শালীন ও মহৎ উদ্দেশ্যকে ইসলাম পূর্ণ করতে চায়। কার্যকর ও ফলপ্রসূ নয় এমন কোন বিয়েকে ইসলাম আদৌ স্বীকৃতি দান করে না । এখানে নামমাত্র বা অকার্যকর বিয়ের কোন অবকাশ নেই ।

২৯১। Encyclopaedia Britanica, Vol. 1950, Chapter: `Divorce`, P. 453
২৯২। Encyclopaedia of Islam, Vol-IV, ch-Talak, pp-636-640
২৯৩। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কালাদেশ, পৃ. ৩৫৩

অতএব, কোন বিয়ে যদি তার উদ্দেশ্য সাধন না করে অথবা যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন না করে তাহলে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের সকল অধিকার সংরক্ষণসহ তাকে তালাকের সাহায্যে নাকচ করা যাবে। কেননা, নামমাত্র বা অর্থহীন চুক্তি বলবৎ রাখার কোনই যৌক্তিকতা নেই । তাছাড়া যে অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তার কবল থেকে মানুষকে নিষকৃতি দেয়াও এর উদ্দেশ্য।[২৯৪] যদি বিধিবদ্ধ আইন ও পুর্ব সর্তকতামূলক ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিচালিত ইসলামী বিয়ে যথাযথভাবে কাজ না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেখানে অবশ্য কোন গুরুতর বাধা-বিপত্তি এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সেখানে নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে, যা সালিশী-নিষ্পত্তি বা পূর্ণমিলন দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, কেবল এ ধরণের পরিস্থিতিতেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তালাকের বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশ্য এই হল সর্বশেষ উপায়। এজন্য ইসলাম 'তালাক' ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ব্যাপক নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা দান করেছে। ইসলামের মূল লক্ষ্য বৈবাহিক সম্পর্কই স্থায়ী হউক এবং তা বিনষ্টের ঘটনা কমই ঘটুক। তাই পুরুষকে তাগিদ করা হয়েছে যে, সে যেন কেবল নারীদের খারাপ দিকটাই না দেখে। কারণ, হয়ত তার মধ্যে অনেক ভাল কিও রয়েছে। আল-কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে,

فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔

"তোমরা যদি তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।"[২৯৫] এরপরও যদি বাস্তবিকই কোন অসহনীয় দোষ দেখা দেয়, তবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে তৎক্ষণাৎ 'তালাক' দেয়ার পরিবর্তে প্রথমে তাকে শাসন করবে। এটা পর্যাপ্ত না হলে অসন্তষ্টি প্রকাশের জন্য তার নিকট থেকে নিজের বিছানা আলাদা করে নিবে । এটাও অপর্যাপ্ত হলে সে জন্য শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মৃদু দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করবে।[২৯৬] এরপর সমঝোতা না হলে স্বামীর পক্ষ হতে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন করে সালিশী নিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যারা মিলিতভাবে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করবে।[২৯৭] এমন ধারাবাহিক প্রচেষ্টাও যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তবেই তালাকের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীসে বলা হয়েছে যে, বৈধ জিনিসসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট 'তালাক' সর্বাধিক ঘৃণ্য।[২৯৮]

২৯৪। হামমুদাহ আবদালাতি, ***ইসলামের রূপরেখা,*** ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট ওরগাইজেশন, ১৪০৪, পৃ. ২৯৫

২৯৫। আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৯

২৯৬। (والتى بخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن-) আল-কুর'আন, ৪ঃ৩৪

২৯৭। وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها – ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما আল-কুর'আন ৪ঃ৩৫

২৯৮। আবু দাউদ আল সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত 'তালাক', ৩য় পরিচ্ছেদ, হাদীস নং-২০১৮

'তালাক' দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনন্তর তালাকের তিনটি পর্যায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং একই সময় তিন তালাকের সাহায্য এই তিনটি স্তর অতিক্রম করা অবৈধ ঘোষনা করা হয়েছে। কারণ, এরপর বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বার স্থপিত হতে পারে না, বরং এক 'তালাক' দিয়ে বিরত হওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে। কারণ যদি কোন সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি হয় তবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া অথবা নতুনভাবে বিয়ের মাধ্যমে পুনরায় সম্পর্ক স্থপন করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে পবিত্র কুর'আনের আরো একটি আয়াত তালাকের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি নতুন বিধান যোগ করেছে, অর্থাৎ 'ইদ্দত' বা অপেক্ষাকাল। এর দু'টি কল্যাণকর দিক রয়েছেঃ (ক) 'তালাক' প্রাপ্তা নারীর কোন সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার পিতৃত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না। (খ) স্বামী তার 'তালাক' প্রত্যাহার করে নিজের তাড়াহুড়ার প্রতিবিধান করার অবকাশ পাবে। যেমন, আল-কুর'আনে বলা হয়েছে,

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء- ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر- وبعو لتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف- وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم-

'তালাক' প্রাপ্তা স্ত্রী তিন হায়েযকাল প্রতীক্ষায় থাকবে তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি কারিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে তাহাদের পুনঃগ্রহণে তাহাদের ('তালাক" দাতা) স্বামীগণ অধিক হকদার । নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৯৯]

الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان – ولا يحل لكم ان تاخذوامما اتيتموهن شيئا

"এই (প্রত্যাহারযোগ্য) 'তালাক' দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা নিজেদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা বৈধ নহে।"[৩০০]

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره- فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون-

আবার বলা হয়েছে, "অতঃপর যদি সে তাহাকে 'তালাক' দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে । অত:পর সে যদি তাহাকে 'তালাক' দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা, জ্ঞানীসম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।"[৩০১]

২৯৯। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৮
৩০০। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৯
৩০১। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩০

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف۔ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايت الله هزوا۔

"যখন তোমরা স্ত্রীকে 'তালাক' দাও এবং তাহারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্ত তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমা লংঘন উদ্দেশ্যে তোমরা তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না। যেই ব্যক্তি তাহা করে সে নিজের উপর জুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করিও না।[৩০২]

উপরোক্ত প্রথম আয়াতে 'ইদ্দত [৩০৩] কালীন সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে। পুরুষদেরকে দেয়া এ অধিকার পরবর্তীকালে কোন কোন লোকের হাতে খুবই খারাপভাবে প্রয়োগ হতে থাকে। 'ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার কাছাকাছি হলে স্বামী নিজ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিত এবং তৎক্ষণাৎ নতুনভাবে তালাক দিত এবং এভাবে স্ত্রীরা সব সময় ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকত। তমাশার যুগে তালাকের কোন সয়খ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। তাই যে কয় বারই 'তালাক' দেয়া হউক না কেন, যে কোন সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল। তাই পরবর্তী আয়াতে ভবিষ্যতে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকের সংখ্যা নিনির্দষ্ট করে দেয়া হয় এবং তালাকের পরিবর্তে সম্পদ গ্রহণের পন্থাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।[৩০৪]

আবার তৃতীয় আয়াতে রাজঈ বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাকের কথা বুঝোনা হয়েছে। যদিও আয়াতে রাজঈ শব্দের উল্লেখ নেই।

এখানে প্রত্যাবর্তন দ্বারা রাজায়াতের দু'টি পন্থা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে রাজায়াত নতুনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়া হয়ে থাকে এবং যে রাজায়াত নতুনভাবে বিয়ে অনুষ্ঠানের মাদ্যমে হয়ে থাকে। কারণ এ দু'বারে 'তালাক' যদি খুলা [৩০৫] অথবা বায়ন তালাকের আকারে হয় তবে সে ক্ষেত্রে নতুনভাবে বিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কেবল রাজায়াত হতে পারে। আর যদি খুলা বা বায়ন 'তালাক' হিসেবে না হয়ে থাকে তবে দুই তালাকের সীমা পর্যন্ত পুর্নবিবাহ ছাড়াই রাজায়াত হতে পারে। এরপর তৃতীয় তালাকের বিধান উভয় ধরণের তালাকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ তৃতীয় তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না।[৩০৬] এখানে জোর পূর্বক 'তালাক' আদায় করা যথারীতি নিষিদ্ধ।

৩০২। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩১

৩০৩। 'তালাক' অথবা মুত্যুজনিত কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর যে সময় সীমার মধ্যে কোন নারী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না তাকে 'ইদ্দত বলে।

৩০৪। শায়খ আহমদ মোল্লাজিউন, *তাফসীর আল আহমদিয়া*, বোম্বে: ভারত-১৩২৭ হিঃ পৃ.১২৪

৩০৫। 'খুলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ খুলে ফেলা, ছিন্ন করা। পরিভাষায়, স্ত্রীর নিকট থেকে অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। পবিত্র কুর'আনের বাণী- فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তাহারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পাইতে চাহিলে তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। (আল-কুর'আন- ২ঃ২২৯)

৩০৬। আল্লামা মোল্লাজিউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

এরপর চতুর্থ আয়াতে দুইয়ের অধিক বার 'তালাক' দেয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুবিধা হ'তে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ বন্ধ করার জন্য আরো বিধান দেয়া হয়েছে। যা দ্বারা পরিস্কারভাবে ফিরিয়ে নেয়ার বাহানায় তাকে বিরক্ত করে তার নিকট থেকে অর্থ-সম্পদ আদায়ের নিকৃষ্ট প্রথা প্রতিরোধ করা হয়েছে। এখানে পারস্পরিক সমঝোতার সুযোগে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে নিজের নিকট রেখে এবং তার জীবন অতিষ্ট করে তুলে নিজেকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত করে নিতে বাধ্য করতে স্বামীকে নিষেধ করা হয়েছে। তালাকের অন্যান্য বিধান সম্পর্কীয় আল-কুর'আনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য আয়াত হলো ঃ

يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة- واتقوا الله ربكم- لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة- وتلك حدود الله ومن يتعد حدودالله فقد ظلم نفسه- لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا-

"হে নবী! তোমরা যখন তোমাদিগের স্ত্রীগণকে 'তালাক' দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগের 'তালাক' দিও 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ইদ্দতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করিও; তোমরা উহাদিগকে বাসগৃহ হইতে বহিস্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না উহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লিলতায়; এইগুলি আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ ইহার উপর কোন উপায় করিয়া দিবেন । (অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর মত পরিবর্তন হইবে এবং সে তাহাকে ফিরাইয়া লইবে।)"[৩০৭]

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله- ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا-

"উহাদিগের 'ইদ্দত' পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও । ইহা দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যে-কেহ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; যে-কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাহার পথ করিয়া দিবেন।"[৩০৮]

والتى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر والتى لم يحضن اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن- ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا-

তোমাদিগের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদিগের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদিগের 'ইদ্দতকাল' হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজ:স্বলা হয় নাই তাহাদিগেরও এবং গর্ভবতী নারীদিগের 'ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন!"[৩০৯]

৩০৭। আল-কুর'আন, ৬৫ঃ১

৩০৮। আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ২

৩০৯। আল-কুর'আন, ৬৫ঃ ৪

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عيهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف- وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

"তোমরা তোমাদিগের সামর্থ অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর তাহাদিগকে সেই স্থানে বাস করিতে দিও; তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিওনা সংকটে ফেলিবার জন্য; তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিবে, যদি তাহারা তোমাদিগের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ করিবে; তোমরা যদি নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।"[৩১০]

উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশে 'তালাক' প্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তানকে স্তন্য দানকালীন সময়ের বিধান বর্ণিত হয়েছে। অত্র আয়াতে 'তালাক' দাতা স্বামীর উপর কতিপয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যা 'ইদ্দতকালীন 'তালাক' প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পর্যন্ত এসেই তালাকের সেই বিধানের বর্ণনা শেষ ও পরিপূর্ণ হয়েছে যাতে পুরুষগণ কর্তৃক নারীদের উপর অবৈধ চাপ প্রয়োগ করে অর্থ-সম্পদ আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে 'তালাক' সম্পর্কিত আরও কয়েকটি আয়াত উপস্থাপিত হল। যেমন ঃ

ياايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا-

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে 'তালাক' দিলে তোমাদিগের জন্য তাহাদিগের পালনীয় কোন 'ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে বিদায় করিবে।"[৩১১]

لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوالهن فريضة- ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره- متاعا بالمعروف حقا على المحسنين-

'যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ এবং তাহাদের জন্য মাহর ধার্য করিয়াছে, তাহাদিগকে 'তালাক' দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই । তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও । বিত্তবান তাহার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তাহার সামর্থানুযায়ী বিধিমত খরচ পত্রের ব্যবস্থা করিবে, ইহা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।"[৩১২]

৩১০। আল-কুর'আন, ৬৫: ৬
৩১১। আল-কুর'আন, ৩৩: ৪৯
৩১২। আল-কুর'আন, ২:২৩৬

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم الا ان بعفون او يعفوا الذى بيده عقدة النكاح- وان تعفوا اقرب للتقوى – ولا تنسوا الفضل بينكم – ان الله بما تعملون بصير-

"তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে 'তালাক' দাও, অথচ মাহর ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাকওয়ার নিকটতর । তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃতি হইও না । তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।"[৩১৩]

'তালাক' প্রসঙ্গটি আল-কুর'আনে যেমন বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে, তেমনিভাবে হাদীস শরীফেও সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এমনকি কতিপয় হাদীস রয়েছে যাতে তালাকের আরো কিছু অধিক বিধান বর্ণিত হয়েছে। আবার কতিপয় এমন হাদীসও হয়েছে যাতে তালাকের ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে যা বিবেচনার দাবী রাখে। যেমন বলা হয়েছে, ابغض الحلال الى الله الطلاق "হালাল জিনিসসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হল 'তলাক'।"[৩১৪]

"সতীনকে 'তালাক' দেয়ার জন্য স্বামীকে বাদ্য করার অধিকার কোন স্ত্রীর নাই।"[৩১৫]

"যে নারী পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে স্বামীর নিকট 'তালাক' দাবী করে আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দিবেন।"[৩১৬]

কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে (ঋতুস্রাব) অবস্থায় 'তালা' দিলে তা ফিরিয়ে নেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক এবং এরপর যদি 'তালাক' দিতে হয় তবে সুন্নাত অনুযায়ী 'তালাক' দিবে।

একসাথে তিন তালাক প্রসঙ্গ

আমাদের সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ তালাকের উদ্দেশ্য ও নিয়মাদি সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকেফহাল নয়। তাই কেউ কেউ এই তালাককে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করছে। তার রাগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে একসাথেই তিন তালাক দিয়ে বসে। অথচ একসাথে তিন তালাক দেয়া যে কুর'আন-হাদীসের বরখেলাফ ও শরী'আত সম্মত নয়, এটা তারা বুঝতে চায়না। তাছাড়া দেশে সুষ্ঠু মুসলিম পারিবারিক আইন না থাকায় আমাদের পারিবারিক জীবনে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়, বিশেষ করে একসাথে তিন তালাককে নিয়ে। তাই ব্যাপারটি বিশদ আলোচনার দাবী রাখে।

৩১৩। আল-কুর'আন, ২ ঃ২৩৭

৩১৪। ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, কিতাবুত-তালাক' তৃতীয় পরিচ্ছেদ, হদীস নং-২০১৮। সুনান ইবনে মাযাহ, 'তালাক' অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, হাদীস নং-২৯৭৭

৩১৫। ইমাম তিরমিযি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২

৩১৬। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী, *জামিউল বায়ান ফি তাফসীরিল কুর'আন (তাফসিরে তাবারী)*, ২য় খণ্ড, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন-১৯৭৮, পৃ. ২৬৬

এসাথে তিন তালাক প্রদান কুর'আন হাদীসে বর্ণিত তালাক প্রদান পদ্ধতি-সম্মত নয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন- الطلاق مرتن "অর্থাৎ তালাক দুইবার দেয়।"[৩১৭] এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশ দ্বারা আরবের জাহিলী যুগে প্রচলিত এক বিরাট সামাজিক ক্রটির সংশোধন করা হয়েছে। তৎকালীন আরবে এক এক ব্যক্তি স্ত্রীকে সীমা সংখ্যাহীনভাবে যতখুশি তালাক দিত। উক্ত আয়াত অনুসারে এক ব্যক্তি স্ত্রীকে খুব বেশী হলে মাত্র দু'বারই তালাক (যাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়) দিতে পারবে।

কুর'আন ও হাদীস হ'তে তালাক দেয়ার যে সঠিক পন্থা জানা যায়, তা হচ্ছে স্ত্রীকে তহুরের (পবিত্র) অবস্থায় এক 'তালাক' দিবে। স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য যদি ঋতুকালীন অবস্থায় ঘটে, তবে তক্ষুনি তালাক দেয়া কিছুতেই ঠিক হবে না, বরং তার এ অবস্থা অতীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে এক তালাক দেয়ার পর ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় তহুরে দ্বিতীয়বার এক তালাক দিতে পারবে। এমতাবস্থায় 'ইদ্দত অতীত হলে পুনরায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকে। অতঃপর স্বামী যদি ঐ স্ত্রীকে নিয়ে সংসার না কারতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে থাকে। তবে তা কুর'আন বিঘোষিত পদ্ধতিতে তৃতীয় তহুরে এসে তাকে বিদায়ের ব্যবস্থা করবে। যেমন পত্রি কুরআনে বলা হয়েছে-

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

বর্তমান সময়ে মূর্খ লোকেরা যেরূপ একই সময়ে তিন তালাক দিয়ে বসে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত কঠিন পাপের কাজ।[৩১৮] নবী করীম (সা.) এভাবে তালাক দেয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

عن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله عز وجل والا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله-

"হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম (সা.) এর নিকট এক ব্যক্তির স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক প্রদানের সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে কি আল্লাহর কিতাবের সাথে খেলা করছে? অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হুযুর! তাকে কতল করে ফেলব না-কি?"[৩১৯]

"আল্লাহর কিতাবের সাথে খেলা করা" অর্থাৎ কুর'আনে দু'তালাকের কথা বলা হয়েছে আর শরী'আতের বিধঅনও হচ্ছে একসাথে তিন তালাক না দেয়া, অথচ তোমরা তিন তালাক দিচ্ছ। ইসলামে একসাথে তিন তালাক দেয়া অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩১৭। আল-কুর'আন, ২: ২২৯

৩১৮। আল-কুর'আন, ২:২২৯

৩১৯। আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ, আসসুনান আন নাসাঈ, কানপুর, ভারত-১২৯৯ হিঃ, কিতাবুত তালাক, খ. ৬, পৃ. ১৪২

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একই সময় তিন তালাক দাতা ব্যক্তিকে তিনি চাবুক মেরে কঠিন শাস্তি দিতেন।[৩২০] কাজেই উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। এরূপে তালাক দেয়া হ'তে সকলকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে।

তাহলীল (হালালাহ্) প্রসঙ্গ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি শরী'আতের বিধান মুতাবিক পুরোপুরি তালাক সংঘটিত হয়ে যায় এবং পরস্পর পরস্পরের জন্য হারাম হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে পুনরায় মিলিত হওয়ার একটি মাত্র উপায়ই শরী'আত উন্মুক্ত রেখেছে। তা হচ্ছেঃ

حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان تقيما حدود الله-

"যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে। অতঃপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না।"[৩২১]

অর্থাৎ সে স্ত্রীলোকটির অপর স্বামীর সাথে বিয়ে হতে হবে এবং দ্বিতীয় বিবাহকারী স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করতে হবে । তারপর যদি কোন কারণে দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবেই এমন বিরল ক্ষেত্রে তার পক্ষে প্রথম স্বামীর নিকট যাওয়ার ও পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হবে।

কিন্তু বর্তমান সমাজে দেখা যায়, কেউ কেউ তার স্ত্রীকে রাগের বশবর্তী হয়ে একসঙ্গেই তিন তালাক দিয়ে দিল, পরে অনুতাপ জাগল, ঘর-সংসারের বিধ্বস্ত রূপ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং এ উদ্দেশ্যে তার এমন উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করে যে কিছু বিনিময় গ্রহণ পূর্বক এ তালাক প্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করে এবং কথা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের পর আবার তাকে তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর পূর্বের স্বামী তাকে আবার বিয়ে করে।

এ রীতি কুর'আনের পুর্বোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত নয়; এমনকি কোন হাদীস থেকেও এর প্রমাণ মিলেনা। এহচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া, নিজেদের প্রয়োজনে আবিস্কৃত ও উদ্ভাবিত এক জঘন্য পন্থা। এরূপ বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু অপর একজনের জন্য স্ত্রী লোকটিকে হালাল করে দেয়ার বাহানা করা-স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন-যাপন এ বিয়ের উদ্দেশ্য নয় । ইসলামে কখনোই এমন মনগড়া, কুরুচিপূর্ন হালালাহর প্রচলন ছিল না, আজও নেই। এটা একটি সামাজিক অনাচার। এরূপ কাজ কুর'আন-হাদীস সমর্থিত হতে পারেনা, হতে পারেনা ইসলামের উপস্থাপিত বিধান।

৩২১। আল-কুর'আন, ২ঃ ২৩০

হাদীসের ভাষায় এরূপ বিয়েকারীকে বলা হয় محلل আর যার জন্য করে তাকে বলা হয় محلل له । মহানবী (সা.) এমন ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له –

"যে লোক এভাবে হালালকারী হয় এবং যার জন্য হালাল করা হয়-এ উভয়ের উপরই নবী করীম (সা.) লা'নত করেছেন।[৩২২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "নবী করীম (সা.) কে হালালকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, না এরূপ বিয়ে করা যাবেনা। বিয়ে হবে শুধু তা-ই যা অনুষ্ঠিত হবে পারস্পরিক আগ্রহে, যাতে কোনরূপ ধোঁকাবাজি থাকবে না, যা করলে আল্লাহর কিতবের সাথে কোনরূপ ঠাট্টা, বিদ্রুপপূর্ণ আচরণ হবে না।[৩২৩]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বুঝা যায়, তাহলীল বা হালালাহর আশ্রয় নেয়া একটি বিভৎস পন্থা। আমাদের উচিত 'তালাক'এর ব্যাপারে কুর'আন ও হাদীসের গন্ডির বাইরে না যাওয়া এবং তাহলীল বা হালালাহর ন্যায় জঘন্য অনাচারকে সমর্থন না করা।

অবশ্য এজন্য প্রয়োজন দেশে সুষ্ঠু মুসলিম পারিবারিক আইন চালু করা যাতে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পারিবারিক আইন সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাহলেই আমাদের পারিবারিক জীবনে উত্থিত নানাবিধ সমস্যা ও অশান্তি দূরীভূত হতে পারে।

৩২২। উদ্ধৃতঃ মাওঃ মাহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪-৪১৫

৩২৩। سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل قال لا- الانكاح رغبة لادلسة ولااستهزا بكتاب الله عزوجل- প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে মানব সমাজে মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, মান-মর্যাদা, তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-কৃষ্টি, বিবেক-বুদ্ধি, পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সাহায্য -সহযোগিতা ও সহানুভূতি ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্যের লালন ও বিকাশ একান্ত আবশ্যক। সভ্যতার অস্তিত্বের জন্যে অপরিহার্য গুণাবলীর বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র হচ্ছে সুশৃঙখল, বৈধ ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক সূত্রে গাঁথা পূত-পবিত্র পারিবারিক জীবন। এ পবিত্র দাম্পত্য পারিবারিক জীবন মানুষের কুরিপু, পশুবৃত্তি, উচ্ছৃঙখলতা, অধিকার হরণ, মানবেতর জীবন যাপন প্রভৃতি পশুচরিত্রকে শুধু দমনই করে না, বরং মানব জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত, সুশৃঙখল, কল্যাণমুখী এবং পূত-পবিত্র করতে সহায়তা করে। অপর দিকে নারী পুরুষের অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা মানুষকে পশুত্ব ও মানবেতর জীবনের অতল অঞ্চকারের আবর্তে ও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। ফলে গোটা মানব সমাজে যে মারাত্মক কুফল নেমে আসবে, তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না।[১]

মানব শিশু অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহন করে। পরিবারের অত্যন্ত মায়া-মমতা ও স্নেহ-যত্নে সে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি লাভ করে। পারিবারিক দৃঢ়বন্ধন ও লালন-পালন ছাড়া তার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্ভব নয়। মাতা-পিতা সন্তানের শুধু লালন-পালনই করেন না, তাদের লেখা-পড়া শিক্ষা সংস্কৃতি, আদব কায়দা ও জীবনে প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

পরিবার হলো শান্তি-সুখের আশ্রয় স্থল ঃ

শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই হচ্ছে মানব জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য, মানব মনের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা। এদিক দিয়ে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসী, এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সিংহাসনারুঢ় বাদশাহ আর ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দীনাতিদীন কুলি-মজুর সমানভাবে দিন-রাত এ উদ্দেশ্যেই কর্ম নিরত হয়ে রয়েছে। ব্যস্ত কর্মপ্রেরণার এ হচ্ছে উৎসমূল। এ জিনিস কেউ সত্যিই লাভ করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে, সে জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছে। সমাজের নারী এ সম্পদ লাভ করতে পারে একমাত্র পুরুষের নিকট থেকে, আর পুরুষ তা পেতে পারে কেবলমাত্র নারীর নিকট থেকে। দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বন্ধুত্ব-ভালবাসা, দুই সঙ্গীর সাহচার্য, দুই পথিকের মতৈক্য, দুই জাতিরবন্ধন, ব্যক্তির মনে তার মতবাদ-বিশ্বাসের প্রতি প্রেম, পেশা ও শিল্পের মনোযোগিতা প্রভৃতি– যে সব জিনিস জীবন সংগঠনের জন্যে অত্যন্ত জরুরী এর কোনটি মানুষকে সে শান্তি, সুখ ও বিবিড়তা-নিরবচ্ছিন্নতা দান করতে পারে না, যা লাভ করে নারী পুরুষের কাছ থেকে এবং পুরুষ নারীর নিকট থেকে।

১। এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, *পারিবারিব জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: হাসান বুক হাউজ. ১৯৯৮, পৃ.৮৬

এজন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক অতীব গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণ চুম্বকের চাইতেও তীব্র। প্রত্যেক নারীর মধ্যে পুরুষের জন্যে অপরিসীম ভালবাসা ও আবেগ উদ্বেলিত প্রেম-প্রীতির অফুরন্ত নিঞ্চিত হয়ে আছে। তেমনি আছে প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে স্ত্রীর জন্যে। এ এমন এক মহামূল্য নেয়ামত, যার তুলনা এ বিশ্ব প্রকৃতির বুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দুনিয়া এক বিরাট-বিশাল কর্মক্ষেত্র, এখানে বসবাসের জন্যে গতি, কর্মোদ্যম ও তৎপরতা-একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দ লাভ করে, কখনো হয় দুঃখ-ব্যথা বেদনার সম্মুখীন। আর মানুষ যেহেতু অতি সূক্ষ্ম ও অনুভূতিসম্পন্ন। সেজন্যে আনন্দ কিংবা দুঃখ তাকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত করে। ফলে তার প্রয়োজন হচ্ছে সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী ও সাথীর। আর এ ক্ষেত্রে নারীই হতে পারে পুরুষের সত্যিকার দরদী বন্ধু ও খাঁটি জীবন-সঙ্গিনী। আর পুরুষ হতে পারে নারীর প্রকৃত সহযাত্রী, একান্ত নির্ভরযোগ্য ও পরম সান্তনা বিধায়ক আশ্রয়।[২] আর এখানেই মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার রহস্যাবৃত। এ মর্মে আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা তাদের কাছে পরম শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া অনুকম্পাও জাগিয়ে দিয়েছে।"[৩]

মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখের আবর্তন সব সময়ই ঘটে থাকে। ফলে তার প্রয়োজন এক সঙ্গী ও সাথীর, যে সব রকমের অবস্থায়ই তার সহচর হয়ে থাকবে ছায়ার মত এবং অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে করবে সব দায়িত্ব পালন।[৪] মানুষের জীবনব্যাপী সংগ্রাম অভিযানের ক্ষেত্রে এ এক স্থায়ী, মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণের জন্যেই ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে স্থায়ী বন্ধন স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। আজীবন এ বন্ধনের সুযোগেই নারী ও পুরুষের জীবন সার্থক হতে পারে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে কার্যকর। এ বন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার সংযোগে এ উদ্দেশ্য লাভ করা সম্ভব নয়।[৫]

২। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

৩। আল-কুরআন, ৩০:২১

৪। এক আরব কবি এ কারণেই বলেছেন:

لا يسئلون اخاهم حين يندبهم- فى النائبات على ما قال برهانا وقربت بالقربى وجدّك انى- متى يك امر
للنكيئة اسّهد وان ادع للجلى اكن من حماتك- وان يأتيك لاعداء بالجهد اجهد

"বিপদ-মুসিবতে তার ভাই যখন ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে, আওয়াজ তোলে, তখন সে তার এ কাজের কোন যুক্তি খুঁজে বেড়ায় না। আমি নিকট অত্মীয়তার হক আদায় করেছি, তোমার ভাগ্যের শপথ যখন কোন বিপদের ব্যাপার ঘটবে, তখন আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব। কোন কঠিন বিপদকালে আমাকে ডাকা হলে আমি তোমার মর্যাদা রক্ষাকারীদের মধ্যে থাকব, শত্রু তোমার ওপর হামলা করলে আমি তোমার পক্ষে প্রতিরোধ করব।"

৫। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, প্র.৩৭

ইসলামী পরিবার সুরক্ষিত প্রাকার

ইসলাম পরিবারকে সুরক্ষিত দূর্গের সাথে তুলনা করেছে। পারিবারিক জীবনযাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে 'দূর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত (محصنين)[৬] লোকগণ। দূর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য, তার ভিতরে জীবনযাত্রা সে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত, পরিবারের নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ে নৈতিকতা বিরোধী ও অসৎ-অশ্লীল জীবনের হাতছানি বা আক্রমন থেকে তেমনিই সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। বস্তুত পরিবারস্থ ছেলে-মেয়ের পক্ষে পিতা-মাতা ভাইবোনের তীব্র শাসন ও নিকটত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না।[৭]

পারিবারিক জীবনের এই দূর্গপ্রাকার রক্ষা করা ইসলামের দুষ্টিতে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত তার প্রমাণ বহন করে ঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا - رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

"তোমার আল্লাহ চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাঁদের একজন কিংবা দুজনই যদি বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত থাকে, তবে তাদের জন্যে কোন কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক কথা বল না, তাদের ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের জন্যে সম্মানজনক কথাই বলবে। তোমার দুই বাহু তাদের খেদমতে অপরিসীম বিনয় ও দয়া-মায়া সহকারে বিছিয়ে দাও এবং তাদের জন্যে সব সময় এই বলে দো'আ করতে থাকো: হে আল্লাহ পরোয়ারদেগার; তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেমন করে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন আমার ছোট্ট শিশু অবস্থায়। তোমাদের আল্লাহ ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন তোমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে। তোমরা যদি বাস্তবিকই নেককার হতে চাও, তাহলে আল্লাহ তাওবাকারী ও আশ্রয় ভিক্ষাকারীদের জন্যে সব সময়ই ক্ষমাশীল রয়েছেন।"[৮]

৬। 'আল্লামা রাগেব ইসফাহানী কুর'আনে উদ্ধৃত حصن শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: কারো সম্পর্কে تحصن বলা হয় তখন اذا اتخذ الحصن مسكنا 'যখন সে দূর্গকে বসবাসের স্থানরূপে গ্রহন করে।' المفردات পৃ.১৩
'আল্লামা শাওকানী কুর'আনে বিবাহিতা মহিলাকে এ কারণেই বলা হয় حصان অর্থাৎ পরিবারের দূর্গস্থিত সুরক্ষিত মহিলাগণ। المراد من المحصنات هنادوات الازواج এখানে 'মুহসানাত' মানে বিবাহিতাগণ। স্বামীসম্পন্না স্ত্রীলোক; এমন মেয়েলোক যাদের স্বামী রয়েছে। এজন্যে যে, لانهن احصنّ فروجهنّ من ازواجهنّ 'তারা তাদের যৌন অঙ্গকে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে'। (ফতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৪১৩)
'আল্লামা আলূসী লিখেছেন: المراد بهنّ على المشهور ذوات الازواج احصهن التزوج او الازواج اولياء اى منعهن عن الوقوع فى الاثم 'মুহসানাত মানে স্বামীসম্পন্না মেয়েলোক, বিয়ে কিংবা স্বামী অথবা অলী অভিভাবক তাদের গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।(রুহুল মা'আনী, খ. ৫, পৃ.১)

৭। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

৮। আল-কুর'আন, ১৭:২৩-২৫

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলার দেয়া জীবন-ব্যবস্থায় আকীদার দিক দিয়ে প্রথম ভিত্তি তাওহীদ–আল্লাহর একত্ব; এবং সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে প্রথম ইউনিট হচ্ছে পরিবার। আর এ পরিবার গড়ে ওঠে পিতা-মাতার দ্বারা। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হয় একটি পরিবারের ভিত্তি-প্রস্তর, এ আয়াতগুলোর বিশেষ বর্ণনাভঙ্গী ও পরস্পরা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের মূল লক্ষ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব ও তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বাস্তবায়িত করা, তার জন্যে পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবন-যাপন না করলে এক আল্লাহর বন্দেগী কবুল হওয়া ও তদানুরূপে বাস্তব জীবনধারা পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত পারিবারিক জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ ও শান্তিপুর্ণ করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে সদা প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে থাকা। সন্তান-সন্ততি যদি পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে প্রস্তুত না হয়, বিশেষ করে তাদের কর্তব্য ও অক্ষমতা, অসহায় অবস্থায়ও যদি তাদের বোঝা বহনকারী পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়দাতা ও প্রয়োজন পূরণকারী হয়ে না দাঁড়ায় বরং যৌবনের শক্তি-সামর্থের অহমিকায় অন্ধ হয়ে তারা পিতামাতার প্রতি কোনরূপ খারাপ ব্যাবহার করে, জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তাদের খেদমত না করে তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতাসূচক ব্যাবহার না করে, যদি তাদের প্রতি অপরসীম শ্রদ্ধাভক্তি ও অন্তরের অকৃত্রিম দরদ পোষণ না করে, তাহলে সে অবস্থা পিতা-মাতার পক্ষে চরম দুঃখ অপমান ও লাঞ্ছনার হয়ে দাঁড়ায়। তার পরিবার ও পারিবারিক জীবনের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে জাগে চিরন্তন অশ্রদ্ধা। এরপর অপর কোন পুরুষ ও স্ত্রী পারিবারিক জীবন-যাপনে তথা সন্তান জন্মদান করে পিতা-মাতা হতে এবং সন্তানের জন্যে অকান্ত পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্ট স্বীকার করতে আর কেউ রাজি নাও হতে পারে। তাহলে আল্লাহর একত্ববাদের কস্তব রূপায়ণের প্রথম ভিত্তি এবং ইসলামী সমাজ জীবনের প্রথম ঐকিক পরিবার গড়ে উঠতে পারবে না। আর তাই যদি না হয় তাহলে সেটা যে বড় মারাত্মক অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের এ অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই সেইসব বিধি-ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে দেয়া হয়েছে, যার ফলে পরিবার দৃঢ়মূল হতে পারে, হতে পারে সুখ-শান্তি ও মাধুর্যপূর্ণ এবং সেসব কাজ ও ব্যাপার ব্যবহারকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যা পরিবারকে ধ্বংস করে, পারিবারিক জীবনকে তিক্ত ও বিষময় করে তোলে।[৯]

পারিবারিক জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য মানব বংশের সম্প্রসারণ

পারিবারিক জীবন-যাপনের লক্ষ্য নারী-পুরুষের যৌন জীবনে পরম শান্তি, পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা, উভয়ের মনের স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ। তবে এটাই চুড়ান্ত নয়; বরং বংশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সদ্যজাত শিশু সন্তানদের আশ্রয় দান, তাদের যথাযথ লালন-পালন দাম্পত্য জীবনের চরম ও বৃহত্তম লক্ষ্য।

৯। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, প্র.৭৯-৮০

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারিক জীবন ছাড়াও সন্তান হতে পারে। কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন-পালন এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ব্যতীত অদৌ সম্ভব নয়। আল-কুর'আনের একাধিক আয়াতের স্পষ্ট বিবরণে বুঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত পারিবারিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান মানব বংশ সম্প্রসারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন।"[১০]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, পারিবারিক জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়া। যারা নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির ভিত্তিতে আল্লাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত তাদেরকে ব্যবহার কর এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রচনার জন্য সন্তান গ্রহন কর।"[১১]

পূত-পবিত্র জীবন যাপন

পারিবারিক দাম্পত্য জীবন-যাপন নারী পুরুষকে কুপ্রবৃত্তি, পশুবৃত্তি, উশৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও মানবেতর পাশবিক জীবন যাপন থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজীদে বলেন ঃ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) ভূষণ।"[১২] পোশাক যেমন মানুষকে ঠান্ডা, গরম, ধূলা-ময়লা থেকে রক্ষা করে, মানুষের সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করে, তেমনি স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের মান মর্যাদা ও চরিত্রমাধুর্য রক্ষা করে। পাপ-পঙ্কিলতা থেকেও মানুষের জীবন পূত-পবিত্র রাখে, বল্গাহীন পাশবিক জীবন-যাপন থেকে বিরত রাখে। পারিবারিক জীবনকে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের রক্ষাকবচ বলা হয়।[১৩]

১০। আল-কুর'আন, ৪:১

১১। আল-কুর'আন, ১:২২৩

১২। আল-কুর'আন, ২:১৮৭

১৩। এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো পবিত্র যৌন জীবন যাপন। বিয়ের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যই হলো পবিত্র যৌন জীবন পরিচালনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"তোমাদের জন্য হালাল করা হল সতী-সাধ্বী মু'মিনা নারীদেরকে এবং তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবদের সতী-সাধ্বী নারীদেরকে, যখন তোমরা তাদের প্রাপ্য (মোহর) প্রদান কর এবং তোমরা না কর প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রনয়।"[১৪]

দাম্পত্য জীবনে যৌন স্বাদ-আস্বাদনের ব্যাপারে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ গ্রহন কর সেজন্য তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহর) প্রদান কর যা অবশ্য দেয় (ফরজ)।"[১৫]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, বিয়ের মাধ্যমে একদিকে সকল প্রকার যৌন অনাচার (প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য) বন্ধ। অপর দিকে বিবাহিত সম্পতিকে যৌন সম্ভোগের অবাধ সুযোগ প্রদান করা হয়। এ জন্য ইসলাম অবৈধ যৌন অনাচারের তা যে প্রকারের হোক না কেন হস্তমৈথুন বা অন্যান্য কৃত্রিম উপায়ে বীর্যপাত বা যৌন স্বাদ গ্রহন, পুরুষে পুরুষে বা নারীতে-নারীতে যৌন ক্রিয়া, পশুমৈথুন বা অবিবাহিত নারী পুরুষে যৌন ইত্যাদি সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যৌন অনাচার হারাম করে দেয় তার জন্য শাস্তির বিধান করেছে। আল-কুর'আনে মু'মিনের যৌন জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"ঐসব মু'মিনগণ সফলকাম যারা তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তবে তাদের স্ত্রীদের ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। এর বাইরে যারা কাম চরিতার্থ করতে প্রয়াসী তারাই সীমা লংঘনকারী।"[১৬]

১৪। আল-কুর'আন, ৪:৫

১৫। আল-কুর'আন, ৩:২৪

১৬। আল-কুর'আন, ২৩:৫-৬

বর্তমান সময়ে যেহেতু দাসী-বাদীর প্রচলন আর নেই তাই কেবল মাত্র বিবাহিত স্ত্রীদেরকে নিয়েই পুরুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর নারীদেরও সন্তুষ্ট থাকতে হবে কেবলমাত্র স্বামীদেরকে

নিয়েই। যৌন ব্যাপারে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহন করা যাবে না। তাই দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারী-পুরুষের যৌন স্বাদ গ্রহন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাও মানুষের মধ্যে অদ্যম আবেগ, অবাধ যৌন প্রবণতা ও সীমাহীন সুযোগ প্রদান করেছেন। মানুষের জন্য পশুর মত কোন মৌসুমের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই কোন বিশেষ সময়ের। যৌন ক্রিয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য যদিও বংশধারা অব্যাহত রাখা; কিন্তু এতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে সীমাবদ্ধ করেন নি। গর্ভধারণের পরও এ ক্রিয়া চলতে থাকে, এমনকি কোন নারীর সন্তান হওয়ার সময়কাল অতীত হয়ে গেলেও এ কাজের আবেগ উচ্ছ্বাস অব্যাহত থাকে।[১৭]

দাম্পত্য জীবনে পবিত্র যৌন জীবন-যাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

"জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করার পর নবী (সা.) এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারি না বিধবা। আমি বললাম, না বরং বিধবা। তিনি বললেন, তুমি একটি কুমারীকে বিয়ে করলে না কেন? তা হলে তুমিও তার সাথে আমোদ-স্ফূর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ স্ফুর্তি করতে পারত।"[১৮]

"জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি স্ত্রীলোককে দেখে জয়নবের ঘরে প্রবেশ করেন এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করেন (সহবাস করেন)। অত:পর বাইরে এসে বলল: কোন স্ত্রী লোক সামনে এলে শয়তান বেশে আসে। অত:পর তোমাদের কেউ কোন স্ত্রী লোক দেখে তাকে ভাল লাগলে সে যেন নিজ স্ত্রীর নিকট যায়। কারণ, ঐ মহিলার যা আছে তার স্ত্রীরও তা আছে।"[১৯]

মোটকথা, বিয়ের মাধ্যমে অন্য সকল প্রকার যৌন সম্পর্কচ্ছেদ করে কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং এটাই দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন কাজ। এজন্যেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বামীর যৌন প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিতে স্ত্রীকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, স্ত্রী যদি চুলার কাজেও ব্যস্ত থাকে তবুও তাকে স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে হবে। তাই পবিত্র পারিবারিক জীবন দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১৭। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, ***মু'মিনের পারিবারিক জীবন***, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, পৃ.৮২

১৮। আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ, জামি'আত আত-তিরমিযী, দিল্লী: খ-২, হা.নং-১০৩৭

১৯। আবু 'ঈসা, (জামি'আত-তিরমিযী) প্রাগুক্ত, হা. নং-১০৯৬

মানবীয় গুণাবলীর লালনক্ষেত্র

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী পরিবার মানবীয় গুণাবলীর লালনক্ষেত্র। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, সমঝোতা, উদারতা, সহায়তা, সহাভূতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আদব-কায়দা, সাহায্য-সহযোগিতা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, তাহযীব ও তামাদ্দুন ইত্যাদি সৎ গুণাবলী যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি লালিত পালিত হয়। আর বৃহত্তর সমাজ সঠনে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এসব গুণ বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি পরিবারে স্নেহ-মমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং উদার মনোভাবের পরিচয় দেয়, সে বৃহত্তর সমাজেও এসব গুণের পরিচয় দেয়। যে সন্তান পিতা-মাতাকে সম্মান করতে শিখে সে সমাজের অন্যান্য গুরুজনকেও সম্মান করে। শিশু পরিবারে যেমন গড়ে ওঠে, বড় হলেও সেভাবেই আচার আচরণ করে। সুস্থ-সুন্দর পারিবারিক পরিমন্ডলে লালিত ও বর্ধিত শিশু কিশোরগণ বড় হয়ে একটি উদার মানবতাপূর্ন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২০]

পারিবারিক জীবন-যাপন প্রাকৃতিক দাবী

পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহুসংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে সমাজ। আর সমাজেরই বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হলো রাষ্ট্র। পরিবার প্রথার অবর্তমানে সমাজ টিকে থাকতে পারে না। নারীর প্রতি পুরুষের আর পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল ও তীব্র আকর্ষণ প্রকৃতিগত করে দেয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিলনই হলো তাদের প্রাকৃতিক দাবী। এ মিলন যদি হয় লাগামহীন পন্থায়, তবে সমাজ ও তমদ্দুনে ফিতনা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়াই অবধারিত। বস্তুত, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-পন্থা অনুযায়ী নারী পুরুষের সঠিক সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সমাজ ও সভ্যতার সুস্থতা ও নিরাপত্তা। আর তাদের উভয়ের মধ্যে খোদায়ী বিধি অনুযায়ী এ সম্পর্ক কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত তাতে সূচনা হয় তাদের পারিবারিক জীবনের। পারিবারিক জীবন ছাড়া মানুষের দাম্পত্য জীবন কোনো অবস্থাতেই সুখের হতে পারে না। স্বাচ্ছন্দের হতে পারে না। অতঃপর তাদের থেকে জন্ম নেয় তাদের সন্তান-সন্ততি। সন্তানের লালন-পালনের জন্যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সন্তানের সুশিক্ষার জন্যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পরিবারেই সন্তানের শারিরীক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। পরিবারের সকলেই মিলে মিশে থাকতে চায়। বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন প্রকৃতি বিরোধী। আর এজন্যেই মানুষের পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-প্রীতি মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিজাত নিয়ম। এসব শুভ মানুবিক গুণাবলীই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা দান করেছে। এ সব গুণাবলী সংরক্ষণের জন্যে যে পারিবারিক জীবন অপরিহার্য, তাতে সন্দেহ নেই।[২১]

২০। এ. বি. এম আবদুল আন্নান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

২১। আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

পবিত্র কুর'আনের নিম্মোক্ত আয়াতগুলো পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে ঃ

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم ازوجكم بنين وحفرة

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয়কে জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের জুড়িদের থেকে তোমাদের দান করেছেন অনেক পুত্র ও পৌত্র ।"[২২]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন।"[২৩]

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"তার মা তাকে অনেক কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে দারুণ কষ্টে আর গর্ভধারণ থেকে স্তন্যত্যাগ পর্যন্ত ত্রিশ মাস অতিবাহিত করেছে।"[২৪]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

"মানুষের জন্যে তাদের মনোপূত জিনিস নারী, সন্তান, সোনা রূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষিজমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে।"[২৫]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

"তিনি আল্লাহ যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"[২৬]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"প্রভূ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহের শীতলতা দাও। আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানাও।"[২৭]

২২। আল-কুর'আন, ১৬:২২
২৩। আল-কুর'আন, ৩০:২১
২৪। আল-কুর'আন, ৪৬:১৫
২৫। আল-কুর'আন, ৩:১৪
২৬। আল-কুর'আন, ২৫:৫৪
২৭। আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুনের আঘাত থেকে বাচাও।"[২৮]

পরিবার রীতি এবং পারিবারিক বন্ধন ছাড়া পবিত্র কুর'আনের এসব নির্দেশ ও দৃষ্টিভংগি কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারে না। তাছাড়া পারিবারিক বন্ধন ছাড়া এমন শান্তিময় জীবন লাভ করা সম্ভবই হতে পারে না।

মানব সভ্যতার লালন ক্ষেত্র

পারিবারিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইসলামী পরিবার মানব সভ্যতার লালন ক্ষেত্র। স্বামী স্ত্রীর প্রেম-প্রীতিময় পূত-পবিত্র পারিবারিক পরিবেশে শিশুর জন্ম হয় এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের হৃদয় নিংড়ানো আদর স্নেহ ও মায়া-মমতায় লালিত হয়ে বড় হয়। আদব-কায়দা শেখে। উন্নত শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে ওঠে। শিশুর প্রথম শিক্ষালয় হল পরিবার। পরিবারেই তার শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে। ভিত্তি ভাল হলে তার জীবনও সুন্দর হয়। পিতা-মাতা তথা পরিবারের সহায়তা না পেলে সে শিশু সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে না। উন্নত দেশগুলোতে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে তাদের সন্তান গুলো প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও পিতা-মাতার স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশ জীবন যাপন করছে। তারা বেশির ভাগই মাদকাসক্তির খপ্পরে পড়ছে। আমাদের দেশেও তথাকথিত প্রাশ্চাত্য সভ্যতার দূষিত হাওয়া এসে লাগতে শুরু করেছে। ফলে আমাদের দেশের তরুণ সমাজ বিপথে যাচ্ছে।[২৯]

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবারের কর্তাব্যক্তি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বিশেষত নারী ও সন্তানের খোরাক, পোশাক এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরিবারের কর্তার উপর অর্পিত হয়।

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"হে পুরুষেরা! জেনে রাখ যে, মেয়েদের খাওয়া ও পরার সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পিত।"[৩০]

পরিবারে মহিলা সদস্যদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাদের স্বামীদের উপর অর্পিত। মহান আল্লাহ কালামে পাকে ইরশাদ করেন ঃ

২৮। আল-কুর'আন, ৬৬:৬

২৯। এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

৩০। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ***সহীহ মুসলিম***, দেওবন্দ: ১ম খন্ড, কিতাবুল হজ্জ, খ.১, পৃ.৩৯৭

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

"তোমরা সামর্থানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর মহিলাদের জন্যেও তদ্রূপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও।"[৩১]

আর বৃদ্ধ পিতা-মাতার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে তার ছেলেরা। ছেলেদের বাল্যকালে পিতা তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করবে; অনুরূপভাবে পিতা-মাতা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়ে গেলে ছেলেরা তাদের খাওয়া পরার যোগান দিবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"(হে রাসূল)! আপনি বলেদিন: তোমরা যা কিছুই খরচ করবে, তা করবে পিতামাতার জন্যে, নিকট আত্নীয়দের জন্যে, ইয়াতীম, মিসকিন এবং সম্বলহীন পথিকদের জন্যে।"[৩২]

পরিবারের সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগার ও কল্যাণস্থল

মুসলিম পরিবারে সন্তানেরা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহর যেমন–ঈমান, আকা'ঈদ, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, শিরক, বিদ'আত, হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েয ইত্যাদি বিষয়গুলোর শিক্ষা পেয়ে থাকে। কুর'আন মজীদ দ্বীনের প্রধান উৎস হওয়ার কারণে পরিবারের তত্ত্বধানে ছেলে-মেয়েদেরকে বাল্যকালেই কুর'আন শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। পরিবারের সবাইকে কুর'আন শেখার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রাসূল (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন– خيركم من تعلم القران وعلمه

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে কুর'আন শিখে এবং অপরকে শিখায়।"[৩৩]

কুর'আন মজীদের পরেই যেহেতু রাসূল (সা.) এর হাদীস আমাদের দ্বীনের দ্বিতীয় উৎস এবং রাসূল (সা.) যেহেতু দীনী সকল আমল ইবাদতের নমুনা, সেহেতু তিনি কোন আমলটি কিভাবে করেছেন তা আমাদের জানা ও শেখা প্রয়োজন। আর তা সবই রয়েছে রাসূল (সা.) এর হাদীসে। হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ। এ হাদীস বা সুন্নাহ পারিবারিকভাবে চর্চা না হলে দ্বীনের সকল ও সঠিক পথে থাকা যায় না। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেছেন–

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।"[৩৪]

৩১। আল-কুর'আন, তালাক:৬৫:৬

৩২। আল-কুর'আন, ২:২১৫

৩৩। আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন জামেউত্ তিরমিযী, করাচী: আসাহহুল মাতাবী, কিতাবুল ইল্ম হা. নং-৩৩২

৩৪। মূল 'আরবী, تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب وسنة رسوله

পারিবারিক জীবনে পিতামাতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে পরকালিন জাহান্নামের থেকে বাঁচার জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহন করবে। কুর'আন মজীদে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Dhaka University Institutional Repository

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৩৫]

সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের ইসলামী শিক্ষা দান, ইসলামী আইন-কানুন পালনে আল্লাহকে ভয় ও রাসূলে করীম (সা.)-কে অনুসরণ করে চলার জন্যে অভ্যস্থ করে তোলাও পিতামাতারই কর্তব্য এটা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অতি বড় হক। সন্তানকে এই জ্ঞান ও অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে দেয়ার তুলনায় অধিক মূল্যবান কোনো দান এমন হতে পারে না যা তারা সন্তানকে দিয়ে যেতে পারে।

এজন্যেই নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما نحل والدا من نحل افضل من ادب حسن

"কোন পিতামাতা সন্তানকে উত্তম আদব কায়দা ও স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দান অপেক্ষা ভাল কোন দান দিতে পারে না।"[৩৬]

মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেছেন ঃ

"তোমাদের সন্তানদেরকে স্নেহ কর এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দাও।"[৩৭]

সন্তানকে যতদূত সম্ভব চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে তার নিজস্ব চেষ্টা সাধনা ও যত্নের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে চলবে না। মু'মিন লোকদের তো অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারের ন্যায় এক্ষেত্রেও আল্লাহর ওপরই নির্ভরতা স্থাপন করতে হয়। কুর'আন মজীদ পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের জন্যে আল্লাহর কাছে দো'আ করার উপদেশ এবং শিক্ষা দিয়েছেন। এ মর্মে আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আল্লাহ্ আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের দিক থেকে চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের নেতা বানাও।"[৩৮]

একটি পরিবার মুসলমান হওয়ার জন্যে ঈমান আনা যেমন প্রথম কাজ, তেমনি সাথে সাথে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সঠিকভাবে নামাযপড়া ও নিয়ম-কানুন শেখানো, নিয়মিত নামায পড়তে অভ্যস্থ করা। এ লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

৩৫। আল-কুর'আন, আত্ তাহরীম:-৬৬:৬
৩৬। আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩
৩৭। মূল 'আরবী: اكرموا اولادكم واحسنوا ادابهم
৩৮। আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"তোমার পরিবারের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও এবং তুমি নিজে তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক।"[৩৯]

ইসলামী পরিবার একটি পবিত্র সংস্থা

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস সূচক ধর্মীয় মতবাদ নয়, ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছাড়াও এর রয়েছে একটি সামাজিক চরিত্র এবং সম্পর্ক। সমাজের প্রাণকেন্দ্র হলো পরিবার। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধুমাত্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়; বরং একটি পবিত্র সংস্থা। পরিবারের সুখ-শান্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও এর রয়েছে একটি আইনগত ও সামাজিক দিক।

মানব জীবনের যৌন চাহিদা স্বামী-স্ত্রীর সাধ্যমে পরিপূর্ণ করা ছাড়া এর রয়েছে একটি সাংস্কৃতিক অবদান। সুসন্তান গড়ে তোলার জন্য পরিবার ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ক্ষেত্র বিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে নেই। পরিবারেই মুসলিম শিশু এবং বয়স্করা পেয়ে থাকেন ধর্মীয় প্রশিক্ষণ। নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ঠ ক্ষেত্র হলো পরিবার। সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। পরিবারে একজন আর একজনের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত হতে হয়। তা থেকে সৃষ্টি হয় সামাজিক আনুগত্য। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি দরদ এবং অনুভূতি ছাড়া আদম সন্তানের মানবিক শান্তি সৃষ্টি হতে পারে না। পরিবার ছাড়া জীবনের যাত্রা পথে থাকে না কোন নিরাপত্তা, সামাজিক, মানবিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ পরিবারেই সবচেয়ে বেশী পারস্পরিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

পরিবার ছাড়া একটি শিশুর পক্ষে সুসন্তান হিসেবে গড়ে ওঠা কষ্টকর। জীবন সায়াহ্নে যে সেবা ও সহানুভূতি মানুষের দরকার তা পরিবারের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পিতৃ-মাতৃহীন এবং সন্তানহীনদের নিরাপদ আশ্রয় অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে পরিবার। অসুস্থ্য ও বিকলাঙ্গরা পরিবারে যতটুকু প্রীতি-স্নেহ পেয়ে থাকে অন্যত্র ততটুকু পায়না।

ইসলামের পরিবার শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরিবারের পরিসর আরো ব্যাপক। নিকট আত্মীয়-স্বজনও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।[৪০]

৩৯। আল-কুর'আন, ২০:১৩২

৪০। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

পরিবার একটি স্থায়ী সংস্থা

পরিবার একটি বিশ্বজনীন, সর্বকালের ও সর্বদেশের জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। মানব ইতিহাসের অতি প্রাচীন কালেও এ পরিবারের অস্তিত্ব দেখা গেছে এবং মানুষ যদ্দিন এ ধরিত্রীর বুকে থাকবে, তদ্দিন পরিবার অবশ্য অবশ্যই টিকে থাকবে। কালের কুটিল গতি তাকে কিছুতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করত পারবে না। প্লেটো থেকে এইচ. জি. ওয়েলস পর্যন্ত দার্শনিকদের প্রস্তাব অনুযায়ী সন্তান-সন্ততিকে

বাপ-মা'র সংস্পর্শ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা যেতে পারে বটে কিন্তু এ পদ্ধতিতে সত্যিকার মানুষ তৈরীর জন্যে কোন সফল প্রচেষ্টা আজো সফল হতে দেখা যায় নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিবার হচ্ছে এক স্থায়ী ও অক্ষয় মানবীয় সংস্থা (Human institution) এবং এর এই সৃতিস্থাপকতার কারণ মানব প্রকৃতির গভীর সত্তায় নিহিত। অন্য কথায় পরিবার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যবর্তী কোন ক্ষণস্থায়ী যোগাযোগের ব্যাপার আদৌ নেই।[৪১]

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব

ঊনবিংশ শতাব্দিতে পাশ্চাত্য জগতের শিল্পবিপ্লব এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে যন্ত্রসভ্যতার পত্তন পরিবার ব্যাবস্থার স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করেছে। বস্তুত শিল্প বিপ্লব সাবেক পারিবারিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুতর ও ব্যাপক বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। তার ফলে পরিবারের চিরাচরিত বিন্যাস বিনষ্ট হয়েছে। যন্ত্রসভ্যতার সূত্রপাতের ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবন ধারায় এবং বিশেষত বাহ্যিক জীবনে বিভিন্ন সুখ-সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু শিল্প সভ্যতার এ ইতিবাচক ভূমিকার দিকটিই সব নয়। শিল্প সভ্যতার সঙ্গে মানবজাতির পরিবার প্রথার ভিত্তিতেও প্রবল আঘাত হেনেছে এবং তার ফলে মানব সমাজের পরিবার ব্যবস্থা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু পাশ্চত্য শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্র সভ্যতার পত্তন ও প্রসার সাবেক পারিবারিক সংগঠনকে শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছে। তার ফলে সাম্প্রতিকালের সংগঠন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে এবং সুবন্যাস্ত পারিবারিক ব্যবস্থা বহুলাংশে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতদসত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উজ্জ্বল। এ ক্ষেত্রে পরিবারের কার্যাবলী তথা সন্তান প্রজনন, সন্তান প্রতিপালন, কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা, সামাজিকীকরণ বিশ্লেষণ করলে পরিবারের গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। সমাজের অবক্ষয় রোধে পরিবারের কার্যাবলী প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক সভ্যতার ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও পরিবারের অবলুপ্তির কথা ভাবা অবাস্তব। নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, পরিবারই সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি।

৪১। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

১. জৈবিক কাজঃ যৌন আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি সাধন, সন্তান প্রতিপালন এবং একটি গৃহের ব্যবস্থা করা –এ গুলো হলো পরিবারের অপরিহার্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিকল্প মাধ্যমগুলো (যৌনাগার, শিশু সদন, টেস্টটিউব) সেই পরিমান পরিতৃপ্তি দেয় না। যা পরিবার থেকে পাওয়া যায়। মানব সমাজের সন্তান প্রজননের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। পরিবারই নিরবিচ্ছন্নভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। যেখানে টেস্টটিউব পর্যুদস্ত।

২. প্রতিপালন: নবজাতকের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব পরিবারকেই সম্পূর্ণরূপে গ্রহন করতে হয়। জন্মলাভের পরই মানব শিশু স্বাবলম্বী হয়ে উঠে না। ভূমিষ্ট হওয়ার পর অসহায় অবস্থা থেকে শিশু স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত সময়টা মোটামুটি দীর্ঘ। এ দীর্ঘ সময়টি ধরে শিশুর সুষ্ঠু সেবা-যত্ন ও লালন-পালনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং একমাত্র পরিবারেই সংস্থার বাইরে: যেমন–childcare center, Dag care center, Nursing home দ্বারা শিশুর লালন-পালন সার্থকভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। সেখানে শিশুর অযত্ন ও অবহেলা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।

আবার, এ পরিবারের মধ্যেই সন্তান লাভের পর স্বামী-স্ত্রীর কামবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয় প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা প্রভূতি সুকুমার বৃত্তিসমূহ। এভাবে পরিবারে সৃষ্টি হয় এক স্বর্গীয় সুষমা।

৩. কর্মনিযুক্তি ব্যবস্থা: সন্তান ধারণ এবং লালন-পালনের পর শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যৌবনে টেনে তোলার পর তার কর্মের দিগন্ত পরিবারের মধ্যে নিহিত হয়। পরিবারই তার আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা করে থাকে। মানুষ মাত্রই পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আশা করে। সকল পরিবারই তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করে। পরিবারের এ দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সামাজিকীকরণ: পরিবারের মাধ্যমেই শিশু বৃহত্তম সমাজে সামিল হয়। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু বিশেষ ধরণের আচার আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং বিশেষ এক চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়। বস্তুত বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়ে থাকে পরিবার। সমাজে বহু ও বিভিন্ন সংগঠন বিদ্যমান। কিন্তু অন্য যে কোন সামাজিক সংগঠনের তুলনায় পরিবারে সংগে শিশুর সম্পর্ক ও সংযোগ সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। এ প্রসঙ্গে সচ্‌দেব বলেছেন The child continuous to identify hims with the family forever. It the only group which is always there in the life of man. [৪২]

৪২। মোঃ গাউসুল আযম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮১-২৮২

পারিবারিক জীবনে সন্তানের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এ জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্যে সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ্‌র নিজস্ব দান বৈ কিছু নয়।"[৪৩]

আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর সাথে অন্তরের গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো, কেননা, প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতির প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে, আর ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মন থাকে বিরূপ। মনের এ আকর্ষণের কারণেই স্ত্রী-পুরুষের মাঝে এমন সম্পর্ক স্থাপিত ও কার্যকর হয়, যার ফলে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে, আর তাই হচ্ছে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য।[৪৪]

স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম ভালবাসা পরিণতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে পারিবারিক জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। এ মর্মে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন।"[৪৫]

ধন-মাল প্রাণ বাচাঁনোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।[৪৬]

দুনিয়ায় কত সহস্র মানুষ এমন রয়েছে, যাদের খাবারের কোন অভাব নেই, কিন্তু কে তা খাবে তার কোন লোক নেই। মানে, হাজার চেষ্টা সাধনা-কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারে নি। আবার কত অসংখ্য লোক এমন রয়েছে, যারা কামনা না করেও তারা বহু সংখ্যক সন্তানের জনক, কিন্তু তাদের কাছে খাবার কিছু নেই কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে এক বিশেষ পরীক্ষা, সন্দেহ নেই।[৪৭]

৪৩। আল-কুর'আন, ১৬:৭২

৪৪। আল্লামা শাওকানী, ***ফতহুল কাদীর,*** খ.৩, পৃ.১৭২ মূল আরবী:
المنعنى خلقلكم من جنسكم ازواجا لتستانسوا بها لان الجنس يابس الى جنسه ويتوحش من غير جنسه وبسبب هذه الانسية يقع بين الرجال والنساء ماهو سبب للنسل الذى هو مقصود بالزواج-

৪৫। আল-কুর'আন, ১৮:৪৬

৪৬। আল্লামা আলুসী, ***রুহুল মা'আনী,*** বৈরুত: দারুল কলম, খ.১১, পৃ.৯২ মূল আরবী: المال مباط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع-

৪৭। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২

কুর'আন মজীদ এ প্রেক্ষিতে বলেছে ঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা বিশেষ; আর কেবল মাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে বিরাট ফল।"[৪৮]

কুর'আনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وما اموالكم ولكم بالتى تقربكم عندنا زلفى الا من عمل صالحا فالنك لهم جزا الضعف بما عملوا وهم فى الغفرفات امنون ـ

"তোমাদের মাল তোমাদের আওলাদ-কোন কিছুই এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে, সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। আমার নিকটবর্তী ও আমার নিকট মর্যাদাবান হবে তো কেবল তারা যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্যেই আমলের দ্বিগুণ ফল রয়েছে এবং বেহেস্তের সুসজ্জিত কোঠায় তারাই অবস্থান করবে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা সহকারে।"[৪৯]

আয়াতদ্বয় পূর্বাপর পটভূমিসহ প্রমাণ করছে যে, যেমন করে ধনমাল আল্লাহর দেয়া আমানত, সন্তান-সন্ততিও অনুরূপভাবে আল্লাহর দান। প্রথমটা যেমন একটা পরীক্ষার বিষয়, এ দ্বিতীয়টিও একটি পরীক্ষার সামগ্রী। ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করলে কিংবা যথাযথভাবে ব্যয় না করলে যেমন আমানতের খিয়ানত হয়, সন্তান-সন্ততিকেও ভুল উদ্দেশ্যে ও অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে, বাতিল সমাজ ব্যবস্থার যোগ্য খাদেম হিসেবে তৈরী করলেও তেমনি আল্লাহর আমানতে খিয়ানত হবে।

সন্তান-সন্ততির উপর পরিবারের প্রভাব

পৃথিবীতে শিশুর প্রথম আশ্রয়স্থল হল পরিবার। তখন শিশু দেহ ও মন উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক অবস্থায় থাকে। শিশুর মনে বিভিন্ন পরিবারিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটে। এ সব ধ্যান-ধারণা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কার্যকরী প্রভাব ফেলে। মানব শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা সৃষ্টি ও কর্মক্ষমতা অর্জিত হয়।

শিশুর মধ্যে সামর্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। বিকশিত হয় মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলী। সৃষ্টি হয় সত্তা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও সহমর্মিতা এবং ত্যাগ ও সৌহার্দ্যবোধ।[৫০]

৪৮। আল-কুর'আন, ৮:২৮

৪৯। আল-কুর'আন, ৩৪:৩৬

৫০। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ***মানব সম্পদ উন্নয়ন: প্রেক্ষিত ইসলাম,*** ঢাকা: ইফাবা. ২০০৬, পৃ.১০

সন্তান জন্মগ্রহনের পর তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে সুসংবাদ প্রদান এবং আনন্দ প্রকাশ করাকে ইসলামে মুস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের পর মদীনায় মুহাজির সাহাবীদের প্রথম যে সন্তান হয়েছিল তার জন্মের পর মুহাজির সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ করেন।[৫১]

ইসলাম পরিবারকে নবজাতকের জন্যে কয়েকটি কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

কানে আযান ও ইকামাত বলা

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দেয়। হযরত আবূ রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে দেখেছি যে, হযরত ফাতিমা (রা.) এর গর্ভ থেকে হযরত হাসানের (রাঃ) জন্ম হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কানে নামাযের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন।[৫২]

তাহনীক নবজাতককে মিষ্টিমূখ করণ ঃ

নবজাতকের দ্বিতীয় করণীয় বা সুন্নাহ হল তাহনীক।[৫৩] খেজুর সহজলভ্য না হলে সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে যে কোন মিষ্টি দ্রব্য দ্বারা তাহনীক করা যায়। তাহনীক সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হচ্ছেঃ

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله عليه وسلم كان يوتى بالصبيان فيبرك عليهم وحنّكهم-

"হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে নবজাতক শিশুদের পেশ করা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দো'আ করতেন ও তাদের মিষ্টি মুখ করাতেন।[৫৪]

৫১। সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, *সিরাতুন্নবী, আযমগড়: দায়েরাতুল মা'আরিফ,* ১৯৫১, খ.১, পৃ.২৯৮

৫২। আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা' প্রাগুক্ত, জামিউত্ তিরমিযী, খন্ড.১ম পৃ.১৮৩ মূল আরবী ঃ
عن ابى رافع رضى قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذّن لدته اذن حسن بن على حين وفى فاطمة بالصلاة-
কানে আযান ও ইকামাত দেওয়ার হিকমত বর্ণনা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নবজাতকের কানে আযান ও ইকামাত দেয়ার অর্থ হলো, তাকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, আযান ও ইকামাত হয়ে গেছে এখন শুধু নামাযের অপেক্ষা, নামায শুরু হতে যে সামান্য সময় বাকী আছে তাই তোমার জীবন। আর কেউ বলেছেন যে, আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে নবজাতকের কানে প্রথমেই আল্লাহর পবিত্র নাম পৌঁছিয়ে দেয়া হয় যেন এর মাধ্যমে তার ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং শয়তানের প্ররোচণা হতে সে নিরাপদ থাকতে পারে। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩)

৫৩। তাহনীফ অর্থ হলো খেজুর চিবিয়ে সেই চর্বিত খেজুর নবজাতকের মুখে দেয়া। চর্বিত খেজুরের কিছু অংশ নবজাতকের মুখে লাগালো হত যাতে এর কিছু রস পেটে পৌঁছে যায়।

৫৪। *সহীহুল মুসলিম,* খন্ড, ২য়, পৃ.২০৯

অন্যত্র এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহন করলে আমি তাকে রাসূল (সা.) এর নিকট পেশ করলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম আর খেজুর দ্বারা তাকে মিষ্টি মুখ করালেন ও তার জন্যে বরকতের দু'আ করে তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[৫৫]

নবজাত শিশুকে শাল দুধ পান করানো

করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে "আশরাফুল মাখলুকাত" বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালন-পালনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করেন। একটি নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাববুল আলামিন তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দেন। শিশুর মাতার বুকে নবজাত শিশুর জন্যে দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণত, যা নবজাত শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী।

গর্ভ অবস্থার শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন হতে যে গাঢ় হলুদ বর্ণের দুধ আসে তাকে শালদুধ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ফোলোষ্টাম বলে। এ দুধ পরিমাণে খুব অল্প। কিন্তু এ সামান্য দুধ নবজাতকের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শালদুধ হলুদ বর্ণ এবং অত্যন্ত গাঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকে বলে কেউ কেউ এ দুধকে ক্ষতিকর বলে মনে করে। অথচ হাদীসে রাসূল (সা.) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী।[৫৬]

শালদুধে স্নেহ ও শর্করার পরিমাণ কম। কিন্তু খনিজ লবণ ও আমিষের পরিমাণ সাধারণ দুধের চেয়ে বেশী, যা নবজাতকের পুষ্টিমান যথার্থ রাখার পাশাপাশি শাল দুধে থাকে প্রচুর পরিমানে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি উপাদান। এর মধ্যে "আইজি-এ" এবং "আইজি-জি" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ উপাদানগুলো শিশুর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

তুলনামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে, শালদুধ এবং সেই সাথে মায়ের দুধগ্রহনকারী শিশুদের এলার্জি, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, ডায়রিয়া, যক্ষা, মেনিন জাইটিস, অন্ত্রপ্রদাহ জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক কম।

৫৫। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮২১

মূল আরবীঃ عن ابى موسى قال ولدلى غلام فاتيت به النبى صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعاله بالبركة ودفعه الىَ-

তাহনীকের একটি উপকারিতা হল, নবজাতকের মুখে চর্বিত বস্তু ঢেলে দেয়ার পর জিববা দ্বারা নড়াচড়ার কারণে তাঁর দাঁতের মাড়ি বজবুত হওয়ার সমূহ সম্ভবনা থাকে। সাথে মাতৃস্তনে মুখ লাগানোর প্রতি সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬)

৫৬। তাফসীরে নূরুল কুর'আন, খ.২য়, পৃ.৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

শাল দুধে থাকে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন-“ই” এবং ভিটামিন-“এ”। উভয় ভিটামিনই দীর্ঘদিন শিশুর যকৃতে জমা থাকে। ভিটামিন-“ই” শরীরে এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে এই নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহনকারী শিশুদের লোহিত কণিকার ভাঙ্গন প্রবণতারোধে শরীরের আন্তঃ ও বহিঃ আবরণীর কোষকে রক্ষা করার পাশাপাশি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত শালদুধ ও মায়ের দুধ গ্রহনকারী শিশুদের শ্বাসনালীর সংক্রমণের হার অন্য শিশুদের চেয়ে অনেক কম। মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে মা-শিশুর অকৃত্রিম বন্ধন তৈরী হয়। এই সংযোগ না শিশুর বন্ধন এবং মায়ের সাথে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ তৈরীতে বিশেষভাবে সহায়ক। তাই শালদুধ ফেলে বা নষ্ট করা একেবারেই অনুচিত। শিশুকে শালদুধসহ বুকের দুধ পান করানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যততড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ দেয়া উচিত।[৫৭]

শিশুর নামকরণ

নবজাতক শিশুর জন্য মাতাপিতার আরো একটি কর্তব্য হল অন্তত জন্মের সপ্তম দিবসে তারজন্য একটি শ্রুতিমধুর ও অর্থবোধক নাম রাখা। যাতে এ নামের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে শুচি-শুভ্রতা ফুটে উঠে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক প্রথমত তিনটিঃ জন্মের পরে পরেই তার জন্যে উত্তম একটি নাম রাখতে হবে, জ্ঞান বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুর‘আন তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে, আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।[৫৮]

বস্তুত সন্তানের ভাল নাম রাখা, কুর‘আন ও হাদীসের শিক্ষাদান না করা এবং পূর্ণ বয়সের কালে তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা পিতামাতার অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে পিতামাতার পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। ভবিষ্যৎ সমাজও ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে উঠতে পারে না। এ পর্যায়ে একটি ঘটনা উল্লেখ্যঃ একটি লোক হযরত উমর ফারুকের কাছে একটি ছেলেকে সঙ্গে করে উপস্থিত হয়ে বললঃ এ আমার ছেলে; কিন্তু আমার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তখন হযরত ওমর (রা.) ছেলেটিকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? পিতামাতার সম্পর্ক ছিন্ন করা বড়ই গুণাহের কাজ তা কি তুমি জানো না? সন্তানের ওপর পিতা-মাতার যে অনেক হক রয়েছে তা তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পার? ছেলেটি বললঃ হে আমীরুল মু’মিনিন, পিতামাতার উপরও কি সন্তানের হক আছে? হযরত ওমর (রা.) বললেনঃ নিশ্চয়ই এবং সেই হক হচ্ছে এই যে, (১) পিতা নিজে সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করবে, যেন তার সন্তানের মা এমন কোন নারী না হয়, যার দরুন সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হতে পারে বা লজ্জা অপমানের কারণ হতে পারে।

৫৭। *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬-১৩৭

৫৮। শাইখ সামারকন্দি, *তামবিহুল গাফিলিন*, বৈরুত: দারুল কলম, খ.২য়, পৃ.৪৭
মূল আরবীঃ حق الولد ثلاثة اشياء ان يحسن اسمه اذا ولد ويعلمه الكتاب اذا عقل ويزوجه اذا ادرك-

(২) সন্তানের ভাল কোন নাম রাখা (৩) সন্তানকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দেয়া। তখন ছেলেটি বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ আমার এ পিতামাতা আমার এ হকগুলোর একটিও আদায় করেন নি। তখন হযরত ওমর (রা.) সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

تقول ابنى يعقنى فقد عققته قبل ان يعقك قم عنىّ-

"তুমি বলছ তোমার ছেলে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আসলে তো তোমার থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ। ওঠো এখান থেকে চলে যাও।"[৫৯]

পিতা-মাতা যদি বাস্তবিকই চান যে, তাদের সন্তান তাদের হক আদায় করুক, তাহলে কর্তব্য সর্বাগ্রে সন্তানদের হক আদায় করা এবং তাতে কোন গাফলতির আশ্রয় না নেয়া।

সপ্তম দিনে শিশুর নামকরণ করা উত্তম। নবজাতকের নাম রাখার সময় একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর বাণীঃ "পিতার উপর নবজাতকের হক হল তারজন্যে সুন্দর নাম রাখা।"[৬০]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।"[৬১]

আল্লাহ তা'আলার বহু গুণবাচক নাম রয়েছে ঐ সমস্ত নামের সাথে "আব্‌দ" শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম। অনুরূপভাবে নবী-রাসূল ও ওলী-বুযর্গগণের নামের সাথে মিলিয়ে রাখাও উত্তম।[৬২]

অজ্ঞাতসারে বা অবহেলাবশত কোন অর্থহীন বা বিটঘুটে কোন নাম রেখে ফেললে তা পরিবর্তন করে একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা অবশ্য কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন সাহাবীর ইসলাম পূর্ববর্তী যুগের রাখা এ ধরণের কোন নাম শুনতে পেলে সাথে সাথে পরিবর্তন করে একটি সুন্দর অর্থবোধক ও শ্রুতিমধুর নাম রেখে দিতেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছেঃ

عن ابن عباس رض الله عنه قال كانت جويرية اسمها برّة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويريّة-

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত "জুওয়ারিয়া" এর পূর্ব নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ (সা.) নাম পরিবর্তন করে 'জুওয়ারিয়া' রাখলেন।"[৬৩]

৫৯। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৩-৩৩৪

৬০। মূল আরবীঃ حق الولد على والده ان يحسن اسمه- (কানযুল উম্মাল, খ.১৬, পৃ.৪১৭)

৬১। মূল আরবীঃ احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن- (সহীহুল মুসলিম, খ.২য়, পৃ.২১৮)

৬২। ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮

৬৩। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২০৮

Dhaka University Institutional Repository

আরো ইরশাদ হয়েছেঃ

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيّر اسم عاصيّة وقال انت جميلة-

"হযরত ওমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) "আসিয়ার" নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর বলে ছিলেন, তোমার নাম হলো "জামীলা"।[৬৪] "আসিয়া" অর্থ পাপী আর "জামীলা" অর্থ রূপসী।

আকীকাহ করা

সন্তান জন্মের ৭ম দিবসে পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে তার জন্যে আকীকাহ [৬৫] করা। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চতুর্দশম দিনে আকীকাহ করবে। তাও সম্ভব না হলে একবিংশতম দিনে আকীকাহ করবে। তাও সম্ভব না হলে যে কোন দিন সম্ভব হয় করবে। অবশ্য এক্ষেত্রে জন্মের সপ্তম দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম।[৬৬]

প্রত্যেকটি সদ্যজাত সন্তান তার আকীকাহ এর নিকট বন্ধী, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে যবাই করা হবে, তার নাম রাখা হবে, এবং তার মাথার চুল মুন্ডন করা হবে।[৬৭]

আকীকাহ বলা হয় সেই জন্তুটিকে, যা সদ্যজাত সন্তানের নামে যবাই করা হয়, এর মূল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভাঙ্গা, কেটে ফেলা। আর নবজাত শিশুর মুন্ডিত চুলকেও আকীকাহ বলে।[৬৮]

শিশু অবস্থায় কোন সন্তান যদি মারা যায় এবং তার জন্য আকীকাহ করা না হয়, তবে সে তার পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে না।[৬৯]

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮

৬৫। "আকীকাহ" আরবী শব্দ। ইসলামের পরিভাষায় নবজাতকের পক্ষ থেকে যে জন্তু জবাই করা হয় তাকে আকীকাহ বলে। ইমাম আবূ উবাইদ ও আসামাঈ বলেনঃ আকীকাহ মূলত ঐ চুল যা নবজাতকের মাথায় গজায়। ইমাম যামাখশারিও অনুরূপ উক্তি করেছেন। আর মাথায় চুল গজা অবস্থায় যেহেতু ছাগল জবাই করতে হয় এবং জবাই করার সময় ঐ চুলগুলোকে কামিয়ে ফেলতে হয় ফলে উক্ত ছাগলকেই আকীকাহ বলে দেয়া হয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আকীকাহ "আকফুন" শব্দ হতে নির্গত যার অর্থ কর্তন করা, চিরে ফেলা। ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, সন্তানের পক্ষ হতে যে ছাগল যবাই করা হয় তাকে 'আকীকাহ' বলে, কেননা ছাগলকে এ মুহূর্তে কেটে ফেলা হয়। ইব্‌ন হারেস (র.) বলেন, সন্তানের পক্ষ হতে যে ছাগল যবাই করা হয় এবং যে চুল কামিয়ে ফেলা হয় উভয়কেই আকীকাহ বলে। (শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী, ***তুহফাতুল আহওয়াযী,*** ফি শারহি জামি আত্ তিরমিযী, দিল্লিঃ মুজতাবায়ী, তা.বি, খ. ৫, পৃ.১০৩)

৬৬। ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১

৬৭। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, ***সহীহ আল-বুখারী,*** খ.২য়, পৃ.৮২২ মূল আরবীঃ
كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى عنه ويحلق راسه-

৬৮। ইমাম শাওকানী, ***নায়লুল আওতার,*** করাচীঃ ইমারাতুল কুর'আন, ওয়াল উলূম আল-ইসলামিয়াহ, তা. বি, খ.৫,পৃ.২২৪ মূল আরবীঃ العقيقة الذبيحة التى تذبح للمولود والعق فى الاصل والشق والقطع-

৬৯। মূল আরবীঃ انه اذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لابويه

যেহেতু যে কোন বন্ধকের জন্যে বন্ধকী জিনিসের প্রয়োজন, এমনিভাবে যে কোন সদ্যজাত সন্তানের জন্যে আকীকাহ দরকার। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছেঃ "প্রত্যেক নবজাত সন্তান আকীকার নিকট বন্ধী।" আবার কেউ কেউ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'প্রত্যেক সদ্যজাত সন্তান আকীকার কাছে বন্ধী।' এর অর্থ আকীকাহ করার আগে কোন সন্তানের না নাম রাখা যাবে, আর না মাথা মুন্ডন করা যাবে।[৭০]

ছেলে সন্তানের পক্ষহতে কাছাকাছি একই রকম দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ হতে একটি ছাগল যবাই করতে হবে।[৭১]

উল্লেখিত হাদীসে একই রকমের দু'টি ছাগল বুঝাতে মুকাফেয়াতানে(مكافئتان) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার দুটি অর্থ করা হয়েছে একটি হচ্ছে যে, হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী (রে.)[৭২] বলেছেন যে, দু'টো একত্রে করতে হবে, দু'টো যবাই করার মাঝে যেন বেশী বিলম্ব না হয়। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন দু'টো যেন একই মানের হয়। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন দুটোর বয়স যেন একই রকম হয়।[৭৩]

উক্ত হাদীসের ব্যাপারে হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) ও অধিকাংশ আলেমগণ বলেন যে, ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি ছাগল যবাই করতে হবে। হাদীসটি তাদের পক্ষের দলীল। কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: ছেলে ও মেয়ের একই বিধান অর্থাৎ উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে ছাগল যবাই করতে হবে। তাঁর দলীল ইমাম বর্ণিত হাদীসঃ

"হযরত আলী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসানের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকীকাহ করেছিলেন।"[৭৪]

৭০। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫

৭১। আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, *জামি'আত-তিরমিযী,* দিল্লীঃ- মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, তা.বি, খ.১ম, পৃ.১৮৩
মূল আরবীঃ عن الغلام شتان مكافئتان وعن الجارية شاة

৭২। ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানীঃ তাঁর পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মাহমুদ ইবন আহমদ আল-আসকালানী আল-শাফি'ঈ আল-মিসরী। তবে ইবন হাজার নামেই তিনি অধীক প্রসিদ্ধ। তিনি ৭৭৩ হিঃ শা'বান মাসে নীলনদ তীববতী কোন একস্থানে জন্মগ্রহন করেন। চার বৎসর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। তারও আগে শিশু অবস্থায় তিনি তাঁর মাকে হারান। যাকী উদ্দীন আবূ খারুবী এর তত্ত্বধানে তিনি ৫ বছর বয়সে কুর'আন হিফয করেন। ১১ বছর বয়সে ৭৮৪ হিঃ সনে তিনি হজ্জ করেন। পরে কুরআন ও হাদীসের উচ্চ শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করে বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও ঐতিহাসিকে পরিণত হন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে ২৮২ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফাতহুল বারী ফি শারহি সহীহ আল-বুখারী, নুখবাতুল ফিকর, বুলুগুল মারাম, লিসানুল আরব, আল-ইসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, তাহযীবুর্ত তাহযীব, তাকরীরুত তাহযীব প্রভৃতি। তিনি ৮৫২/১৪৪৮ সনে ইন্তিকাল করেন। (তাহযীবুত তাহযীব, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪০৪/১৯৮৪) খ.১ম, পৃ.১-১৩)

৭৩। শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.১০৩-১০৪

৭৪। মূল আরবীঃ عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة-

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু উক্ত হাদীস দ্বারা ইমাম মালেকের মত প্রতিষ্ঠিত হয় না কেননা, উক্ত হাদীসটিতেই অন্য বর্ণনায় দু'টি দু'টি করে দুবার বর্ণনা এসেছে আর তাছাড়াও তিরমিযীর হাদীসটিকে সহীহ মেনে নিলেও দু'টি ছাগলের হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়, কেননা, তখন অর্থ এমন দাঁড়াবে যে, একটি ছাগলের আকীকাহ দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে, তবে অবশ্যই দু'টি দেওয়াই উত্তম হবে।[৭৫]

অধিকাংশ ওলামার মত হচ্ছে উট এবং গরুর আকীকাহ বৈধ হবে। তবে এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে আনাস থেকে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত সনদে মিস'আদাহ বিন ইয়াসা আল-বাহেলী নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন যিনি য'ঈফ। যার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বলেনঃ আমরা বহুদিন থেকে তার বর্ণিত হাদীসগুলোকে ছুঁড়ে ফেলি।[৭৬]

আকীকাতে উট, কিংবা গরু হোক কিংবা ছাগল তা মাত্র ১ জনের পক্ষ থেকেই হতে হবে। অর্থাৎ কুরবানীর মত সাত ভাগের কোন অংশ নেয়া আকীকায় জায়েজ হবে না। একটি পশু একজন মাত্র নবজাতকের পক্ষ থেকেই হতে হবে সেটা উট হোক কিংবা গরু হোক কিংবা ছাগল হোক।[৭৭]

আকীকায় ছাগল যবাই করা উট অথবা গরুর চেয়ে উত্তম। কেননা, আকীকার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছাগলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আকীকাহ করার রেওয়াজ প্রাচীন আরব সমাজে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। এর মধ্যে নিহিত ছিল সামাজিক, নাগরিক মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণবোধ। একারণেই নবী করীম (সা.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে এ প্রথাকে চালু রেখেছিলেন। নিজে আকীকাহ দিয়েছে এবং অন্যদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করেছেন।

আকীকার মাধ্যমে দানশীলতার বিকাশ ঘটে। গরীব, মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় হয়। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আপসে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়।[৭৮]

আকীকাহ মূলত নতুন এক নেয়ামত প্রাপ্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহিঃ প্রকাশ ও নবজাতকের পক্ষ থেকে ফিদিয়া স্বরূপ অর্থাৎ যেন কোন ধরণের বালা মুসিবত বিদূরিত হয় ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক বিরাট অসিলা। আর যেহেতু ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের তুলনায় বেশী অনুগ্রহ, ফলে তার কৃতজ্ঞতাও বড় হতে হবে, ফলে ছেলের পক্ষ হতে ২টি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি ছাগল দিতে হবে।[৭৯]

৭৫। শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪; আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী, ***কুরআন হাদীসের আলোকে ঈদ, কুরবানী ও আকীকাহ.*** ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০০৯/১৪৩০, পৃ.৭৫

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪; প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

৭৭। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-তুওয়াইজিরী, ***মুখতাসার আল-ফিকহুল ইসলামী,*** দিল্লীঃ মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, তা.বি, পৃ.৬৯১; ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

৭৮। ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

৭৯। ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতে, আকীকার উপকারিতা অনেক। তার মধ্যে বিশেষ উপকারিতা হচ্ছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

التلطف باشاعة نسب الولد ذلابد من اشاعته لئلا يقال فيه ما يحبه ولا يحسن ان يدور فى السكك فينادى انه ولدلى ولد فتعين التلطف لمثل ذلك ومنها انباء داعيه السخاوة وعصيان دامية الشح-

"আকীকার সাহায্য খুব সুন্দর ভাবেই সন্তান জন্মের ও তার বংশের প্রচার হতে পারে। কেননা, বংশ পরিচয়ের প্রচার একান্তই জরুরী, যেন কেউ কারো বংশ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কথা বলতে না পারে। আর সন্তানের পিতার পক্ষে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তাঁর সন্তান হওয়ার কথা চিৎকার করে বলে বেড়ানোও কোন সুষ্ঠু ও ভদ্র পন্থা হতে পারে না। অতপর মাধ্যমেই একাজ করা অধিকতর সমীচীন বলে প্রমাণিত হলো। এ ছাড়াও এর আর একটি ফায়দা হচ্ছে এই যে, এতে করে সন্তানের পিতার মধ্যে বদান্যতা ও দানশীলতার অনুসরণ প্রবল ও কার্পণের ভাবধারা প্রশমিত হতে পারে।"[৮০]

জাহিরী মতের আলিমদের দৃষ্টিতে আকীকাহ করা ওয়াজিব। তবে অধীক সংখ্যক আলিম ও মুজতাহিদের মতে তা করা সুন্নাত। যদিও ইমাম আবূ হানীফার মতে তা ফরয, ওয়াজিব এমনকি সুন্নাতও নয়, বরং নফল– অতিরিক্ত সাওয়াবের কাজ।[৮১]

ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শিক্ষাদান

অতঃপর পিতামাতার প্রতি তথা পরিবারের প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে পরকালীন জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহন করবে। কুর'আন মজীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ইমানদার লোকেরা, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁও।"[৮২]

আয়াতে তোমাদের নিজেদেরকে বাচাঁও প্রথমে বলার কারণ এই যে, লোক নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁতে চায় না। সে অপরকে নিজের সন্তান-সন্ততি পরিবার পরিজনকে তা থেকে বাচাঁর জন্যে কখনো চেষ্টা করতে পারে না। আর "আহল" বলতে স্ত্রীসহ গোটা পরিবারকে পরিবায়স্থ সমস্ত লোককে বুঝায়। একজন লোক যাদেরকে কোন কথা বলতে পারে এবং তারা তা মেনে চলতে বাধ্য হয় এমন সব লোকই এ "আহল" শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

কুর'আনের দৃষ্টিতে স্ত্রীসহ গোটা পরিবারের প্রতি পিতার পরিবার কর্তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাঁবার জন্যে এ দুনিয়ায়ই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন, তাদের মনে পরকালীন জবাবদিহির ভয় জাগিয়ে তোলা এবং এমনভাবে জীবন-যাপনের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে তোলা যেন তার পরিণামে তারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর জাহান্নাম থেকে বাচাঁবার ও বাচাঁবার উপায় হচ্ছে নিজে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করা এবং তার পরিবারবর্গকে এভাবে তৈয়ার করা।

৮০। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), ***হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা***, দিল্লীঃ কুতুব খানা রাশীদিয়া, ১ম সং, ১৩৭৩হিঃ, খ.১ম,পৃ.৭৮

৮১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫

৮২। আল-কুর'আন, ৬৬ :৬

চতুর্থ অধ্যায়

পরিবারিক কল্যাণ: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মানব জীবনের যাত্রা থেকেই পরিবার সূত্রের শুভ সূচনা। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমেই এর প্রথম বিকাশ। এ মর্মে আল-কুর'আনের ঘোষণাঃ

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এ গাছের কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।"[১]

এতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এক আদম (আ.)-এর পরিবার থেকে উৎসারিত হয়েছে অগণন বনূ আদমের বিন্যস্ত সংসার। তাই প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়, পরিবারই সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। পরিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানব জাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা।

দুনিয়া ব্যাপী মানব বংশের সম্প্রসারণও ঘটেছে এ আদি পারিবার থেকেই। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে নিম্নোক্ত কুর'আনের আয়াতঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।"[২]

কুর'আনের অন্যত্র আরো বলা হয়েছেঃ

يا يها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم -

"হে মানব! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন।"[৩]

১। আল-কুর'আন, ৭:১৯

২। আল-কুর'আন, ৪:১

৩। আল-কুর'আন, ৫:৪৯

এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, আজকের বিশ্বময় সম্প্রসারিত অগমন মানব প্রজন্ম দয়াময় প্রভুর এক অপার অনুগ্রহ। এ তাঁর অসীম কুদরতের বিন্দু বিকাশ। মূলত মানুষের জীবনের পারস্পরিক ভালবাসা স্নেহ-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা পারিবারিক জীবনাচরণের কল্যাণেই হয়ে থাকে অনেকাংশে। নিম্নে ইসলামের আলোকে পারিবারিক কল্যাণের দিকগুলো তোলে ধরার প্রয়াস পাব।

পরিবার বিশ্ব প্রকৃতির শাশত্ব রূপ

এ দুনিয়ায় মানুষের জীবনের সূচনা তার জন্মের মাধ্যমে এবং জীবনের ইতি আসে মৃত্যুর হীম-শীতল স্পর্শে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এ সময় টুকু মানুষের জীবন। এ জীবনটা সে একাকী কাটাতে পারে না। তার জন্মও কোন একক ভূমিকার ফসল নয়; বরং একজন নারী ও একজন পুরুষের সক্রিয় মেলামেশা ও যৌনমিলনের ফলেই তার জন্ম হয়। জন্ম যেমন কারো একক ভূমিকায় সম্ভব নয় তদ্রুপ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ার এ জীবনে যৌথ পথ পরিক্রমায় তথা পারিবারিক জীবন পদ্ধতিতে তাকে চলতে হয়। এটাই যেন বিশ্ব সম্রাটার অমোঘ বিধান। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

"প্রত্যেক জিনিসই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"[৪]

একজন পুরুষ যখন একজন নারীকে বিয়ে করে তখন উক্ত নারী-পুরুষকে বলা হয় নব-দম্পতি। দম্পতি মানে নারী-পুরুষের জোড়া।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদের একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তাঁর জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তার সাথে জীবন-যাপন করে।"[৫]

এ যুগল বন্ধন আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতিগত নিয়মে সুসংগঠিত পায়। এতে কারো হাত নেই। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ পরবর্তী বংশধারা বংশ পরিক্রমা চলতে থাকে। পুরুষে পুরুষে বা নারীতে এ প্রক্রিয়া সম্ভব নয়।

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى - مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

"এবং নিশ্চয় তিনি নর-নারীকে যুগল করে সৃষ্টি করেছেন, বীর্য থেকে যখন তা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়।"[৫]

৪। আল-কুর'আন, ৭:১৮৯

৫। সূরা আন্ নজম: ৪৫-৪৬

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতিয় জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের জুড়িদের থেকে তোমাদের দান করেছেন অনেক পুত্র ও পৌত্র।"[৬]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

তিনিই আল্লাহ, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"[৭]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, যিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তার নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার।"[৮]

পরিবার গঠন পক্রিয়ার এ অমোখ বিধি শুধু যে শ্রেষ্টজীব মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়; বিশ্ব প্রকৃতির সকল জীবের মধ্যে এ নিয়ম সমভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ

"তিনি তোমাদের জাতি থেকে তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন আর জানোয়ারদের মধ্য থেকেও জুড়ি বানিয়েছেন। এ এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।"[৯]

ইসলামী সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবার এবং পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। এখানেই সর্বপ্রথম ব্যাষ্টি ও সমষ্টির সম্মিলন ঘটে এবং এখানেই হয় অবচেতনভাবে মানুষের সামাজিক জীবন-যাপনের হাতেঘড়ি। মূলত ব্যক্তি দেহে কলব-এর গুরুত্ব ইসলামী সমাজ জীবনে সে গুরুত্ব পরিবারের পারিবারিক জীবনের। তা সত্ত্বেও আধুনিক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতার ইসলামী ক্রমধারাকে অস্বীকার করে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের কথা চাপিয়ে দিতে চায়। তাদের ইতিহাস ও সভ্যতা প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাথে সংঘর্ষ হওয়ায় তারা ধর্মীয় সভ্যতার ইতিহাসকে গ্রহন করতে চায় না; বরং ধর্মীয় সভ্যতার বিপরীতে তারা সেই সভ্যতার যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা বাসীর যুগ হিসেবে উপস্থাপন করে। তারা পারিবারিক জীবন-যাপনকে গুরুত্ব না দিয়ে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা নারী স্বাধীনতার ধোয়া তুলে নারীর সম্মান অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে নারীকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে।

৬। আল-কুর'আন, ১৬:৭২

৭। আল-কুর'আন, ২৫:৫৪

৮। আল-কুর'আন, ৩০:২১

৯। আল-কুর'আন, ৪২:১১

পরিবার বিরোধী মতবাদকে প্রতিষ্ঠার নামে পরিবার ভেঙ্গে নারীকে পন্যে পরিণত করে নারীর সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে, নারীকে তাদের মনোরঞ্জনের দাসী বানিয়ে পুতুলের ন্যায় নাচাতে চাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নারী হারাচ্ছে তাদের অস্তিত্ব এবং বিশ্বের ধর্ম ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মান-সম্মান। যা ইউরোপের নারীদের জন্যে বড়ই ভাবনার বিষয়।[১০]

নব দম্পতির দু'টি জীবনের সার্থক সমন্বয় ও সমঝোতা

একজন নারীর সম্মতি প্রদান ও একজন পুরুষের সেচ্ছাপ্রণোদিত গ্রহণের স্বীকৃতির মাধ্যমে যে বিয়ে হয় তাতে দু'টি প্রাণ এক হয়ে যায়, ঘুঁচে যায় তাদের মধ্যেকার সকল প্রকার ভেদাভেদ। এতদিন তাদের মধ্যে যে পর্দার প্রাচীর দাঁড়িয়েছিল তা সহসাই সরে যায়। সমপূর্ণ ভিন্ন দুটি প্রাণ এক হয়ে যায়। তাদের মধ্যে থাকতে পারে অভ্যাসগত ও রুচিগত পার্থক্য, থাকতে পারে শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈষম্য, পারিবারিক ভেদাভেদ, ঐতিহ্যগত ও পারিপশ্বির্ক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন পথ। কিন্তু দু'য়ের মহামিলনে সর্বক্ষেত্রে সবকিছু ধীরে ধীরে ঐক্যের পথে এগিয়ে চলে। দু'য়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সমঝোতা সৃষ্টি হয় সমন্বয় সাধিত হয়। এ দু'য়ের মহামিলনে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে বলে দিয়েছেন, তিনি বলেনঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"তারা (নারীরা) তোমাদের (পুরুষদের) পোষাক আর তোমরা (পুরুষগণ) নারীদের পোষাক।"[১১]

বস্তুত পোষাক দেহের সাথে মিল করেই তৈরী করা হয়, কারো শরীরে যে পোষাক ফিট হয় না সে পোষাক সে পরিধান করে না, পোষাক দেহের আবরণ যা দেহের সাথে একেবারেই মিলে মিশে যায়। পোষাক দেহের দৃষ্টিকটু অংশ ঢেকে ফেলে, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাছাড়া পোষাক দেহের সাথে সাথে তাকে অনুসরণ করে। পোষাক যেমন শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও হয় তেমনিভাবে আবিচ্ছেদ্য। স্বামী যদি কোন দিকে যায় স্ত্রী চিন্তায় থাকে, স্বামীরও মনে পড়ে বাড়ীতে অবস্থানরত স্ত্রীর কথা। স্ত্রী তার বাপের বাড়ীতে গেলে, স্বামীও তার সাথে চলে যায় অথবা তার জন্যে অস্থির থাকে। এভাবে দু'জনের মধ্যে হয় চিন্তা-চেতনার ঐক্য, পারস্পরিক সমন্নয় ও সমঝোতা। তাই পারিবারিক জীবনের প্রথম দাবী হলো দ'জনের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা, যা কিনা বিশ্বপ্রকৃতিরই শাশত্ব রূপ।

১০। জাবেদ মুহাম্মদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০
১১। আল-কুর'আন, ২:১৮৭

পারিবারিক জীবন-যাপনে মানব চরিত্রকে নিষ্কলুষ করে

বিবাহের মাধ্যমে গড়া পারিবারিক জীবন-মানব জীবনকে নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান করে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখে। পারিবারিক জীবন-যাপন মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট ইহসান, অফুরন্ত নিয়ামত, অবর্ণনীয় কল্যান পরিপূর্ণ। নারী-পুরুষকে অসৎ চরিত্র থেকে মুক্ত রেখে সভ্যতায় সমাসীন রাখে এবং সকল ধরনের সামাজিক অনাচার থেকে দূরে রেখে আদর্শ পরিবার গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

احل لكم ما وراء ذالك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين ـ

"এ মুহাররম নারী ছাড়া অন্যসব নারীকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তোমাদের সম্পত্তির বিনিময়ে তাদেরকে লাভ করতে চাবে নিজেদের চরিত্র দুর্জয় দূর্গের মত সুরক্ষিত রেখে এবং মুক্ত যৌন চর্চা করা থেকে বিরত থেকে।"[১২]

আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত ঘোষণা থেকে যা বুঝা গেল তা হলো–

১. নির্দিষ্ট কয়েকজন নারী বিয়ে করা ও তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। সে হারাম বা মুহাররম নারী কয়েকজন ছাড়া আর সব নারী বিয়ে করা পুরুষের জন্যে হালাল।

২. হালাল নারীদের দেন মোহর স্বরূপ দেয়া অর্থের বিনিময়ে গ্রহন করতে হবে।

৩. দেন মোহর ব্যতীত অন্য কোনভাবে হালাল নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

৪. এভাবে বিয়ে করে নৈতিক চরিত্রের এক দুর্জয় দূর্গ তথা পরিবার গঠন এবং অবাধ যৌন লিপ্সা বা চরিত্রহীনতা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমরা তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে করো। প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের দেনমোহর দাও। যেন তারা বিয়ের বেষ্টনিতে সুরক্ষিত থাকে। অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থে উদ্যোগী না হয় এবং অভিসারে বের না হয়। বিয়ের বেষ্টনীতে সুরক্ষিত থাকার পরও যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। স্বাধীন মহিলাদের জন্যে নিদিষ্ট শাস্তির অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে যারা বিয়ে না হলে গুনাহের কাজ করে বসতে পারে। সবর করতে পারলে তোমাদের জন্য ভাল। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও করুণাময়"।[১৩]

১২। আল-কুরআন, ৪:২৪
১৩। আল-কুর'আন, ৪:২৫

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, বিয়ের মাধ্যমে একদিকে সকল প্রকার যৌন অনাচার (প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য) বন্ধ করা হবে অপরদিকে বিবাহিত দম্পতিকে অনাচারের যৌন সম্ভোগের অবাধ সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হয়। এজন্যে ইসলাম অবৈধ যৌন অনাচারের তা যে প্রকারেরই হোক না কেন– হস্তমৈথুন বা অন্যান্য কৃত্রিম উপায়ে বীর্যপাত বা যৌন স্বাদ গ্রহন, পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে যৌন ক্রিয়া, পশুমৈথুন বা অবিবাহিত নারী-পুরুষে যৌন মিলন ইত্যাদি সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যৌন অনাচার হারাম করে তার জন্যে শাস্তির বিধান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে যৌন জীবন সম্পর্কে বলেনঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون

"ঐসকল মু'মিনগণ সফলকাম হবে, যারা তাদের যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ করে। তবে তাদের স্ত্রীদের ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। এর বাইরে যারা কাম চরিতার্থ করতে প্রয়াসী তারাই সীমালংগণকারী।"[১৪]

বর্তমান সময়ে যেহেতু দাসী বাদীর প্রচলন আর নেই তাই কেবল মাত্র বিবাহিত স্ত্রীদেরকে নিয়েই পুরুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর নারীদেরকেও সন্তুষ্ট থাকতে হবে কেবলমাত্র স্বামীদেরকে নিয়েই। যৌন ব্যাপারে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রহন করা যাবে না। তাই দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নারী-পুরুষের যৌন স্বাদ গ্রহন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাও মানুষের মধ্যে অদম্য আবেগ অবাধ যৌন প্রবণতা ও সীমাহীন সুযোগ প্রদান করেছেন। মানুষের জন্যে পশুর মত কোন মৌসুমের প্রয়োজন নেই, নেই প্রয়োজন কোন বিশেষ সময়ের। যৌন ক্রিয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য যদিও বংশধারা অব্যাহত রাখা কিন্তু এতে আলাহ তা'আলা এ কাজকে সীমাবদ্ধ করেননি। গর্ভধারণের পরও এ ক্রিয়া চালু থাকে, এমনকি কোন নারীর সন্তান হওয়ার সময়কাল অতীত হয়ে গেলেও এ কাজের আবেগ উচ্ছ্বাস অব্যাহত থাকে। পারিবারিক জীবনে পবিত্র যৌন জীবন-যাপনের প্রতি লক্ষ্য করে রাসূলল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

"জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করার পর নবী (সা.)-এর কাছে গেলাম তিনি বলেন, হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী, না বিধবা। আমি বললাম, না বরং বিধবা। তিনি বললেন, তুমি একটি কুরারীকে বিয়ে করলে না কেন? তা হলে তুমিও তার সাথে আমোদ-ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ ফুর্তি করতে পারত।"[১৫]

১৪। সূরা-মু'মিনুন, ৫-৬

১৫। জামি আত্-তিরমিযি, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১০৩৭; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়. কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৩২৭১, সহীহুল বুখারী অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৭০৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৯২৮, আহমাদ, হাদীস নং-১৩১৭ মূল হাদীস পাঠঃ
عن جابر بن عبد الله رضـ عنه يقول زوجت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت ثيبا فقال مالك وللعذارى ولغابها فذكرت ذلك لعمربن دينار فقال عمر وسمعت جابر بن عبد الله يقول قال لى رسول الله صلى الله هلا جارية تلاعبها وتلاعبك

"জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) একজন স্ত্রীলোককে দেখে জয়নব (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করেন (সহবাস করেন)। অত:পর বাইরে এসে বললেন ঃ কোন স্ত্রী লোক সামনে এলে শয়তান বেশে আসে। অত:পর

তোমাদের কেউ কোন স্ত্রী লোক দেখে তাকে ভাল লাগলে সে যেন নিজ স্ত্রীর নিকট যায়। কারণ, ঐ মহিলার যা আছে তার স্ত্রীরও তা আছে।"[১৬]

"জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেনঃ হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কুমারী না বিধবা? আমি বললাম বিধবা।

তিনি বললেন কেন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না, তা হলে তার সাথে তুমি রসিকতা ও কৌতুক করতে পারতে? আমি বললাম, আমার আরেকজন বোন আছে। তাই আমি আমার ও আমার বোনদের মধ্যে একজন কুমারী মেয়ের প্রবেশ করাকে সংকটজনক বোধ করলাম। তিনি বলেনঃ তাতো ভাল কথা।"[১৭]

দাম্পতি জীবন গড়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নে উল্লেখিত মহানবী (সা.) এর বাণীঃ

عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصروا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء-

"হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা কতিপয় যুবক রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম, আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। রাসূল (সা.) আমাদের বললেনঃ হে যুব সমাজ! যে বিয়ের সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিয়ে (পর স্ত্রী–দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে, কেননা, রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।"[১৮]

১৬। জামি আত্ তিরমিযি, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-১০৯৬

১৭। সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-১৮৬০, আ.প্র. মূল হাদীস পাঠঃ
عن جابر بن عبد الله قال بزوجت امراة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت يا جابر قلت نعم قال ابكرا اؤ ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها قلت كن لى اخوات فخشيت ان تدخل بينى وبينهن قال فذاك اذن-

১৮। *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-৪৬৯৩, সুনানু নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-৩২২১, ই.ফা,

ইসলামী পরিবার পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। একে অপরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। বিশেষত

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে প্রগার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামী স্ত্রীর মন রক্ষা করে, স্ত্রীও স্বামীর মন রক্ষা করে। মহান আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"এবং তাঁর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো এই যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের। যেন তোমরা তার সাথে একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে পার, আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন প্রেম প্রীতি-ভালবাসা, হৃদ্যতা ও মেহেরবাণী।"[১৯]

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রেম, স্নেহ-মমতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। সুখে-দুঃখে একে অপরকে আপন করে নেয়। সুখে-দুঃখে এক সাথে চলে। একে অপরের সুখে সুখী হয় দুঃকে হয় দুঃখী। যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতি এক সাথে মোকাবেলা করে। স্বামী অসুস্থ্য হয়ে পড়লে স্ত্রী নিজেকে সমপূর্নরূপে পেশ করে তার সেবায়। আবার স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামী তার সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, স্ত্রীর প্রসবকালে স্বামী অস্থির হয়ে পড়ে। পারিবারিক জীবন-যাপনের জন্যে নব-দম্পতির কিছু অপরিহার্য জিনিসের প্রয়োজন। তাদের জন্যে প্রয়োজন নিরিবিলি দাম্পত্য জীবনকে উপভোগ করার জন্যে একটি ঘর, কিছু কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র এবং খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা। এ সবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বামীকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে তার স্ত্রীর খাবার ও পরার ন্যায়সংগত যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহন, কোন ব্যক্তির সামর্থ্যের অধিক বোঝা তার উপর চাপানো হয় না।"[২০]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, স্বামীর দায়িত্ব হলো পরিবারের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ ইসলামের বিধানমত স্বামী বা পুরুষের দায়িত্ব হলো রুজী-রোজগারের, উপার্জনের। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির খোরপোষের ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। পারিবারিক জীবনের দাবী হলো স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বাভাবিক জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজন পূরণে পরিবারের কর্তার দায়িত্ব গ্রহন। এমনকি পরিবারের সকল সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানও ইসলামী বিধান মতে পরিবারের কর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিবারের কর্তার সামর্থ্য অনুযায়ীই তার দায়িত্ব।

১৯। আল-কুর'আন, ৩০:২১

২০। আল-কুর'আন, ২:২৩৩

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Dhaka University Institutional Repository

“যাকে যেমন অর্থ-সম্পদের মালিক করা হয়েছে, সে সে অনুযায়ী স্ত্রী-পরিজনের জন্যে খরচ করবে, আর যার রুজি-রোজগার ও রেযেক সীমিত করা হয়েছে, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকেই স্ত্রী পরিজনের জন্যে খরচ করবে। আল্লাহ কাউকে তাকে যা দেয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা দান করেন।”[২১]

পারিবারিক জীবন মাধুর্যময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ন করে তোলার জন্যে ইসলামে কতগুলো জরুরী বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা কিনা ইসলামী পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রেম ভালবাসা

প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি লাভই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কারণ এ জিনিস মানুষ মাত্রেই প্রয়োজন-স্বভাবের ঐকান্তিক দাবি। পরিবারের প্রাথমিক দু‘জন সদস্য (স্বামী-স্ত্রী) সম্পর্ন ভিন্ন বংশ, ভিন্ন পরিবার ও পরিবেশের লোক, পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, একজনের নিকট অপরজন সম্পূর্ণ নতুন আনকোরা, প্রত্যেকের মন-মগজ চিন্তা-ভাবনা, স্বভাব-অভ্যাস পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ সতন্ত্র ও ভিন্ন। স্বামী-স্ত্রীতে প্রথমত গভীর একাত্মবোধের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে তাদের এ একাত্মবোধ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে সুহাদ্যের সৌধ গড়ে তোলে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, কুর’আন মজীদের আয়াত সমূহে স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের জন্যে একই শব্দ “زوج” ‘যাওজ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থের ভাবধারা কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে আছে। আল্লামা আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ “المراغى” তে একথাই উল্লেখ করেছেনঃ “যাওহ” শব্দটি পুরুষ নারী উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর আসল অর্থ এমন একটি সংখ্যা যা এমন দু‘টি জিনিসের সমন্বয়ে রচিত ও গঠিত যেখানে সে দু‘টি জিনিসই একাকার হয়ে রয়েছে এবং বাহ্যত তারা দু‘টি হলেও মূলত প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একটিমাত্র জিনিসে পরিণত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যে।

২১। আল-কুর’আন, ৬৫:৭

২২। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২

২৩। আল্লামা আহমাদ মুস্তফা আল-মারাগী, ***তাফসীরুল মারাগী,*** প্রাগুক্ত, খ.২, প.১৯০ মূল আরবী পাঠঃ
الزوج يطلق على الذكر الانثى۔ واصله العدد المكون من شيئين اتحدا وصار شيئا وّاحدا فى الباطن وان كانا شيئين فى الظاهر وسمّى به كل من الرجل و المرأة للدلالة على ان من مقتضى الفطرة ان يتحدا الرجل بامراته۔ والمراة بيعلها بتمازج النفوس ووحد المصلحة حتى يكون كل منهما كانه عين الاخر۔

ব্যবহার করা হচ্ছে একথা বুঝাবার জন্যে যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অন্তরের গভীর একাত্বপূর্ণ ভাবধারা ও ভেদহীন কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে থাকবে, তা-ই হচ্ছে স্বাভাবিকতার ঐকান্তিক দাবি। তারা একাকার হবে এমনভাবে যে, একজন ঠিক অপরজনে পরিণত হবে।”[২৩]

আরবী ভাষার এটি এক অপূর্ব সৌন্দর্য-এটি কুর'আনের ভাষা–যে যৌথ জীবন সঙ্গীর প্রত্যেক পাটনারকে "যাওজ" (زوج) বলে অভিহিত করেছে। সুতরাং পুরুষকে বলা হয় 'যাওজ' আর স্ত্রীকেও বলা হয় "যাওজ"। 'যাওজ' শব্দটির অর্থ দু'জন (জুটি)। সুতরাং এদের প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক এবং একীভূত সত্ত্বা। এদের কেউ প্রকাশ্যে এক ব্যক্তি হলেও বাস্তবে জোড়া বা "যাওজ"।[২৪]

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা

স্বামী-স্ত্রীর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে মন কষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এরই ফলে পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে কিছু বিলম্ব হয় না। অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চলা হয়ে ওঠা, নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। মেয়ের এ স্বাভাবিক দুর্বলতা কিংবা বৈশিষ্ট্যই বলুন–আল্লাহর খুব ভালভাবেই জানা ছিল। তাই তিনি স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দেবেন।"[২৫]

এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, স্বামীদের প্রতি প্রথম নির্দেশ হচ্ছে ঃ তোমরা যাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলে, যাকে নিয়ে ঘর বাধঁলে তাঁর প্রতি সবসমই খুব ভাল ব্যবহার করবে, তাদের অধিকার পূর্ন মাত্রায় আদায় করবে। আর প্রথমেই যদি এমন কিছু দেখতে পাও যার দরুন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ঘৃণাই হয়ে পরে এবং যার কারণে তার প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালবাসা জাগার বদলে ঘৃণা জেগে উঠে, তাহলে তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করো না। বুদ্ধির স্থিরতা ও সজাগ বিচক্ষণতা সহকারে শান্ত থাকতে ও পরিস্থিতিকে অয়ত্তে আনতে চেষ্টিত হবে। তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোন বিশেষ কারণে তোমার স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার মনে ঘৃণা জেগে থাকে, তবে এখানেই চুড়ান্ত নৈরাশ্যের ও চির বিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেল না।

২৪। ড.ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯
২৫। আল-কুর'আন, ৪:১৯

কেননা, হতে পারে, প্রথমবারে হঠাৎ এক অপরিচিতা মেয়েকে তোমরা সমগ্র মন দিয়ে তুমি গ্রহন করতে পারো নি। তার ফলেই এ ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তুমি হয়তো একটি দিক দিয়েই তাকে বিচার করেছ এবং সেদিক দিয়েই তাকে মনমতো না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছ।

অথচ তোমার বুঝা উচিত যে, সেই বিশেষ দিক ছাড়া আরো সহস্র দিক এমন থাকতে পারে, যার জন্যে তোমার মনের আকাশ থেকে ঘৃণতর এ পুঞ্জিত ঘনঘটা দূরীবৃত হয়ে যাবে এবং তুমি তোমার সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আপন করে নিতে পারবে। সে সাথে সে সঙ্গে এ কথা বুঝা উচিত যে, কোন নারীই সমগ্রভাবে ঘৃণাই হয় না। যার একটি দিক ঘৃণাই, তার এমন আরো সহস্র গুণ থাকতে পারে, যা এখনো তোমার সামনে উদঘটিত হতে পারে নি। তার বিকাশ লাভের জন্যে একান্তই কর্তব্য।

এ কারণেই নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

لا يفرك مومنة مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخر-

"কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশিও হয়ে যেতে পারে।"[২৬]

কেননা, কোন নারীই খারাবীর প্রতিমূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলে অনেকগুলো গুণও তার থাকতে পারে। সে কারণে কোন কিছু খারাপ লাগলে অমনি অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভাল দিকের উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সেজন্যে অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য।[২৭]

আল্লামা আহমাদুল বানা উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

"কোন মু'মিনের উচিত নয় অপর কোন মু'মিন স্ত্রীলোক সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করা, যার ফলে চুড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে মেয়েলোকটির ভাল গুণের খাতিরে তার দোষ ও খারাবী ক্ষমা করে দেয়া আর তার মধ্যে ঘৃণাই যা আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা; বরং তার প্রতি ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করা। হতে পারে তার স্বভাব-অভ্যাস খারাপ; কিন্তু সে বড় দ্বীনদার কিংবা সুন্দরী রূপসী বা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পন্ন অথবা স্বামীর জন্যে জীবন সঙ্গিনী।"[২৮]

২৬। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৯০

২৭। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

২৮। আল্লামা আহমাদুল বান্না (র.), ***বুলুগুল 'আমানী'*** প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ২৩৪
মূল আরবী পাঠঃ
والمعنى ان شان المؤمن ان لاتيغاض المؤمنة بعضا كليا يحمله على فراقها بل ينبغى له ان يغفر سيئتها الحسنتها و بيغلض عما يكره بما يحب كئان تكون سيئه الخلق لكنها دينيه او جميلة او عفيفه او رقيقة به-

আল্লামা শাওকানী এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"এ হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে বসবাস করার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনি তার কোন এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধও করা হয়েছে। কেননা, তার মধ্যে এমন কোন গুণ থাকবে, যার দরুণ সে তার প্রতি খুশি হতে পারবে।"[২৯]

মহনাবী (সা.) এজন্যেই স্বামীদের স্পষ্ট নসীহত করেছেন ঃ

استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ضلع وانه اعوج شئ فى الضلع اعلاة فان ذهبت تقيمه كرته وان تركته اعوج فاستوصوا بالنساء-

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সবসময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্যে আমার এ নসীহত কবুল করো। কেননা,নারীরা জন্মগত ভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোড় পূর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে অমনি ছেড়ে দাও তবে সে সবসময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব, বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহন করবে।"[৩০]

হযরত আবূ হরায়ারা (র.) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

المراة كا الضلع ان اقمها كسرتها وان استمعت بها استمعت بها وفيها عوجٌ-

"মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মতো। তাকে সোজা করতে চাবে তো তাকে চূর্ন-করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করতে হবে।"[৩১]

২৯। আল্লামা শাওকানী (র.), ***নাইলুল আওতার,*** প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.৩৫৯
মূল আরবী পাঠঃ
فيه الارشار الى حسن العشرة والنهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من اخلاقها فانها لا تخلو مع ذلك عن امر يرضاه منها-

৩০। মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (র.), ***সহীহ বুখারী,*** নারীদের নসীহত অধ্যায়ঃ উপরোক্ত হাদীসের মানে বদরুদ্দীন ভাষায় নিম্নরূপ ঃ
اصيكم بالنساء خيرا فاقبلوا وصيتى فيهن فانهن خلقن من ضلغ-
"আমি মেয়ে লোকদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তাদের সম্পর্কে আমার দেয়া এ নসীহত অবশ্যই কবুল করবে। কেননা, তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পাজরের হাড় থেকে।" (বদরুদ্দীন 'আইনী, উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ১৬৬); মেয়েলোকদের হাড় থেকে সৃষ্টি করার মানে কি? বদরুদ্দীন 'আইনী এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ
استعر الضلع للعوج اى خلقن خلقا فيه اعواجاج فكانهن خلقن من اصل معوج فلا يتهيا الانتفاع بهن الابمدار تهن الصبر على اعوجاجهن
"পাঁজর থেকে সৃষ্টি কথাটা বক্রতা বোঝার জন্যে অর্থে বলা হয়েছ। তার অর্থ হচ্ছে যে, মেয়েদের এমন এক ধরণের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা-বাঁকা হওয়া। অর্থাৎ মেয়েদের এক বাঁকা মূল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তাদের দ্বারা কোনরূপ উপকারিতা লাভ করা সম্ভব কেবল তখনি, যদি তাদের মেজাজ স্বভাবের প্রতি পূর্নরূপে সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয় এবং তাদের বাঁকা স্বভাবের দরুন কখনো ধৈর্য হারানো না হওয়া।" বদরুদ্দীন 'আইনী উমদাতুল ক্বারী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১৬৬

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। এ বক্রতা সম্পূর্নরূপে দূর করা কখনো সম্ভব হবে না। তবে তাদের আসল প্রকৃতিকে বজায় রেখেই এবং তাদের স্বভাবকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাদেরকে দিয়ে সুমধুর পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে, সম্ভব তাদের সহযোগিতায় কল্যাণময় সমাজ গড়া। আর তা হচ্ছে তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে অত্যন্ত দরদ ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করা এবং তাদের মন রক্ষা করতে শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া ও যেতে রাজি থাকা।

আল্লামা শাওকানী (র.) এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেনঃ

"মেয়েলোকদের পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, انها معوجة الاخلاق لاتسقيم ابدا- মেয়েরা স্বভাবতই বাঁকা, তাদের সোজা করা সম্ভব নয়। যদি কেই তাকে ঠিক করতে চেষ্টা করে তবে সে তাকে ভেঙ্গে-চূরে ফেলবে, নষ্ট করবে। আর তাকে যেমন আছে তেমনি থাকবে, সে তার দ্বারা অশেষ কল্যাণকর কাজ করাতে পারবে। ঠিক যেমন পাঁজরের হাড়। তাকে বানানোই হয়েছে বাঁকা, তাকে সোজা করতে যাওয়া মানে তাকে ভেঙ্গে ফেলা-চূর্ণ করা। আর যদি তাকে বাঁকাই থাকতে দেয়া হয়, তবে তা দেহকে সঠিক কাজে সাহায্য করতে পাবে।

তিনি আরো লিখেছেনঃ

والحديث فيه الارشاد الى ملاطفة النساء والصبر على مالا يستقيم من اخلاقهن والتنبيه على انهن خلقن على تلك صفة التى لا يفيد معها التاديب ولاينجح عندها النصح فلم يبق ولا الصبر والمحاسنه وترك التأنيب والمحاشنة-

এ হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে যে, মেয়েলোকদের সাথে সব সময়ই ভাল ও আন্তরিকপূর্ন ব্যবহার করতে হবে। তাদের স্বভাব-চরিত্র বক্রতা থাকলে অসীম ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। আর সমাধান করে দেয়া হয়েছে যে, মেয়েরা এমন এক স্বভাবের সৃষ্টি, যাকে আদব-কায়দা শিখিয়ে অন্যরকম বানানো সম্ভব নয়। স্বভাব বিরোধী নসীহত উপদেশও সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই ধৈয্যধারণ করে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাকে ভর্ৎসনা করা এবং তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা সম্পূর্ন বর্জন করা ছাড়া পুরুষের গত্যন্তর নেই।"[৩২]

নারীদের এমন এ বাঁকা স্বভাব দেখে তাদের এমনি ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, বরং ভাল ব্যবহার ও অনুকুল পরিবেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করাই পুরুষের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার সব সময়ই প্রয়োজন, তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। সেই সঙ্গে মেয়েদের অনেক "দোষ" ক্ষমা করে দেয়ার গুণও অর্জন করতে হবে স্বামীদের। খুঁটিনাটি ও ছোটখাটো দোষ দেখেই চটে যাওয়া কোন স্বামীরই উচিত হবে না।[৩৩]

৩১। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত

৩২। আল্লামা শাওকানী, ***নাইলুল আওতার,*** প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.৩৫৮

৩৩। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের স্বভাবগত দোষের দিক ছাড়া তার ভাল ও মহৎ গুণের দিকও অনেক রয়েছে। তারা খুব কষ্টসহিষ্ণু, অল্পেতুষ্ট, স্বামীর জন্যে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালান-পালনের কাজ নারীরা–মায়েরা যে কতখানি কষ্ট সহ্য করে সম্পন্ন করে থাকে, পুরুষদের পক্ষে তা অনুমান পর্যন্ত করা সহজ নয়। এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। ঘর সংসারের কাজ করায় ও ব্যবস্থাপনায় তারা অত্যন্ত সিদ্ধান্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, তাদের মধ্যে দোষের দিকের তুলনায় গুণের দিক অনেক বেশী।

একজন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ পুরুষদের লক্ষ্য করে বলেছেনঃ

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব জনিত কঠিন ও দুঃসহ যন্ত্রণার কথা একবার চিন্তা করো। দেখো, নারী জাতি দুনিয়ায় কত শত কষ্ট ব্যথা-বেদনা ও বিপদের ঝুকি নিজেদের মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা যদি পুরুষের ন্যায় ধৈর্যহীনা হতো, তাহলে এতোসব কষ্ট তারা কি করে বরদাশ্‌ত করতে পারত? প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব মানবতার এ এক বিরাট সৌভাগ্য যে, মায়ের জাতি স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু, তাদের অনুভূতি পুরুষদের মতো নাজুক ও স্পর্শকাতর নয়। অন্যথায় পুরুষের এসব নাজুক ও কঠিন কষ্টকর কাজের দায়িত্ব পালন সম্পূর্ন অসম্ভব ছিল।[৩৪]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শণই যার কথার ধরণ, তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন-যাপন করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি ক্ষমাসহিষ্ণুতা প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুর'আন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব, তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর তাদের উপর বেশী চাপ প্রয়োগ না করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে আল্লাহ নিজেই বেশী ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৩৫]

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭
৩৫। আল-কুর'আন, ৬৪:১৪

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুখ শান্তির বেশীর ভাগই নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির উপর। তাই সুন্দর ও আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা প্রত্যেক মু'মিনেরই দায়িত্ব। বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। এ জীবনে তারা একজনের উপর আরেকজন কিছুটা অধিকার লাভ করে। একজনের প্রতি আরেকজনের উপর অর্পিত হয় কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। দাম্পত্য জীবনকে সুখী সমৃদ্ধশালী করার জন্যে তাদের দু'জনই দু'জনের উপর সে অধিকার লাভ করবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রত্যেককে দান করেছেন। তাদের উভয়কে উভয়ের প্রতি সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করতে হবে যা ইসলামী শরী'আত তাদের উপর অর্পন করেছে। সর্বপরি তাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের থাকতে হবে নিষকলুষ আন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম ও ভালবাসা এবং আবেগ উদ্দীপ্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পরিক। একজনের যা অধিকার অপরজনের অনেকাংশে তা দায়িত্ব। দাম্পত্য জীবনের (স্বামী-স্ত্রীর) এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যেই রয়েছে পারিবারিক কল্যাণ।

স্বামীর অধিকার

১. পরিবার পরিচালনা ও কর্তৃত্বের অধিকার

পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী একজনের দায়িত্ব থাকা দরকার। পারিবারিক শৃংখলা রক্ষার জন্যে এটা অত্যন্ত জরুরী। ইসলামী জীবন বিধান দাম্পত্য জীবনের যে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাতে পুরুষকে কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কুর'আন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের পরিচালক কর্তা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে একজনের উপর আরেকজনের মর্যাদা দান করেছেন এবং পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"[৭৬]

তাই পুরুষের রয়েছে কর্তৃত্বের [৭৭] অধিকার। তারা পরিবার পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। পরিবারের জন্যে উপার্জন ও রুজী-রোজগার করবে। পরিবারের স্ত্রী পরিজনের ব্যয়ভারের, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। নারীকে পুরুষের অনুগত্য করে চলতে হবে। পরিবারের ভরণ-পোষণের কোন দায় দায়িত্ব স্ত্রীর নেই। স্ত্রী সর্বদা স্বামীর আদেশ মেনে চলবে।

৭৬। আল-কুর'আন, ৪:৩৪

৭৭। قوّام 'কাওয়াম' (Sustainer, Provider) কর্তা, রক্ষক, (Protector), অভিভাবক, পরিচালক। (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদ্দী, স্বামী স্ত্রীর অধকার, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মুসা, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯২, পৃ.২৯ ইবনুল আরাবী قوّام শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ -قوّام هو امين عليها يتوتى امرها ويصلحها فى حالها
"স্বামী "কাওয়াম" এর অর্থ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর আমানতদার, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তার যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল, কর্তা এবং তার অবস্থার সংশোধনকারী ও কল্যাণ বিধানকারী।" (আহকামুল কুর'আন, খ.১, পৃ.৪১৬)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"অবশ্য পুরুষদের জন্যে তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।"[৭৮]

স্বামীর কর্তৃত্ব মানা ও স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তাই পরিবারের সার্বিক পরিচালনা ও কতৃত্ব করা স্বামীর অধিকার। অবশ্য স্বামীর এ অধিকার নিরংকুশ বা শর্তহীন নয়। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পরই স্বামীর আনুগত্য করা যাবে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে বাদ দিয়ে স্বামীর অনুগত্য করা চলবে না। অথবা আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি মূলক অনুগত্যও বিধেয় নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ

لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق

"স্রষ্টার নাফরমানীতে সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না।"[৭৯]

তাই আল্লাহর দাসত্ব, এবাদত-বন্দেগী ও আনগত্য প্রদানে যদি স্বামী বাধ সাধেন তবে তা মানা স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এমনকি স্বামীর শরী'আত বিরোধী কার্যক্রমে হেকমতের সাথে বাধা প্রদান এবং তা থেকে স্বামীকে বিরত রাখাও একজন মুসলিম নারীর কর্তব্য। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর উপর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছেন যে, সে যদি যথার্থভাবে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী তার কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে না পারে তবে তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

الرجال راع على اهله وهو مسئول-

"পুরুষ তার পরিজনের পরিচালক এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে।"[৮০]

ইসলাম স্ত্রীর উপর স্বামীকে যে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছে, সে সম্পর্কে শাহ্ ওলী উল্লাহ দিহলবী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় লিখেছেনঃ

"স্ত্রীর উপর স্বামীকে কর্তা ও পরিচালক নিযুক্ত করাটা অবশ্য জরুরী কাজ। আর এ প্রাধান্য একটা প্রকৃতগত ব্যাপারও বটে। কারণ পুরুষ অধিক জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন। শাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে অধিকতর দক্ষ। সাহায্য ও সহযোগিতার কাজে অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন। অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ ও অশ্লীল কাজ প্রতিরোধের কাজে সে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। তাছাড়া পুরুষ স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেও কর্তৃত্বশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৮১]

৭৮। আল-কুর'আন, ২:২২৮

৭৯। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, নিকাহ অধ্যায়, হাদীস নং-

৮০। প্রাগুক্ত,

৮১। আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৮

পুরুষদেরকে প্রকৃতগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা দান করেছেন যা নারীদের দেয়া হয়নি বা অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। এ কারণে পারিবারিক সংস্থায় পুরুষই ব্যবস্থাপক হওয়ার যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে নারীদেরকে প্রকৃতগতভাবেই এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে দাম্পত্য জীবনে পুরুষদের হিফাযত ও তত্ত্বধানের অধীন হয়ে থাকাই তাদের বাঞ্চনীয়।[৮২] পরিবারের স্বামীর কর্তৃত্ব ও স্ত্রীর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে পারিবারিক প্রকৃত কল্যাণ।

২. স্ত্রীর গোপন বিষয়সমূহের হিফাযত

স্ত্রীর উপর স্বামীর একটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে, সে স্বামীর গোপন বিষয়সমূহ হিফাযত করবে, যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করবে। স্বামীর যাবতীয় আমনত রক্ষা করবে। স্বামীর কোন গোপনীয়তা কখনো প্রকাশ করবে না, স্বামীর সম্মান হানী করবে না।

স্বামীর জন্য অমর্যাদাকর হবে এমন কোন কথা কখনো বলবে না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজেকে পূর্ন হিফাযত করবে। এ ব্যাপারে কুর'আন মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"পূন্যবতী নারীরা হয়ে থাকে অনুগত অনুরক্ত আল্লাহর অনুগ্রহে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার গোপনীয় বিষয়ের হিফাযত কারী।[৮৩]

নারী সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন المراة راعية على بيت زوجها

"এবং নারী-স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণা বেক্ষণকারীণী, কত্রী।"[৮৪]

৮২। আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেছেন ঃ "পুরুষেরা স্ত্রীদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা এমনভাবে করে, ঠিক যেমনভাবে শাসকগণ করে থাকেন (বা করা উচিত) দেশের জনসাধারণের। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের দু'টি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। একটি কারণ আল্লাহর বিশেষ দান সম্পর্কীয়, আর অপরটি পুরুষদের নিজেস্ব অর্জনের ব্যাপারে। আল্লাহর দান এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নানা দিক দিয়ে পুরুষদের বিশিষ্ট করেছেন। স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও গুরুতর কার্য সম্পাদন, বিপুল কর্মশক্তি প্রকৃতির দিক দিয়ে পুরুষগণ সাধারণতই প্রধান ও বিশিষ্ট। এজন্যই নবুয়ত, সামাজিক নেতৃত্ব, শাসন ক্ষমতা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যে জিহাদ, বিচার কার্য পরিচালনা ইত্যাদির দায়িত্ব কেবল পুরুষের উপরই অর্পিত হয়েছে এবং সে দায়িত্ব অধিক হওয়ার কারণে মীরাস স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষদের অংশ বেশী দেয়া হয়েছে। (কাযী নাসীরুদ্দীন আবূ সাঈদ উমর আল বায়যাবী, ***আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল*** (তাফসীরে বায়যাবী), ইউ.পি, দারুল ফিরাস লিন নাশর, তা.বি, খ.১, পৃ. ১৮৫)

৮৩। আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৮৪। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, এ হাদীসের "راع" শব্দের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী লিখেছেনঃ

الراعى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظرة فكل من كان تحت نظرة شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه فى دينه ودنياه ومتعلقاته فان وفى ماعليه من الرعاية حصل له الحظ الاوفو والجزاء الاكبر وان كان غير ذلك طلبه كل احد من رعيته بحقه۔

"راع" হচ্ছে হিফাযকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্যে একান্ত বাধ্য। যে ব্যক্তির দায়িত্বেই যে কোন জিনিস দেয়া হবে, এমন প্রত্যেকেরই তেমন প্রত্যেকটি জিনিসে সুবিচার ও ইনসাফ করা এবং তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন করাই বিশেষ লক্ষ্য। এখন যার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে যদি তা পুরোপুরি পালন করে, তবে সে পূর্ন অংশই লাভ করল অধিকারী হলে বিরাট পুরুষ্কার লাভের, আর যদি তা না করে, তবে দায়িত্বের প্রত্যেকটি জিনিসই তার অধিকার দাবী করবে।" (আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ.১০)

নবী করীম (সা.) আরো বলেছেনঃ

خير النساء امراة اذا نظرت اليها سرّتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظت فى مالك ونفسك۔

তোমার সর্বোত্তম স্ত্রী হচ্ছে সেই স্ত্রী যাকে দেখলে তোমার মন খুশী হয়, যাকে কোন কাজ করতে বললে সে তা মেনে নেয়। তুমি যখন ঘরে অনুপস্থিত থাকো তখন সে ধন-সম্পদ ও তার নিজেকে হিফাযত করে।"[৮৫]

৩. স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান ও তার অনুগত্য

স্বামীর আরেকটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট থাকবে। সে হবে পূর্ন স্বামীগত প্রাণ। তার আচার আচরণ হবে কোমল ও বিনয়ী, কথা বার্তায় হবে সে নম্র-ভদ্র, বিনয়, আনুগত্য ও স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে সর্বদা সচেষ্ট থাকা হবে তার ভূষণ। স্বামীর এ অধিকারটি সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

"সতী-সাধবী নারীরা একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে।"[৮৬]

স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্যেই তার অনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেনঃ

المراة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاوعت بعلها فلتدخل من اى ابوات الجنة شائت۔

"স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত পড়ে, যদি রমযানের একমাস ফরয রোযা রাখে, যদি তার যৌন অঙ্গের পবিত্রতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে অবশ্যই বেহেশতের যে দুয়ার দিয়েই ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।"[৮৭]

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্য করাকে নামায-রোযা ও সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একেত্ত সেসব কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় হাদীসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, স্ত্রীর উপর যেমন আল্লাহর হক রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বামীর অধিকার। স্ত্রীর যেমন কর্তব্য আল্লাহর হক আদায় করা, তেমনি কর্তব্য স্বামীর কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করা, স্বামীর যাবতীয় অধিকার পূরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। স্বামীর অধিকার আদায় না করে স্ত্রীর জৈবিক জীবন তেমনি সাফল্য মন্ডিত হতে পারে না, যেমন আল্লাহর হক আদায় না করে সফল হতে পারে না তার নৈতিক ও পরকালীন জীবন। শুধু তাই না, স্বামীর হক আদায় না করলে আল্লাহর হকও আদায় করা যায় না।

৮৫। ইবনে মাজাহ এখানে গোপনীয় বস্তু বলতে সে জিনিসকেই বুঝানো হয়েছে, যার উপর কেবল স্বামীরই একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং তার অনুপস্থিতিতে আমানত স্বরূপ স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত থাকে। এ গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বংশ সংরক্ষণ, বীর্যপালন, ইযযত রক্ষা ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা। মোটকথা, এর মধ্যে এ সব কিছুই এসে যায়। এগুলোর পূর্ন সংরক্ষণ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার।

৮৬। আল-কুর'আন, ৪:৩৪

৮৭। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি., নিকাহ অধ্যায়, পৃ. ১৩২

রাসূল (সা.) খুবই জোরালো ভাষায় বলেছেন ঃ

والذى نفس محمد بيده لاتؤدى المراة حتى ربها حتى تودى حق زوجها ولوسالها نفسها وهو على قتب لم تمنعه –

"যার মুষ্টিতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ-জীবন, তাঁর শপথ, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর হক আদায় না করবে, ততক্ষণ সে তার আল্লাহর হকও আদায় করতে পারবে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে পেতে চায় যখন সে সাওয়ার হয়ে যাচ্ছে তবে তখনো সে স্বামীকে নিষেধ করতে পারবে না।"[৮৮]

বস্তুত স্বামীর হক আদায় করার জন্যে দরকার তার আনুগত্য করা, তার কথা ও তার দাবী অনুযায়ী কাজ করা। এজন্যে সর্বোত্তম স্ত্রী কে এবং কি তার গুণ এ ধরণের এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলে করীম (সা.) বলেছে ঃ

التى تره اذا نظر وتطيعد اذا امر ولاتخالفه فى نفسها ولامالها بها يكره-

"সে হচ্ছে সেই স্ত্রীলোক, যাকে স্বামী দেখে সন্তুষ্ট হবে যে স্বামীর অনুগত্য করবে এবং তার নিজের স্বামীর ধন-মালে স্বামীর মতের বিরোধীতা করবে না- এমন কাজ করবে না, যা সে পছন্দ করে না।"[৮৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর যেমন কর্তব্য, তেমনি অত্যন্ত বিরাট মর্যাদা ও মাহাত্মের ব্যাপারও বটে। নিম্নোক্ত হাদীসে এ মর্যাদা ও মাহাত্মের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

ما استفاء المومن بعد تقوى الله خير له من زوجه صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عيها نصحته في نفسها وماله-

"মুসলিমের জন্য তাকওয়ার পর সবচেয়ে উত্তম জিনিস হচ্ছে নেককার চরিত্রবতী স্ত্রী – এমন স্ত্রী, সে স্বামীর আদেশ মেনে চলে, স্বামী তার প্রতি তাকালে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামী কোন বিষয়ে কসম দিলে সে তা পূরণ করবে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের ও স্বামীর ধন-মালের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণকারী হবে।"[৯০]

আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার পর সব মুসলিম পুরুষের জন্যেই সর্বোত্তম সৌভাগ্যের সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধবী, সুদর্শনা অনুগত্যা স্ত্রী। প্রিয়তম স্বামীর সে একান্ত প্রিয়তমা, স্বামীর প্রতিটি কথায় উৎসর্গকৃতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সে অত্যন্ত সজাগ আর এ রকম স্ত্রী যেমন একজন স্বামীর পক্ষে গৌরব ও মাহাত্মের ব্যাপার, তেমনি এ ধরনের স্ত্রীও অত্যন্ত ভাগ্যবতী।

৮৮। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ, (কলিকাতা: বশীর হোসাইন এ সন্স-১৯৭৩) কিতাব আন নিকাহ, পৃ. ১৩২

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৯০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৪. অবাধ্য স্ত্রীকে শাসনের অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর মধ্যে ঔদ্ধত্য, অহংকার ও অবাধ্যতা দেখা দিলে তাকে শাসন করার অধিকার স্বামীর আছে। স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য না করে, কিংবা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) তথা ইসলাম স্বামীকে যেসব অধিকার প্রদান করেছেন স্ত্রী যদি তার কোন একটি অধিকার খর্ব করে তাহলে স্বামী প্রথমে তাকে উপদেশ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করবে। এতে স্ত্রী শুধরে না গেলে স্বামী তার আচরণে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করবে। তাতেও না শুধরালে স্বামী তাকে মারধোরও করতে পারবে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"এবং যাদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে উপদেশ দান কর, তাদের বিছানা আলাদা করে দাও এবং তাদেরকে মারধোর কর, অতঃপর যদি তারা অনুগত্য করে তবে কোন বাহানা তালাশ করো না, আল্লাহ অনেক উচ্চ অনেক বড়।"[৯১]

এখানে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য স্ত্রীদেরকে ক্রমিক পদ্ধতিতে আনুগত্যশীল করতে বলে দিয়েছেন। প্রথমে তাকে বুঝাতে হবে। তাতেও কাজ না হলে তাদের বিছানা পৃথক করে মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে, তাতেও কাজ না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের অধিকার প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায় স্ত্রীর আধ্যতার কারণে এবং যেহেতু সে সংশোধনের পথে আসছে না তাকে হালকাভাবে মারধোর করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে শাসন করার অধিকার রয়েছে স্বামীর। কিন্তু নবী (সা.) শর্ত আরোপ করেছেন যে, বেদম মার যেন না হয়।

واضربوهن اذا عصيكم فى المعروف ضربا غير مبرح ولايضرت الوجه ولايقبح-

"যদি তারা তোমাদের ন্যায় সংগত আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাদেরকে এরূপ মারধোর কর যেন তা অধিক যন্ত্রনাদায়ক না হয় মুখাবয়বে আঘাত করা যাবে না এবং গালি-গালাজও করা যাবে না।"[৯২]

৯১। আল-কুর'আন, ৪:৩৪; অত্র আয়াতে واهجرهن فى المضاجع "বিছানায় তাদের ছেড়ে দাও" বলে শাস্তিস্বরূপ সহবাস বর্জন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিছানা আলগের সময় সীমা হবে চার মাস। যে স্ত্রী এতটা অবাধ্য ও উদ্ধত মস্তিষ্ক যে, স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে তার সাথে শোয়া পরিত্যাগ করেছে এবং সে এও জানে যে, চার মাস পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান থাকার পর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী স্বামী তাকে তালাক দিবে, এরপরও সে নিজের অবাধ্যচরণ থেকে বিরত হয় না, তাকে বর্জন করাই উপযুক্ত কাজ। (মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২)

৯২। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অপরাধের তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া হচ্ছে যুলুম। যে অপরাধের ক্ষেত্রে উপদেশই যথেষ্ট সেখানে কথাবার্তা বন্ধ রাখা যেখানে কথাবার্তা বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

রাখাই যথেষ্ট সেখানে সহাবস্থান বর্জন করা এবং যেক্ষেত্রে বিছানা পৃথক করে দেয়াই যথেষ্ট সেখানে মারধোর করা যুলুম পরিগণিত হবে। কেননা মারধোর হচ্ছে সর্বশেষ শাস্তি, যা কেবল মারাত্মক ও অসহনীয় অপরাধের জন্যেই দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানে নবী করীম (সা.) কর্তৃক সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সীমালংঘন করলে স্বামীর বাড়াবাড়ি হবে এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকারিনী হবে।

৫. যৌন চাহিদা পূরণ ও পরিতৃপ্তি লাভের অধিকার

বিয়ের মৌল বিষয় হলো স্বামী-স্ত্রীর যৌন বৈধতা অর্জন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই প্রকৃতিগতভাবে যৌন চাহিদা থাকা স্বাভাবিক। বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বামীর যৌন চাহাদা পূরণে স্ত্রী এগিয়ে আসবে, স্ত্রীর চাহিদা পুরণে স্বামী এগিয়ে যাবে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন সূত্র অবলম্বন করা যাবে না। অন্য কোন ধরণের যৌন সম্পর্ক রক্ষা করা বা সম্পর্ক স্থাপন ইসলামে সম্পূর্ন হারাম ও পরিত্যাজ্য। তাই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক হবে পরিপূর্ন যাতে উভয়ের পূর্ন পরিতৃপ্তি লাভ হয়। যেন যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অন্য কোন দিকে স্বামী বা স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়। এভাবে বিয়ের মাধ্যমে একটি পবিত্র সমাজ গড়ে উঠবে। যেখানে থাকবে না কোন অবৈধ যৌন সম্পর্ক। কোন জ্বেনা-ব্যভিচার। বিবাহিত নারী-পুরুষের জ্বেনা-ব্যভিচারের কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা (জনসমক্ষে পাথর নিক্ষেপ হত্যা) এজন্যেই নির্ধারিত ব্যবস্থা হয়েছে। তাই স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীকে যৌন চাহিদা পূরণে পরিপূর্ন তৃপ্তিদান আর স্বামীর অধিকার হলো স্ত্রী থেকে যৌন চাহিদা পূরণে পরিপূর্ন তৃপ্তিলাভ। এভাবে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত কোন স্বামী অন্য কোন মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক নয়। স্বামীর এ দাবী পূরণে স্ত্রীকে যে কোন সময় সাড়া দিতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, “যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে ডাকে তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়- যদিও সে চুলার কাজে রত থাকে।”[৯৩]

অপর এক হাদীসে এর চেয়েও কড়া কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح-

“স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহবান করে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে), তখন যদি সে সাড়া না দেয় অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার উপর অভিশাপ বর্ষন করতে থাকে।”[৯৪]

৯৩। শায়খ ওয়ালীউদ্দীন, ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি., হাদীস নং- ৪০১৮ মূল আরবী পাঠঃ - اذا الرجل دعا زوجته لحاجته خالت له وان كانت على التنور

৯৪। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন ‘আইনী লিখেছেন: হাদীসটি থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ ঘটনা যখন রাত্রী বেলা হয়, তখনই ফেরেশতারা অস্বীকারকারী স্ত্রীর উপর অভিশাপ বর্ষন করে; কিন্তু আসলে কেবল রাতের বেলার কথাই নয়, দিনের বেলাও এরূপ হলে ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু যৌন মিলনের কাজ সাধারণত রাতের বেলাই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এজন্যে রাসূল করীম (সা.) রাতের বেলার কথা বলেছেন। মূলত এ কথা রাত ও দিন উভয় সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য। (উমদাতুল কারী, খ.২০, পৃ. ১-৩)

অপর এত হাদীসে এ কথাটি অধিকতর তীব্র ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছেঃ

والذى نفسى بيده ما من رجل يدعوا امراته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عيها-

"যার হাতে আমার তার শপথ করে বলছি যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি তার স্ত্রী অমান্য করে – যৌন মিলনে রাজি হয়ে তার কাছে না যায়, তবে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।"[৯৫]

অনুরূপ আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

ثلاثة لاتقبل لهم صلاة لا يصعد لهم الى السماء حسنة العبد الابق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمراة الساخط عليها زوجها حتى يرجع-

"তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উত্থিত হয় না তাদের কোন নেক কাজও। তারা হচ্ছে ঃ পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসবে, নেশাখোর, মাতাল–যতক্ষণ না সে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হবে এবং সেই স্ত্রী, যার স্বামী তার প্রতি অসন্তষ্ট যতক্ষণ না তার স্বামী সন্তুষ্ট হবে।"[৯৬]

ইবনে জাওজীর 'কিতাবুন্ নিসা'য় উদ্ধৃত অপর এক হাদীসে আরো বিস্তৃত কথা বলেছেন–হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেনঃ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والغلسة- اما المسوفة فهى المراة التى اذا ارادها زوجها قالت سوف والمغلسة هى التى اذا ارادها قالت انى حائض وليست بحائض-

রাসূলে করীম (সা.) 'মুসবিফা' ও 'মুগলিসা'র উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। 'মুসবিফা' বলতে বুঝায় সে নারী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহবান জানালে সে বলেঃ এই শীগগিরই আসছি' আর 'সুগলিসা' হচ্ছে সেই নারী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহবান জানালে সে বলে, 'আমার হায়েয হয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ঋতু অবস্থায় নয়।"[৯৭]

অবশ্য এ ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা ও ভাবধারার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী যদি নিতান্ত পশু হয়ে না থাকে, তার মধ্যে থেকে থাকে মনুষ্যত্ব সুলভ কোমল গুণাবলী, তাহলে সে কিছুতেই স্ত্রীর মরজী-মনোভাবের বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে যৌন মিলনের পাশবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে যাবে না। সে অবশ্যই স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত মানবিক সুবিধা-অসুবিধার, আনুকূল্য-প্রতিকূলতা সম্পর্কে খেয়াল রাখবে এবং খেয়াল রেখেই অগ্রসর হবে।

৯৫। আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, বিবাহ অধ্যায়, হাদীস নং- ৩৬১৪,

৯৬। প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬১৫

৯৭। বদরুদ্দীন 'আইনী, *উমদাতুল কারী*, খ. ২, পৃ. ১-৫

উপরে উদ্ধৃত হাদীস সমূহ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه بغير عذر شرعى-

"এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রকার শরী'আত সম্পর্কিত ওযর বা কারণ ছাড়া স্বামীর শয্যায় স্থান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর পক্ষে হারাম।"[৯৮]

ইসলামে এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেবলমাত্র এজন্যে যে, সমাজের লোকদের পবিত্রতা, নিষ্কলুষ চরিত্র ও দাম্পত্য জীবনের অপরিসীম তৃপ্তি ও সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালবাসা ও মাধুর্য রক্ষার জন্যে এ বিষয়গুলো অপরিহার্য। আর এ কারণেই নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম এর যুগে স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের সুন্তুষ্টি বিধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। এমন কি কোন স্বামীর প্রত্যাখ্যান তার স্ত্রীর এ কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করতে পারত না। হাদীসে ও সাহাবীদের জীবন চরিত্রে এ পর্যায়ের ভূরি ভূরি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬. সহাস্যবদনে স্বামীর অভ্যর্থনা

স্বামী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসে, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে ও সহাস্যবদনে তাকে অভ্যর্থনা করা স্বাগতম জানানো। কারণ স্ত্রীর স্মিতহাস্যে বিরাট আকর্ষণ রয়েছে, তার দরুণ স্বামীর মনের জগতে এমন মধুভরা মলয়-হিল্লোল বয়ে যায় যে, তার হৃদয় জগতের সব গ্লানিমা-শ্রান্তি-কান্তি জনিত সব বিষাদ-ছায়া সহসাই দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যত কান্ত-শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুন না কেন এবং তার হৃদয় যত বড় দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতায়ই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ন হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমিষেই ভুলে যেতে পারে। যে সব স্ত্রী স্বামীর সামনে গোমরা মুখ হয়ে থাকে, প্রাণখোলা কথা বলে না স্বামীর সাথে, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নিতে জানে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর ও পরিবারকে বিষায়িত করে তোলে। রাসূলে করীম (সা.) একারণেই ভালো স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ

وان نظر اليها سرته-

"স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। (স্বামী স্ত্রীকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে)।"[৯৯]

৭. স্বামীর গুণের স্বীকৃতি

স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার জন্যে সধ্যানুযায়ী উপহার উপঢৌকন নিয়ে আসে, তার সুখ-শান্তির জন্যে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহন করে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর এসব কাজের দরুণ আন্তরিক ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞাতা স্বীকার করা। অন্যথায় স্বামীর মনে হতাশা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ

৯৮। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪৬৪

৯৯। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

لاينظر الله الى امراة لاتشكر زوجها-

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ তা'আলা এমন স্ত্রী লোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভাল ভাল কাজের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না।"[১০০]

এ শুকরিয়া যে সব সময় মুখে ও কথায় জ্ঞাপন করতে হবে, এমন কোন জরুরী শর্ত নেই। শুকরিয়া জ্ঞাপনের নানা উপায় হতে পারে। কাজে-কর্মে, আলাপে-ব্যবহারে স্বামীকে বরণ করে নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর মনের কৃতজ্ঞতা ও উৎফুল্লতা প্রকাশ পেলেও স্বামী বুঝতে পারে যে, তার ব্যবহারে তার স্ত্রী তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ এবং সে তারজন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করছে, তা সে অন্তর দিয়ে স্বীকার করে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এগারো জন স্ত্রীলোকের এক বৈঠকের উল্লেখ রয়েছে। ড়তাতে প্রত্যেক স্ত্রীহ নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে বর্ণনা দানের প্রতিশ্রুতি গ্রহন করে এবং তার পরে প্রত্যেকেই তা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর খুবই প্রশংসা করে। এ প্রশংসা করা যে অন্যায় নয় এবং অনেক সময় প্রয়োজনীয় তা এ থেকে সহজেই বুঝা যায়। তাই এসম্পর্কে 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী লিখেছেনঃ

ومنها مدح الرجل فى جهه بما فيه اذا علم ان ذلك غير مفسدله ولامغير نفسه-

"এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর সম্মুখে তার প্রশংসা করা – বিশেষত যখন জানা যাবে যে, তার দরুন তার মেজাজ বিগড়ে যাবে না তার মন দুষ্ট হবে না সঙ্গত কাজ।"[১০১]

৮. তালাক প্রদানের অধিকার

দাম্পত্য জীবনে পুরুষকে অন্যতম অধিকার দেয়া হয়েছে তা হলো, যে স্ত্রী তার সাথে সে মিলেমিশে বসবাস করতে পারবে না তাকে তালাক দিবে। যেহেতু পুরুষ তার নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করেই স্বামীত্বের অধিকার অর্জন করে, সেহেতু সে সমস্ত অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে।[১০২]

১০০। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ, হাদীস নং-২০২২

১০১। আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী, ***উমদাতুল কারী,*** খ.২০, পৃ.১৭৮

১০২। একদল লোক পাশ্চাত্যের অনুকরণে এটা চাচ্ছে যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আদালতকে দেয়া হোক। যেমনটা তুরস্কে করা হয়েছে। কিন্তু এটা চুড়ান্ত ভাবে কুর'আন হাদীসের পরিপন্থী। কুর'আনে তালাকের আহ্‌কাম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিটি স্থানে তালাকের ক্রিয়াকে স্বামীর দিকে নির্দেশ করেছে:- واذا طلقتم النساء - وان طلقها - وان عزموا الطلاق ইত্যাদি। এথেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা কেবল স্বামীকে দেয়া হয়েছে। আবার কুর'আন পরিষ্কার ভাষায় স্বামীর সম্বন্ধে বলে بيده عقدة النكاح "বিবাহের বন্ধন তার (স্বামীর) হাতে" (আল-কুর'আন, ২:২৩৭)
এখন কার এ অধিকার আছে যে, এ বন্ধনকে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিচারকের হাতে তুলে দিবে। ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লমের কাছে এসে অভিযোগ করলো, "আমার মালিক তার এক দাসীকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছিল। এখন সে তাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।" এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ভাষণে বললেনঃ

يايها الناس مابال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق-

"হে লোকেরা! এ কেমন অদ্ভুত কথা যে, তোমাদের কেউ নিজের দাসীকে স্বীয় দাসের সাথে বিবাহ দেয়, আবার উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়? অথচ তালাকের ক্ষমতা কেবল স্বামীদেরই।"

নারীকে এ অধিকার দেয়া যেতে পারে না। কেননা যদি সে তালাক দেয়ার অধিকারী হতো তাহলে সে পুরুষের অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে যেত। এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে কোন জিনিস হাসিল করে, সে তা রক্ষার করার জন্যে শেষ চেষ্ঠা করে যাবে এবং কেবল তখনই তা ত্যাগ করবে যখন তা বর্জন করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু যদি অর্থ ব্যয় করে এক পক্ষ এবং তাদ্বারা হাসিল করা বস্তু ধ্বংস করার ক্ষমতা অপর পক্ষের জুটে যায়, তা হলে এ দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে এটা কমই আশা করা যায় যে, সে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার বেলায় অর্থ ব্যয়কারী প্রথম পক্ষের লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। সুতরাং পুরুষের হাতে তালাক প্রদান করা শুধু তার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করাই নয়; বরং এর ভেতর আর একটি বিচক্ষণতা রয়েছে যে, এতে তালাকের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে হবে না।

তালাক ও এর শর্তসমূহ

শরী'আতের পরিভাষায় 'তালাকের' অর্থ হচ্ছে 'বিচ্ছেদ' যার অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। পুরুষ তার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। পুরুষ মোহরের বিনিময়ে এ অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু শরী'আত তালাক পছন্দ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق-

"সমস্ত হালাল বস্তুর মধ্যে তালাকই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত।"[১০৩]

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলের নিম্নোক্ত বাণী থেকেও তালাকের ভয়াবহতা ও ভয়ংকরতা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। বাণীটি নিম্নরূপঃ

تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش-

"তোমরা বিয়ে করো, কিন্তু তালাক দিয় না, কেননা, তালাক দিলে আল্লাহ্ আরশ কেঁপে ওঠে।"[১০৪]

মহানবী (সা.) আরো বলেনঃ

تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لايحب الذواقين والذواقات-

"তোমরা বিয়ে কর, কিন্তু তালাক দিওনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সে সব নারী পুরুষকে পছন্দ করেন না যারা নিত্য-নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহন করতে অভ্যস্ত।"[১০৫]

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী অনুযায়ী তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিচারালয়ের হাতে তুলে দেয়া কখনো জায়েয নয়। যুক্তির দিক থেকেও তা হচ্ছে ভ্রান্ত পদক্ষেপ। এর পরিণাম এছাড়া আর কি হতে পারে যে,ইউরোপের মত আমাদের এখানেও পারিবারিক জীবনের লজ্জাকর বিপদ সমূহ ও অশোভনীয় ঘটনাবলী প্রচারিত হতে থাকবে।[১০৬]

এজন্যে পুরুষকে তালাকের স্বাধীন এখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে তাকে কতগুলো শর্তের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সে এ শর্তের আওতাধীনে কেবল সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে তার এ ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারবে।

১০৪। ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুর'আন*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি., খ. ১৮, পৃ. ২৪৯

১০৫। প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৩৩

১০৬। মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

কুর'আন মজীদের শিক্ষা হচ্ছে–স্ত্রী যদি তোমাদের অপছন্দনীয়ও হয় তবু যথাসাধ্য তার সাথে সদ্ভাভে মিলেমিশে জীবন-যাপন করার চেষ্টা করো। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"তোমরা (স্বামীরা) তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো। তারা (স্ত্রীরা) যদি তোমাদের মনের মতো না হয় তা হলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তার মধ্যে অফুরন্ত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।"[১০৭]

কিন্তু যদি মিলেমিশে না-ই থাকতে পারো। তাহলে তোমার (স্বামীর) এ অধিকার আছে যে, তাকে তালাক দাও। কিন্তু এক কথায় বিদায় করে দেয়া জায়েয নয়। এক এক মাসের ব্যবধানে এক এক তালাক দাও। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ তুমি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবে। হযতবা সমঝোতার কোন উপায় বেরিয়ে আসবে অথবা স্ত্রীর আচরণের মধ্যে পছন্দনীয় কোন পরিবর্তন এসে যেতে পারে।

অবশ্য এ সময়-সুযোগের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝাপড়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে ত্যাগ করাই তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় মাসে শেষ তালাক দাও অথবা পুনঃগ্রহন (রুজু) না করে ইদ্দাত অতিবাহিত হতে দাও।[১০৮]

এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা তালাক সম্পর্কিত বিরোধসমূহ নিম্নবর্ণিত উপায়ে মীমাংসা করা সম্ভব।

১. স্বামীকে যদিও তালাকের অধিকার দেয়া হয়েছে তবুও স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উভয়ের অধিকার ও উভয়ের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পন্ন হতে নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সা.)-এর এ মহামূল্য বাণীটি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছেঃ- الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته-

"হুশিয়ার, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১০৯]

والرجل راع على اهله وهو مسئول عن رعيته-

"পুরুষ দায়ী তার পরিবারবর্গের জন্যে। আর সেজন্যে সে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।"[১১০]

والمرأة راعيه على بيت زوجها وهو مسئولة عن رعيتها-

"স্ত্রী দায়ী তার স্বামীর ঘর বাড়ি ও যাবতীয় আসবাবপত্রের জন্যে এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১১১]

১০৭। আল-কুর'আন, ৪:১৯

১০৮। "তালাক প্রদানের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, তৃতীয় মাসে তৃতীয় তালাক না দিয়ে এমনিতেই হদ্দাতের সময় অতিবাহিত হতে দেয়া। এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে পুনর্বার বিবাহ হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে তা "মুগাল্লাযা"বা চুড়ান্ত তালাকে পরিণত হয়। এরপর 'তাহলীল' ছাড়া প্রাক্তন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিবাহ হতে পারে না। কিন্তু, দুঃখের বিষয় লোকেরা সাধারণত এ মাসআলা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং যখন তালাক দিতে উদ্যত হয়, একত্রে তিন তালাক ছুড়ে মারে। পরে অনুতপ্ত হয় এবং মুফতীদের কাছে গিয়ে ছল-চাতুরী করে বেড়ায়। (মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭)

১০৯। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, অধ্যায়: বিয়ে-শাদী, হাদীস নং-৪৮২৫

১১০। প্রাগুক্ত

১১১। প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এ দায়িত্ববোধ উভয়ের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত থাকলে পারিবারিক জীবনে কখনো ভাঙ্গন বা বিপর্যয় আসতে পারবে না। কখনো তালাকের প্রয়োজন দেখা দেবে না।

২. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীতে যখনই কোন প্রকার বিবাগ-বিবাদ বা মনোমালিন্য দেখা দিবে, তখনই তাদের উভয়ের জন্যে এ নসিহত রয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেন অপরের ব্যাপারে নিজের মধ্যে সহ্য শক্তির সংবৃদ্ধি রক্ষা করে, অপরের কোন কিছু অপছন্দ হলে বা ঘৃণাই হলেও সে যেন দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তা অকপটে বরদাশ্ত করতে চেষ্টা করে। কেননা, এ কথা সর্বজন বিদিত যে, পুরুষ ও স্ত্রী স্বভাব-প্রকৃতি, মন ও মেজাজ ও আলাপ ব্যবহার ইত্যাদির দিক দিয়ে পুরামাত্রায় সমান হতে পারে না। কাজেই অপরের অসহনীয় ব্যাপার সহ্য করে নেয়ার জন্যে নিজের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করা কর্তব্য।

৩. দাম্পত্য জীবন সংরক্ষণের এ ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, বিরোধ-বিরাগ ও মনোমালিন্যের মাত্রা যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত মীমাংসার জন্যে উভয়ের নিকট অত্মীয়দের আগ্রহে এগিয়ে আসা কর্তব্য। স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্বামীর পক্ষ থেকে একজন পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ বিধানের জন্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চেষ্টা চালাবে। কুর'আন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে এ ব্যবস্থারই নির্দেশ করা হয়েছেঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

"যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিরোধ মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে ভয় করো, তাহলে তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক পাঠাও। তারা দু'জন যদি বাস্তবিকই অবস্থার সংশোধন করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের সেজন্যে তাওফীক দান করবেন।"[১১২]

১১২। আল-কুর'আন, ৪:৩৫ ,উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত বিচারকদ্বয় এদের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকেই হতে হবে। فان الاقارب اعرف ببواطن الاحوال واطلب للصلاح "কেননা, নিকটাত্মীয়রাই প্রকৃত অবস্থার গভীরতর রূপের সন্ধান পেতে পারে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে এবং তারা অবশ্যই উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করার জন্যে সর্বাধিক আগ্রহী হয়ে থাকে।"('আল্লামা বায়যাবী (র.), তাফসীরুল বায়যাবী, খ.১, পৃ.১৭৬) বাইরের লোক এ মীমাংসা কাজে নিয়োগ না করে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আপনজন নিয়োগের নির্দেশ দেয়ার কারণ যে কি, তা আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস এর নিম্নোক্ত কথা থেকে জানা যায়। তিনি এ কারণ দর্শাতে গিয়ে লিখেছেন:

لئلا تبق الظنه اذا كانا اجنبيين بالميل الى احدهما فاذا كان احدهما من قبله والاخر من قبلها زالت الظنة وتكلم كل واحد منهما عمن هو من قبله-

"বাইরের লোক বিচারে বসলে তাদের কোন এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ার ধারণা হতে পারে; কিন্তু উভয়েরই আপন আত্মীয় যদি এ মীমাংসার ভার গ্রহন করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলে, তাহলে এধরণের কোনো ধারণার অবকাশ থাকে না – এজন্যেই আত্মীয় ও আপন লোককে এ বিরোধ মীমাংসার ভার দিতে বলা হয়েছে।" (আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস, ***আহকামুল কুরআন***, খ. ২, পৃ. ২৩১)

স্ত্রীর অধিকার

ইসলামী পরিবারে পারিবারিক কল্যাণ সাধনে স্বামী তার অধিকার পায় স্ত্রীর কাছে আর স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর প্রতি, বিপরীত ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার স্বামীর নিকট আর স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর প্রতি। ইসলামী পারিবারিক আইনের অধীনে দাম্পত্য জীবনের যে, নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকে পুরুষকে একজন কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এ মর্যাদার কারণেই স্বামীর উপর কতিপয় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা কিনা স্ত্রীর অধিকার। এ পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যেই পারিবারিক কল্যাণ নিহিত। ইসলাম পারিবারিক জীবনে এ কল্যাণের জন্যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অধিকারের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিম্নে স্ত্রীর অধিকারগুলোর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

১. মোহরানা লাভের অধিকার

স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করবে। কেননা বিবাহের মাধ্যমে স্বামী হিসেবে স্ত্রীর উপর তার যে অধিকার সৃষ্টি হয়েছে তা মোহরানার বিনিময়েই। পুরুষ স্ত্রীর উপর প্রকৃতগতভাবেই কর্তৃত্বের অধিকারী, কিন্তু কার্যত এ মর্যাদা মোহরানার আকারে ব্যয়িত অর্থের বিনিময়েই অর্জিত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

واتوا النساء صدقتهن نحلة

"এবং তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে আদায় করো।"[১১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"এ মুহরিম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্য সব নারীকে তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা করো। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে এবং অভাধ যৌনচর্চা প্রতিরোধের জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করছো তার চুক্তি অনুযায়ী তাদের মোহরানা পরিশোধ করো।"[১১৪]

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"অতএব, তোমরা দাসীদেরকে তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করো এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করো।"[১১৫]

১১৩। আল-কুর'আন, ৪:৪
১১৪। আল-কুর'আন, ৪:২৪
১১৫। আল-কুর'আন, ৪:২৫

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

এবং মোহরানা আদায়ের বিনিময়ে তোমাদের জন্যে সম্ভ্রান্ত ঈমানদার নারী এবং যাদের কাছে তোমাদের পূর্বে কিতাব পাঠানো পয়েছে (আহলে কিতাব) তাদের মধ্যকার সতী নারী হালাল করা হয়েছে।"[১১৬]

সুতরাং বিবাহের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে মোহরানার যে চুক্তি হয়ে থাকে তা পরিশোধ করা পুরুষের অপরিহার্য কর্তব্য, সে যদি চুক্তি মোতাবেক মোহরানা আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখার অধিকার রাখে। পুরুষের এটা এর্মান তক দায়িত্ব যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই। তার স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয় অথবা তার দারিদ্রের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করে দেয় অথবা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে খুশির সাথে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেয় তবে ভিন্ন কথা।

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের মোহরানার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা তৃপ্তির সাথে ভোগ করো।"[১১৭]

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"মোহরানার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পারস্পারিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণে কমবেশী করে নাও, তাহলে এতে কোন দোষ নেই।"[১১৮]

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"এবং মেয়েদের অলি গার্জিয়ানদের তাদের বিয়ে করো এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।"[১১৯]

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

"এবং মুহাররম মেয়েদের ছাড়া আর সব মহিলাকেই তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তোমরা তাদের গ্রহন করবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে।"[১২০]

২. স্ত্রীর খোর পোষের অধিকার

স্ত্রীর দ্বিতীয় অধিকার তথা স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ইসলামী আইন-বিধান স্বামী-স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রের সীমা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে ঘরে অবস্থান করা এবং পারিবারিক জিন্দেগীর দায়িত্ব সমূহ আনজাম দেয়া।

وقرن فى بيوتكن- "তোমরা তোমাদের ঘর সমূহে অবস্থান করবে।"[১২১] আর পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে আয় উপার্জন করা এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা।

১১৭। আল-কুর'আন, ৪:৪
১১৮। আল-কুর'আন, ৪:২৪
১১৯। আল-কুর'আন, ৪:২৫
১২০। আল-কুর'আন, ৪:২৪
১২১। আল-কুর'আন, ৩৩:২৩

এ দ্বিতীয় বিষয়টির ভিত্তিতেই স্বামীকে স্ত্রীর উপর এক ধাপ বেশী শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং এই কর্তৃত্বের সঠিক অর্থের অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি কোন বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং খোঁজখবর রাখে

তাকে ‘কাওয়াম’ বলা হয়। এ অধিকার বলেই সে ঐ বস্তুর ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা রাখে। স্বামী যদি এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আইন তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। সে যদি তা অস্বীকার করে অথবা অসমর্থ হয় তাহলে আইন তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারে। কিন্তু খোরপোষ দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা স্বামীর সামর্থ্যের ওপরেই নির্ভরশীল। কুর’আন মজীদ এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেঃ- على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

“ধনী ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী।”[১২২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“যে লোককে অর্থ-সম্পদে সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সে হিসেবেই তার স্ত্রী পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। আর যার আর-উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহ্র দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।”[১২৩]

আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেনঃ

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাবার ও পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা।”[১২৪]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালন স্ত্রীর কাজ; আর তার ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে স্ত্রীরা খোরপোষের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এর প্রভাব তাদের মনে ও জীবনে সুর্দরপ্রসারী হবে। নবী করীম (সা.) স্বামীদের লক্ষ্যকরে তাই এরশাদ করেছেনঃ ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن

“স্ত্রীর খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।”[২২৫]

১২২। আল-কুর’আন, ২:২৩২

১২৩। আল-কুর’আন, ৬৬:৭

১২৪। আল-কুর’আন, ২:২৩৩; এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ

هذه النفقة والكسوة الوجبتان على الاب بما يتصارفه الناس لايكلف منها ان يدخل تحت وسعه وطاقته لاما يشق عليه-

সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোন পিতাকেই তার শক্তি সামর্থ্যের বাইরে তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এমন মান ও পরিমাণ তার ওপর চাপানো যাবে না। (আল্লামা শাওকানী, ফতহুল কাদীর, খ.১, পৃ.২১৮)

৩. স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ না করা

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। নবী করিম (সা.) তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন এ ধরণের কোনো কথা প্রকাশ করতে। নবী (সা.) বলেছেনঃ

ان من اشر الناس عند الله منزلة الرجل يفضى الى امراته وتفضى اليه ثم ينشرسرها-

"যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় সে তার স্বামীর সাথে, অতপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়- প্রচার করে, সে স্বামী আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"[১২৫]

অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, তার সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করে, স্ত্রী নিজেকে, নিজের পূর্ণ সত্তা-দেহ ও মনকে স্বামীর নিকট উন্মুক্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত হয়ে তা অপর লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়, তবে তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও এব্যক্তির মর্যাদা নিকৃষ্টতম হতে বাধ্য। কেননা এর মত হীন ও জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। ইমাম নববীর মতে একাজ হচ্ছে হারাম।

تحريم افشاء الرجل مايجرى بينه وبين امراته من امرور الاستمتاع-

"স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্ভোগ সম্পর্কিত গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা হারাম।"[১২৬]

একদা রাসূলে করীম (সা.) নামাযের পরে উপস্থিত সকল সাহাবী বসে থাকতে বললেন এবং প্রথমে পুরুষদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেনঃ

هل منكم الرجل اذا اتى اهله اغلق بابه وارخى ستره يخرج فيحث فيقول فعلت اهلى كذا وفعلت باهلى كذا فسكتوا-

তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে নাকি, যে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়,তারপর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা বলে ও বলে দেয় ঃ আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি?... হাদীস বর্ণনাকারী বলছেন এ প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চুপ থাকলেন। তারপর মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন করলেনঃ

هل من كن من تحدث

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি, যে স্বামীর স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয়?"

১২৪। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, প্রাগুক্ত, নিকাহ্ অধ্যায়, হাদীস নং-৩০২৩
১২৫। প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০২৪
১২৬। প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫০

তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ای الله انهم يتحدثون وانهن ليتحدثن

"আল্লাহর শপথ এ পুরুষরাও যেমন সে কথা বলে দেয়, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে।"

অতঃপর নবী করীম (সা.) বললেনঃ

هل تدرون مامثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطان لقى احدهما صالحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون اليه۔

"তোমরা কি জানো এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করলো, অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলো।"[১২৭]

উপরোক্ত দু'টি হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ

الحديثان يدلان على تحريم افشاء احد الزوجين لما يقع بينهما من امور الجماع۔

"এ দু'টি হাদীসই প্রমাণ করছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গম কার্য প্রসঙ্গে যত কিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে, তার কোন কিছু প্রকাশ করা অন্যদের কাছে বলে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।"[১২৮]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ভলবাসার আদান-প্রদান হয়, হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলি। একজন তো অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই অপর জনকে তা বলেছে, এখন যদি কেউ অপর কারো কথা কিংবা যৌন মিলন সংক্রান্ত কোনো রহস্য অন্য লোকদের কাছে বলে দেয়, তা হলে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হলো অপরদিকে লজ্জার কারণ ঘটল। এ কারণে ইসলামে একাজকে সম্পূর্ন নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত একজন যদি তাদের স্বামীর স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম ভালবাসার কথা বাইরের কোন লোক নারী বা পুরুষকে বলে তাহলে শ্রোতার মনে সেই স্ত্রী-বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর যদি কেউ যৌন সঙ্গম কার্যের বিবরণ অন্য লোকের সামনে প্রকাশ করে, তাহলে তার গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়, গুপ্ত ব্যাপারাদি উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান হয়ে উঠে। কোন নেকবখ্‌ত স্ত্রীর দ্বারাও যেমন এ কাজ হতে পারে না তেমনি কোন আল্লাহ ভীরু ব্যক্তির দ্বারাও এ কাজ সম্ভব নয়।

বিশেষভাবে মেয়েরাই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে কুর'আনে তাদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"তারা অতিশয় বিনীতা, অনুগতা, অদৃশ্য কাজের হিফাযতকারিনী আল্লাহর হেফাযতের সাহায্যে।"[১২৯]

১২৭। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০২২

১২৮। শায়খ কাযী মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আশ্‌ শাওকানী, ***নাইলুল আওতার,*** বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৩, খ. ৬, পৃ. ৩৫১

১২৯। আল-কুর'আন, ৪:৩৪

৪. স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা, আদর-সোহাগ পাওয়ার অধিকার

বিয়ের ফলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতে প্রেম-ভালবাসার এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যার ফলে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে। স্বামী স্ত্রীকে স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও আদর, সোহাগে ভরে দেয়। স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে, অকারণে ও উঠতে বসতে আর কথায় কথায় কোন রূপ দুর্ব্যবহার বা মারধোর করতে শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত হয়নি ইসলাম আরো অগ্রসর হয়ে স্ত্রীদের প্রতি সক্রিয়ভাবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বামীদেরকে।

এ পর্যায়ে কুর'আনের আয়াতঃ -وعاشروهن بالمعروف

"স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে খুব ভাল ব্যবহার কর।"[১৩০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসেমী বলেছেনঃ

صاحبوهن بالانصاف فى الفعل والاجمال فى القول حتى لاتكونوا سبب النشوز او سوء الخلق فلا يحل لكم حينئز-

"স্ত্রীদের সাথে কার্যত ইনসাফ করে আর ভাল ও সম্মানজনক কথা বলে একত্রে বসবাস কর যেন তোমরা স্ত্রীদের বিদ্রোহ বা চরিত্র খারাব হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না বসো। এ ধরণের কোন কিছু করা তোমাদের জন্যে অদৌ হালাল নয়।"[১৩১]

স্ত্রীদের ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم وخياركم لنسائكم-

"যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিস্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল।"[১৩২]

তাই প্রেম-ভালবাসায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যত উচ্ছল হবে যত আনন্দময় হবে, ততই তা মহান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হবে এবং এটাই রাসূলের (সা.) চরিতাদর্শ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

حبب الى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرةعينى فى الصلاة-

"পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামায হচ্ছে আমার নয়নের প্রশান্তি।"[১৩৩]

৫. জৈবিক চাহিদায় তৃপ্তি লাভ

স্বামীর যেমন অধিকার স্ত্রীর কাছ থেকে জৈবিক চাহিদা পূরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রাপ্তি তেমনি স্ত্রীরও হক বা অধিকার হলো স্বামীর পক্ষ থেকে জৈবিক চাহিদায় তৃপ্তি লাভ করা। এ অধিকার পূরণ আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা মুসলিম স্ত্রীর নেই। মূলতঃ মুসলিম স্ত্রী মাত্রই ইসলামী শরী'আত মোতাবেক তার যৌবনের সকল কিছু সে স্বামীর হাতে সঁপে দেয়। তাই স্ত্রীর এ চাহিদার প্রতি স্বামীর খেয়াল রাখা আব্যশক।

১৩২। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, বিবাহ অধ্যায়, হাদীস নং- ৩৯৪০

১৩৩। আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী, অধ্যায়, স্ত্রীর সাথে ব্যবহার, হাদীস নং-৩৯৪৩

কোনো ভাবেই স্ত্রীকে অবহেলা করা বা চাহিদার প্রতি গুরুত্ব না দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মিলন সদকাহ স্বরুপ গণ্য করে।

এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেনঃ

بضعه اهله صدقه قالوا يا رسول الله ياتى شهوته وتكون له قال ارايت لو وضعها فى غير حقها أكان يأثم-

"নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সাদাকা। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূল (সা.) সে তো নিজের কামস্পৃহা পূরণ করে, এটা সাদাকা হবে কিরুপে? রাসূল (সা.) বলেনঃ যদি সে অবৈধ স্থানে চরিতার্থ করে, তবে কি সে গুনাগার হবে না?"[১৩৪]

স্বামীদেরকে স্ত্রীদের প্রকৃতিগত এক মৌলিক দুর্বলতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে চলবার জন্যে স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেনঃ

يكفرن العشير ويكفر الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت مارايت منك خيرا قط-

"মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে করে অস্বীকার। তুমি যদি জীবন ভরেও কোন স্ত্রীর অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, আর কোন এক সময় যদি সে তার মর্জি মেজাজের বিপরীত কোনো ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে ওঠে ঃ আমি তোমার কাছে কোনোদিনই সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি।"[১৩৫]

উপরোক্ত হাদীস থেকে যেমন নারীদের এক মৌলিক প্রকৃতিগত দোষের কথা জানা গেল, তেমনি এ হাদীস স্বামীদের জন্যেও এক বিশেষ সাবধান বাণী। স্বামীরা যদি নারীদের এ প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না রাখে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এ জন্যে পুরুষদের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ ধরণের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুন্ন রাখা পুরুষদেরই কর্তব্য। এই পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলে করীমের সেই ফরমান যা তিনি বিদায় হজ্জের বিরাট সমাবেশে মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করিছিলেন। আবূ দাউদের বর্ণনা মতে সে ফরমানের নিম্নরুপঃ

فاتقول الله فى النساء فانكم اخزتموهن بامانة الله واستحللتم فروجه بكلمة الله وان لكم عليهن ان لايوطنّ فرشكم احد تكرهونه-

"হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহ্‌র কালেমার সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের ওপর তোমাদের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দু'জনের মিলন শয্যাকে কলংকিত করবে না।"[১৩৬]

১৩৪। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, অধ্যায়, সালাম, হাদীস নং ৫১৫৩

১৩৫। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ কুফরানুল আশির, হাদীস নং-৫২৩২

১৩৬। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ হজ্জ, হাদীস নং-৩৪৩৭

৬. গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ

পারিবারিক পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ গ্রহন করা স্বামীর কর্তব্য যা স্ত্রীর অধিকার।

জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহন চালু করা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকুল। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে। তাতে করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঐকান্তিক আস্থা-বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালবাসা প্রমাণিত হয়। আর স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর মনে ভালবাসা ও আন্তরিক আনুগত্য মূলক ভাবধারা গভীতর হয়। শুধু তাই নয়, ঘরের মেয়েলোকদের নিকটও যে অনেক সময় ভাল ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জটিল বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধানের শুভ পরামর্শ, তাও তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় অতি সহজে। কুর'আন মজীদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরাত্বারোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানকে কতটুকু দুধ পান করানো হবে তা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

"স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।"[১৩৭]

কুর'আন মজীদ সন্তান পালনের মতো অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপরজনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি–এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য কর তাহলে গুরুতর বিপদজনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপার সমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে।[১৩৮]

রাসূলে করীম (সা.) এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অনোমদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রীয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। তিনি বলেনঃ لقد شئت على نفيى

আমি এ ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি।

১৩৭। আল-কুর'আন, ২:২৩৩

১৩৮। আল্লামা আহমাদুল মুস্তফা আল-মারাগী, তাফসীরে আল-মারাগী, বৈরুত: ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ.২, পৃ. ১৮৮
মূল আরবী পাঠঃ
وهانت اذا ترعى ارشاد القران الى استعمال المشورة فى ادنى الاعمال لتربية الولد ولم يبيع لاحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الاخر فمالك باجل الاعمال خطرا واعظمها فئدة -

এ কথা শুনে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে বলেছিলেনঃ

كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الصيف ونعين على نوائب الحق فلا يسلط الله عليك الشياطين والاوهام والامراء ان الله اختيارك لهداية قومك۔

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনোই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি তো ছেলায়ে রেহ্মী (আত্মীয়তার সম্পর্ক) রক্ষা করেন। অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপর্দকহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা কখনোই শয়তানদের আপনার ওপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোন অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়েতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।"[১৩৯]

হযরত খাদিজা (রা.) এর এ সন্তনা বাণী রাসূলে কারীমের মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে তাঁর প্রিয়তমা ও সহানুভূতিসম্পন্না স্ত্রীর আন্তরিক সান্তনা কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে অবস্থানরত চৌদ্দশ সাহাবী নানা কারণে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে রাসূল (সা.) তাদেরকে এখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে তাঁর এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থানরতা তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সব কাথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্বত্তিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেনঃ

اخرج يا رسول الله وابدأهم بما تريد راوك فعلت اتبعوا

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবীগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং কাজ করতে লেগে যাবেন।"[১৪০]

এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই হযরত উম্মে সালমার পরামর্শ বিরাট ও অচিন্ত্যপূর্ব কাজ করেছিল। এমনিভাবে সব স্বামীই তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে এ ধরনের কল্যাণময় পরামর্শ লাভ করতে পারে তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।

১৩৯। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় বদ'উল অহী, হাদীস নং-৩, নূরুল ইয়াকীন, সিরাতে সায়্যেদুল মুরসালিন, খ.১, পৃ.২৬

১৪০। নূরুল ইয়াকীন, *সিরাতে সায়্যেদুল মুরসালিন*, পৃ. ১৯১

৭. খোলা তালাক প্রদানের অধিকার

ইসলামী শরী'আত যেভাবে পুরুষকে এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে স্ত্রীকে পছন্দ করে না অথবা যার সাথে কোন রকমেই তার বসবাস করা সম্ভব নয় তাকে সে তালাক দিতে পারে; অনুরুপ স্ত্রীকে এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে পুরুষকে পছন্দ করে না বা যার সাথে তার কোন মতেই বসবাস করা সম্ভব নয়। সে তার থেকে 'খোলা'[১৪১] করিয়ে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশের দু'টি দিক রয়েছেঃ (১) নৈতিক দিক (২) আইনগত দিক। নৈতিক দিক এই যে, চাই পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক। প্রত্যেকে 'তালাক' অথবা খোলার ক্ষমতা কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। শুধু যৌনচর্চার উদ্দেশ্যে 'তালাক' অথবা খোলাকে যেন খেলনায় পরিণত না করা হয়।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সমূহ বিবৃত হয়েছেঃ

ان الله لايحب الزواقين والزواقات

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা স্বাদ অন্বেষণকারী ও অন্বেষণকারিনীদের আদৌ পছন্দ করে না।[১৪২]

ايما امرات اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين والمختلعات هن المنافقات۔

"যে স্ত্রীলোক স্বামীর কোনরূপ ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই খোলার আশ্রয় নেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও মানব জাতির অভিসম্পাত। খোলাকে খেলনায় পরিণতকারী স্ত্রীলোকেরা মুনাফিক।"[১৪৩]

কিন্তু আইন যার কাজ হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণ করা, তা নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে না, তা পুরুষকে স্বামী হওয়ার প্রেক্ষিতে যেমন তালাকের অধিকার দেয়, অনুরূপ নারীকে স্ত্রী হওয়ার প্রেক্ষিতে খোলার অধিকার দেয়, যেন উভয়ের জন্যে প্রয়োজনবোধে বিবাহ বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয় এবং কোন পক্ষকেই এমন অবস্থায় না ফেলা হয় যে, অন্তরে ঘৃণা জমে আছে, বিবাহের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হচ্ছে না, অথচ দাম্পত্য সম্পর্ক একটা বিপদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একজন অপর জনের কাছে কেবল একারণেই বন্ধ যে, এ বন্ধীখানা থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই।

১৪১। খোলা শব্দের অর্থ খুলে ফেলা, মুক্ত করা। যেমন আল্লাহ বলেন, فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى - طه ১২: من الاته অর্থাৎ হে মুসা! তুমি তোমার জুতাজোড়া খুলে নাও, কেননা তুমি এখন 'তুওয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় উপস্থিত।

'খোলা' এক প্রকারের 'তালাক'। যাকে বলে 'খোলা তালাক'। 'খোলা তালাক' মানে, স্ত্রী স্বামীর সাথে রাজি নয়, সে সে তালাক দিতে চায়; কিন্তু স্বামী তালাক দিতে ইচ্ছুক নয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী কিছু টাকা পয়সা দিয়ে স্বামীকে তালাক দিতে রাজি করে নেয়। ইসলামে একে বলা হয় 'খোলা তালাক' এবং শরী'আতে এরুপ তালাকের অবকাশ রয়েছে। কেননা স্ত্রী যদি কোনো মতেই স্বামীর সাথে থাকতে প্রস্তুত না হয় আর স্বামীও তাকে তালাক দিতে প্রস্তুত নয় এরূপ অবস্থা একজন নারীর জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাই সুযোগ রাখা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীকে টাকা-পয়সা দিয়ে তালাক দিতে বাধ্য করতে পারে এবং সে তালাক দিয়ে দেয়। তবে স্ত্রীর মুক্তি লাভের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। (মাওলানা আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩)

১৪২। আবু বকর আল-জাসসাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

১৪৩। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, নিকাহ অধ্যায়, হাদীস নং-৩২২০

খোলা তালাক প্রদানে শর্তসমূহ

আপনারা তালাকের আলোচনায় দেখেছেন যে, পুরুষকে তার স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে তার উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন সে স্ত্রীকে মোহরানা রূপে যা কিছু দিয়েছে এর ক্ষতি তাকে সহ্য করতে হবে। হায়েয চলাকালিন সময়ে তালাক দিতে পারবে না, প্রতি তুহুরে এক এক তালাক দিবে তখন তাহলীল ছাড়া এ স্ত্রীকে গ্রহন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও খোলার অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিও কতগুলো শর্তারোপ করা হয়েছে, যা কুর'আন মজীদের এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

"তোমরা স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ (তালাকের সময়) তা থেকে সামান্য কিছুও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অটুট রাখতে পারবে না (তবে এটা স্বতন্ত্র কথা)। তোমরা যদি আশংকা কর যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করে সীমা রক্ষা করতে পারবে না এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাতে কোন দোষ নেই।"[১৪৪]

এ আয়াত থেকে খোলা তালাকের নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যায়ঃ

এক. এমন অবস্থায় খোলার আশ্রয় নিতে হবে যখন আল্লাহ্‌র সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। فلا جناح عليهما শব্দগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যদিও খোলা একটি মন্দ জিনিস, যেমন তালাক একটি মন্দ জিনিস, কিন্তু যখন এ আশংকা হয় যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হয়ে যাবে তখন 'খোলা' করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই।

দুই: স্ত্রী যখন বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তখন তাকেও আর্থিক ক্ষতি মেনে নিতে হবে, যেভাবে পুরুষ সেচ্ছায় তালাক দিলে তাকেও আর্থিক ক্ষতি মেনে নিতে হয়। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে সে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহরানা হিসেবে প্রদত্ত অর্থের সামান্য পরিমাণও ফেরত নিতে পারে না। যদি স্ত্রী বিচ্ছেদ কামনা করে তাহলে সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানার আকারে যে অর্থ গ্রহণ করেছিল তার অংশ বিশেষ অথবা সম্পূর্ণটা ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

তিন: افتدت به অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করে মুক্তি লাভ করার জন্যে শুধু বিনীময় প্রদানকারীর ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, বরং এ ব্যাপারটির আপোষ নিষ্পত্তি তখনি হবে যখন বিনীময় গ্রহনকারীও এতে সম্মত হবে অর্থাৎ স্ত্রী শুধু কিছু পরিমাণ অর্থ পেশ করে নিজেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে না, বরং তার দেয়া অর্থ গ্রহনের বিনীময়ে স্বামীর তালাক বিচ্ছিন্নতার জন্যে অপরিহার্য।

১৪৪। আল-কুর'আন, ২: ২২৯

১৪৫। নাম জামিলা বিনতে ওবাই ইবনে সালুল। কেউ কেউ যয়নব বিনতে 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তার নাম জামিলা এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কন্যা নন; বরং বোন। (সহীহুল বুখারী (বাংলা) প্রকাশক: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, খ. ৫, টীকা নং ২৭, পৃ. ১২২)

চার: "খোলা"র জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্ত্রী তার সম্পূর্ন মোহরানা অথবা তার এক অংশ করে বিচ্ছেদের দাবী তুলবে এবং পুরুষ তা গ্রহন করে তাকে তালাক দিবে। "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" ব্যাকাংশ থেকে জানা যায়, খোলার কাজটি উভয় পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। যেসব লোক খোলার কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্যে আদালতের ফয়সালাকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয় – এ আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণার অপনোদন হয়ে যায়। যে বিষয়গুলো পরিবারের অভ্যন্তরে মীমাংসা করা সম্ভব তা আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ইসলাম অদৌ পছন্দ করে না।

পাঁচ: যদি স্ত্রী 'ফিদয়া' (মুক্তিবিনিময়) পেশ করে এবং স্বামী তা গ্রহন না করে, তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রী জন্যে আদালতে যাওয়ার অধিকার আছে। যেমন উল্লেখিত আয়াতে فان خفتم الا حدود الله থেকে প্রকাশ্রভাবে জানা যায়। এ আয়াতে "খিফতুম" বলে মুসলমানদের 'উলিল আমর' বা সরকারী কর্মকর্তাকেই জম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু 'আমির' বা শাসকদের সর্ব প্রথম দায়িত্বই হচ্ছে এ সীমারেখার হেফাযত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে (স্ত্রীকে) যেসব অধিকার দিয়েছেন তা তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

খোলা তালাকের দৃষ্টান্তসমূহ

খোলার সর্বাদিক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা হচ্ছে সাবিত ইবনে কায়েস (রা.) এর। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর কাছ থেকে খোলা অর্জন করে নিয়েছিলেন। এ মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের বিভিন্ন অংশ হাদীস সমূহে বর্ণিত আছে। অংশগুলোকে একত্র করলে জানা যায়, সাবিত (রা.) থেকে তার দুই স্ত্রী খোলা অর্জন করেছিলেন। এক স্ত্রী হচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বোন।[১৪৫] তাঁর ঘটনা এই যে, সাবিতের চেহারা তাঁর পছন্দ ছিল না। তিনি খোলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন এবং নিম্নোক্ত ভাষায় নিজের অভিযোগ পেশ করলেন ঃ

يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه فى خلع ولادين ولكنى اكره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه وطلقها تطليقة۔

"সাবিত ইবনু কায়স এর স্ত্রী নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) চরিত্রগত বা দ্বীনি বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের উপর আমি দোষারোপ। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা (স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছিনা। রাসূল (সা.) বললেন: তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল ঃ হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেনঃ তুমি বাগানটি গ্রহন কর এবং মহিলাকে এক তালাক দিয়ে দাও।"[১৪৬]

১৪৬। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, তালাক অধ্যায়, হাদীস নং-৫২৭৩,

Dhaka University Institutional Repository

অন্য বর্ণনায় মহিলাটি নিম্নোক্ত ভাষায় নিজের অভিযোগ পেশ করলেঃ

يا رسول الله لا يجمع رأسى ورأسه شئ ابدا انى رفعت جانب الخباء فرأيته اقبل فى عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها-

"হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার মাথা ও তার মাথাকে কোন বস্তু কখনো একত্র করতে পারবে না। আমি ঘোমটা খুলে তাকাতেই দেখলাম, সে কতগুলো লোকের সাথে সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশী কালো, সবচেয়ে বেঁটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম।"[১৪৭]

হযরত সাবিত (রা.) এর আর এক স্ত্রী ছিলেন হাবীবা বিনতে সাহল আল আনসারিয়াহ (রা.)। তার ঘটনা ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ দাউদ (র.) এ ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন খুব ভোরে রাসূল (সা.) ঘর থেকে বের হয়েই হাবীবা (রা.) কে দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? তিনি বললেনঃ

لا انا ولا ثابت بن قيس

"আমার ও সাবিত ইবনু কায়সের মধ্যে মিলমিশ হবে না।"

যখন সাবিত (রা.) উপস্থিত হলেন, নবী (সা.) বললেন ঃ দেখো এ হচ্ছে হাবীবা বিনতে সাহল। এরপর সাবিত যা কিছু বলার তাই বললেন। হাবীবা (রা.) বলল: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সাবিত আমাকে যা কিছু দিয়েছে তা সবই আমার কাছে আছে। নবী (সা.) সাবিত (রা.) কে নির্দেশ দিলেন: "এসব কিছু তুমি ফেরত নাও এবং তুমি তাকে এক তালাক দাও"।

হযরত ওমর (রা.) এর সামনে এক মহিলা ও এক পুরুষের মোকাদ্দমা পেশ করা হলো। তিনি স্ত্রীলোকটিকে স্বামীর সাথে বসবাস করার উপদেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি তার পরামর্শ গ্রহণ করেনি। এতে তিনি একটি ময়লা-আবর্জনায়পূর্ণ একটি কুঠরিতে তাকে আবদ্ধ করে দিলেন। তিনদিন বন্দী করে রাখার পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কি অবস্থা"? সে বললঃ "আল্লাহর কসম! এ রাত কয়টিতে আমার কিছুটা শান্তি হয়েছে।" একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেনঃ

اخلعها ويحك ولو من قرطها-

'তোমার জন্যে দুঃখ হয়, কানের বালির মত সামান্য অলংকারের বিনিময়ে হলেও একে 'খোলা' দিয়ে দাও।"[১৪৮]

"রুবাহ" বিনতে মুআত্তবিয ইবনে আফরা (রা.) তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে 'খোলা' করিয়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামী মানল না। হযরত ওসমান (রা.) এর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করা হলো তিনি স্বামীকে নির্দেশ দিলেনঃ

১৪৭। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

১৪৮। ***কাশফুল গুম্মাহ***, খ.২,পৃ.৫৩১

فاجازه وامره باخذ عقاس رأسها فما دونه-

"তার চুল বাঁধার 'ফিতাটা' পর্যন্ত নিয়ে নাও, এবং তাকে 'খোলা' দিয়ে দাও।"[১৪৯]

ইসলামী পরিবারে সন্তান, সন্তানের গুরুত্ব ও অধিকারঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান-সন্ততির রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতিকে প্রদত্ত সকল নিয়ামতের মধ্যে সুসন্তান হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

"এবং আল্লাহ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন।"[১৫০]

আল্লামা শাওকানী (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, "আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের প্রজাতির মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার সাথে অন্তরের সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পার। কেননা, প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতির প্রতি মনে আকর্ষণ বোধ করে। আর ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মনে অনুরূপ আকর্ষণ থাকে না। মনের এ আকর্ষণ ও বিশেষ সম্পর্কের কারণেই বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য।"[১৫১] স্বামী স্ত্রীর আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমেই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ।

আল্লামা আলুসী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "ধন সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায়, আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।"[১৫২]

পৃথিবীতে কত অগণিত মানুষ এমন রয়েছে যাদের সম্পদের কোন অভাব নেই কিন্তু তা ভোগ করার জন্য কোন আপন জন নেই। হাজার চেষ্টা সাধনা এবং কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারছে না। আবার কত অসংখ্য লোক দেখা যায়, যারা কামনা না করেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। কিন্তু তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নিয়ামত। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

১৪৯। বদরুদ্দীন 'আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১৫০। আল-কুর'আন, ১৬ : ৭২

১৫১। কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, আল মাকতুবাত আল রশিদিয়া, কোয়াটা, পাকিস্তান ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭২

১৫২। সাইয়্যিদ মুহাম্মদ শিকরী আল আলুসী আল বাগদাদী, *রুহুল মা'আনী*, ইদারাত আত-তাবায়তি-আল-নিরিয়াহ্, বৈরুত, লেবানন-১৯৮৫, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনিই সর্বশক্তিমান।"[১৫৩]

মানুষ যত বৈষয়িক ক্ষমতার অধিকারীই হউক না কেন ইচ্ছামত সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা তার নেই, অন্যদের সন্তান দান তো দূরের কথা। যার ভাগ্যে সন্তান নেই সে কোন উপায় অবলম্বন করেও সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয় না। বস্তুত: সন্তান মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। আর তাই মুসলিমরা দোয়া করে ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যাহারা আমাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকী দিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।"[১৫৪]

সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে মানুষ সামাজে মর্যাদার অধিকারী হয় এবং মৃত্যুর পরও এ পৃথিবীতে বেচে থাকে। শুধু তাই নয়, মানুষ পরকালীন জীবনেও উপকৃত হতে পারে এমন একটি সম্পদ হচ্ছে নেক সন্তান-সন্ততি। মহানবী (সা.) বলেছেন, "মানুষ যখন মারা যায় তার সমস্ত নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমলের সাওয়াব তার জন্য জারী থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম (জ্ঞান) যা থেকে মানুষ লাভবান হতে পারে, (৩) এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"[১৫৫]

নেক সন্তান রেখে যাওয়াকে আমল বলার কারণ এই যে, সন্তান পিতামাতার কারণেই পৃথিবীতে আগমন করে এবং তাদের সমস্ত লালন-পালনে সে নেক সন্তান হতে পারে। হাদীসে সন্তান কর্তৃক দু'আর কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে পিতামাতার জন্য দু'আ করার ব্যাপারে সন্তানকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে পিতামাতার জন্য সব সময় আল্লাহর নিকট দু'আ করা। সন্তানকে নেক সন্তান তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় সন্তান-সন্ততির পরিচর্যা। ইসলাম সন্তান-সন্ততির সুষ্ঠু পরিচর্যায় পিতা-মাতার প্রতি বহুবিধ অধিকার আদায়ের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছে।

সন্তানের গুরুত্ব

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্বিকসহ বহুবিধ কারণে সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুর'আনে সন্তানকে সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

১৫৩। আল-কুর'আন, ৪২ ঃ ৪৯-৫০

১৫৪। আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৭৪

১৫৫। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-১৩৮৩, পৃ. ২২৫

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।"[১৫৬] মানব সমাজে সন্তান-সন্ততি হচ্ছে সৌভাগ্য বা সুসংবাদ স্বরূপ।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى

"হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি তাহার নাম হইবে য়াহ্ইয়া।"[১৫৭]

মানব সমাজে সন্তান পিতা-মাতার অবদান। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অকৃত্রিম ভালবাসা, নির্ভরতা, উভয়ের স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তির একটি মাধ্যম সন্তান। মানব সন্তানের জন্ম হয়ত বা পারিবারিক জীবন ব্যতীত সম্ভব কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন-পালন, সঠিক পরিচর্যা এবং ভবিষ্যত সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনায় পবিত্র কুর'আনে প্রথম নর-নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক জীবন যাপনের প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সংগিনীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন।"[১৫৮] পবিত্র কুর'আনে উপস্থাপিত এ পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য শুধু স্বামী-স্ত্রীর আনন্দ উপভোগই নয়, বরং তার মূলে বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে সন্তান জন্ম দান, সন্তানের লালন-পালন এবং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সন্তান-সন্ততি যেমন আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত তদ্রূপ পরীক্ষার বস্তুও বটে। কারণ পৃথিবী মানব জাতির জন্য পরীক্ষার বস্তু হিসেবে স্বীকৃত। তাই আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বিষয় সমূহের অন্যতম। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহা-পুরস্কার রহিয়াছে।"[১৫৯]

১৫৬। আল-কুর'আন, ১৮ ঃ ৪৬
১৫৭। আল-কুর'আন, ১৯ ঃ ৭
১৫৮। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১
১৫৯। আল-কুর'আন, ৮ ঃ ২৮

উক্ত আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেমন করে ধন-সম্পদ আল্লাহর দেয়া নিয়ামত, সন্তান-সন্ততিও অনুরূপভাবে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত। অন্যায় পথে ব্যয় করলে কিংবা যথাস্থানে ব্যয় না করলে যেমন আমানতের খিয়ানত হয়, সন্তান-সন্ততিকেও ভুল পথে এবং অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে, তেমনি আল্লাহর আমানতের খিয়ানত হবে। তাই আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত সন্তান-সন্ততিকে অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ও সুমানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা, সন্তান যদি অসৎ প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠে তাহলে এ সন্তান পিতামাতার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

বস্তুত: প্রথম নর হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টির পরই তাঁর জুড়ি হিসেবে প্রথম নারী হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন যাপন স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রথম মানব পরিবারে মোট চল্লিশজন সন্তানের মধ্যে বিশ জন পুত্র ও বিশ জন কন্যা দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্যও ছিল নর-নারীর পারিবারিক জীবন যাপন পবিত্রতার সাথে যেন অব্যাহত থাকতে পারে এবং সে সব পরিবার থেকেও যেন বৈধ সন্তান জন্ম লাভ করে মানব বংশের বিস্তার ঘটাতে পারে।

মানুষ সামাজিক, মানবিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবারেই সবচেয়ে বেশী পারস্পরিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে। জীবন সায়াহ্নে যে সেবা-সহানুভূতি মানুষের প্রয়োজন তা সন্তান- সন্ততি ভিন্ন অন্য কারো থেকে ততটুকু আশা করা যায় না। যে সমাজে সন্তান সন্ততি পিতামাতার প্রতি উদাসীন সে সমাজের মা-বাবা বার্ধক্যে হয়ে যান সঙ্গহীন।

সন্তান-সন্ততির সঙ্গ পান না বলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে বয়স্কদের আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিতে হয়। বেতনভূক্ত সেবক সেবিকাদের সেবা কখনও সন্তান-সন্ততির স্নেহময় সেবার বিকল্প হতে পারে না। ইসলাম মানব জাতির এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান পারিবারিক পর্যায়ে তথা সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করেছে। একটি শিশু, তার শিশুকালে যেইরূপ আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়েছে, বয়স্কদেরও তাদের সন্তান-সন্ততির থেকে সেরূপ আদর-যত্ন, শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা পাবার স্বাভাবিক এবং মানসিক অধিকার নির্ধারিত হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"যখন তাহাদিগের (মাতা-পিতার) একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদিগকে বিরক্তিসূচক, 'উফ্' বলিওনা এবং তাহাদিগকে ধমক দিওনা: তাহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা। মমতাবশে তাহাদিগের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"[১৬০]

১৬০। আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ২৩-২

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধাভরে সম্বোধন, নম্র, ভদ্র, আনুগত্য ও অবনতভাবে আচরণ ছাড়াও বার্ধক্যে পিতা-মাতার সার্বিক দায়িত্ব সন্তানের।

এখানেই শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পরও মাগফিরাত কামনা করে সন্তানই তাঁর জন্য দু'হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করবে। মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য, সম্মান ও মর্যাদা আনয়নে যেরূপ গুরুত্ব বহন করে, তদ্রুপ গুরুত্ব বহন করে থাকে পারলৌকিক জীবনের ক্ষমা তথা কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও। তাইতো সন্তান-সন্ততি পিতামাতার নয়নপ্রীতিকর, চোখের শান্তিস্বরূপ। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে অনুরূপ সন্তান কামনা করতেই শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততি দান কর যাহারা আমাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর।"[১৬১]

ইসলামী পরিবারে সন্তানের অধিকারঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

উল্লেখিত নেক, নয়নপ্রীতিকর, সুসন্তান তথা সমাজ ও মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত সুপরিকল্পিকভাবে সন্তান জন্ম দান, সন্তানের লালন পালন, সর্বোপরি সন্তান-সন্ততির সঠিক পরিচর্যা। পিতা-মাতাকে সন্তান-সন্ততি জন্ম দানের পরিকল্পনা থেকে তাদেরকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলা পর্যন্ত যাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। ইসলাম পিতা-মাতার উপর সন্তানের বহু সংখ্যক মানবিক অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। জাতিসংঘ সনদে শিশু অধিকার সম্বলিত বিশেষ ধারা সংযোজনের বহুকাল পূর্বে ইসলাম সন্তানের বিষয়ে বিশেষ গুরত্বারোপ করে আসছে এবং শিশু সন্তানের পরিচর্যার বিষয়টিকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম যে সন্তানের জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছে তা নয়, বরং সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলাম তার অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথভাবে আদায় করার প্রতিও নির্দেশ আরোপ করেছে।[১৬২]

যে কোন উপায়েই হউক সন্তানের ন্যায্য অধিকার সঠিকভাবে আদায়ের প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পিতা মাতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত সন্তানের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের স্বার্থে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করারও অনুমতি ইসলামে রয়েছে।[১৬৩]

সন্তানকে মানব জাতির জন্য কল্যাণকর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পিতা-মাতাকে হাতেগুনে কয়েকটি দায়িত্ব পালন করলে হবে না, বরং সময়, কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সার্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

১৬১। আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৭৪

১৬২। সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা,* ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ১৯

১৬৩। "------- and rights thst should make parents think of adjusting, their procreation patterns to their religious obligations to their children (Adbel

Rahim Omran, Family Plannig in the Legacy of Islam, Routledge, London-1992, P.32.)

মহানবী (সা.) বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকই একজন দায়িত্বশীল। তোমরা সকলেই ব্যক্তিগতভাবে অধীনস্থদের জন্য দায়ী এবং আওতাধীন যারা আছে তাদের সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের জন্য দায়ী। তার সংসারের সকলের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১৬৪]

ইসলাম সন্তান-সন্ততির অধিকার নিশ্চিত করতে পিতা মাতার প্রতি জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছে এবং এক্ষেত্রে কোনরূপ দায়িত্ব শৈথিল্যের অবকাশ রাখেনি। নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেন, "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর আসে সে যদি তা সঠিকভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।[১৬৫] অপর একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, "যাদের খাওয়া পরার দায়িত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়,তবে এ কাজ তার গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[১৬৬] অন্য কথায় এ গুনাহই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। কেননা, তারা তারই বংশধর ও পরিবার পরিজন। তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থই তার নিজের ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

পিতা-মাতা সন্তানের কোন্ কোন্ দায়িত্ব, কতদিন পর্যন্ত পালন করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সার্বিক দায়িত্ব পিতা-মাতাকেই বহন করতে হয়। একটি সন্তানের গর্ভধারণ হতে শুরু করে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুই হচ্ছে মানব জীবনের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে একটি সন্তান পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভিভাবক, সমাজ ও পরিবেশের ছোঁয়াছে প্রকৃত মানুষ হয়ে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে; অথবা অমানুষ হয়ে সমাজের জন্য বিষফোঁড়া হিসেবে প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর মুখ নিঃসৃত নিম্নের হাদীসটি উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেন, "প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত (স্বভাব) এর উপর জন্মগ্রহণ করে, পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাছারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।[১৬৭] বস্তুত: সন্তানকে শুধু খাওয়া পরা দিয়ে লালন-পালন করলেই দায়িত্ব পালন হবে না, বরং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশ দিয়ে সন্তানকে প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সকল আয়োজন করতে হবে।

সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর আমানত স্বরূপ। তাদের আকীদা বিশ্বাস মন-মগজ, চরিত্র-অভ্যাস, জীবন যাত্রার ধারা ইত্যাদিকে সঠিকরূপে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা পিতা-মাতারই কর্তব্য।

১৬৪। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, ***সহিহ আল বুখারী,*** (রশিদ হোসাইন এন্ড সন্স, কলিকাতা-১৯৭৩) কিতাব আল জুমুয়া, পৃ. ১২২

১৬৫। উদ্বৃতঃ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ***পরিবার ও পারিবারিক জীবন,*** (ইফাবা, ঢাকা-১৯৮৩) পৃ. ৩৭৮

১৬৬। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫, হাদীস নং-২৯৪

১৬৭। মুসলিম ইবনে আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, ***সহিহ মুসলিম,*** (আসাহহাল মাতাবী, করাচী-১৯৩০) কিতাব আল ক্বদর, খ. ২, পৃ. ৩৩৬

মোটকথা, পিতামাতা সন্তানকে এমন গুণের অধিকারী করে গড়ে তুলবেন, যেন সন্তান সমাজের জন্য বোঝা বা ক্রীড়নক না হয়ে আশীর্বাদ হয়। এ বিষয়ের প্রতিই ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সন্তানকে নেক ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য সন্তানের গর্ভপূর্বাবস্থা থেকে সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সময় পর্যন্ত ইসলাম নির্দেশিত অধিকারসমূহ নিম্নে আলোচিত হল-

বংশীয় পবিত্রতায় এবং সুস্থাবস্থায় সন্তানের জন্মগ্রহণের অধিকার

ইসলাম শুধু জন্মের পর থেকেই সন্তানের প্রতি গুরুত্ব দেয় না, জন্মের পূর্ব থেকেই ইসলাম তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। সন্তান একটি পবিত্র বংশধারায় জন্মগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "কোথায় তোমার বীর্য স্থাপন করবে তা চিন্তা ভাবনা করে স্থির করে নিও। বংশধারা যেন ঠিক থাকে।"[১৬৮] মহানবী (সা.) আরো বলেন, "এদের মধ্যে যে ধর্মভীরু, তাকেই যেন অগ্রাধিকার দাও, তোমার হাতে মাটি পড়ুক।"[১৬৯] অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সব কিছু বলে বিবেচিত না হয়; বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি যেন যুক্ত থাকে। আর সে যেন মার্জিত পরিবারের সদস্য হয়। কেননা, তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ ইত্যাদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হবে। অপরদিকে ইসলাম নিষেধ করেছে ঐ মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জুড়তে যার আচার-আচরণ ও চারিত্রিক মূল্যবোধ সুমার্জিত নয়। বলা হয়েছে, তোমরা ময়লার স্তূপে উৎপন্ন শ্যামলিকা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বংশের সুন্দরী রমণী থেকে বেঁচে থাক।"[১৭০]

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) প্রস্তাবিত মহিলার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণতা, চরিত্রবান এবং দায়িত্বশীল পাত্রকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি বলেন, "যদি তোমার নিকট এমন কোন প্রস্তাব আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্র তোমাদের পছন্দনীয় হয়, তাহলে তার সাথেই বিবাহ দেবে। যদি তোমরা এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হও তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃংখলা ও বিপর্যয়।"[১৭১]

ইসলাম নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। কেননা, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বারবার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে জন্মগত অক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। তাদের দেহ ক্ষীণকায় এবং মেধা নিম্নমানের হতে পারে।[১৭২]

১৬৮। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ, ***সুনান ইবনি মাযাহ,*** (কলিকাতা, বশীর হোসাইন এণ্ড সন্স-১৯৭৩) কিতাব আল নিকহ, পৃ. ১৪২

১৬৯। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড কিতাব আল নিকাহ, আল ইকফা-ফী আল দীন অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭৬২

১৭০। ড. আব্দুর রহীম উমরান, তানজীম-আল-উসরাত ফি আল-তিরাস-আল-ইসলামী, (জামেয়া আল আজহার আল ইসলামী, কায়রো, মিশর-১৯৯৪) পৃ. ৩৪

১৭১। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

১৭২। আবদেল রহীম উমরান, ***ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা,*** (অনু. শামসুল আলম ঢাকা-১৯৯৫) পৃ. ৫১

পবিত্র কুর'আনেও ইঙ্গিত রয়েছে এ কথার প্রতি যে, শিশুকে মা-বাবার মিশ্রিত বীর্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিশ্র শুক্রবিন্দু হইতে।"[১৭৩] অর্থাৎ সন্তানকে পিতা-মাতার ভিন্ন-ভিন্ন বীর্যের একত্রীকরণে এবং উভয় পারিবারের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে তৈরী করা হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, সন্তানের পিতা-মাতার বংশ দূর সম্পর্কীয় হলে শিশু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে অধিকতর উর্বর হবে; চিন্তা শক্তির দিক দিয়ে হবে তীক্ষ্ম এবং শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক দিয়ে হবে অধিকতর শক্তিশালী।

আরবের আল সাঈব গোত্রের লোকেরা ক্ষীণকায় দূর্বল হয়ে যাচ্ছিল দেখে হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেছিলেন, "হে সাঈব গোত্রের লোকজন! তোমাদের সন্তান-সন্ততি দূর্বল ক্ষীণকায় হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের উচিত স্বীয় গোত্রের বাইরে বিয়ে করা।"[১৭৪] প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল-গাযালী (র.) (১০৫৮-১১১১খৃ.) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "অতি নিকটাত্মীয়দের (First cousin) মধ্য থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা সংগত নয়। কারণ সন্তান ক্ষীণকায় ও মেধাহীন হতে পারে।[১৭৫] আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু গবেষণার পর উপলব্ধি করেছে যে, ক্রমাগত নিকটাত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পৌণঃপুণিক বিবাহ সম্পাদিত হলে সন্তান দূর্বল, কায়ক্লিষ্ট ছাড়াও বংশধারায় নানাবিধ রোগের প্রকাশ দেখা দিতে পারে।"[১৭৬] উল্লেখিত বিষয়ে ইসলাম কয়েক শতাব্দী পূর্বের জোরালো ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, যদি স্বামী-স্ত্রীর নির্বাচন সুষ্ঠু ভিত্তির উপর সম্পন্ন হয় তখন সন্তানেরা হবে আল্লাহর বিশেষ দান ও জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ।"[১৭৭]

১৭৩। আল-কুর'আন, ৭৬ ঃ ২

১৭৪। উদ্ধৃতঃ আবদেল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৭৫। ইমাম গাযযালী, ***এহইয়াও-উলুমুদ্দীন,*** (অনু. মাওলানা ফজলুল করিম, ঢাকা-১৯৬১) পৃ. ২২

১৭৬। These include cell anaemia, cystic fidrosis (of the lung and pancreas), thalassemia (a blood disease) and phenylketonuria (PKU) (a deficiency of an essential liver enzyme), (Abdel Rahim Omran, Op. cit, P. 23.)

১৭৭। ইসলামে শিশু পরিচর্যা, প্রাগুক্ত পৃ. ২২

সন্তানের নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার

ইসলাম গোটা মানব গোষ্ঠির জীবনের নিরাপত্তা বিধানে সামান্যতম শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিবে না।"[১৭৮] এ আয়াতে মহান আল্লাহ মানব জাতির জীবনের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এক সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন-কোন কারণ ব্যতীত মানুষ একে অপরকে কোন অবস্থায়ই হত্যা করবে না। প্রচলিত এ সাধারণ নীতির সাথে শিশুদের জীবন ও পরিবর্ধন বিষয়ের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল। আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।"[১৭৯]

অন্ধকার যুগের লোকেরা সন্তানদের হত্যা করত। বিশেষ করে তারা কন্যা সন্তান জন্ম নিলে ক্ষোভে, দুঃখে এবং লজ্জায় জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম এ জঘন্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং মহাপাপ বলে ঘোষণা দেয়। পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তাহার গ্লানি হেতু নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে। সাবধান, উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।[১৮০] সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা পারিবারিক সম্মান হানির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অথবা দরিদ্রতার ভয় ইত্যাদি অজ্ঞতা যুগের যে কোন কারণেই তাকে হত্যা করা যাবে না। এধরনের অমানবিক প্রথাকে ইসলামে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৭৮। আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১৫১

১৭৯। আল-কুর'আন, ৫ ঃ ৩২

১৮০। আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৫৮-৫৯

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিই রিযিক দিয়া থাকি। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।"[১৮১] অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদিগের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। আমিই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে রিযিক দিয়া থাকি।"[১৮২] মহান আল্লাহ সন্তান হত্যার পরিণাম বলতে গিয়ে অন্য আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত: নিজেদিগের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারাতো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"[১৮৩]

বস্তুত: ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসে সন্তান হচ্ছে পিতামাতার নিকট রক্ষিত আমানত। যে আমানত সম্পর্কে পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পবিত্র কুর'আনের অন্য আয়াতে শেষ দিবসের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।"[১৮৪]

ইসলাম বৈধভাবে সন্তান জন্মাবার নিশ্চয়তা দেয়

জন্মের বৈধতা ইসলামে পরিবার গঠনের মৌলিক ভিত্তি। ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগের ন্যায় বর্তমানেও তথাকথিত উন্নত সমাজে বহু সন্তান জন্মদাতার পরিচয় ছাড়াই হতভাগ্যের ন্যায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আর এটা সভ্য সমাজের অন্তরায় তা সর্বজনবিদিত। অন্ধকার যুগে একাধিক ব্যক্তি একই সন্তানের পিতা বলে দাবী করলে মহানবী (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হন। ইসলাম এ বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম করে দেয়, "সন্তান বৈবাহিক বিছানার।"[১৮৫]

১৮১। আল-কুর'আন, ১৭ : ৩১

১৮২। আল-কুর'আন, ৬ :১৫১

১৮৩। আল-কুর'আন, ৬ : ১৪০

১৮৪। আল-কুর'আন, ৮১: ৮-৯

১৮৫। ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ঈসা আত্ তিরমিযি, প্রাগুক্ত, কিতাব আল ওয়াসায়া, পৃ.৪২

অর্থাৎ সন্তানের বৈধতার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিবাহ প্রথা। বিবাহ হচ্ছে নারী-পুরুষের বৈধ মিলন ও বৈধভাবে সন্তান জন্ম দানের একটি প্রক্রিয়া। আর বিয়ের মাধ্যমে পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে মানব জাতি বর্তমানে উন্নত পর্যায়ে হয়তো পৌঁছতে পারত না।"[১৮৬]

ইসলাম নবজাতকের জন্যে অবশ্য করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন

নবজাতকের জন্য অবশ্য করণীয়

ইসলাম নবজাতকের জন্য প্রথম করণীয় হল তাকে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে শরীরে লেগে থাকা ময়লা পরিস্কার করা। অবশ্য আবহাওয়া ঠান্ডা হলে গোসল করানোর ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ঠান্ডায় আক্রমণ করতে না পারে। গোসলের সময় খুব লক্ষ্য রাখবে যেন পানি তার নাক, কান এবং মুখে প্রবেশ করতে না পারে। গোসলের পরপরই শরীর পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে এবং আবহাওয়া অনুযায়ী নরম জাতীয় কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। শিশুকে বেশী আলোকোজ্জ্বল স্থানে রাখবে না। অধিক আলোর প্রভাবে শিশুর চোখের জ্যোতি হ্রাস পেতে পারে। শিশুকে এক পার্শ্বে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেবে না। এর ফলে শিশুর 'রাতকানা' রোড়ে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। গোসল করানোর পর শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামাত দিতে হবে। হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবূ রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূল (সা.) কে দেখেছি যে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান (রা.)-এর জন্ম হলে রাসূল (সা.) তাঁর কানে নামাযের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন।"[১৮৭] অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " হাসান ইবনে আলী (রা.) এর জন্মগ্রহণের দিন রাসূল (সা.) তাঁর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিয়েছিলেন।"[১৮৮]

নবজাতকের ক্ষেত্রে অপর একটি করণীয় বা সুন্নত হল 'তাহ্নীক'। 'তাহ্নীক' অর্থ হল, খেজুর চিবিয়ে সে চর্বিত খেজুর নবজাতকের মুখে দেয়া। খেজুর সহজ লভ্য না হলে সুন্নাত পালনার্থে অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য দ্বারাও তাহ্নীক করা যায়, হবে খেজুর দ্বারা করাই উত্তম। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.)-এর কাছে নবজাতক শিশুদেরকে পেশ করা হত। তিনি হাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন এবং তাহ্নীক করাতেন।"[১৮৯] তাহ্নীকের একটি উপকারীতা তল নবজাতকের মুখে চর্বিত বস্তু দেয়ার পর জিব্বা দ্বারা নড়াচড়ার কারণে তার দাঁতের মাড়ি মজবুত হয় এবং আরো একটি বিশেষ উপকার হচ্ছে সে মাতৃস্তন্য মুখে লাগানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করতে অভ্যস্ত হয়।

১৮৬। মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূইয়া, *যুগ-জিজ্ঞাসা ও পরিবার,* (ঢাকা-ইফাবা-১৯৮৭) পৃ.১

১৮৭। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

১৮৮। *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা. ঢাকা-২০০০, পৃ. ১৩৪

১৮৯। মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯

সন্তানের জন্যে সুন্দর নাম বাছাই করা

ইসলামে নাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম সন্তানের শরী'আত সম্মত সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা অতি প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই; তোমরা তাঁহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে।"[১৯০] এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "পিতার উপর সন্তানের অধিকর হচ্ছে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং সুন্দর নাম রাখা।"[১৯১]

অবশ্য সে সুন্দর নামের বিন্যাস হতে হবে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবী (রা.) গণের সুন্নাহ অনুযায়ী। আমাদের এ উপমহাদেশে প্রচলন না থাকলেও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, মুসলমানদের নামের সাথে পিতার নাম সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহর বাণী কুর'আন এবং রাসূল (সা.) এর হাদীস, এ দুয়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে তাগিদ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"তোমরা উহাদিগকে ডাক উহাদিগের পিতৃ পরিচয়ে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায় সঙ্গত।"[১৯২] শেষ বিচারের দিনও মানুষ তাদের নাম ও পিতার নামে পরিচিত হবে। রাসূল (সা.) সে সংবাদ জানিয়ে বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে। তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো।"[১৯৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, মানব সন্তানের নাম শুধু যে শেষ বিচারের দিনেই আবশ্যক তা নয়, মানব সন্তানের জন্মলগ্ন থেকেই নামের একান্ত প্রয়োজন। আজকাল সারা পৃথিবীতে সন্তানের "জন্ম-নিবন্ধন"[১৯৪] এর প্রচলন হয়েছে। জন্ম নিবন্ধন আজকের শিশুদের একটি সামাজিক অধিকার, আর এর জন্য প্রয়োজন সন্তানের জন্মের সাথেই একটি নাম রাখা।

১৯০। আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৮০

১৯১। বাশীর বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল হামীদ আল মাসুম, ***ইসলামে নাম করণের পদ্ধতি,*** ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ৩২

১৯২। আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৫

১৯৩। আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাব আল আদব, পৃ. ৩৩৬

সন্তানের আকিকাহ[১৯৫] করা

সন্তান জন্মের পর তার জন্য আকিকাহ করা পিতামাতার দায়িত্ব। মহানবী (সা.)-এ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রতিটি সদ্যজাত সন্তান আকিকাহ্‌র সাথে দায়বদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু যবাই করতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়।[১৯৬] "নবজাত সন্তান তার আকিকাহর কাছে দায়বদ্ধ "কথাটির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, শিশু অবস্থায় কোন সন্তান মারা গেলে এবং তার জন্য যদি আকিকাহ না করা হয়, তবে সে তার পিতা মাতার জন্য আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে না।"[১৭৯] প্রকৃত কথা হচ্ছে আকিকাহ করা অপরিহার্য। প্রাচীন আরব্য সমাজেও আকিকাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর মধ্যে নিহিত ছিল সামাজিক, নাগরিক, মনস্তাত্ত্বিক সর্বপ্রকারের কল্যাণবোধ। রাসূল (সা.) ও নিজ আকিকাহ দিয়েছেন, অন্যকে আকিকাহ্‌র প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সালমান বিন আমের থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবজাতক সন্তানের সঙ্গেই আকিকাহ কার্যটি জড়িত। অতএব তোমরা তার নামে জন্তু যবাই করে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার মাথা মুন্ডন করে চুল ফেলে দাও।"[১৯৮]

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকাহ করার কথা বলা হয়েছে এজন্যে যে, জন্মে ও তার আকিকাহর মাঝে সময়ের কিছুটা ব্যবধান হলে জন্মের ব্যস্ততা কেটে উঠে আকিকাহ্‌র প্রস্তুতি গ্রহণে সুবিধা হবে তাই। আর সপ্তম দিনেও যদি আকিকাহ করা সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে করা যেতে পারে। তাও সম্ভব না হলে জীবনে যে কোন সময়ে করে নিতে হবে। আকিকার জন্তু ছাগল পলে পুত্র সন্তানের জন্য দুটি আর কন্যা সন্তানের জন্য একটি যবেহ করতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, "পুরুষ সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবাই করাই যথেষ্ট।"[১৯৯]

১৯৪। জন্মনিবন্ধন বা জন্মরেজিষ্ট্রার এর ব্যবস্থা আধুনিককালে প্রায় সবদেশেই আছে। বর্তমানে বিশেশ্ব জন্ম-নিবন্ধন-সনদ বা বার্থ সার্টিফিকেট হচ্ছে নাগরিকত্বের একটি প্রবেশ পত্র। এ প্রবেশপত্র ব্যতীত দাপ্তরিকভাবে কোন সন্তানের অস্তি স্বীকৃত নয়। কাজেই একটি রাষ্ট্রের দেয়া বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা লাভের বৈধ সুযোগও তার থাকে না। (দেশসমূহের অগ্রগতে, সম্পাদিত, ইউনিসেফ ঢাকা-১৯৯৮, পৃ.৫)

১৯৫। 'আকিকাহ' বলা হয় সে জন্তুকে যা নবজাত সন্তানের নামে যবাই করা হয়। শিশুর জন্মের পর কর্তিত চুলকেও আকিকাহ বলা হয়। তবে আকিকাহ হচ্ছে শিশু জন্মের পর সপ্তম দিবসে যে পশু যবাই করা হয়। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ৩৬)

১৯৬। আবূ দাউদ আল সিজিসতানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, আকিকাহ অধ্যায়, পৃ.৩৬

১৯৭। উদ্ধৃতঃ মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

১৯৮। আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাব আল আকিকাহ, পৃ. ৮২২

১৯৯। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত্‌ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

মাতৃদুগ্ধ পান সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

"মায়ের দুধের বিকল্প নেই"-এ কথাটি সর্বজনবিদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্রমাগত গবেষণার পর এ সিদ্ধন্তে উপনীত হয়েছে যে, শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। মায়ের দুধে রয়েছে এমন সব উপাদান যা যে কোন ধরনের সংক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি ছাড়াও মায়ের দুধ শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

পবিত্র কুর'আনে শিশুকে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে।"[২০০]

এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "মা'আরেফুল কুর'আন"-এ উল্লেখ করেছেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, প্রথমত শিশুদের স্তন্য দান করা মায়ের উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির কারণে স্তন্য দান বন্ধ করলে পাপ হবে। দ্বিতীয়তঃ স্তন্য দানের জন্য স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা বিনিময় পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্ত্রীর স্বীয় দায়িত্ব। তৃতীয়তঃ পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের সময় পূর্ণ দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা সন্তানের অধিকার। এতে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যপানের সময় সীমা দু'বছর, এরপর স্তন্য পান করানো যাবে না। তবে কুর'আনের অপর আয়াতের[২০১] আলোকে ইমাম আবূ হানিফা (র.) (৮০-১৫০ হিঃ) শিশুর দূর্বলতার ক্ষেত্রে ৩০ মাস (আড়াই বছর) পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দান সকল ইমামের মতে হারাম।[২০২]

মাতৃদুগ্ধ পানের গুরুত্বের কারণ আল্লাহর রাসূল (সা.) স্তন্যদান কালে মহিলাদের গর্ভবতী হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন। যাকে শরী'আতে আল ঘায়লাহ, ঘায়েল বা ঘেয়াল (শিশুর প্রতি আঘাত) বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের গোপন পন্থায় ধ্বংস করবে না। কেননা, দুগ্ধপায়ী শিশুর বর্তমানে স্ত্রী সঙ্গম করলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।"[২০৩]

২০০। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৩

২০১। "তার দুধপান এবং দুধ ছাড়ানোর সময় হল ত্রিশ মাস/আড়াই বছর" (আল-কুর'আন, ৪৬ ঃ ১৫)

২০২। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাফসীরে মাআরেফুল কুর'আন, (ইফাবা-ঢাকা-১৯৮০) খ. ১, পৃ. ৬৯

২০৩। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাব আত্ তিব, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সা.) শিশুদের অধিকারের কথা চিন্তা করে দুধপান কালে স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, "দুগ্ধপায়ী শিশুর মা-র সাথে সঙ্গম করতে আমি নিষেধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারস্য ও রোকমদের সম্পর্কে আমাকে জানানো হল যে, তারা এ কাজ করে। তবে তাতে তাদের সন্তানদের তেমন কোন ক্ষতি হয় না।[২০৪] তাছাড়া শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময়কাল দু'বছর এত লম্বা সময় পর্যন্ত স্ত্রী মিলন চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হলে স্বামীদের তাতে কষ্ট হত এবং এতে সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।[২০৫] এতবিধ কারণে মহানবী (সা.) শিশুর দুধপান কালে এ কাজকে নিষিদ্ধ না করে এ কাজ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

বস্তুত: মায়ের দুধ শিশুর জন্য মহান আল্লাহর নিয়ামত স্বরূপ। যা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই মহান আল্লাহ মায়ের স্তনে শিশুর উপযুক্ত খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করে দেন। মহান আল্লাহ শিশুর মাতার বুকে নবজাত শিশুর জন্য হালকা, মিষ্টি ও উষ্ণ দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা নবজাত শিশুর নাজুক উবস্থার উপযোগী। গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন হতে যে গাঢ় হলুদ দুধ আসে থাকে শালদুধ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'ক্লোষ্টাম' বলে। এ দুধ পরিমাণে খুব অল্প। কিন্তু এ সামান্য দুধ নবজাতকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শালদুধ হলুদ বর্ণ এবং অত্যন্ত গাঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকে বলে কেউ কেউ এ দুধকে ক্ষতিকর বলে মনে করে। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী।

শালদুধে স্নেহ ও শর্করার পরিমাণ কম। কিন্তু খনিজ লবণ, লৌহ ও আমিষের পরিমাণ সাধারণ দুধের চেয়ে বেশী, যা নবজাতকের পুষ্টিমান যথার্থ রাখার পাশাপাশি একটি উত্তম রেচক হিসেবেও কাজ করে থাকে। পুষ্টিমান রক্ষার পাশাপাশি শালদুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি উপাদান। এর মধ্যে 'আইজি-এ' এবং 'আইজি-জি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপাদানসমূহ শিশুর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। তুলনামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে, শালদুধ এবং সেই সাথে মায়ের দুধ গ্রহণকারী শিশুদের এলার্জি, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, ডায়রিয়া, যক্ষা, মেনিনজাইটিস, অন্ত্রপ্রদাহ জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব অন্য শিশুদের তুলনায় অনেক কম। শালদুধে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই এবং ভিটামিন-এ। উভয় ভিটামিনই দীর্ঘ দিন শিশুদের যকৃতে জমা থাকে। ভিটামিন-ই শরীরের এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে এ ভিটামিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের লোহিত কণিকার ভাঙ্গন প্রবণতারোধে সহায়তা করে থাকে। ভিটামিন 'এ চোখের রঞ্জক তৈরী, দাঁত, হাড়ের গড়ন সহায়তা, শরীরের আন্ত ও বহিঃ আবরণীর কোষকে রক্ষা করার পাশাপাশি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০৪। মুসলিম ইবনে আল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাব আল নিকাহ, পৃ. ৪৬৬

২০৫। আল্লামা ইউসুফ আল করজাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা-১৯৮৪,) পৃ. ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, পর্যাপ্ত শালদুধ ও মায়ের দুধ গ্রহণকারী শিশুদের শ্বাসনালীর সংক্রমণের হার অন্য শিশুদের চাইতে অনেক কম। মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে মা-শিশুর অকৃত্রিম বন্ধন তৈরী হয়। এ সংযোগ মা-শিশুর বন্ধন এবং মায়ের সাথে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ তৈরীতে বিশেষভাবে সহায়ক। তাই শালদুধ ফেলে দেয়া বা নষ্ট করা একেবারেই অনুচিত। শিশুকে শালদুধসহ বুকের দুধ পান করানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ দেয়া উচিত।

দশ বছর বয়স থেকে সন্তানের আলাদা শয়নের অধিকার

পিতামাতার উপর সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বয়সে তার জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা। মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন ৭ বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ কর। ১০ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য হালকা মার দাও এবং তাদের শয্যা আলাদা করে দাও।"[২০৬]

ইমাম গাযালী (র.) (১০৫৮-১১১১ খৃ.) বলেন, "ছয় বছর বয়স হলে তাকে আদব শিখাবে, নয় বছর বয়সে তার বিছানা পৃথক করে দিবে এবং তের বছর বয়সে তাকে নামাযের জন্য প্রহার করবে।"[২০৭] আলাদা শয্যার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক কক্ষে হতে পারে, একই কক্ষের বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। তবে প্রত্যেকের শয্যা পৃথক হবে।

সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা বিধান

সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম মাতা-পিতার প্রতি আরোপ করেছে বিশেষ দায়িত্ব। সন্তান হচ্ছে মাতা-পিতার নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত। যদি মাতাপিতা অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কারণে শিশুদের দেখাশুনায় মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদিগের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর।"[২০৮] নিজেদের পরিবার পরিজনকে ধ্বংস ও আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর বিষয়টি নিজেকে ধ্বংসের থেকে বাঁচানোর মতই সমান গুরুত্ব রাখে। আর এ ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের বিষয়টি পরকালের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ পার্থিব জীবনেও। সন্তান যাতে পার্থিব জীবনে আর্থিক অসুবিধায় পড়তে না হয় সে বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয়েছে, "নিজের সন্তানকে অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর ফেলে যাওয়ার চেয়ে অভাবমুক্ত রেখে যাওয়াই ভাল।"[২০৯]

২০৬। আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, প্রাগুক্ত, খ. ১, কিতাব আস্ ছালাত, পৃ. ৮৬
২০৭। ইমাম গাযযালী, এহইয়াও উলুমিদ্দিন, (অনু: মাওলানা ফজলুল করীম), ঢাকা: ১৯৬৩, পৃ. ১০১৪
২০৮। আল-কুর'আন, ৬৬ ঃ ৬
২০৯। আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাব আল-ওয়াসায়া, পৃ. ৪১

সন্তানের চরিত্র গঠন

সন্তানকে সমাজের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হবে। কাজেই সন্তানকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের তথা পিতামাতার সদা সজাগ থাকতে হবে। চরিত্র গঠন বলতে তাদের মধ্যে দুষ্টু চরিত্রের (আখলাকে যামিমা) প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং উন্নত চরিত্র (আখলাকে হামিদা) দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করা বুঝায়। যেমন অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করাতে হবে। সাথে সাথে তাদের মাঝে আল্লাহ রাসূল, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, কুর'আন, হাদীস ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং সততা, আমানতদারী, অঙ্গীকার পূরণ করা, দানশীলতা, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করার মত মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দিতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, “কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার জন্য একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।”[২১০]

মানুষ সামাজিক জীব। মানব শিশু শৈশবেই যেন সামাজের অন্যান্যদের সাথে চলা ফেরায়, উঠা-বসায়, কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে উন্নত ও শালীন হয়। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে যেভাবে শিখিয়েছেন পবিত্র কুর'আন সেভাবে উল্লেখ করেছে, “অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিওনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিওনা; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।”[২১১]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

পিতামাতাসহ পরিবারের বড়দের দায়িত্ব শিশু-সন্তানদের ভদ্রতা-নম্রতা শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে গর্ব ও অহংকার করতে না দেয়া। ভাল কাজের জন্য সন্তানকে বাহবা দেয়া এবং সম্ভব হলে কিছু উপহার দেয়া প্রয়োজন। এতে ভাল কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ বাড়বে। আর মন্দ কাজের জন্য সাথে সাথে তিরস্কার না করে বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক। তাহলে সন্তানের মধ্যে খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

২১০। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
২১১। আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৮-১৯

সন্তানকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা

ইসলাম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, এবং কাজড়-চোপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পাত্র থেকে খাবার গ্রহণ করতে হয়। মনো দৈহিক রোগ থেকে বাঁচার জন্য অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি পবিত্র মন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদিগকেও ভালবাসেন।"[২১২] মহানবী (সা.) বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"[২১৩]

আধুনিক বিজ্ঞানও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণিত করেছে। বর্তমান বিজ্ঞান পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুতারোপ করে থাকে। বিশেষত রোগ প্রতিরোধে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং শিশুকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে পরিবারের তথা পিতামাতার। সন্তানের দৈহিক পরিচ্ছন্নতা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা পুরোটাই নির্ভর করে পিতামাতার উপর। যেমন ঃ

ক) শিশু-সন্তানের হাত পরিস্কার রাখা

হাত পরিস্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং শৈশব থেকেই মানব সন্তানের মধ্যে এ অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। কেননা, মানুষ হাত দিয়ে আহার গ্রহণ করে, চোখ মুছে, মুখ মুছে এবং প্রয়োজনে মুখের ভিতরে হাত দেয়। আবার এ হাত দ্বারাই মানুষ ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করে। তাই হাত পরিস্কার না করা হলে খাদ্য দূষিত হয়ে মারাত্মক রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূর (সা.) বলেন, "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে হাত তিন বার না ধুয়ে যেন কোন পাত্রে তা না ঢুকায়।"[২১৪] তিনি আরো বলেন, "নখ কাটা ফিতরাত তথা নবীগণের সুন্নাত।"[২১৫]

খ) সন্তানের মুখ পরিস্কার রাখা

মুখকে বলা হয় দেহের ফটক। মুখের ভিতর দিয়ে খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় দেহে প্রবেশ করে। সেজন্য মুখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরী। মুখের ভিতর কোন সংক্রমণ হলে তা খাদ্য নালীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ইসলামের চিন্তাধারা অত্যন্ত পরিস্কার। দিনে পাঁচবার ওযুর জন্য ১৫ বার মুখ ধুতে হয়। শুধু তাই নয় এ সময় মিসওয়াক করা হয় বলে দাঁত পরিস্কার করা হয়, দাঁতের গোড়ায় পাথর জমে না। মিসওয়াক করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, "আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের ওযুর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[২১৬]

২১২। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২২
২১৩। ইমাম অলি-আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯
২১৪। ইমাম অলি-আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২১৫। ইমাম অলি-আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২১৬। অলি আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

মুখ ও হাতের ন্যায় সন্তানের নাক, কান, চোখ ও মাথা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গই হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। এগুলো যাতে রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। নাক-কান, চোখ ও মাথা পরিস্কার রাখার ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। দিনে পাঁচবার ওযু করতে প্রতিটি অঙ্গ পনের বার ধয়ে পরিস্কার করার ব্যবস্থা ইসলামের রয়েছে।

ওযু করার সময় মাথা মাসেহ করতে হয় যা মাথাকে পরিস্কার রাখতে সাহায্য করে। যারা লম্বা চুল রাখে তাদের চুল পরিস্কার করার প্রতি মহানবী (সা.) এর নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন, "যার মাথার চুল রয়েছে সে যেন তার পরিচর্যা করে।"[২১৭]

সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

শিশুর শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও মানসিক পবিত্রতার সাথে সাথে পোশাক-পরিচ্ছেদের পরিচ্ছন্নতারও একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত অর্থে সুস্থ মন ও সুস্থ শীরিরের জন্য পরিস্কার কাপড় পরিধান করা বাঞ্চনীয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনের নির্দেশ ঃ

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।"[২১৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।"[২১৯]

সন্তানের শিক্ষা লাভের অধিকার

ইসলাম জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি শুধু উৎসাহই যোগায়নি, বরং প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জনকে ফরয করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, "জ্ঞান অন্বেষণ সকল মুসলিমের (নারী-পুরুষের) জন্য ফরজ।"[২২০] এ ফরয কোন বিশেষ শ্রেণী, দল বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং এ হচ্ছে এমন একটি সর্বজনীন অধিকার ও স্বার্থ, যা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে, যারা জীবনে আলো পেতে চায়।

২১৭। অলি-আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২
২১৮। আল-কুর'আন, ৭ ঃ ৩১
২১৯। আল-কুর'আন, ৭৪ ঃ ৪

২২০। অলি-আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, কিতাব আল ইলম, পৃ. ৩৪

এ ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"মু'মিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।"[২২১] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিলে ও মু'মিন হইলে তাহারা জান্নাতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হইবে না।"[২২২] স্বামীর পুণ্য বা পাপের কারণে স্ত্রী পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না, প্রত্যেকে নিজের কৃতকর্মের জন্যই পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি পাবে। তাই ইসলাম শুধু পুরুষ সন্তানের জন্য শিক্ষাকে আবশ্যক করেনি, বরং জ্ঞানচর্চা কন্যা-পুত্র সকলের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও আখলাক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে তোলা ইসলামের মৌলিক নীতি। সন্তানের মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা পিতামাতার নৈতিক দায়িত্ব। অন্যায়, মিথ্যাচার, মদ-নেশা-সন্ত্রাস ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচারে সন্তানেরা যাতে লিপ্ত না হয় সেদিকে পিতামাতার নজর রাখতে হবে। নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। মহান আল্লাহ হযরত লুকমান (আ.) স্বীয় পুত্রের প্রতি যে উপদেশ দিয়েছিলেন পবিত্র কুর'আনে তা উল্লেখ করেন ঃ

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎ কর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মের নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। ইহাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[২২৩]

২২১। আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৯৭

২২২। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২৪
২২৩। আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৭

মোটকথা, ইসলাম সর্বদাই সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরীমায় সুসন্তান এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করে থাকে। মহানবী (সা.) বলেন, "তোমাদের সন্তানদের জ্ঞান দান কর। কেননা, তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্টি।"[২২৪] বস্তুত: সন্তান (শিশু) জাতির ভবিষ্যৎ। একটি জাতি তার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে গর্বভরে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হওয়া। মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেন ঃ

يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাহাকে হিকমত (যাবতীয় বিষয় বস্তুর সঠিক জ্ঞান বা বিজ্ঞানস্ম্মত জ্ঞান) প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।"[২২৫] বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ যে জাতিকে বিজ্ঞানের জ্ঞান তথা সঠিক জ্ঞান দান করেছেন সে জাতিই সফলতার চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। এক সময়ে আরব জাতি সারা বিশ্বে বর্বর ও অসভ্য বলে পরিচিত ছিল। সেই জাতিই ইসলামের সংস্পর্শে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রতূত্ব অর্জন করে। বস্তুত: ইসলামই মুসলমানদেরকে জ্ঞান চর্চার অনুপ্রাণীত ও বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে এম. এ. করিমের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, "The initiation of the conquest of nature and the utilization of its forces for the good of humanity is indeed, one of the greatest blessings Islam conferred upon mankinl"[২২৬]

মানব জাতির কাঙ্খিত উন্নতি এবং পার্থিব ও পরকালীন মুক্তির লক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নতি সাধন করতে হয়। আধ্যাত্বিক জ্ঞান মানবাত্মাকে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ করে কলুষমুক্ত রাখে। পিতামাতাকে অবশ্যই তাদের সন্তানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবতার মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বের ভয়ানক ও বহুল আলোচিত এইডস, দারিদ্র্য, মানবাধিকার লংঘন, পরিবেশ দূষণ, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি ইত্যাদি নৈতিকতাবিহীন শিক্ষার কারণে ছড়াচ্ছে। এ গুলো থেকে পরিত্রাণের মূল চাবিকাঠি হল নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি সাধন এবং সত্যিকারভাবে তার অনুসরণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরাধামে যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করা।

২২৪। উদ্ধৃতঃ অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস সিকদার, ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা, (ঢাকা, প্যাথ পাইণ্ডার ইন্টা ঃ ১৯৯৬) পৃ. ২৩

২২৫। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৬৯
২২৬। M.A Karim, Islams Contribution to Science and Civilizaition (সূত্রঃ K.A. Waheed, Islam and the Origins of Modern Science, Islamic Publication, Lahore, 1967, P.7)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"তিনিই উম্মীদিগের মধ্যে তাহাদিগের একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদিগের নিকট আবৃত্তি করে তাহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[২২৭] প্রকৃতপক্ষে ইসলাম উন্নয়নের যে ধারণা প্রদান করেছে তাতে মানবত্মার পবিত্রতা (তাজকিয়া) কেও বুঝানো হয়েছে।

কেননা, ইসলামে উন্নয়নের ধারণা অনেক ব্যাপক; যাতে পার্থিব ও পরকালীন উভয়বিধ উন্নয়ন রয়েছে।"[২২৮]

মোটকথা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় সন্তানদেরকে নৈতিক ও আদর্শ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, বিচার, বাণিজ্য, যোগাযোগসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। যাতে সন্তান-সন্ততি মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শকে নিজ জীবনে পাথেয় করে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মাধ্যমে বস্তুজগতে মানবিক বৃত্তিগুলোর সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশ প্রক্রিয়ায় বিশ্ব মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। এরূপ কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করার প্রতিই মহান আল্লাহ মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নি যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।"[২২৯]

২২৮। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ M.Asaduzzaman, Dhaka University Journal of Business Studies, Voll-viii No, (Dec-1997), P. 101.
২২৯। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২০১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য

ইতোপূর্বে ইসলামী পরিবারে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে যেহেতু কোন ক্ষেত্রেই এক তরফা হক ধার্য করা হয় নি, বরং সেই সঙ্গে অন্যেদের প্রতি কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে, তাই পিতামাতার উপর যে সন্তানের হক রয়েছে, তেমনি সন্তানের উপরেও মা-বাবার হক রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি পারিবারিক জীবনের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে চাকর-বাকর, অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে ব্যবহার। এই পর্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পিতা-মাতার অধিকারঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক হয় পরস্পর পরস্পরের পরিপুরক। ইসলামে পিতা-মাতা সন্তানের সম্পর্ক, পারস্পরিক কর্তব্য ও অঙ্গীকার দ্বারা নিবিড়ভাবে সুসংবদ্ধ। কিন্তু বয়সের পার্থক্যটা কখনও কখনও এত বিরাট হয়ে দাঁড়ায় যে, তা পিতামাতাকে শারীরিক দিক থেকে দূর্বল ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলে। এর প্রায় সাথে সাথে আসে অসহিষ্ণুতা, শক্তির অবক্ষয়, অত্যধিক স্পর্শকাতরতা এবং সম্ভবত ভুল ধারণা। এর পরিণাম পিতামাতার কর্তৃত্বের অপব্যবহার কিংবা আন্তঃপুরুষ বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতা পর্যন্ত গড়াতে পারে।[২৩০] সম্ভবত এসব বিষয়ে বিবেচনা করে ইসলাম কতিপয় মৌল শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্ষার মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সারাজীবন ধরে পিতা-মাতা ভালবাসা, কোমল অনুভূতি এবং বৃদ্ধ বয়সে অধিকতর সেবা-শশ্রূষা প্রাপ্য। পবিত্র কুর'আনে পিতা-মাতা ও সন্তানের পরস্পরের পরিপূরক সম্পর্ককে অতি সংক্ষেপে "ইহসান" এর ব্যাপকতম ধারণার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে, যা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরকে পরিস্কারভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে।[২৩১]

সন্তানের প্রতি সহৃদয়তা, ভালবাসা, অনুকম্পা ও স্নেহশীলতার যথাযোগ্য প্রতিদান পাওয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে। ইসলামে পিতা-মাতার ক্ষেত্রে ইহসান সংক্রান্ত ধারণার বাস্তত প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবে তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, কৃতজ্ঞতা ও অনুকম্পা, তাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, তাদের আত্মার জন্য কল্যাণ কামনা, তাদের বৈধ অধিকারের প্রতি সম্মান, তাদেরকে আন্তরিক পরামর্শ দান ইত্যাকার বিষয়গুলো এসে পড়ে।

২৩০। Hammuda Abdalati, Op.Cit., P.120
২৩১। Ibid, P.121

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের কাছ থেকে আনুগত্য প্রত্যাশা করার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে। যদিও তা কেবল সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কৃত ত্যাগ-তিতিক্ষার আংশিক বিনিময় হয়। কিন্তু পিতা-মাতা যদি কোন অন্যায় জিনিস দাবী করেন কিংবা অসঙ্গত কাজের আদেশ দেন তাহলে তা অমান্য করা শুধু যুক্তিযুক্তই নয়, বরং অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।[২৩২] আবার পিতা-মাতার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের জন্য সন্তানেরাই বাধ্য। পিতা-মাতার জীবনকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুভূত হলে সর্বতোভাবে সাহায্য করা সন্তানের পক্ষে একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য। যা হইক এটা এক অপরিহার্য বিষয় হল যে, সন্তানের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কোমল ব্যবহার পিতা-মাতার প্রাপ্য। আল-কুর'আনে বারবার আল্লাহর প্রতি দায়িত্বের সঙ্গে আদম সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করিবে।"[২৩৩] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

. "আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি, জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"[২৩৪]

প্রথমোক্ত আয়াতে 'ইহসান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে-যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ সদ্ব্যবহার, সুন্দর ব্যবহার, প্রেমময় সদাচরণ, উপকার ইত্যাদি। একই বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

২৩২। Ibid, P.121

২৩৩। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৬

২৩৪। আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৪।

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদিগের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায়

Dhaka University Institutional Repository

বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদিগকে "উফ্" বলিও না এবং উহাদিগকে ধমক দিওনা, তাহাদিগের সহিত বলিও সম্মান সুচক নম্র কথা। মমতাবশে তাহাদিগের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক তাহাদিগের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"[২৩৫]

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ-বাৎসল্য আর পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি-শ্রদ্ধা এক চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়ম। ইসলাম এ স্বাভাবিক নিয়মকে চিরজীবন্ত করে রাখতে চায়। পারিবারিক পর্যায়ে একটি শিশু তার শিশুকালে যেরূপ সেবা-যত্নে প্রতিপালিত হয়, বয়স্কদেরও তাদের সন্তানদের থেকে সেরূপ আদর-যত্ন পাবার স্বাভাবিক এবং মানবিক অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকারগুলোই উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- (ক) তাঁদেরকে সন্তান-সন্ততি কর্তৃক শ্রদ্ধা ভরে সম্বোধন করতে হবে। কোন প্রকার বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞাসূচক শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। নম্রভাবে তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে।

খ) তাঁদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদেরকে ধমক দেয়া যাবে না এবং তাঁদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করা যাবে না।

গ) পিতা-মাতার প্রতি নম্র, ভদ্র, আনুগত্য এবং অবনতভাবে আচরণ করতে হবে।

ঘ) পিতা-মাতার প্রতি শুধুমাত্র নম্রভাবে আচরণ করলেই চলবে না, তাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে হবে। এ মুনাজাতের মধ্যে তারা শিশুকালে সন্তানের প্রতি যেরূপ স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেছিলেন তার স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে। আর এই মুনাজাত শুধু একবার দু'বার করলে চলবে না; বারবার করতে হবে এবং প্রতিদিনই নামাযের পর করতে হবে। এ মুনাজাতের মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি অধিকতর দায়িত্ব সচেতন হতে হবে।[২৩৬]

২৩৫। আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ২৩-২৪। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে একটি বিষয় প্রাণিধানযোগ্য। আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার কথা বলা হয়েছে। এতে মানব জীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব কতটুকু তা অনুধাবন করা যায়। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের বিষয়টি আজকাল বিশ্বব্যাপী বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, চিকিৎসা পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির কারণে আগের তুলনায় মানুষ বর্তমানে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। ফলে বার্ধক্য দীর্ঘায়িত হলে পিতা-মাতার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেয়া খুবই প্রয়োজন। অতীতে যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলে অভাব অনটনে, রোগ-শোকে, অসুস্থতায় পরিবারের এক সদস্য আরেকজনের পাশে এসে দাঁড়াত। কিন্তু বর্তমান যুগে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে একক পরিবারের সৃষ্টি হওয়াতে সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন হয়ে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। বার্ধক্যে পিতা-মাতা সংগহীন হয়ে উঠেছে। তারা তাদের সন্তান-সন্ততি বা পৌত্র-পৌত্রিদের সান্নিধ্য পায় না। বাধ্য হয়ে অনেককে বয়স্কদের আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিতে হয়। বেতনভূক্ত সেবক সেবিকাদের সেবা কখনও সন্তান-সন্ততির স্নেহময় সেবার বিকল্প হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে ভিন্নতর যা বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩৬। Abdel Rahim Omran, Op. Cit., PP. 24-27

উপর্যুক্ত বর্ণনায় দেখা গেল যে, ইসলাম একত্ববাদ তথা আল্লাহকে সর্বোতভাবেই এক অংশীদারবিহীন বলে স্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছে এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত

করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতেই বুঝা যায়, বান্দার উপর আল্লাহর হকের পরেই পিতা-মাতার হক ধার্য হবে। নবী করীম (সা.) এর কয়েকটি হাদীস প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। নবী করিম (সা.) বলেন, "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি মলিন হউক, 'ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি মলিন হউক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি মলিন হউক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাঁদের সেবা করে নাই) বেহেস্তে যেতে পারল না।"[২৩৭]

"মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী পুত্র যখন রহমতের দৃষ্টিতে তার পিতা-মাতার দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজ্জের সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবীগণ আরজ করেন, যদি সে প্রতি দিন একশত বার করে তাকায়? বললেন, যদি সে ইচ্ছা করে একশত বার তাকাতে পারে। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় এবং পূত-পবিত্র।"[২৩৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূল (সা.), আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে ? তিনি বললেন, তোমার মা! তিনি আবার বললেন, অতপর কে ? তিনি বললেন, তোমার মা ! তিনি আবার বললেন, অতপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা! তিনি আবার বললেন, অতপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।"[২৩৯]

সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকার এত বেশী যে, তাঁদের অনুমতি ছাড়া এমন কি জিহাদেও যোগদান করতে ইসলাম অনুমতি দেয়নি।

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিযরত করার শপথ গ্রহণ করতে চাই। আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখি। নবী করীম (সা.) বললেন, "তোমার পিতা-মাতার কেউ কি জীবিত আছেন?" সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয় (জীবিত আছেন)। তিনি বললেন, "এরপরও তুমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা কর?" লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, "পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহর কর এবং তাঁদের খেদমত কর।"[২৪০]

২৩৭। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

২৩৮। ইমাম অলি আল দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

২৩৯। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

২৪০। প্রাগুক্ত, পৃ.২২০। এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ বিন উমরের বর্ণনায় আরেকটি হাদীস রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কাছে এসে বলল, আমি আপনার কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য এসেছি। আমি আমার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি তাঁদের কাছে চলে যাও এবং তুমি যেভাবে তাদের কাঁদিয়ে এসেছে তেমনি গিয়ে থামাও আর তিনি তাকে বাইয়াত করাতে অস্বীকার করেন।

পিতা-মাতার সাথে দূর্ব্যবহার করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাঁদের মনে কষ্ট দেয়া ও তাঁদের নাফরমানী করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় উপরাধ। এমনকি যারা এরূপ করে

তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে। তবে যদি পিতা-মাতা ভিন্নধর্মী হন এবং সন্তানদেরকে ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন করতে চান তাহলে সেরূপ পিতা-মাতার আল্লাহ বিরোধী নির্দেশ পালন করতে সন্তান বাধ্য নয়। তবে পিতা-মাতা যে ধর্মের অনুসারীই হউক না কেন, তাঁদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই রূঢ় ব্যবহার করতে পারবেনা। এ ব্যাপারে আল্লাহর কড়া নির্দেশ হল ঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে-বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাহাদিগের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদিগের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর।"[২৪১]

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য (মক্কা থেকে মদীনায়) আসলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এসেছে। আমি কি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর।"[২৪২]

হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে যত গুনাহ এবং যে কোন গুনাহই ক্ষমা করে দিবেন, তবে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাঁদের নাফরমানী করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়ায় শিগগির করে দেয়া হবে।"[২৪৩]

আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, বড় গুনাহসমূহের মধ্যে একটি হল পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল (সা.) ! কোন লোক কি তার পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৪১। আল-কুর'আন, ৩১: ১৫

২৪২। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

২৪৩। ইমাম অলি-আল-দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১। (বুখারী ও মুসলিমের নূফাই ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত আছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, "মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই (কথাটি তিনি তিন বার বললেন) তাহল আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া।"

একজন অন্যজনের পিতাকে গালি দেয়, আর সে প্রত্যুত্তরে তার পিতাকে গালি দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গালি দেয় আর দ্বিতীয়জন প্রথম জনের মাকে গালি দেয়।"[২৪৪]

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আরো একটি প্রধান উপায় হল, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচারণ করা। নবী করীম (সা.) পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুরব্বী আত্মীয় হউক অথবা অনাত্মীয় সকলের সাথেই সুন্দর ব্যবহার করা কর্তব্য। নবী করীম (সা.) বলেন, "সৎ কাজসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হল, কোন ব্যক্তি তার পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।"[২৪৫]

হযরত উসায়েদ (রা.) বলেন, "একদা আমরা রাসূল (সা.) এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় বণী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহর করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের কৃত ওয়াতা পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, এ কারণে যে, এরা তাদেরই আত্মীয় এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।"[২৪৬]

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অধিকার

পারিবারিক জীবনের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হল চাকর-বাকর, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ব্যবহার। যারা স্থায়ীভাবে চাকর-বাকর রাখেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের জন্য অনেক সদুপদেশ ও সুসংবাদ দিয়েছেন। চাকর-বাকরদের সাথে গোলামের মত নয়, বরং ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করার জন্য মনিবদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং মহানবী (সা.) ও তাঁর নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত প্রশ্রয়পূর্ণ, তাঁর আনাড়ী ছোট-খাট ভৃত্যটি তার কাজের জন্য বকুনী খাবে তা তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। তাঁর খাদেম হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, দশটি বছর আমি রাসূল (সা.) এর খেদমতে রয়েছি। তিনি আমাকে কখনও 'উহ' শব্দটিও বলেন নি।"[২৪৭]

২৪৪। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০ (মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণিত আরেকটি হাদীস নবী করীম (সা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, কৃপণতা করা, অবৈধভাবে অন্যের মাল দাবী করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত প্রোথিত করা তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন---------।"

২৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২

২৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

২৪৭। অলি-আল-দীন, প্রাগুক্ত, বাব ফি আখলাকিহী ও শামায়েলিহী, হাদীস নং ৫৮০, খ.১, পৃ. ৫১৮

তিনি পরিবার-পরিজনদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তাঁর একজন পুত্র সন্তান তাঁর বুকের উপরই মারা যান ধাত্রীর ধোয়াটে গৃহের মধ্যে আর সে ধাত্রী ছিলেন একজন কর্মকারের

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী। তিনি শিশুদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাজপথে শিশুদেরকে থামিয়ে তাদের গন্ডদেশ চাপড়ে দিতেন। তিনি জীবনে কারো শরীরে আঘাত করেন নি। কথাবার্তার মধ্যে তিনি সবচেয়ে খারাপ যে উক্তি করেছেন, সে হচ্ছে, লোকটার হয়েছে কি? ওর কপালে ধুলোবালি লেগে থাক।[২৪৮] হযরত (সা.) বলেছেন, যে কেউ তার চাকরের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, আল্লাহ তার মৃত্যুর কঠিন ও কষ্টকর মুহূর্তটিকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে দেবেন। চাকর-বাকরদের ন্যায়বিদার, দয়াদ্রতা, অনুকম্পা, আহার্য, পোশাক-আশাক, বাসস্থান এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত খরচপত্র পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মহানবী (সা.) এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, চাকর-বাকরদের আপন মনিবদের মতই আহার্য-গ্রহণ ও পোশাক-আশাক পরিধান করাতে হবে এবং তাদের প্রতি কর্তব্যের অঙ্গ হিসেবেই মনিবরা নিজ ব্যয়ে এর ব্যবস্থা করবে।

এর বিনিময়ে চাকর-বাকরদের উপর কোনরূপ নিগ্রহ চালানো কিংবা তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন অথবা তাদের কাছ থেকে বাড়তি কাজ আদায় করা যাবে না। যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের দাসগণ তোমাদেরই দাস। অতএব তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দাও। তোমরা যেরূপ কাপড় পরিধান কর, তাদেরকে তদ্রুপ কাপড়ই পরিধান করতে দাও।"[২৪৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে চাকর কিংবা শ্রমিক হওয়ার কারণেই কোন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না কিংবা তার সম্মান লোপ পায় না। প্রকৃত মুসলিম সমাজের সকল সদস্যই একটি সমান ভিত্তির উপর দন্ডায়মান হয়। কেননা, ইসলাম কোন প্রকার বর্ণাশ্রম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্বকে স্বীকার করে না। ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের যে একমাত্র মাপকাঠি স্বীকার করে, তা হল পরহেজগারী, পূণ্যশীলতা এবং আল্লাহর পথে সৎকাজ। যেমন আল-কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" [২৫০]

২৪৮। সৈয়দ আমির আলী (অনু-মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান), দি স্পিরিট অব ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১৯৯৩, পৃ. ১৬০

২৪৯। আল্লামা শিবলী নোমানী, আস সিরাত- আন নববীয়া, আযমগড়, মাতবা আল মাআরিফ-১৯৫২, পৃ. ১৫৫

২৫০। আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

অনুভূতি সম্পন্ন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আর সকলের আদি উৎসও এক। আল্লাহ যাকে আজ অধীনস্ত করে দিয়েছেন তিনি ইচ্ছা করলে কালই তাকে উপরস্থ করে দিতে পারেন। তাই নবী করিম (সা.)– বলেছেন, 'দাসদাসীগণকে ন্যায় সংগতভাবে খাদ্য ও পোশাক দেবে। তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

সাধ্যতীত কাজ করতে দিবে না।" তিনি আরো বলেন, "প্রবঞ্চক, অহংকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং দাস-দাসীদের প্রতি অসদ্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।" যখন কোন গোলাম তার মনিবকে উপদেশ দেয় এবং উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লিখিত হয়। " হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)- এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, খাদেমের কোন দোষত্রুটি কত বার ক্ষমা করব ? রাসূল (সা.) কতক্ষণ নিরব থেকে বললেন, প্রত্যেক দিনে তাকে ৭০ বার ক্ষমা করবে।" হযরত ওমর (রা.) প্রত্যেক শনিবার মদীনা হতে তিন মাইল দূরে 'আওয়ামী' নামক জায়গায় যেতেন। যদি তিনি কোন দাসকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজে দেখতেন, তিনি তার কাজ কম করে দিতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে একটি প্রাণীর উপর সাওয়ারী হয়ে যেতে এবং তার পেছনে পেছনে তার গোলামকে দৌড়িয়ে যেতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তাকে তোমার পেছনে আরোহণ করিয়ে নেও। কেননা সে তোমার ভাই। তার আত্মা তোমার আত্মার ন্যায়। তারপর লোকটি তাকে উঠিয়ে নিলে তিনি বললেন, কোন বান্দা আল্লাহর নিকট থেকৈ দূলে যেতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার গোলাম তার পিছনে হাটতে থাকে। [২৫১]

পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সত্যিকার উদার সহানুভূতি ও যত্নশীল মনোভাব প্রদর্শনের লক্ষে তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য দান ও সহযোগীতা করার জন্য ইসলাম মানুষকে আদেশ করেছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, আরবী ভাষায় আত্মীয়তা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে এমন একটি ধাতু থেকে, যার অর্থ হল, দয়াশীলতা (রহম ও রহমাহ) ২৫২ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন হল বেহেশতে পৌঁছার সহজ ও সরল পথ। যারা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তাদের জন্য এ পথটা নিষিদ্ধ। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহৃদয় ব্যবহারকে মহানবী (সা.) ঐশী আশীর্বাদ ও পরম অনুগ্রহ বলে বিবৃত করেছেন। আত্মীয়-স্বজনদের মঙ্গল সাধন করা একটি পবিত্র দায়িত্ব-এমনকি তারা একই ভাবে সাড়া না দিলেও। এ কর্তব্যের আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহর জন্যই এটি পালন করতে হবে আত্মীয়-স্বজনের কোন তোয়াক্কা না করেই। এ সম্পর্কে কুরআনের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করার মত। যেমন ঃ

---

২৫১ । ইমাম গাযযালী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০১৮-১০২১।

২৫২। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নাই, কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মী-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ

সংকটে দুঃখ -ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্য পরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী। [২৫৩]

আত্মীয় স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না। [২৫৪]

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাহার শরীক করিবেনা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকটপ্রতিবেশী, দূরপ্রতিবেশী সংগী-সাথী পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, আত্মগরবীকে। [২৫৫]

"এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।" [২৫৬]

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের রিযিক প্রশস্ত হওয়ার এবং নিজের আয়ূস্কাল বৃদ্ধি হওয়া পছন্দ করে, যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" " আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না। [২৫৭]

নবী করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি রহমান (করুণাময়) এবং এই রহম (আত্মীয়তা) আমার নাম থেকে বের করে তার নামকরণ করেছি। যে তার বন্ধন রাখে আমিও তার সাথে সংযুক্ত থাকি এবং যে তাহা ছিন্ন করে আমিও তা বিচ্ছিন্ন করি।

২৫৩। আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৭৭

২৫৪। আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ২৬

২৫৫। আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৬

২৫৬। আল-কুর'আন, ৪ ঃ

২৫৭। মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯-২৩০

২৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

নবী করীম (সা.) আরও বলেন, " আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির কাজ শেষ করে যখন অবসর হলেন তখন 'রাহম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) দাঁড়িয়ে বলল, এই স্থানটি কি ঐ ব্যক্তির জন্য যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার জন্য আপনার নিকট পানাহ চায় ? তিনি (আল্লাহ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট হবে যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছেদ

করবঽ রাহম বলল, হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট হব। আল্লাহ বললেন, এ স্থানটি তোমার।” [২৫৮] আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, “এক ব্যক্তি বললেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার এরূপ আত্মীয় রয়েছে আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি' তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার ক রে। আমি তাদের সাথে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি' তার াসর্বধা মূখতার পরিচয় দেয়। নবী (সা.) বলেন, তুমি যেমন বলেছ সত্যিই যদি তেমনটি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তারেকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছ। তুমি যতক্ষণ উল্লেখিত কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহ সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে এবং তিনি তাদের ক্ষতি থেকে তোমাকে বাঁচাবেন। [২৫৯]

তিনি আরো বলেছেন, “ইহসানের পরিবর্তে ইহসানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়, বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ঐ ব্যক্তি যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে পুণরায় তাই স্থাপন করল। [২৬০]

নবী করিম (সা.) বলেছেন, “ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সেখানে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না। [২৬১]

সুতরাং আত্মীয়-স্বজনকে কোন অবস্থাতেই কষ্ট দেয়া বৈধ নয়, বরং অত্যন্ত গুনাহের কাজ। তাদের শোক-দুঃখের অংশীদার হওয়াই সকলের নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য। তাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার সেবা করতে হবে। যদি কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে তথাপি তার সাথে ভাল ব্যবহার করাই ইসলামের নীতি। যদি সে অত্যাচার করে তাহলে প্রতিশোধন না নিয়ে তাকে ক্ষমা করা ইসলামী আদর্শ। গরীব ও বিপদগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিক সাহায্য করা ধনী আত্মীয়ের উপর ফরজ। আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা বিদ্বেষ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ।

২৫৯। হাদীসে গরম ছাইকে গুনাহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। গরম ছাই ভক্ষণকারী কষ্ট ভোগ করে, ঠিক তদ্রুপ গুনাগার ব্যক্তিও দুঃখ কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু নেক্কার ব্যক্তিকে এরূপ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, বরং তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং তার প্রাপ্য হক নষ্ট করার জন্য প্রতিপক্ষই কষ্ট ভোগ করবে। (মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮-২১৯)

২৬০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

২৬১। অলি আল-দীন মুহাম্মদ, *মিশকাত আল মাসাবিহ,* এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা:তাবি, পৃ. ৪২০

যারা এধরণের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে আদৌ ভালবাসেন না। তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত থাকে এবং পরকালেও জান্নাতের পরম শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে তা বজায় রাখা আবশ্য কর্তব্য। তবে ইসলাম যেমন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের অধিকার আদায়

Dhaka University Institutional Repository

করতে নির্দেশ দিয়েছে, তেমনি অন্যায়ভাবে তাদেরকে সহায়তা করতে এবং তাদের পক্ষপাতিত্ব করতেও নিষেধ করেছে। অতএব ইসলামের নির্দেশিত সীমা অতিক্রম না করে তাদের হক আদায় করতে হবে।

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় এর সদস্যদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বয়সে যারা ছোট তাদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। পারিবারস্থ সদস্যরা বড় হউক আর ছোট হউক তাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। তাই বড়দের প্রতি ছোটদের যেমন শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তেমনি ছোটদের প্রতি বড়দেরও স্নেহশীল হতে হবে। মানুষ যেহেতু স্বভাবই দূর্বল তাই সঙ্গদোষেই হউক কিংবা রিপুর তাড়নায়ই হউক সে যে কোন মুহূর্তেই তার দূর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলে সে আর কাউকে মান্য করতে চায় না। এমনকি পিতা-মাতার সাথেও দুব্যবহার করে থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি আত্মসংযম বা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ ইবাদত করে তাহলে তা হবে আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। অতএব কেউ যদি এহেন যৌবন অবস্থায় বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান দেখায় তাহলে মহান আল্লাহও তার বৃদ্ধাবস্থায় অন্য কারে দ্বারা তাকে সম্মান দেখাবেন। যেমন নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধ লোকতে তাঁর বার্ধ্যেকের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার বৃদ্ধবস্থায় তার জন্য এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, সে তাকে সম্মান করবে। [২৬২]

বড়দের ন্যায় ছোটদেরও যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। ছোট ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা বয়সে ছোট তাদের প্রতি মায়া-মমতা, স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের আদর যত্ন করতে হবে।

২৬২। অলি আল দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮৭, হাদীস নং-৪৯৭১

বড়দের আধিকার ও ছোটদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জানে না, সে আমাদের সমাজভূক্ত নয়। [২৬৩]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, একদা এক বেদুইন নবী করীম (সা.) -এর খেদমতে আসলেন, তিনি বললেন, আপনারা কি শিশুদের চুম্বন করেন ? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। নবী করীম (সা.) তখন বললেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা উঠিয়ে নেন তবে আমি কি বারণ করার সামর্থ রাখি।[২৬৪]

সুতরাং পরিবারের বায়োজৌষ্ঠ্য সদস্যদের কর্তব্য হল ছোটদের আদর স্নেহ করা, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। আর বায়ো:কনিষ্ঠ্যদের কর্তব্য হচ্ছে, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের কথা মান্য করা, সালাম দেয়া এবং বসা থাকলে উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করা। যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব বিদ্যমান সেখানেই সুখ-শান্তি বিরাজ করে। কারণ ছোট শিশু একটু আদর সোহাগ পেলে সে কখনও তা ভুলে না। আর অনাদর ও অবহেলা দুঃখ ও বিপদ ডেকে আনতে পারে। বড়দের সামান্য আদর শিশুর মনের কালিমা দূর করে দেয়। কাজেই ইসলামী বিধান মতে, বড়দের মান্য করা ছোটদের একান্ত কর্তব্য এবং ছোটদের স্নেহ করাও বড়দের দায়িত্ব।

এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতাসহ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সকল সদস্য যদি কুর'আন সুন্নাহ তথা ইসলামী বিধানানুসারে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে তাহলেই কেবল সুখী-সমৃদ্ধশালী ইসলামের কাংখিত পরিবার গঠিত হতে পারে।

২৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩
২৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

ইসলাম প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়। ইসলাম হলো একটি সামাজিক ব্যবস্থা, একটি সংস্কৃতি ও সভ্যতা। সে হিসেবে এর রয়েছে নিজস্ব মূল্যবোধ, আদর্শ, লক্ষ যা

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের পরিপূর্ণতার চুড়ান্ত রুপ। ইসলামী আইন অত্যন্ত ব্যাপক। অন্যান্য ধর্মীয় বিধি-বিধানের মত ইসলামের বিধি-বিধান শুধুমাত্র বিশ্বাস আরাধনা এবং পূজা-অর্চনায় সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি বহুল বিস্তৃত। মানুষের নৈতিক আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যকারন ইত্যাদিও ইসলামী অনুশাসনের অংগীভূত। তা'ছাড়া রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সরকারের পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্য, কর আদায়, সমাজ কল্যাণ, সমাজের উন্নয়ন, পরিবার ও সমাজ গঠন, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। মানব জীবনের কোন একটি সমস্যা সম্পর্কে ইসলাম উদাসীন নয়। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম একটি নিছক তথাকথিত ধর্মীয় মতবাদ নয়। ইসলাম হলো সামগ্রিক জীবন-বিধান। সমাজ স্থবির নয়, বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবার গঠন ও এর পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্বের মৌলিক নীতিমালা ইসলামী আদর্শের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয়েই পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ হওয়া উচিত। বিনা পরিকল্পনায় কোন কাজই ফলদায়ক হতে পারে না। গঠনমূলক কাজ পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভবই নয়। বিনা পরিকল্পনায় কোন বাড়ী তৈরীর কাজে হাত দিলে বার বার এত বেশী ভাংগার কাজ করতে বাধ্য হতে হবে যে, গড়ার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব জগত বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেননি। তাই এর সৃষ্টিতে কোথাও অসামঞ্জস্যতা, বিশৃংখলা, অনিয়ম ও অন্য কোন রকম দোষ ক্রটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর বাণী ঃ

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

"দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ কোন ক্রটি দেখতে পাও কি?"[১]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তারই দরুন যেখানে মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলে না সেখানেই অসংগতি, অশান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। মহাশূন্যের গ্রহালোকে, মহাসমূদ্রে, বনজংগলে ও পশু জগতে কখনো মানব সমাজের মতো বিশৃংখলা দেখা দেয় না। কারণ ঐ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর পরিকল্পনা তিনি নিজে বাস্তবে কার্যকর করেন। মানুষের মতো স্বাধীনতা তাদেরকে তিনি দেননি।

১। আল-কুর'আন, ৬৭ঃ৩

ইসলাম ও পরিকল্পনা

জীবন ব্যাবস্থা হিসেবে ইসলাম এর অনুসারীদের সংগঠিত ও সুসংহত করতে দায়। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে তারা শেষ্ঠ উম্মত এবং তাদেরকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলিম জীবনের এ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে হলে পরিকল্পনাহীনভাবে তা' সম্ভব

নয়। এপৃথিরীর সমস্ত কিছুই যে বিশ্ব বিধাতার একটি সুন্দরতম পরিকল্পনা এবং বিধানুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এ কথাটি আল-কুর'আনে গুরুত্বের সংগে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি 'কাদার' অনুসারে অথ্যাৎ নির্ধারিত পরিমাপে বা বিধি অনুসারে।"[২]

আল-কুর'আনে বার বার মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করতে, গবেষণা করতে। তাদের চারিদিকে বিরাজিত বিশ্ব পরিকল্পনা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং অলৌকিকতা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে। আল-কুর'আনে ঈমানদারদের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

"যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি।"[৩]

সমগ্র বিশ্বে বিরাজ করছে একটি নিখুঁত শৃংখলা ও প্রাকৃতিক নীতিমালা। বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে আল-কুর'আন স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। প্রত্যেকে ভাসমান এবং নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তনণ করে।"[৪]

ধর্মীয় দৃষ্টিভংগী হতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত মহাবিশ্বের পিছনে রয়েছে একজন মহান সৃষ্টিকর্তা।

২। আল-কুর'আন, ৫৪ঃ৪৯
৩। আল-কুর'আন, ৩ঃ৯১
৪। আল-কুর'আন, ৩৬ঃ৪০
বিশ্ব সৃষ্টিতে আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

"মহা-মহিমন্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব, তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে, কে তোমাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

কর্মোত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না।"[৫]

মুসলিম জীবনে পরিকল্পনার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হলো 'এবাদতের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া সালাতের মধ্যে। দৈনিক ৫ বার নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে সালাত এর অন্তর্নিহিত পরিকল্পনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রোযা বা উপবাসও ইচ্ছামত সময়ে করা যায় না, বছরের যে কোন সময়ে হজ্ব করা যায় না। হজ্বে সময় ও হজ্বের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। যাকাতের হিসাব না করে দেয়া যায় না যাকে ইচ্ছা তাকে দেয়া যায় না;তার রয়েছে নীতিমালা।

জাগতিক বিষয়ে পরিকল্পনার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। মিশরে দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করেন হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর সুচিন্তির পরিকল্পনার মাধ্যমে। তিনি ফিরা'উনের স্বপ্নের সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) শস্য সংগ্রহের জন্যে ৭ বছর ব্যাপী পরিকল্পনা করেন এবং পরবর্তী ৭ বছর শস্য উৎপাদন না হলেও একটি জাতির জন্যে প্রয়োজনীয় বিরাট শস্য ভান্ডার গড়ে তোলেন। আল্লাহর সকল নবীর ন্যায় হযরত ইউসুফ (আ.)ও মুসলিমদের নিকট সমভাবে সমাদৃত। আল-কুর'আনে ঘটনাটির নিরুপ বর্ণনা রয়েছেঃ

"ফেরা'উন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম ৭টি স্থুলকায় গাভী। এদেরকে ৭টি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে। আরো দেখলাম ৭টি সবুজকায় শীষ ও অপর ৭টি শুষ্ক শীষ। হে প্রধানগণ যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জান তবে তোমরা আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও। তারা বলল, এটি অর্থহীন স্বপ্ন। এরুপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় আমরা অভিজ্ঞত নই।

দু'জন কায়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল সে দীর্ঘকাল পর (ইউসুফকে) স্মরণ করল। সে বলল, "আমি স্বপ্নের তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। তোমরা আমাকে (কারাগারে) পাঠাও।"

৫। আল-কুর'আন, ৬৭ঃ১-৩

অতঃপর সে (মুক্তিপ্রাপ্ত কায়েদী) বলল,"হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! ৭টি স্থুলকায় গাভী এদেরকে ৭টি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে। ৭টি সবুজকায় শীষ এবং অপর ৭টি শুষ্ক শীষ। এ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও যাতে আমি রাজ দরবারে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা স্বপ্ন বিষয়ে অবগত হতে পারে।

ইউসুফ (আ.) বলল, তোমরা ৭ বছর একাধিকক্রমে চাষ করবে। অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ ভক্ষণ করবে বাকীটুকু শীষ সমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে ৭টি কঠিন বছর। এ ৭ বছর যা পূর্বে-সঞ্চয় করে রাখবে জনগণ তা-ই খাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল সামান্য কিছু বীজ যা তোমরা সংরক্ষণ তা ব্যতীত। এরপর আসবে ১ বছর। সে বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।”[৬]

আল-কুর’আনে উপরোক্ত আয়াত সমূহের তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপরোক্ত আয়াতে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতের দুঃখ-কষ্ট পরিহার করার প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ নেয়া ইসলামী শরী‘আহ্ বিরোধী নয়। পরিকল্পনা গ্রহণ করলে একথা বলা যাবে না যে, তাকদীরের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।[৭]

ইমাম জাবিদী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) খায়বরের ১ বছরের উৎপাদিত খেঁজুর ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন।[৮]

পরিবার পরিকল্পনা ব্যতিক্রমধর্মী নতুন কিছু নয়। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে যোগাযোগ, খোঁজ-খবর, অনুসন্ধান, প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। মেয়ের বয়স হয়েছে বলে খোঁজ-খবর না নিয়ে সবদিক বিবেচনা না করে বিয়ে দেয়া যায় না।

পরিকল্পিত এবং সুনির্বাচিত পাত্র-পাত্রীর বিয়ে সম্পাদিত হলো। এরপরে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা যায় না। জৈবিক কারণে বছর বছর সন্তান উৎপাদিত হতে পারে না। সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থে গর্ভধারণের সময়ে ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়, পরিকল্পনা করতে হয়। শিশু সন্তানের স্বাস্থ্য, খাদ্য সম্মন্ধেও চিন্তা করতে হয়। পশু শাবক যত সহজে বিনা যত্নে গড়ে উঠতে পারে মানব সন্তানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষ। কিন্তু মানব শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা বা গো-মেষ শাবক অপেক্ষাও অনেক বেশী অসহায় থাকে। একদিন বয়সের গো-শাবক উঠে দাঁড়াতে পারে মায়ের স্তন খুঁজে বের করতে পারে।

৬। আল-কুর’আন, ১২ঃ৪৩-৪৯

৭। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪

৮। Al-Zabidi Ithaf, P. 382

পশু শাবকের আখলাক তৈরীতে শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। তারা নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ নিয়ামত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। সুষ্ঠু শিক্ষা এবং পরিবেশে মানব শিশু ফেরেশতার উর্ধ্বতর স্তরে পৌঁছতে পারে। এজন্যে পয়োজন শিক্ষা ও পরিবেশ। শুধু শিশু ও শিশুর মায়ের জন্যেই পরিকল্পনার প্রয়োজন তা’ নয়। মুসলিম পরিবারের দাদা-দাদী, অসহায় ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগিনা-ভাগিনী আরো অনেকে নির্ভরশীল থাকে। তাদের সুখ-দুঃখ এবং স্বার্থের কথাও নিজস্ব পরিবার পরিকল্পনার

সময় খেয়াল রাখতে হয়। পরিবারে বয়স্কদের বিশেষ সেবার প্রয়োজন হয়ে থাকে। বৃদ্ধদেরকে প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতির ন্যায় অপ্রয়োজনীয় বোঝা ভেবে অবহেলা করা শুধু অন্যায়ই নয় মহাপাপ। শুধুমাত্র নিজের সন্তান-সন্ততির সুখ-দুঃখের দিকে লক্ষ্য করা এবং বৃদ্ধ অসহায় পিতা-মাতাকে উপেক্ষা করা ইসলামী আদর্শ নয় নারকীয় জীবন পদ্ধতি। পরিবার ভিন্ন মুসলিম জীবন সুন্দর হতে পারে না সুখী হতে পারে না। বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্ভোগ ইসলামে স্বীকৃত নয়। বিবাহ এবং পরিবার জান্নাতের দ্বার এবং সিঁড়ি। অপরিকল্পিতভাবে ভুল দরজায় প্রবেশ করে পদস্খলন হলে জাহান্নামই হবে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।[৯]

ইসলাম গুণগতমানের ধর্ম

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নে ইসলামের নির্দেশ হলো মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং পৃথিবী আবাদ করতে হবে। কিন্তু শর্ত রাখা হয়েছে যে, মানুষের গুণগতমান উপেক্ষা করা যাবে না। মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ এ নয় যে, সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে কিন্তু সন্তানের ঈমান ও আখলাকের প্রতি লক্ষ্য না রাখলেই চলবে। মুসলিম নামধারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে, কিন্তু তারা মুশরিক হোক কাফির হোক, মুনাফিক হোক এ ব্যাপারে পিতা-মাতা উদাসীন থাকবে এটা ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, হবে তা নামধারী মুসলিম নয়, ঈমানদার মুসলিম যাদের চিরন্তন নিবাস হবে জান্নাত। মানুষের সংখ্যা এবং মানুষের গুণগতমানের মধ্যে ইসলাম অবশ্যই গুণগতমানের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।[১০]

আল-কুর’আনে বলা হয়েছেঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

“ভাল ও মন্দ এক নহে যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে।”[১১]

৯। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৫

১০। Khalaf Ali and Mari in Rabat Proceedings, Vol,2, P.44

১১। আল-কুর’আন, ৫ঃ১০০

অন্যত্র আরো বলা হয়েছেঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

“আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্রদল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে।”[১২]

সংখ্যাধিক্যের উপরে গুণগতমানের গুরুত্ব আল্ আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ সালতুত এর ফতোয়ার মধ্যে স্পষ্ট।

মুসলিমদের সংখ্যা নয় বরং তাদের ঈমান, আখলাক, ত্যাগ ও কুরবানী ইত্যাদি অধিকতর গুরুত্বপূর্ন। এ ধারা প্রতিফলিত হয়েছে **১৯৭১** সনে রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলাম ও পাঠবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা সম্মেলনে।[১৩]

উলামায়ে-কিরাম চান যে মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাক। তারা অবশ্য একথা বলেন না যে ঈমান আকীদাহ ও আখলাকহীন মুসলিমদের সংখ্যাই বেশী হোক। কিন্তু যে পরিবেশে সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনায় মুসলিমগণ সংখ্যা গরিষ্ট হবে, সাথে সাথে মজবুত ঈমান-আকীদাহ সম্পন্ন হবে এরুপ অবস্থা ও নেতৃত্ব মুসলিম সমাজে দেখা যাচ্ছে না। তাদের কথা হলো মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তাতেই রয়েছে পরিবার পরিকল্পনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।[১৪]

ইসলাম সার্বজনীন ও সর্বকালের ধর্ম

ইসলাম নাযিলকৃত আসমানী ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী। ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্যে নির্বাচিত ধর্ম। এটা কোন বিশেষ এলাকা বা বিশেষ কালের বা ইতিহাসের কোন বিশেষ সময়ের জন্যে নির্ধারিত ধর্ম নয়। এ ধর্ম শুধু ৭ম শতাব্দীর আরবদের জন্যে নাযিল হয়নি। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সকল সময়ের প্রয়োজন মত অন্তর্নিহিত গুণাবলী এর মধ্যে রয়েছে। ইসলামের বিধানসমূহ যেহেতু সর্বকালের জন্যে এবং পরিবর্তনশীল, তাই এর প্রাসংগিকতা অনুধাবনে অনেকেই কষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর সার্বজনীনতা সুস্পষ্ট।

১২। আল-কুর'আন, ২ঃ২৪৯
১৩। See Rabat Procudings, Vol. 2
১৪। শেখ আবূ জাহরা, তানজিমুল উমরা, পৃ.১০২

জনসংখ্যার পরিবর্তন

জনসংখ্যা বিজ্ঞান পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাসের গতিধারা ও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। সকল শতাব্দী ও যুগের প্রয়োজন মিটাবার মত অন্তর্নির্হিত শক্তি অবশ্যই ইসলামের আছে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত ব্যাপক পার্থক্য যুগে যুগে হয়েছে তার অত্যন্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে। খ্রীষ্টাব্দ ২য় শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল অর্ধ মিলিয়ন বা

Dhaka University Institutional Repository

৫০ কোটির কম। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটিতে দাঁড়ায়।[১৫] সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বা আধুনিক যুগ শুরু হবার পূর্বে পৃথিবীর সবদেশে মৃত্যুহার ছিল খুব বেশী। তখন মহামারী দুর্ভিক্ষ, খরা ইত্যাদিতে মৃত্যু ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার ছিল অতি উচ্চ। এসব কারণে উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ছিল সহায়ক। যদিও বিভিন্ন বছরে বৃদ্ধির হার ছিল ভিন্ন কিন্তু শতাব্দী ব্যাপী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল নামমাত্র।

ফিগার ১.১-এ বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, ৩য় শতাব্দীর শুরু থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল নামমাত্র। আধুনিক যুগের শুরু থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মহামারিজাত মৃত্যুর হার কমতে থাকে আষ্টদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নশীল দেশ সমূহে মৃত্যুর হার কমে যায়, কিন্তু জন্মের হার ঠিকই থাকে। যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঠিক থাকে।

ফিগার ১.১

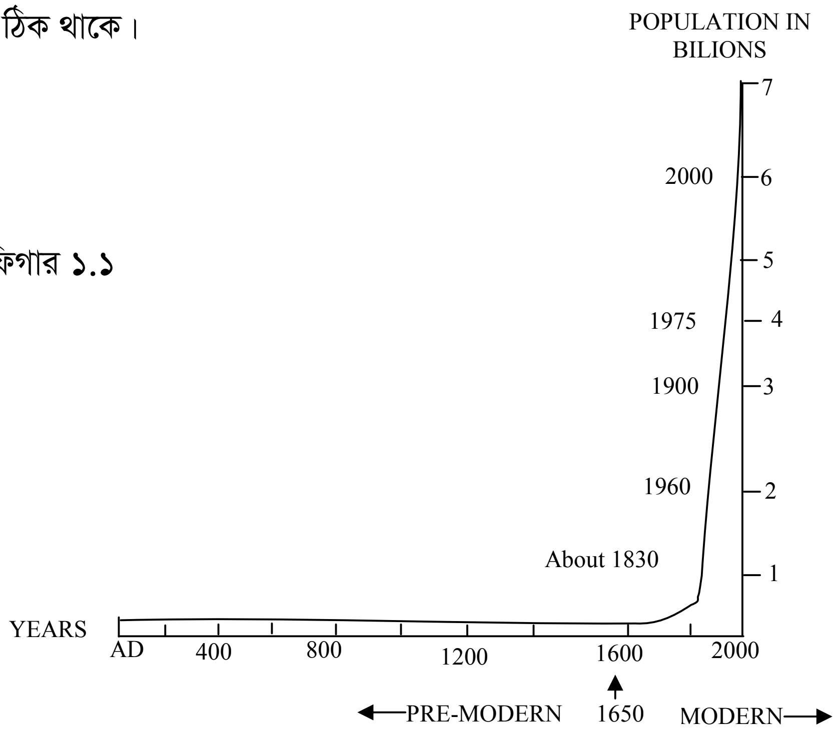

১৫। Omran, The Epidemiologic Transition', Mibank Tournal, P. 509

১৬। Abdel Rahim Omran (ed) Community Medicine in Developing Contries, (New York. Spninges, 1974), P. 102

ইউরোপে জনসংখ্যা বিস্ফোরনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে নতুন জনবসতি স্থাপিত হতে থাকে। ইউরোপে জনসংখ্যার চাপ কিছুটা কমে। তদুপরি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে জন্মের হারও কিছুটা কমতে থাকে। বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থাপিত জনসংখ্যা স্থিতি। ইউরোপের বর্ধিত জনসংখ্যা যদি বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে না পড়তে পারত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থিতি না আসত তা হলে উহার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি দারুণভাবে ব্যহত হতো।

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা হলো ভিন্নরুপ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ফললাভ অধিকাংশ দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পৌঁছেনি। ফলে মৃত্যুর হারও তেমন একটা হ্রাস পায়নি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্কুল, কলেজ স্থাপন, হাসপাতাল স্থাপন, সাধারণ শিক্ষার বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর হার বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে হ্রাস পেতে শুরু করে। কিন্তু জন্মের হার আধুনিক যুগ শুরু হওয়ায় যা ছিল সে পর্যায়ে থেকে যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে উন্নত বিশ্বের মতো সামাজিক ও স্বাস্থ্য সম্মত সুযোগ-সুবিধা সমূহ দ্রুত সমপ্রসারিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে জন্মের হার ঠিকই রইলো কিন্তু মৃত্যুর হার করতে থাকলে, তাদের জন্যে সৃষ্টি হলো নতুন সমস্যা। অর্থনৈতি এবং সামাজিক উন্নতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে কিছুতেই তাল মিলিয়ে চলতে পারল না।

কিছু কিছু অনুন্নত দেশ স্থানীয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা অভিযান শুরু করলো। এলক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থাসমূহ এগিয়ে এলো। বিভিন্ন ধরণের জনসংখ্যা সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হলো এর লক্ষ্য হলো গর্ভধারণ ও জন্মহার সীমিত করা। যাতে জাতীয় সম্পদের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কিছুটা সামঞ্জস্য থাকে। উন্নত দেশের বহুবিধ সুবিধার কথা অনুন্নত দেশের মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালীগণ অবহিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হলো নতুন সমস্যা। তারা চাইল উন্নতর আবাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা। পারিবারিক আয়ের উপরে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হলো। অন্যদিকে একটি শিশুকে সুশিক্ষিত করার ব্যয় অনেক বেড়ে গেল। শুধু শিশুর খাদ্য বস্ত্রের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতো, তাকে শিক্ষিত এবং উন্নতর সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আরো অর্থের প্রয়োজন হতো। পূর্বে নারী শিক্ষার প্রয়োজন তেমন ছিল না। মেয়েদের শিক্ষার জন্যে গৃহকর্তার ব্যয় ছিল অতি সীমিত। তাদের জন্যে ব্যয় ছিল বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয়। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হলো শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়। বহিরাংগনে চলাফেরার জন্যে জামা-কাপড়ের জন্যেও অধিকতর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখনো যারা রক্ষণশীল অল্প আয়ে তুষ্ট, যাদের জীবনের চাহিদা কম তাদের পরিবারের আয়তন অন্যদের থেকে সীমিত, যদি তারা নিজেরা ভালভাবে থাকতে চায়, উন্নতর জীবনযাত্রার স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। সমাজের এক অংশ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে পরিবারের জনসংখ্যা সীমিত রাখতে পক্ষপাতী। কিন্তু অপর অংশ একে মেনে নিতে পারছে না। এ দু'গ্রুপের মধ্যে চলছে মানসিক সংঘাত।[১৭]

ইসলাম ও জনসংখ্যা পরিবর্তন

ইসলাম একটি সার্বজনীন এবং শাশ্বত জীবনদর্শন। এরমধ্যে বৃহৎ পরিবার এবং ক্ষুদ্র পরিবারের সমর্থক সকলেই আশ্রয় খুঁজে পায়। মুসলিম সমাজের মধ্যে বর্তমান সময়ে দু'ধরণের পারিবারিক সংগঠন হয়েছে। বড় পরিবার এবং উচ্চ জন্মহার যেমন মুসলিম সমাজে

দেখা যায় ঠিক তেমনি ক্ষুদ্র পরিবারও দেখা যায়। মুসলিম সমাজের এ অবস্থাটি ১.২ লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে।

ফিগার ১.২

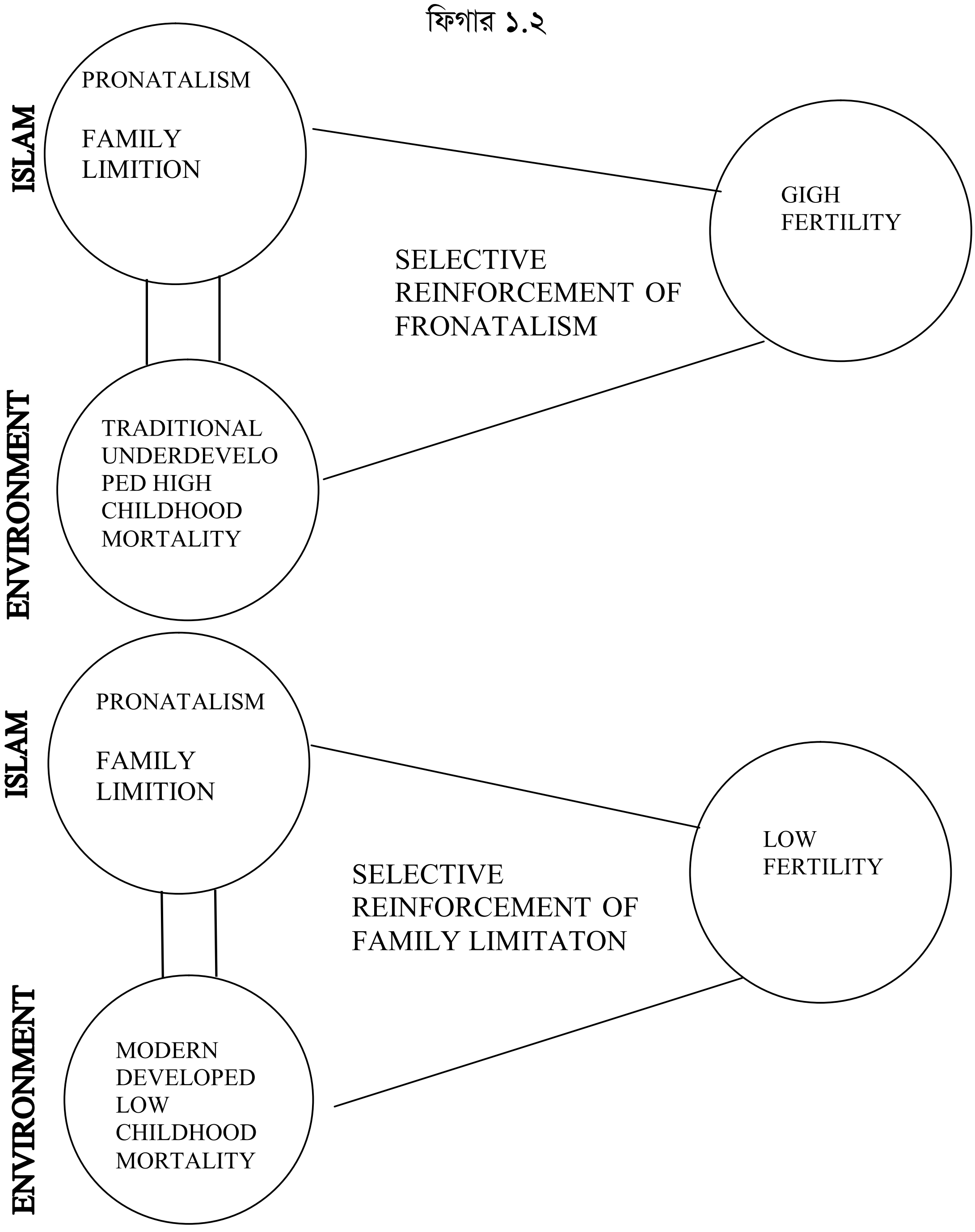

১৭. আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭-৯৮

উভয় প্রকরণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার চিন্তাভাবনা এবং কার্যক্রম রয়েছে, তবে এর ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে কিছুটা পরিমাণগত প্রার্থক্য। প্রাথমিক মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক কঠোরতা দূরীকরণের মাধ্যম হিসেবে আমল-এর প্রচলন ছিল। কিন্তু, গর্ভনিরোধের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানের চেয়ে অনেক সীমিত ছিল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এ বিষয়টি আল আজহারের প্রাক্তন গ্রান্ড ইমাম শায়খ

Dhaka University Institutional Repository

হাসান মামুনের ফতোয়ার মধ্যে প্রতিফলিত। তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, অল্প সংখ্যক অনুসারী নিয়ে যে নতুন ধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল তাতে এর ভবিষ্যৎ প্রসারের সম্ভাবনা নিহিত ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী জনসংখ্যার যে ঘনত্ব দেখা যাচ্ছে তাতে মানব সমাজের জীবন যাত্রার মান ক্রমবর্ধমান হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্ররোচিত হচ্ছে। তিনি তাঁর ফতোয়ার উপসংহারে বলেন যে, যদি কেহ প্রয়োজন অনুভব করে, তার পরিবার পরিকল্পনাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে গ্রহনে শরী'আহর দৃষ্টিকোণ হতে আমি কোন আপত্তি দেখছি না।[১৮]

পরিবার পরিকল্পনায় মহান আল্লাহর মূলনীতি

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হলো মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। এজন্যে পরিবার গড়ার ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক। পারিবারিক জীবনকে র্বাংগীন সুন্দর করার জন্যে ইসলাম যত বিধান দিয়েছেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন অংগের জন্যে এমন পূর্ণাঙ্গ বিধি দেয়া আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন মনে করেননি। ইসলাম রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্যে কতক মৌলিক বিধান দিয়ে তারই আলোকে যত আইন দরকার তা তৈরীর সুযোগ মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু পরিবারের বেলায় পূর্ণাংঙ্গ বিধান দিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের এ মূল কেন্দ্রটি সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়। বিবাহ, তালাক, ফরায়েজ (সম্পত্তি বন্টন), স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, পিতা-মাতা ও সন্তান সন্ততি সম্পর্কে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, অক্ষম ভাইবোন ও নিকট আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এসবের বিধান রচনার দায়িত্ব তাদের হাতে দিলে ন্যায় বিচার কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাছাড়া এসব সম্পর্ক আবেগ দ্বারা পরিচালিত বলে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান রচনা করতে মানুষ সম্পর্ণ অক্ষম। আল্লাহ তা'আলা পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে চান বলেই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবার গড়ার মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যা নিুরুপঃ

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০৩

১. বিয়ে সবচেয়ে সহজ হতে হবে, যাতে বিবাহ যোগ্য নারী পুরুষের নৈতিক মান বহাল তাকে।

২. বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সকল পথ বন্ধ করতে হবে, যাতে মানুষ বিবাহ ছাড়া যৌন সম্পর্কের কোন সুযোগ না পায়।

৩. নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে সহজে অবৈধ সন্তান জন্ম নিতে না পারে।[১৯]

মূলত আল্লাহ প্রদত্ত "পরিবার পরিকল্পনা" যাকে বুঝায় তাকে বাদ দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রনকে মানুষের নিকট আকর্ষনীয় করার জন্যে এর নাম দেয়া হয়েছে "পরিবার পরিকল্পনা"। জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবারের "মহাকল্যানের পরিকল্পনা" করা হয়েছে বলে যাতে সবাই মনে করে নেয় সে উদ্দেশ্যেই পরিবার পরিকল্পনার লেবেল লাগিয়ে পেশ করা হয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সূচনা

আঠারো শতকের শেষ দিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৭৯৮ সালে মি. থমাস রাবার্ট মালথাস জনসংখ্যা ও সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রভাব (An essay of popuation and it efects the future improvement of the Society) শীষর্ক পস্তকে সর্ব প্রথম এ মতবাদ প্রচার করেন। [২০] পরবর্তীকালে কান্সিস প্ল্যান ফরাসী দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রচার শুরু করেন। ১৮৩৩ সালে ড. চার্লস নোলটন তার "চরিত্র দর্শনের ফলাফল" (Fruits of philosophy) নামক পুস্তকে সর্ব প্রথম জন্মনিরোধের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা প্রধান শুরু করেন।[২১] কিন্তু এ আন্দোলন তখন জনগণের নিকট আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়নি। উনিশ শতকের শেষাংশে নয়া মালথাশসী (New Malthusion) আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮৭৬ সালে মিসেস এ্যানী ব্যাসন্ত ও ডা. চার্লস রডিল, ড. নোলটন রচিত 'দর্শনের ফলাফল' পুস্তকখানা ইংল্যান্ডে প্রকাশ করেন। ১৮৭৭ সালে ডা. ড্রাইয়োডেলের সভাপতিত্বে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং ঐ সমিতি জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে প্রচারণা শুরু করে। [২২] ১৮৭৯ সালে ডা. এ্যানি ব্যাসন্তের রচিত 'জনসংখ্যা আইন' (Law of population) প্রকাশিত এবং তা প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। ১৮৮১ সালে জন্মনিয়ন্ত্রের বাণী হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানীতে বিস্তার লাভ করে ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল উন্নত দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৫ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত এবং ঐ কমিটি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জোগায়। [২৩] ক্রমে এ আন্দোলন তৎকালিন ভারতে (পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ) বিস্তার লাভ করে।

১৯। আহমাদুল্লাহ রাহমানী, *তাজবীযে রাহমানী বা ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি,* (ঢাকাঃ তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৮৮ইং), পৃ.৩৭

২০। আবদুল খালেক, *জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও বাংলাদেশ,* (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশ নী, ১৯৮১ইং) পৃ.৩৪

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীদের যুক্তি

বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ নিন্মবর্ণিত যুক্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে জোরাল অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। যেমনঃ

১. ভূমি সংকট নিরসনঃ তাদের মতে পৃথিবীর আয়তন যেমন সীমিত, তেমনি এর বসবাস উপযোগী ভূমিও সীমিত। কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে অগ্রসরমান। অর্থনীতিবিদ

Dhaka University Institutional Repository

ম্যালথাসের তথ্যানুযায়, 'মানুষ বাড়ছে জ্যামিতিক হারে, কিন্তু সম্পদ বাড়ছে গাণিতিক হারে।"[২৪] এভাবে চলতে থাকলে এক সময় বসবাস উপযোগী আবাদী ভূমি অপর্যাপ্ত ও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। ফলে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান সব দিয়েই নেমে আসবে সমস্যা সংকুল এক দুর্বিসহ অবস্থা। সংকটময় এ অবস্থা থেকে মানুষদের নিস্কিৃতি দানের উদ্দেশ্যেই স্বপক্ষীয়রা জন্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যকীয় মনে করে। [২৫]

২. প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি প্রকৃতির নিয়ম নীতিম সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিটি প্রাণীকুল এমনকি মানব জন্মধারা যাতে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে না যায় সে জন্যে প্রকৃতি একটি সীমা বেঁধে দিয়েছেন। এ সীমা রক্ষার্থে প্রথমত জন্মের অনেক উপায় উপকরণকেই প্রতিহত করা হয়। দ্বিতীয়ত কখনও এ সংখ্যা অপ্রত্যশিতভাবে বেড়ে গেলে মৃত্যু, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা প্রভৃতির মাধ্যমে তা কমিয়ে প্রাকৃতিক ভারসার্ম্য রক্ষা করা হয়। এ দিক দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির বিরোধিতা নয়, বরং প্রকৃতির অনুকুলে। [২৬]

৩. অর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণঃ আবহমান কাল থেকেই মনুষ্য সমাজে রয়েছে ধনী ও দরিদ্রের বাস। দরিদ্র শ্রেণীর অর্থের দ্বারা তাদের সন্তান প্রতিপালন, শিক্ষাদান, ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্তে যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় তাদের সন্তান উৎপাদন সীমিত না হলে দুর্ভোগ বেড়ে যাবে, অভিভাবক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে এবং কায়িক ও মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে হাবুডুবু খাবে। অনুরুপ ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ না করলে তাদের সন্তান বেড়েঁ যাওয়ার সাথে সাথে সম্পদ বন্টিত হয়ে জীবন যাত্রার মান নিচে নেমে আসবে। তার শিক্ষা, উৎপাদন, সুখ-শান্তি, সামাজিক প্রতিপত্তি সকল দিক দিয়েই দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই পরিবার, সমাজ ও জাতিকে অত্যাসন্ন বিপর্যয় থেকে মুক্তিদান কল্পে জন্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। [২৭]

২৪। An Agrawal Kundanlal, Economics of Developemnt and planing, (New Delhi Vikash publishing House. 1993), P-5

২৫। আল-লুজনা আদ-দাইয়া লিল বুহুছ আল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ইবহামু হাইয়াতি কিবারিল উলামা বিল মামলাকাতিল আরাবিয়াহ্ আস্-মাইদিয়া, আর রিয়াসাতুল আমবাহ লি ইবারাতিল বুহুছ আল্-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ইফতা দাওয়াহ্ ওয়াল ইরশাদ (রিয়াদঃ ১৪০৯/১৯৮৮), সং. ১, পৃ. ৪২৩

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

৪. দাম্পত্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভঃ তাদের মতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনিরোধ স্ত্রী স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য সহায়ক। ক্রমাগত সন্তান জন্মদান, তাদের সুষ্ঠু তত্ত্ববধান, সন্তানের কল্যাণার্থে রাত্রি প্রভৃতিতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ভেঙ্গে পড়ে যা দাম্পত্য সুখ ভোগকে বহুলাংশে কেড়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে তা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনাকৃষ্টতা এমন কি তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণও হয়ে

থাকে। তাই পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ়, সুখময় ও স্থায়ী করতে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। [২৮]

জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীদের যুক্তির পর্যালোচনা

প্রথম যুক্তির পর্যালোচনাঃ জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীরা এর গ্রহণ যোগ্যতার পক্ষে ভূমি সংকটকে যে প্রধান ও এক নম্বর সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছে, এটা তাদের মনগড়া, কাল্পনিক এবং ভ্রান্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল, যা বাস্তবতার সমপূর্ণ বিপরীত। কারণ পৃথিবী সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যবধি সকল অধিবাসীর প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। একবিংশ শতাব্দির এ সংখ্যাধিক্যের যুগেও পৃথিবীর বহু অঞ্চল অনাবাদী পড়ে রয়েছে। ব্রাজিলের আমাজান নদীর উপকুলে যে পরিমাণ পতিত জমি রয়েছে তা পৃথিবীর মোট স্থলভাগের কুড়ি ভাগের একভাগ বলে অনুমিত হয়। [২৯] ইথিওপিয়ায় পৃথিবীর উর্বরতম জমির আঠার কোটি একক এলাকা অনাবাদী আছে। ফিলিপিনের মিন্ডারো দ্বীপ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যস্থল বিপুল পরিমাণ জমিতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। দৈনিক ইত্তেফাকের এক রির্পোটে বলা হয়েছে যে, "বিশ্বে খাদ্য সমস্যা সৃষ্টির কোন কারণ নেই। পৃথিবীর বর্তমান চাষাবাদ যোগ্য জমি থেকেই বর্তমান জনসংখ্যার পাচঁ গুণ অধিক লোকেরও খাদ্য জোগানো সম্ভব। [৩০] আধুনিক গৃহ নির্মাণ কৌশলের উন্নতির ফলে বহুতল বিশিষ্ট অট্রালিকা নির্মাণ করে অল্প জায়গায় থরে থরে অসংখ্য ফ্ল্যাট তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে। শহরের ন্যায় গ্রামেও এভাবে বাসস্থান তৈরী হতে পারে। নদী ও সমুদ্রের কিনারে পানির উপরও দালান কোঠা তৈরী করা সম্ভব এবং বহুদেশে তা হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরে যে হারে দ্বীপ মালা জেগে উঠেছে তা পৃথিবীর বর্তমান স্থলভাগের সমান বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যান্য মহাসাগরেও অনুরূপ দ্বীপ জাগতে পারে। বর্তমান স্থলভাগেরও অধিকাংশ এলাকা এখন পর্যন্ত অনাবাদীই রয়ে গেছে। অষ্ট্রিলিয়া মহাদেশ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিরাট এলাকা এখনো অনাবাদীই পড়ে আছে।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
২৯। আবদুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

পানির ব্যবস্থা করে বিশাল মরুভূমিও আবাদ যোগ্য করা সম্ভব। আরবের মরুভূমি মরুদ্দ্যানে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবী সবটুকু আবাদ করতে পারলে কয়েক বছরেও স্থানাভাব হবে না। অথচ চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে মানুষ পৌঁছে গেছে। দু'শ বছর আগে আমেরিকাতেও মানুষ বাস করতো না। এক'শ বছরের মধ্যে চন্দ্রে বসতি স্থাপনের সম্ভবনা কি উড়িয়ে দেয়া যায়? বিজ্ঞানের বিজয়

ডংকা বেজে উঠবার পর মানুষ সব দিকে এত শক্তির অধিকারী হয়েছে যে, এখন আত্মবিশ্বাসের সাথে যারা কাজ করতে চায়,তাদের খাদ্যাভাব বা স্থানভাবের চিন্তা হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।[৩১]

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জীবন যাত্রার মান ক্রমশই উন্নত হতে দেখা যাচ্ছে জেনাল্ড জে বগ রচিত 'Pninciples of Demoghaphy' পুস্তক থেকে কয়েকটি দেশের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পদ হ্রাস পায় না; বরং বৃদ্ধি পায়। কারণ মানুষ যত সম্পদ ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপন্ন করে।

১৯৫০-৫১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক জাপানের জনসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৩২ লাখ। ১৯৬০-৬১ সালে এ সংখ্যা ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৯ হাজারে পৌঁছে যায়। অপর দিকে জাপানের জনগণের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৫০ সালে ছিল ২১৭ মার্কিন ডলার এবং তা ১৯৬২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫১ ডলারে হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা১৯৫০-৫১ সালে ছিল ৩৬ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার। ১৯৬০-৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার। ১৯৫৩ সালে ভারতের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ৮৬১ মার্কিন ডলার। ১৯৬২ সালে ঐ আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪০৭ মার্কিন ডলারে। কানাডায় মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৫৩ সালে ছিল ১৪৭৫ মার্কিন ডলার, ১৯৬২ সালে ঐ আয় ১৬৯২ ডলারে পৌঁছে। ঐ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ২জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ১৯৫৩ সালে ছিল ২০৮০ ডলার, ১৯৬২ সালে ঐ আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৯১ ডলার। আর ঐ সময়ে সে দেশে হাজার প্রতি ১২.১ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৩২]

৩১। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

৩২। Donald 1, Principles of Demography, Boghe pages 62, 63, 64, 131, 138, 394, 395.

শুধুমাত্র ঐ কয়টি দেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীরই এ অবস্থা। অর্থনীতিবিশারদগণ দুনিয়ায় বিদ্যমান উপায়-উপকরণাদি ও জন্ম-মৃত্যুর হার হিসাব করে বার বার হুঁশিয়ারি উচ্চরণ করেছেন কিন্তু তাদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনও সত্য প্রমাণিত হয়নি। স্বয়ং ম্যালথাস যে যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন সে যুগে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব

সংগঠিত হয়নি। শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবীর মানুষ কি কি সম্পদের অধিকারী হবে তা তাঁর জানা ছিল না। কারণ ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না। চরম দারিদ্র্য নিমর্জ্জিত সৌদি আরবের মাটির নিচে যে তেল লূকিয়ে ছিল তা তো দু'যুগ আগেও অজ্ঞাত ছিল। আজ সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশ বিপুল সম্পদের অধিকারী। মরুভূমির অধিবাসীগণ আজ কল্যাণের রাষ্ট্রের সকল সুবিধা ভোগ করছে। বৈদ্যুতিক শক্তি মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়ে কি পরিমাণ কল্যাণ সাধন করতে পারে তা দেড় দু'শো বছর আগেও আমাদের জানা ছিল না। আজ একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বৈদ্যুতিক পাখার সুবিধে ভোগ করছে। অথচ মোঘল সম্রাটগণও এত সুখের কল্পনা করতে পারতেন না। কিন্তু পন্ডিত ব্যক্তিগণ সম্পদ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত এ দিকটি বিবেচনা না করেই ভীতি সৃষ্টিকারী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

ম্যালথাস বলেছিলেন যে, জনসংখ্যা জামিতিক হারে এবং খাদ্য জাতীয় উৎপাদন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা ১ থেকে ২, ২ থেকে ৪, ৪ থেকে ৮, ৮ থেকে ১৬ হারে বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১ থেকে ২, ২ থেকে ৩, ৩ থেকে ৪ ইত্যাদি। তিনি তার এ কথার সমর্থনে কোন যুক্তি পেশ করেননি। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার উক্তি সত্য নয়, একটি মাত্র খাদ্য শস্যের কণা থেকে কয়েক শত শস্য উৎপন্ন হতে দেখাওকি এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? একটি মাত্র বীজ থেকে বিরাট বৃক্ষ জন্মায় এবং ঐ বৃক্ষ প্রতি বছর অসংখ্য ফল দান করে। একটি মাত্র বীজ থেকে বিপুল সংখ্যক ফল প্রাপ্তির পরও কি ঐ জ্যামিতিক ও গাণিতিক হার সঠিক বলে মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে?

মি. অসলিনসন লিখেছেঃ "ম্যালথাসের অপর একটি মন্তব্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং প্রায়ই বিরুপ সমালোচনার শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই ঐ বিষয়ে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। বিষয়টি হচ্ছে তাঁর ঐ মন্তব্য সেখানে তিনি বলেছেন যে, অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ম্যালথাসের উপরোক্ত তুলনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর বিরোধীরা তাই এটাকে অসম্ভব ও অবান্তর দেখা দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এই বিভ্রান্তিকর গণনা পদ্ধতিটিকে ম্যালথাসের সূত্র প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। [৩৩]

ঐ পুস্তকেই লেখক (মি. অসলিনসন) পুনরায় লিখেছেনঃ "এভাবেই কার্ল মার্কস মন্তব্য করেন যে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলতে কিছুই নেই। মার্কসের দৃষ্টিতে ম্যালথাস ছিলেন

শোষণকারী শ্রেণীর ক্রীড়ানক এবং বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি অন্যায় আচরণকারী। মার্কসের সহচর ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ম্যালথাসিয়ান যুক্তিকে লজ্জাকর ও অপমানজনক সূত্র বলে অভিহিত করেন।" [৩৪]

"কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ও তার নিরাপত্তা বিষয়ে পাইকারী হারে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলো সর্বদাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। ম্যালথাস যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইউরোপ অধিবাসীরা জন্মনিরোধ করতে ব্যর্থ হলে সে দেশে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেবে, তখন তিনি ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও আমেরিকার কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারেন নি। পরবর্তীকালীন ম্যালথাসপন্থী সংখ্যাতত্ত্বের যেসব খেলোয়াড় এক দুই বা ছয় শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তারা বিজ্ঞানের অজ্ঞাত সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী কোন দিকে মোড় নেবে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেন না।

৩৩। One Additional Element of Malthus Work has necived such attention frequently adverse as to require comment her.
This is his statement that population when on checked. Increases in a geometarical ratio, Snbsistance increase only in arithmetical rato..... this comparison of two progressions was unforfunate choice for malthus. It was easy for his opponents to attak by æReductioad Absurdim" and it had been one of the strongest points of criticism of Malthus over the years. This Misleading calculation, however, should not be trcated as the basic reasoning of Molthus theory.
(Mr. Oslinson, Popolation Dynamics, (London1960), P. 56

৩৪. Karl Mary Positives that is no such thing as over Population.....
In Marx sayes, Malthns was an agologist for the exploitiog class and a literacy oppression of the unfer privilged. Marx associate Fredrich Engels Malthns teaching as a shamful, degrading doctrine. (Ibid-P-60)

জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক দপ্তর বলছে, বর্তমানে জনসংখ্যা যে সব হারে বেড়ে চলছে সে হিসেবে পরবর্তী ছয় শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে যে, প্রতি বর্গমিটারে একজন হারে লোক বাস করতে বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, কখনও এ অবস্থা ঘটবে না। এটা প্রতিরোধ করার জন্যে অবশ্যই অন্য কিছু ঘটে যাবে।[৩৫]

" এমনকি যেসব দরিদ্র দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জন্মহার থেকে মৃত্যুর হার বাদ দিয়ে শতকরা তিনজন, সেসব দেশের জনগণ (এ উচ্চ হার সত্ত্বেও) অধিকতর ভাল খাদ্য গ্রহণ করছে, অতীতে তারা কখনও এরুপ খাদ্য গ্রহণ করতে পারেনি।"[৩৬] তাছাড়া জমির উৎপাদন শক্তিও দিন দিন বেড়েই চলছে। অথচ একথা খুবই সত্য যে, ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকার সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস হায়। কিন্তু উন্নত সার প্রয়োগ করে ঐ ক্ষয় পূরণ করাই সম্ভব নয়, উপরন্ত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোও যেতে পারে। মি. ডাউলীস্টাম্প উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে নিম্নের তথ্যাবলী প্রকাশ করেছেনঃ গম উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি।[৩৭]

একর প্রতি উৎপাদনের হার (মেট্রিক টনে)

দেশ	১৯৩৪-৩৮	১৯৫৬.....
ডেনমার্ক	১.২৩	১.৬৩
হল্যান্ড	১.২৩	১.৪৫
ইংল্যান্ড	.৯৬	১.২৬
মিশর	.৮১	.৯৫
জাপন	.৭৬	.৮৫
পাকিস্থান	.৩৪	.৩৭
ভারত	.২৪	.২৯

৩৫। But the only safe generalization about long range population predictions to that they always proved wrong. When Malthus fore sow mass starvation in Europe unless it people stoped; enccding, he faild to reckon with industrial revolution and the agricultural potential of the America. Latter day players of the Malthusian heenleen games, Who foresee globle, economic ruin in one, two, on six centuries, usually fail to reckon sufficiently on The unkonwable potentialites of science and the unpredictable turn of events, Says the united Nations Department of Economic and social Affairs, æWith the present rate of increase, it can be calculated that in baoyars the member of hbuman beinges on earth will be such that there will he only one square meter for each to live on It goes without saying that this can never take Samethings will happen to Prevent it. (Population, Weekly Times, Londont 11/1/1960.)

৩৬। Even in those poorer nations where natural increase rates people are generally eating petter that even before their history, (Ibid.)

৩৭। Dudlislamp, Our Developing world (london;1960, P.7)

পুনরায় মি. ডাউলীস্টাম্প পৃথিবীতে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের একটি তুলনামূলক হিসেব পেশ করেছেন।[৩৮]

খাদ্য	১৯৩৪-৩৮	১৯৪৮-৫২	১৯৫৭-৫৬
	৮৫	১০০	১১৭

জনসংখ্যা	১৯৫৩	১৯৫০	১৯৫৭
	৯০	১০০	১১২.২

এ হিসাব থেকে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের হার বেশী। বিভিন্ন দেশের খাদ্য উৎপাদনের হার পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যোৎপাদনের হারও দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

মি. ডাউলীস্টাম্প এ ধরণের একটি হিসাবও প্রকাশ করেছেনঃ

খাদ্য উৎপাদনের হিসাব [৩৯]

দেশ	১৯৫২-৫৩	১৯৫৮-৫৯
গ্রীস	১৮	১২০
ইংল্যান্ড	৯৫	১০৫
আমেরিকা	৯৮	১১২
অষ্ট্রিয়া	৯১	১২১
ব্রাজিল	৮৯	১১৯
মেক্সিকো	৮৭	১২৩
ভারত	৯০	১০৫
জাপান	৯৭	১১৯
ইসরাঈল	৮২	১৩০
তিউনিশিয়া	৯৬	১৩৭
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	৮৬	১৬১
অষ্ট্রেলিয়া	৯৮	১২০

এ পরিসংখ্যান ও আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপানের পরিমাণ কম তো নয়ই বরং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ কথাও বুঝা যায় যে, জনসংখ্যা বরং খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ভয়ের চোখে দেখাও কোন সঙ্গত কারণ প্রমাণিত হয় না।

পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের পরিমাণ হচ্ছে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৮ হাজার বর্গমাইল। ১৯৫৯ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২ শত ৮৫ কোটি। এ হিসাব অনুসারে প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র ৫৭ জনের বসতি রয়েছে। আর পৃথিবীর প্রতিটি বাসিন্দার ভাগে পড়ছে সাড়ে বার একর জমি।[৪০]

৩৮। Ibid, P. 72

৩৯। Tbnw, P. 92

৪০। Let there be bread by Robert Britain (আব্দুল খালেক কর্তৃক উদ্ধৃত প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)

বর্তমান বাসস্থান নির্মাণ করার জন্যে মানুষ জমি দখল করার চেয়ে আকাশ দখল করার প্রতি অধিকতর মনোযোগী। নিউইয়র্কে ২২ হাজার লোক স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে। শতাধিক তলা বিশিষ্ট অট্টালিকায় বাসস্থান নির্মাণ সম্ভবপর হবার পর বসবাসের জন্যে স্থানাভাবের আশংকা নেহায়েত অমূলক বলেই মনে হয়। রবার্ট ব্রিটেনের হিসাব মোতাবেক পৃথিবীর মোট জমির

পরিমাণ হচ্ছে ৩৬ কোটি শত একর। তম্মধ্যে একদশমাংশেরও কম পরিমাণ জমিতে বর্তমানে চাষাবাদ করা হয়।[৪১] কারণ এ একদশমাংশ জমিতে অত্যন্ত সহজে চাষাবাদ করা যায়। এ জমি পূর্ব থেকেই উপযুক্ত আবহাওয়া বৃষ্টি ও নদীর পানিতে ধৌত হয়ে ফসল উৎপাদনের জন্যে তৈরী হয়েছিল। পূর্ব থেকে নিজে নিজে বীজ বপনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল তাই বর্তমানে খাদ্যোৎপাদন করে চলেছে। কিন্তু সামান্য পরিশ্রম করলে আরো বিপুল পরিমাণ জমি চাষাবাদের অধীনে আনা যেতে পারে।

পৃথিবীর মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ [৪২]

দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের হিসাবে

মোট জমি		১৩৪০
বর্তমানে চাষাবাদ করা হয়	জমির পরিমাণ	১৩.২
	মোট জমির অংশ	১০%
বর্তমানে ব্যবহৃত উপকরণ অনুসারে	জমির পরিমাণ	১৩.৫
	মোট জমির অংশ	১০%
নতুন উপকরণ অনুসারে	জমির পরিমাণ	২৮.২
	মোট জমির অংশ	২১%
ভবিষ্যতে যে উপকরণ হবে	জমির পরিমাণ	৩৮.৪
	মোট জমির অংশ	২৮%
মোট চাষযোগ্য জমি	জমির পরিমাণ	৯৩.৯
	মাট জমির অংশ	৭০%

ওপরের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে পরিষ্কার ভাবে জানা যায় যে, পৃথিবীর মোট জমির শতকরা ৭০ ভাগ চাষাবাদের অধীনে আনা যেতে পারে এবং বর্তমানে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বর্তমানে যেসব উপকরণ ব্যবহার করে চাষাবাদ করা হচ্ছে, সেসব উপকরণ দিয়েই আরো শতকরা ১০ ভাগ জমিতে অনায়াসে চাষাবাদ করা যেতে পারে। বর্তমানে চাষাবাদকৃত জমির পরিমাণ হচ্ছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এ বর্তমানে ব্যবহৃত চাষাবোদের সাহায্যেই আরও এক কোটি পয়ঁত্রিশ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদ শুরু করা যেতে পারে।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪২। G.D Barnd, Word without war, (London:1952, P. 69)

১৯৭০ সালে পৃথিবীর মোট খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ দাড়িয়েছিল ১৩০৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ঐ বছরে বিশ্বের মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ছিল ১৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ৯০ লক্ষ টন খাদ্য উদ্বৃত ছিল।[৪৩]

ম্যালথাসের অর্থনৈতিক মতবাদটি শিল্প বিপ্লবের পূর্বে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু তা আজ সর্বোতভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে মানব সংখ্যার বহুগুণ বেশী হারে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে।[৪৪] আজ এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, মানুষের প্রয়োজনই তাদের বাধ্য করছে পৃথিবীকে বসবাস ও আবাদ যোগ্য করে তুলতে এবং আবিষ্কার কার্যে অগ্রগতি সাধন করতে। মানুষের চেষ্টায় আজ এমন সব বিষয় আবিস্কৃত হয়েছে যা পূর্বে কাল্পনিক বলে মনে হতো। এ চেষ্টার ধার অব্যাহত থাকলে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পৃথিবীতে গচ্ছিত রাখা এমন সব উপকরণ আবিস্কৃত হতে পারে যদ্দারা মানব জীবনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন রচিত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

"বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৪৫]

পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা এ সত্যটিই ধরা পড়ে যে, তখনকার তুলনায় বর্তমানে আবাদযোগ্য জমি ও জীবন যাত্রার মান সবই উন্নতর হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে মানুষের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। পক্ষান্তরে জনসংখ্যা না থাকলে ফল হতো উল্টো। অর্থনৈতিক এ সকল দর্শন জন্ম নিয়ন্ত্রণবাদীদের অযৌক্তিক দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে মূলত তিনটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছেঃ

প্রথমতঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেজন্যে এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা রোধের যে উপদেশ দিচ্ছেন, তা কিছুমাত্র যুক্তি সঙ্গত নয়। কেননা, এতে চরম স্বার্থপরতা প্রমাণিত হয় এবং মানবতার সাথে চরম দুশমনি করা হয়। এতে সে মনোবৃত্তিও প্রকাশ পায় যে, আমরা যারা দুনিয়াতে এসেছি তারাই যেন এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকতে ও ভোগ বিলাস করতে পারি, অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে ভাগ বসাতে এবং আমাদের অভাবগ্রস্ত করতে না পারে।

৪৩। বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জনসংখ্যা শিক্ষা,(ঢাকাঃ ১৯৭৪ইং),পৃ. ২৮

৪৪। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩

৪৫। আল-কুর'আন, ৫১ঃ২০

৪৬। ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৪) পৃ.১৯৭

দ্বিতীয়তঃ কিছু সংখ্যক অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা সমস্যা দেখাতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন তা ভুল। যেহেতু জনসংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে না, বাড়ে ক্রমিক সংখ্যার অনুপাতে এবং খাদ্যের উৎপাদনও ঠিক সে অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃত পক্ষে কোন সমস্যাই নয়।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে পৃথিবীতে যা কিছু খাদ্য সম্পদ আছে, তা শুধু বর্তমান জনসংখ্যার জন্যে নয়, এর বর্তমান আয়োজন দেয়েই এর তিনগুণ বেশী লোকের জন্যেও বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যা মোকাবিলা করার জন্যে দু'টি প্রস্তবনা পেশ করা যেতে পারে। প্রথমঃ আধুনিক পদ্ধতিতে আল্লাহর দেয়া যাবতীয় উৎপাদন উপায়কে প্রয়োগ করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে নতুন নতুন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা। আর দ্বিতীয়ঃ সুবিচারপূর্ণ পন্থায় ও সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা এবং একটি লোককেও তার প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য হতে বঞ্চিত না রাখার নীতি গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় যুক্তির পর্যালোচনা

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তির উত্তরে বলেন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, সন্তান জন্মদান ও সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার প্রাকৃতিক চাহিদার বিপরীত নয়। কারো সন্তান না হলে বা অল্প বয়সে মৃত্যু হলে স্বভাবত সে শূন্যতা ও বেদনা অনুভব করে। প্রকৃতিগতভাবে সবাই চায় নিজের বংশকে অক্ষুন্ন রাখতে। সকল পিতা-মাতাই সন্তানকে আশির্বাদ বলে মনে করে এবং তাদের সুখের জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। সুতরাং মানুষের প্রকৃতগত স্বভাব সন্তান উৎপাদনকে বাঁধা দেয় না।[৪৭]

তৃতীয় যুক্তির প্রর্যালোচনা

তাদের তৃতীয় যুক্তিটি একটি অশোভন উদ্দেশ্য সাধন ও প্রবঞ্চনাকর দুরভিসন্ধির শামিল যা প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, প্রাকৃতিক চাহিদা মিটানোর তাগিদেই আদিকাল থেকেই সমাজে ধনী ও দরিদ্রের অবস্থান চলে আসছে। সন্তান কামনা দরিদ্র বিমোচনের ফলপ্রসূ কোন সমাধান নয় বরং তা বিশ্ব প্রভুর এক অমোঘ বিধান, প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী তা চিরকালই মনুষ্য সমাজে থাকবে। মানব প্রজন্ম উন্নতি ও অগ্রগতির অন্তরায় নং; বরং সহায়ক এবং দেশ ও জাতির রক্ষাকবচ।[৪৮]

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

তারা সন্তান বৃদ্ধির ফলে বিত্তশালীদের প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হওয়ার যে যুক্তি করেছে তা এ কারণে অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর যে, সম্পদ চিরকালের জন্যে কোন বংশ বা গোত্র বিশেষের হাতে থাকা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পদই বিত্তশালী হওয়ার একমাত্র পন্থা নয়। বরং তা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে বিলাস প্রিয় ও অলস করে তোলে। যা তাদের প্রতিপত্তির

ক্ষুন্নের কারণ নিজ কর্মদক্ষতা ও পরিকল্পনানুযায়ী অর্থ সংগ্রহকারীই জীবনে অগ্রগতি প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

চতুর্থ যুক্তির পর্যালোচনা

তাদের চতুর্থ যুক্তিটির পক্ষ তারাই অবলম্বন করতে পারে মানবীয় স্বভাব বিলুপ্ত হয়ে পশু প্রবৃত্তি যাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে একমাত্র স্ত্রীসম্ভোঘ যৌন চাহিদা চরিতার্থই তাদের উদ্দেশ্য। জৈব চাহিদা পুরণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে তারা সন্তানের দায়-দায়িত্ব ও কষ্ট স্বীকার থেকে দূরে থাকতে চায়, যা সুষ্ঠু বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাজ নয়। তাছাড়া গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান মহিলাদের আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র দায়িত্ব। কোন মহিলা যদি এ দায়িত্ব থেকে দূরে থাকে তবে তার মাঝে হীনতা, মানসিক উৎকর্ষতার প্রতিবন্ধক অবস্থার সৃষ্টি হয়। গর্ভরোধের জন্যে বন্ধ্যাকরণ বা অনুরোপ ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে তার দুঃখ-কষ্ট বহু গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সন্দেহ নেই যে, এ কারণে আপতিত ক্ষতিসমূহ জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক।

ডা. কাসিস কারাল-এর মতে,"একজন মহিলার জীবনে সন্তান উৎপাদনের গুরুত্ব যে কত অধিক সে সম্পর্কে মানবীয় চিন্তাধারা এখনো পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছেনি। কোন মহিলা সন্তান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সে নিজেকে শারীরিক দুর্বলতা ও ঘাটতি থেকে রক্ষা করতে পারে বটে; কিন্তু জন্মদানের ফলে তার যে নতুন সৌন্দর্যের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং আত্মার উৎকর্ষ হয় তা নিঃসন্দেহে সন্তানের জন্মদানের ঘাটতি থেকে অনেক শ্রেয়।"[৪৯]

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ড. এডোয়াড সুয়ার্জ তার 'নাফসিয়াতুল জিন্স' গ্রন্থে বলেন, মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গেরই সুনির্দিষ্ট কাজ রয়েছে, যার আঞ্জাম দেয়া তার অত্যবশ্যকীয় দায়িত্ব। এ কারণে কোন অঙ্গকে তা সুনির্দিষ্ট কাজে বাঁধা প্রদান করা হলে দৈহিক শৃংখলা ও কার্যক্রমের ভারসাম্যতা বিঘ্নিত হয়। সে কারণে কোন মহিলার সন্তান ধানণ না করার প্রতিক্রিয়া তার ব্যক্তিত্বের উপর এভাবে পড়ে যে, প্রথম তার মাঝে সংকোচন অবস্থার সৃষ্টি হয়, দ্বিতীয়ত্ব বঞ্চনা, পরাভূতি ও নৈরাশ্যতার গ্লানি নেমে আসে।[৫০]

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
৫০। প্রাগুক্ত,

ড. মেরী মারলেইব তার দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করেনঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেশারী (Passaries) জীবানুনাশক ওষধ ব্যবহারের ফলে তাৎক্ষণিক কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ এসব ব্যবহারের ফলে মধ্যবয়সে পৌছতে না পৌছতে নারী দেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিশৃংখলা দেখা দেয়। নিস্তেজ অবস্থা, নিরনন্দ মনোভাব,

উদাসীনতা, খিলখিটে মেজাজ, বিষন্নতা, নিদ্রাহীনতা, চিন্তার অস্থিরতা, মন ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা, রক্ত চলাচল হ্রাস, অনিয়ামিত মাসিক স্রাব ইত্যাদি হচ্ছে এ অবস্থার অনিবার্য পরিণতি।[৫১]

অন্যান্য ডাক্তারের মতে, জন্মনিরোধ উপকরণ ব্যবহারের ফলে জরায়ুর স্থান চ্যুতি (Falling of the womb), জীবাণু সংরক্ষণের অক্ষমতা, হৃদকম্পন ও মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত দেখা দিয়ে থাকে। তা ছাড়া দীর্ঘকাল সন্তান না নিলে গর্ভধারণের অঙ্গসমূহ এমন শৈথিল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয় যে, সে পরবর্তীকালে গর্ভধারণ করলেও প্রসবকালে তাকে অত্যন্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়।"[৫২] সন্তান জন্ম না দেয়াটা অনেক ক্ষেত্রে তালাক প্রাপ্তিরও কারণ হতে পারে। Talcoult parsenes বলেছেন, প্রকৃত সত্য হলো অধিকাংশ তালাকই নিঃসন্তান দম্পতিদের মাঝে হয়ে থাকে।[৫৩]

সাধারণত আল্লাহ ভীতি ও লোক লজ্জার ভয়েই মানুষ অপরাধ থেকে দূরে থাকে কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদির সহজ লভ্যতার ফলে গর্ভধারণের আশংকা না থাকায় যেমনি ব্যভিচার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি নেমে আসছে নৈতিক অবক্ষয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীরা যে সব যুক্তির অবতারণা করে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালাচ্ছেন তা মূলত অসার ও অযৌকিত।

৫১। প্রাগুক্ত,
৫২। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৫৩। বিচার্ড হেলগারসন, বাংলাদেশ টাইমস, ঢাকাঃ ১৯'মে-১৯৭৬ইং

জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলের উদ্দেশ্য

জন্মনিয়ন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ বৃদ্ধির প্রতিরোধ। প্রাচীনকালে এতদুদ্দেশ্যে আজল, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও ব্রহ্মচর্য (অবিবাহিত থাকা বা স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন পরিহার করা) অবলম্বন করা হত। আজকাল শেষের দুটি ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং এদের পরিবর্তে এমন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, যাতে করে যৌন মিলন বহাল রেখে ঔষধ

Dhaka University Institutional Repository

অথবা উপকরণাদির দ্বারা গর্ভ সঞ্চারের পথ বন্ধ করে দেয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় গর্ভপাতের ব্যবস্থা এখনো প্রচলিত আছে।[৫৪]

মি. ম্যালথাস যেসব কারণের ওপর ভিত্তি করে জন্মহার বৃদ্ধি রোধ করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, বর্তমান যুগে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করার মূলে ঐ সব কারণ প্রকৃত কারণরূপে পরিগণিত হচ্ছে না, বরং ইউরোপে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolation), অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ, বস্তুতান্ত্রিক কৃষ্টি, আত্মসুখলিপ্সু সভ্যতা ও রাজনৈতিক চালই এর প্রকৃত কারণ। আমি এর প্রতিটি সম্পর্কে পৃথক পৃথক পর্যালোচনা করে কি কারণে পাশ্চাত্য হাতিগুলো জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছে তা দেখাবার চেষ্টা করবো।

১. শিল্প বিপ্লবঃ ইউরোপে যন্ত্র আবিষ্কারের পর সম্মিলিত পুঁজির ভিত্তিতে বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে ব্যাপক উৎপাদন (Mass Production) শুরু হয় এবং গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীগণ দলে দলে চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে চাকরীর উদ্দেশ্যে শহরের পথ ধরে। অবশেষে গ্রামাঞ্চল শূন্য হয়ে পড়ে এবং বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। এসব শহরে সীমাবদ্ধ স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হয়। এমতাবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই উন্নত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ব্যবস্থার ফলেই অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। জীবন সংগ্রাম কঠোর হয়ে পড়ে। সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। সামাজিকতার মান উর্ধ্বমুখী হয়। জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীয় তালিকা দীর্ঘ হয় এবং এদের দাম এত বেড়ে যায় যে, সীমাবদ্ধ আয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা বহাল রাখা অসাধ্য হয়ে পড়ে। আবাসস্থান সংকীর্ন এবং বাড়া বেশী হয়ে যায়। উপার্জনকারী খাবার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধিকে ভীতির চোখে দেখতে থাকে। পিতার জন্যে সন্তান এবং স্বামীর জন্যে স্ত্রীর লালন পালন এক দুঃসহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি লোকই নিজের উপার্জন শুধু নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে এবং এ ব্যাপারে অন্যান্য অংশীদারের সংখ্যা যথা সম্ভব কমাতে বাধ্য হয়।[৫৪]

৫৪। প্রফেসর পল লিন্ডসে নামক জৈনক আধুনিক লেখক খুবই অর্থপূর্ণ ভাষায় উপরিউক্ত কথা স্বীকার করেছেনঃ "শিল্পভিত্তিক সমাজের মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উর্বরতা সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার শিকারে পরিণত হয়েছে। এমনকি এখন যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যৌন যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য বর্তমান কালে সন্তান উৎপাদন (Procreation) নয়, বরং (Recreation) বলে পরিগণিত হচ্ছে। (দ্রষ্টব্যঃ Social Problems, Chicago, 1959, P.102)

২. নারীদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাঃ উপরোল্লিখিত অবস্থার দরুন নারীদেরও নীজ নীজ ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য হতে হয় এবং পরিবারের উপার্জনশীলদের মধ্যে তাদেরও শামিল হতে হয়। সমাজের প্রাচীন প্রথা মুতাবিক পুরুষের উপার্জন করা এবং নারীর গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকার কর্মবন্টন বাতিল হয়ে যায়। নারীগণ অফিস ও কলকারখানায় চাকরী করার হাজির হয়ে যায়। এদিকে পুরুষ মানুষের পক্ষে ঘরের বাইরে শ্রম করা যতটা সহজ, নারীর জন্যে তা করা ততটা কঠিন। আর জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব গ্রহনের পর সন্তান জন্মানো ও

তার প্রতিপালনের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। যে নারী নিজের প্রয়োজন পূরণ ও ঘরের বাজেটে নিজের অংশ দান করতে বাধ্য হয়, তার পক্ষে সন্তান জন্মানো কি আর সম্ভব? অনেক নারীই গর্ভাবস্থায় ঘরের বাইরে দৈহিক বা মানসিক শ্রম করার অযোগ্য হয়ে যায়, বিশেষত গর্ভকালের শেষাংশে তো ছুটি গ্রহন করা তার জন্যে অপরিহার্য। পুনঃসন্তান প্রসবকালে ও তার পরবর্তী কিছুদিন সে কাজ-কর্ম করার যোগ্য থাকে না। তারপর শিশুকে দুধ পান করানো এবং অন্তত তিন বছর পর্যন্ত তার প্রতিপালন, দেখাশোনা, শিক্ষা দানের কাজ চাকরীর অবস্থায় করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে? দুগ্ধপায়ী সন্তানকে কারখানায় বা অফিসে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেমন মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি আর্থিক অসংগতির দরুন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোন চাকর নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। যদি মায়ের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে বেকার থাকতে হয় তাহলে হয় তাকে অনাহারে মরতে হবে কিংবা স্বামীর জন্যে সে এক অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এ ছাড়া তার নিয়োগকারীও পুনঃ পুনঃ সন্তানের প্রসবের জন্যে তাকে ছুটি দান করা পছন্দ করবে না। মোদ্দাকথা, এসব কারণেই নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে এবং পেটের দায়ে যাবতীয় সহজাত প্রবৃত্তিকে কুরবানী করতে বাধ্য হয়। এমনকি তাদের পক্ষে মাতৃত্বের গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কামনা করা খুবই স্বাভাবিক।

৩. ভোগবাদী সংস্কৃতিঃ আধুনিক ভোগবাদী মতবাদ ইউরোপেই জন্মগ্রহন করে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মদ্রোহিতামূলক চিন্তা সর্বত্র প্রসার লাভ করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বিতারিত করে ব্যক্তি জীবনের সংকীর্ণ গন্ডিতে ঠেলে দেয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রতি রবিবারে গির্জায় যাওয়া ছাড়া মানুষের বাস্তব জীবনে ধর্মের কোন প্রভাবই রইলো না। ফলে জীবন হয়ে উঠলো ভোগবাদী, এ জীনবটাই সার। মৃত্যুর পর কোন জীবন আছে কিনা, যদি থাকে তবে তা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ভাবনা সেকেলে বিবেচিত হতে শুরু হয়। মৃত্যুর আগে জীবনকে ভোগ করাই জীবনের স্বার্থকতা। তাই বিলাসী জীবন যাত্রা সকলেরই কাম্য হয়ে উঠলো। বেশী ও উচ্চমানের খাদ্য গ্রহন, দামী দামী কাপড় চোপড় ও আসবাবপত্রাদি সংগ্রহ, বিলাস বহুল বাড়ী নির্মান, নর-নারী অবাধ মেলা-মেশার মাধ্যমে অবাধ যৌন মিলন ইত্যাদিই জীবনকে ভোগ করার উপায় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলো। তাই নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে নারীদের ঘর থেকে টেনে বের করলো এবং যৌন অনাচার সমাজকে কলুষিত করে দিল। বেলেল্লাপনা, উচ্ছৃংখলা, বলে-নাচ ইত্যাদির ছড়াছড়ি, নারীকে পুরুষের খেলার সামগ্রীরুপে ব্যবহার করার পথে সন্তান অন্তরায় সৃষ্টি করে; তাই জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করার জন্যে নারীকে সন্তানহীনা অথবা দু'একটি সন্তানের জননী করে

Dhaka University Institutional Repository

রেখে দিয়ে তাকে দীর্ঘদিন ভোগ করার মানসিকতা থেকেই প্রধনত জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

৪. আধুনিক কৃষ্টি ও সভ্যতাঃ আধুনিক কৃষ্টি ও সভ্যতা এমনি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, এর ফলে সমাজে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব মানুষের মধ্যে চরম স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আরামের জন্যে বেশী পরিমাণ সামগ্রী সংগ্রহের পক্ষপাতীর এবং একের রিজক অন্য কেউ অংশীদার হোক এটা তারা মোটেই পছন্দ করে না। এমনকি বাপ, ভাই, বোন ও সন্তানকে পর্যন্ত এরা নিজেদের উপার্জিত সম্পদের ভোগে অংশীদার করতে রাজী নয়। ধনী ও বড় লোকেরা বিলাসিতার জন্যে এত সব উপায় উপাদান তৈরী করেছে যে, এদের দেখাদেখি মধ্যবিত্ত ও নিুশ্রেণীর লোকেরাও এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার লোভ সামলাতে পারেনি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অনেক বিলাসোপকরণ মানুষের সামাজিক মান এত নিচু করে দিয়েছে যে, স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকের পক্ষে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ব্যয়ভার বহন করা দুরের কথা তার নিজের বাসনা চরিতার্থ করাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫৫]

আধুনিক কৃষ্টি ও সভ্যতা চরম আত্মসুখ বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। মানুষ অধিক পরিমাণে সম্ভব সুখভোগ কিন্তু এর পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবে তাদের উপর যেসব দায়িত্ব আসে তা বহন করতে তারা প্রস্তুত নয়। জীবন যাত্রার মান ও কল্পনা বিলাসিতা এত উর্ধগামী হয়ে গেছে যে, জীবন যাপনের উপকরণগুলো এদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। এদের এ উচ্চ কল্পনা বিলাস অনুযায়ী অধিক সংখ্যক সন্তানদের প্রতিপালন, শিক্ষাদান এবং জীবন উত্তম সূচনায় সুযোগ দান এদের জন্যে অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তথাকথিত সভ্যতা শিক্ষা-দিক্ষার উপায়-উপকরণগুলোকে অত্যন্ত ব্যয়বহুলও করে দিয়েছে।

৫৫। একজন ফরাসী লেখক প্রকাশ করেছেন, জন্মনিরোধকারী দম্পতিদের নিকট থেকে এদের এ পথ অবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, অধিক সন্তান ও অধিক অস্বচ্ছলতার দরুন যারা জন্মনিরোধ করে তাদের সংখ্যা অতি নগন্য। অধিক সংখ্যক লোক যে, কারণে জন্মনিরোধ করে তা হচ্ছে, "নিজের আর্থিক অবস্থা এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নত করণ, নিজেদের সম্পতির অধিক সংখ্যক উত্তরাধিকারী গণের মধ্যে বন্টন রোধ, প্রিয় সন্তাদের উচ্চ সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা দিয়ে উজ্জল ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী করণ, স্ত্রীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তাকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের ঝামেলা থেকে হেফাজত করা। নিজেদের ভ্রমন ও চলাফেরার আজাদী বহাল রাখা যেন অনেক সন্তানের দরুন স্ত্রী শুধু শিশুদের দখলে না যায় এবং স্বামীর আনন্দ অতৃপ্ত থাকতে বাধ্য না হয়।" (Paul Burcen, Towards Moral Bankruptcy, London;1925, P.46)

নাস্তিকতা মানুষের মন থেকে আল্লাহর ধারণাই মিটিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর রেজেকদাতা হওয়ার উপর নির্ভর করার প্রশ্নই উঠে না। এ ধরনের মানুষ শুধু বর্তমানের উপর নির্ভর করে নিজেকেই নিজের ও সন্তানদের রেজেকদাতা বলে বিবেচনা করে। এসব কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে জন্মনিরোধ অন্দোলন দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করেছে। এসব কারণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো প্রথমেই

ভুল করে তাদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও আত্মপূজার ভ্রান্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। তারপর যখন তাদের এ কীর্তি পূর্ণতায় পৌঁছে; তার কুফল দ্বারা সমাজকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে, তখন দ্বিতীয় বার তারা নির্বুদ্ধিতা করে বাহ্যিক চাকচিক্যময় আর্থিক ও সামজিক ব্যবস্থাকে বহাল রেখে এর যাবতীয় কুফল থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছে। এরা বুদ্ধিমান হলে নিজেদের সামাজিক অত্যাচারের উৎস খুঁজে বের করত এবং নিজেদের জীবন থেকে এসব দোষ দূর করতে চেষ্টা করত। এরা আসল দোষের সন্ধান তো পায়ইনি বা পেয়ে থাকলেও বাহ্যিক বাকচিক্যময় সভ্যতার যাদুতে এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে যে, এর সংশোধন করে কোন উন্নততর সমাজ কায়েম করতে এরা রাজি নয়। বরং এরা নিজেদের কৃষ্টি-সভ্যতা, আর্থিক ব্যবস্থা ও সামাজিকতায় ঠাঁট বজায় রেখে জীবনের সমস্যাবলীকে ভিন্নপথে সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে এদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে সন্তান সংখ্যা কমিয়ে দেয়াই এদের নিকট সহজ বিবেচিত হয়েছে; যাতে করে ভবিষ্যৎ বংশধরকে নিজেদের খাদ্য ও বিলাস দ্রব্যের অংশ না দিয়ে পরমানন্দে দিন কাটানো সম্ভব হয়।

৫. রাজনৈতিক চালঃ উন্নত দেশগুলো জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার বিষফল ভোগ করছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই কোন জাতির জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে তখনই তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যখনই জনসংখ্যা কমেছে, তখন সংশ্লিষ্ট দেশ দুর্বল হয়ে গেছে। ইউরোপের জনসংখ্যা যে সময় বৃদ্ধি পাচ্ছিল সে সময় তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কারণ জনসংখ্যার চাপেই তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। সমুদ্র দিয়ে যাওয়ার জন্যে তাই তারা জাহাজ নির্মাণ করতে শেখে। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করে। এভাবেই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শিল্পবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমে প্রায় অর্ধেক দুনিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপিত হয়। এক সময় বলা হত “বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না।” যে জনসংখ্যা তাদের সারা দুনিয়ায় প্রাধান্য দান করেছিল, সে জনসংখ্যা হ্রাস করার ফলে তারা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। আজ বৃটিশ জাতি লেজগুটিয়ে সীমাবদ্ধ গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশগুলোও ঐ একই অবস্থা। তাদের সকলেরই জনশক্তি ক্ষয়িষ্ণু। তাই তারা প্রাচ্যে ও বিশেষভাবে মুসলিম দেশগুলোর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দেখে ভয় পাচ্ছে। তারা মনে করে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে জনসংখ্যা যাদের বেশী সে সব দেশই রাজনৈতিক প্রাধান্য ও নেতৃত্ব হারাতে বাধ্য হবে। তারা আরও

Dhaka University Institutional Repository

মনে করে যে, আজ হোক কাল হোক অথবা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বর্তমানের অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর বাড়তি সম্পদে তাদের ন্যায্য হিস্যা দাবী করবে। এজনেই তারা অর্থ-সরঞ্জামাদি ও বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে দিয়ে অনুন্নত দেশগুলোকে জনসংখ্যা কমানের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। এমনকি সাম্প্রতিক কালে জন্মরোধ করার শর্তাধীনে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য মঞ্জুর করা হচ্ছে। মি. অসলিনসন লিখেছেন; "অনুন্নত দেশগুলো যদি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজে লিপ্ত থাকে এবং তারা যদি জীবন-যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টার বিফল হয় তাহলে ঐ ব্যর্থতা রাজনৈতিক এমনকি সামরিক সংঘর্ষও ডেকে আনতে পারে।"[৫৬]

ঐ প্রবেন্ধেই লেখক পুনরায় মন্তব্য করেন যে, "বৃহৎ শক্তিগুলো বিপুল সম্পদ সম্ভারের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ জাতিগুলো বস্তু সম্পদেও তাদের হিস্যা দাবী করতে পারে।[৫৭]

সংখ্যাতত্ত্বের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়াসহ ইউরোপের জনসংখ্যা শতকরা ১ জন হারে বেড়ে চলেছে। পক্ষান্তরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে জনসংখ্যা বাড়ছে শতকরা ২.৬ জন হারে। ইউরোপের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে যেসব প্রতিবেশী রয়েছে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়াও গণচীনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশী। ঘনবসতিপূর্ণ জনসংখ্যার অধিকারী চীনসহ এশিয়া ও আফ্রিকার জন্মনিরোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মহার কমানোর সম্ভাবনা অতি সামান্য। চায়নীজ মুসলমান ও হিন্দু পরিবারগুলোর মনোভাব পরিবর্তনের অনেক সময়ের দরকার।

৫৬। If the under developed areas continue to increase their population so precipitously and if there frustated in their attempt to achieve living Conditions, there may tee political friction and even military Canfict-. (Mr. Oslinson, Ibid, p. 365)

৫৭। Ibid, p. 370

ইতিহাস থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে স্থানাভাব ক্লিষ্ট ও অভাবগ্রস্থ দেশের অধিবাসীগণ বিস্ফোরনের বেগে উন্নত দেশগুলোর দিকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করবে। যদি তাদের পচন্দনীয় দেশে সহজ প্রবেশাধিকার থাকে তাহলে দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশান্তরের ধারা শান্তিপূর্ণভাবেই চলবে। কিন্তু এটা সামরিক অভিযানের রুপেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে।[৫৮]

" এশিয়া, আফ্রিকা, ও ল্যাটিন আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যার আধিক্য দেখে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকার পন্ডিত মহল বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। জাতিসংঘে আফ্রো জাতিগুলো ইতিমধ্যে পশ্চাত্য দেশগুলোর বিপক্ষে একটি শক্তিশালী গ্রুপ গঠন করে নিয়েছে। যদি সময় মতো তাদের যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দিয়ে শান্ত করে রাখা না হয়, তাহলে তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে।"[৫৯]

"জনৈক ইতালীয় অর্থনীতিবিদ বলেন, ইউরোপ অতিশীঘ্রই কৃষ ও পীত বর্ণের সাঁড়াশী দ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করবে এবং সে সময় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।"[৬০] আফ্রিকার জনগণ কালো এবং এশিয়াতে কালো ও পীত উভয় বর্ণের লোকই রয়েছে। এজন্যে ইউরোপীয়গণ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে শংকিত হয়ে উঠেছে।

আর্থার ম্যাক করম্যাক স্পষ্ট করেই বলেছেন, "উন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা কমিয়ে রাখতে আগ্রহী। কারণ তারা অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের নিজেদের জীবন-যাপনের উচ্চমান এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য বিপন্ন মনে করে।"

৫৮। History demonstrats thal such condidilions can easily degenerate, causing an explosive exodus countries offering attractions to space starved and hungry people such a movement may take place over a long period and may develop peacfully if access to suitabele countries is open to them . But it can also degenerate into a migration . (Vou Unjrnstam burg, World populaticn Conferenee, 1965, vol- 2, p.61)

৫৯। Arther, Mac Cormack, peopu, spaci, food, Londont: 1960, p. 77

৬০। Ibid, p.78

তাদের এ চালাকী শীঘ্রই প্রাচ্যের নিকট ধরা পড়ে যাবে এবং তখন তারা পাশ্চাত্য জাতিদের কিছুতে মাফ করবে না। এটা সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশল। কালো ও অনুন্নত জাতিগুলোর উপর সাদা চামড়ার শ্রেষ্ট্রত্ব বহাল রাখাই এর উদ্দেশ্য।[৬১]

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, ভবিষ্যত জনসংখ্যা সমৃদ্ধ ও কারিগরি বিদ্যায় পারদশী জাতিই দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করবে। প্রাচ্য ও মুসলমান দেশগুলোতে জনসংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যার চাপেই তারা কারিগরি বিদ্যা অর্জনের জন্যে চেষ্টা করতে বধ্য হবে। ফলে

উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ প্রাচ্যজাতিগুলোকে আর পদদলিত করে রাখা পাশ্চাত্যের পক্ষে সম্ভব হবে না, তাই তারা একদিকে নিজেদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে এবং অপর দিকে প্রাচ্য ও মুসলিমদেশগুলোকে জনসংখ্যা কমানোর জন্যে উৎসাহ দিচ্ছে এমনকি বৈদেশিক সাহায্যের টোপ ফেলে জনসংখ্যা হ্রাস করতে বাধ্য করছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিণতি

বিগত ১০০ বছরের অভিজ্ঞতায় জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব ফলাফল দেখা দিয়েছে তা আলোচনায় আনা দরকার। যে আন্দোলন বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে এবং যার ফলাফল বরাবর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তার ভাল মন্দ সম্পর্কে মতামত গঠন করার জন্যে একশত বছরের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। জন্মনিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাকে আদর্শ দেশ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কেননা, আমাদের নিকট অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দু'দেশে সমৃদ্ধি ও তথ্য অনেক বেশী পরিমাণে আছে। আর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এ দু'দেশের পার্থক্য খুব বেশী নয়।

১. জন্মনিরোধ আন্দোলন শ্রেনীবৈষম্যের সৃষ্টি করছে: ইংল্যান্ডের রেজিষ্ট্রার জেনারেলের রিপোর্ট, ন্যাশনান বার্থ কন্ট্রোল কামিশনের অনুসন্ধান এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত রয়েল কমিশনের রিপোর্ট দেখে জানা যায় যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। বেশীর ভাগই উচ্চ বেতন ভোগী কর্মচারী, উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত সচ্ছল লোক এবং ধনী, শাসক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণই জন্মনিরোধ অভ্যাস করে থাকে। আর নিম্ন শ্রেণীর মজুর ও শ্রম পেশা লোকদের মধ্যে জন্মনিরোধ প্রথা না থাকারই শামিল। এদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়নি, এদের মনে ইচ্চাশাও নেই এবং ধনীদের মত জাঁক-জমকপূর্ণ সামাজিকতার প্রতিও এদের কোন লোভ নেই। এদের সমাজে এখনো পুরুষ উপার্জনকারী নারী গৃহকর্ত্রী।

৬১। Ibid, p. 78

এ প্রাচীণ প্রথাই এখনো প্রচলিত আছে। আর এ কারণেই এরা আর্থিক অসচ্ছলতা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নি মূল্য এবং গৃহ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জন্মনিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন বোধ করে না। এদের মধ্যে জন্মহার হচ্ছে প্রতি হাজারে ৪০ জন। অপর উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্মহার এত কমে গিয়েছে যে, ইংল্যান্ডের মোট জন্মহার ১৯৫৪ সালে হাজার প্রতি ১৫৫৩ জন ছিল। কায়িক পরিশ্রমকারীদের পরিবারগুলো বৃহদাকৃতির। সাম্প্রতিক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ১৯০০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে যেসব বিয়ে হয়েছে তার মধ্যে , শ্রমিক পরিবারগুলোর শতকরা ৪০টিই হচ্ছে বড় পরিবার।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্রা বিষয়ক মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়ারেন থম্পসন ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স ও সুইডেনের জনসংখ্যার শ্রেণীভিত্তিক পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ

"কায়িক শ্রমকারী লোক ও শ্বেতাংগ চাকরীজীবীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে প্রথমশ্রেনীর প্রজনন শক্তিই বেশী। কায়িক পরিশ্রমকারীদের মধ্যে কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় কৃষিক শ্রেণীর প্রজনন শক্তি বেশী। কৃষকদের বাদ দিয়ে অপরাপার শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীল মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় যে, যারা কারিগরিতে বিশেষজ্ঞ নয় এবং যাদের কাজ কঠিন নিম্ন শ্রেণীর এবং জীবন- যাত্রার মান যাদের নিম্ন তাদের প্রজনন ক্ষমতা বেশী। শিক্ষার মাপকাঠীতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, অল্প শিক্ষিত লোকদের পরিবার উচ্চ শিক্ষিতদের তুলনায় অনেক বড়।"[৬৩]

এর ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণকারী সমাজের দৈহিক পরিশ্রমকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা অধিক বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী, যাদের কর্ম পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা রয়েছে তাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কোন জাতির জন্যে এ ধরণের অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ, এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব। আর নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব দেখা দিল কোন জাতিই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। জন্মনিরোধ দেশগুলো বর্তমানে যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রেণীর অভাব, সাধারণ ভাবে বুদ্ধি ও বিচক্ষনতার অধোগতি এবং নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এ জন্যে সেসব দেশের চিন্তাবিদগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অলভাস হাক্সলী (Alous Huxley) সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর পুস্তক "Brave New world Revisited"-এ বলেন, "আমাদের কার্যকলাপের ফলে আমাদের বংশবৃদ্ধি জৈবিক দিক দিয়ে নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের হতে চলেছে।[৬৪] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "নতুন ঔষধপত্র উন্নততর চিকিৎসার প্রচলন সত্ত্বেও নিয়মমাফিক যে শুধু উন্নত হয় না তাই নয় বরং নিম্ন হয়ে যাচ্ছে। আর স্বাস্থ্যের মান নিম্ন হওয়ার সংগে সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মানওহ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।"[৬৫]

৬২। Britaint An officia: Handbook, 1954, p. 8
৬৩। Thompson Warren. S. Populatin Problem, New York, 1953. pp.19195
৬৪। Huxley. Hldous, Brave New world Revisited, 1959, p. 28
৬৫। Ibid, 1954, p. 28

মি. Huxley জনৈক জীবতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের (ডাক্তার সিন্ডান) মতামত নিম্ন ভাষায় উদ্ধৃত করেন ঃ "বর্তমান অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর লোকদের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর লোকসংখ্যা অধিক পরিমাণে বেড়ে চলেছে। মানব বংশ বৃদ্ধির ধারণা এ ধরণের ভ্রান্তি ও বক্রগতি জীববিজ্ঞান মোতাবিক একটি বুনিয়াদি সত্য বৈ আর কিছু নয়।"[৬৬]

সিন্ডান এ কথাও বলেন যে, আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা তেকে জানা গিয়েছে যে, ১৯৬৫ সালেন তুলনায় সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মান অনেক নিম্ন।[৬৭]

ইংল্যন্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ বারট্রান্ড রাসেল খত্যন্ত উদ্বেগের সংগে (অথচ অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই যে, রাসেল ও হাক্সলী দু'জনই জন্মনিরোধ বিশেষত প্রাচ্যে এক সময় ব্যাপক প্রসারের ঘোর সমর্থক) লিখেছেন ঃ

ফ্রান্সে বর্তমানে জনসংখ্যা স্থির অবস্থায় (Stationary) আছে অর্থাৎ একই অবস্থায় রয়েছে। ইংল্যান্ড দূতগতিতে ঐ একই অবস্থায় পৌঁছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশেষ এক শ্রেণীর লোকসংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং অপর বিশেষ শ্রেণীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কাজেই অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন না হলে যা হবে তা হচ্ছে এই যে, যে শ্রেণী কমে যাচ্ছে তা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং যে শ্রেণি বেড়ে চলেছে তার দ্বারাই দেশ ভরে যাবে। যে শ্রেণী কমে যাচ্ছে তা হচ্ছে দক্ষ কারিগর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। যারা বেড়ে চলেছে তারা হচ্ছে গরীর, ভোতা মস্তিষ্ক, মাতাল ও নির্বোধ ধরণের লোক। বুদ্ধি মত্তার দিক থেকে যারা সর্বোচ্চ শ্রেণীর তাদের সংখ্যা প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যাদের বংশধরদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে উত্তম অংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃত্রিম উপায়ে এতে বন্ধাত্ব সৃষ্টি করা হয়। অন্তত যারা বৃদ্ধি পায় তাদের তুলনায় যারা কমে তাদের অবস্থা ঠিক উল্লেখিত ধরণেরই হয়।"[৬৮]

ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে রাসেল আরো লিখেন ঃ

ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্য থেকে নমুনাস্বরুপ কিছু সংখ্যক শিশু বাছাই করে নিয়ে যদি মাতা পিতার [৬৯] অবস্থা আলোচনা করা হয় তাহলে জানা যাবে যে, বোধশক্তি দৈহিকশক্তি ও বুদ্ধি জ্ঞানের অধুনিকতায় এরা সাধারণ অধিবাসীদের তুলনায় নিম্নমানের ; আর নিষ্ক্রিয়তা, নির্বুদ্ধিতা, চিন্তাশক্তিহীনতা ও সংস্কার আসক্তির ব্যাপারে এরা সকলের উর্ধে।

৬৬। Ibid

৬৭। Ibid

৬৮। Russel Bertrand, Principles of Social Reconstructions, 1951. p. 24

৬৯। পরিসংখ্যান বিভাগের একটি বিশেষ পরিভাষা মাফিক পর্যালোচনা করে সকল গ্রুপের প্রতিনিধিত্বশীল একদল লোক বাছাই করে নেওয়াকেই Sample বা নমুনা গ্রহণ বলে।

আমরা আরো জানতে পারি যে, বোধশক্তি সম্পন্ন মেধাবী ও প্রগতিশীল শ্রেণী তাদের সমসংখ্যক সন্তান জন্মাতে পারছে না। অন্যকথায় সাধারণত এ শ্রেণী লোকদের গড়ে দু'টি করে সন্তান জীবিত থাকে না। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত, এদের পরিবারে দু'টি বেশী সন্তান জন্মায় এবং বংশবৃদ্ধির মারফত এরা বরাবর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে যায়।[৭০]

পুনরায় এ পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা সম্পর্কে রাসেল বলেন যে, সমাজে উচ্চ শ্রেণী লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হ্রাস প্রাপ্তির পরিনাম স্বরুপঃ

১. ইংল্যান্ড, ফরাসী এবং জার্মান জাতির লোকসংখ্যা অনবরত কমে যাচ্ছে।

২. লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন এসব জাতির উপর অপেক্ষাকৃত কম সভ্য জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এদের উচ্চমানের রীতিনীতি খতম হয়ে যাচ্ছে।

৩. এসব জাতির মধ্যে যাদের সংখ্যা বাড়ছে তারা নিম্ন শ্রেণীরলোক এবং দুরদর্শিতা ও বুদ্ধিতার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

এ সম্পর্কে রাসেল বর্তমান অবস্থাকে রোমীয় সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, ঐ সভ্যতার মূলেও এ ধরনের কার্যকারণ বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন ঃ "দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ঈসায়ী শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যে কর্মক্ষম জনসমাজেও বুদ্ধিমত্তার যে অধঃগতি দেখা দেয় তা চিরকাল অবোধগম্য হয়ে গেছে। তবু আজকের দুনিয়ায় আমাদের সভ্যতায় যা কিছু ঘটছে সে যুগেও ঠিক ঐ ধরনেরই ব্যাপারই ঘটেছিল বলে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। অর্থাৎ রোমীয়দের প্রত্যেক স্তরের উত্তম লোকগণ তাদের সমসংখ্যক সন্তান জন্মাতে ব্যর্থ হয় এবং যাদের কর্মশক্তি ছিল না তারাই হয় জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ।"[৭১]

এসব আলোচনার পর জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক রাসেলের মত চিন্তবিদও এ সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে,

"এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও নৈতিক মানদন্ড পরিবর্তন না হলে সকল সভ্য দেশে পরবর্তী দু'তিন স্তরের বংশধরদের নৈতিক মান নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছবে এবং সভ্যলোকদের সংখ্যা শোচনীয়বাবে হ্রাস প্রাপ্ত হবে। .... এ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের জন্মহারে প্রচলিত অশুভ নির্বাচন পদ্ধতিকে (Sefectiveness) কোন না কোন উপায়ে বন্ধ করতে হবে।"

৭০। Russel Bertrend, Principles of social Reconstructions, 1951, p. 124- 125
৭১। Ibid

এ ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের কল্যাণে একদিকে সমাজের শ্রেণীগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এক কর্মদক্ষ শ্রেণীরসংখ্যা ক্রমশঃকমে যায় অপর দিকে সমাজে শিশু ও বৃদ্ধদের অনুপাত বিকৃত হয়ে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও উদ্বেগজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। সমগ্র জনসংখ্যায় শিশুদের অনুপাতের তুলনায় বৃদ্ধদের অনুপাত বেড়ে যায় এবং এর ফলে স্বাভাবিক পন্থায় জাতির দেহে নয়া রক্ত সঞ্চয়ের পদ্ধতি ব্যাহত হয়। শিশুদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তির দরুন ব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদাই শুধু হ্রাস পায় না;পরন্ত সমগ্র জাতির কর্মশক্তি উদ্যম ও প্রেরণার স্থলে নিস্ক্রিয়তা ও স্থবিরতা স্থান পায়। বিপদের মোকাবিলা করা এবং প্রয়োজনের সময় জান প্রাণ দিয়ে কাজ করার প্রেরণা শেষ হয়ে যায়। এর ফলে জাতির বিপুল সংখ্যক লোক শুধু ছককাটা পথে চলতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। এ অবস্থা ক্রমে ক্রমে একটি জাতিকে জ্ঞান, জীবিকা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐ সব জাতির অনেক পেছনে ফেলে দেয় যারা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নতুন সন্তান জন্মায় এবং যাদের বিপুল সংখ্যক যুবক জাতির আশা আকাংখাকে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যে হারে শিশু ওযুবকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং বৃদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তার স্বভাবিক কুফল দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রত্যেক চক্ষুস্মান ব্যক্তিই নিজের চোখে এসব দেখতে পারেন । গত ৭০ বছরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে নিম্নে প্রদত্ত চার্টই তার জলন্ত প্রমাণঃ

এসব দেশের জনসংখার অভ্যন্তরীণ অবস্থায় যে পরিবর্তণ হচ্ছে, কোন দেশই এ অবস্থা থেকে বাদ পড়ছে না। সম্প্রতি জাতিসংঘ জনসংখ্যার এ ভারসাম্যহীন তার গতিধারা সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান জনিত বির্পোটি প্রকাশ করেছে এবং এতে এ বিষয়ে উদ্বেগজনক তথ্য পরিবেশন করেছে।[৭২] এ রির্পোটি পরিবেশিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ১৯০০ এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যায় ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে বয়স্কদের সংখ্যা যদি ১০০ ধরে নেয়া যায় তা হলে ১৯৫০ সালে এদের সংখ্যা নিম্নরুপ দাঁড়ায়।

নিউজিল্যান্ড ------ ২৩৬
বৃটেন ---------- ২৩১
অষ্ট্রিয়া --------- ২১২
আমেরিকা ------- ২০০
জার্মানী -------- ১৯০
বেলজিয়াম ------ ১৭৩
ফ্রান্স ---------- ১৪৪

৭২। The Aging of population and Its Economics Social Implication United Nations Department of Economic and Social Afiairs, New York, 1956.

জনসংখ্যার বয়সের অনুপাত [৭৩]

দেশ	ঈসায়ী সাল	১০ বছরের কম বয়স্ক ছেলে মেয়ে	১০-১৯ বছর বয়স্ক	৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়স্ক	৬৪ বছরেরউর্ধ্বে
ইল্যান্ড	১৮৮০ ১৯৫০	২৫.৭% ১৫.৫%	২০.৭% ১৫.৫%	৯.৮% ১৬.৮%	৪.৬% ১০.৯%
জার্মানী	১৮৮০ ১৯৫০	২৫.১% ১৫.৪%	১৯.৭% ১৬.৩%	৮.১% ১৬.৪%	৭.৯% ৯.৩%
ফ্রান্স	১৮৮১ ১৯৬৪	১৮.৩% ১৪.১%	১৭.১% ১৫.৭%	৪.৫% ১৬.৪%	৮.০% ১১.০%
আমেরিকা	১৮৮০ ১১৫০	২৬.৭% ১৯.৫%	২১.৪% ১৪.৪%	৮.৪% ১৪.৩%	৩.৪% ৮.১%

রির্পোটে একথাও প্রকাশ হয়েছে জনসংখ্যার অনুপাত পরিবর্তনে গর্ভধারণ ক্ষমতা ও জন্মহার পরিবর্তনের প্রভাব বেশী। এ ব্যাপারে জন্মহার যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে মৃত্যু হার তা পারে না।[৭৪]

এবিষয়টি (বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি) অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অর্থবোধক। অর্থাৎ পরিণত বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে এই যে, মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাবে এবং জন্মহার হ্রাস পাবে। এ ছাড়া যুবকদের তুলনায় বৃদ্ধলোকের অর্থনৈতিক ও সম্পদ উৎপানের ক্ষেত্রে অপেক্ষকৃত কম উপযোগী।[৭৫]

অর্থনৈতিক কাঠামো সুষ্ঠু ভিত্তিতে উন্নত করার জন্য বৃদ্ধ ও যুবকদের সংখ্যায় এ বিশেষ ভারসাম্যমূলক অনুপাত থাকা দরকার যেন সভ্যতার গাড়ীকে যারা চালিয়ে নিয়ে যাবে তাদের হাত কখনও দুর্বল না হয়ে যায়। প্রকৃতি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করে রেখেছে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকৃতির আওতায় হস্তক্ষেপ করার দরুন স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। বৃদ্ধদের সংখ্যা অব্যাহত গতিতে বেড়ে যায়। এবং যুবকদের সংখ্যায় প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির অভাবহেতু প্রতিকুল অনুপাত সৃষ্টি হয়। এর পরিণতি হচ্ছে কর্মী লোকদের অভাব। জাতীয় শক্তির অধঃপতন এবং অর্থনৈতিক শক্তির দুর্বলতা। অতঃপর যুবকদের অনুপাত হ্রাসের সংগে সংগে কর্মী ও জনসংখ্যার অভাব শামিল হলে একটি জাতি শাসন থেকে শাসিত এবং উন্নত ও সম্মানজনক স্থান থেকে অবনত ও অপমানকারীদের কখনও ক্ষমা করে না।

৭৩। Thompson Warren, populaticn problem, p. 94

৭৪। Ibid, p.22

৭৫। ibid, p. 95

এ বিদ্রোহের মধ্যেই এমন সব বিষয় লুক্কায়িত থাকে যা অবশেষে অপরাধের সাজাদানকারীর ভূমিকায় অবতরণ এবং অন্যদের শিক্ষাগ্রহণ করার জন্যে যথেষ্ট উপাদান সরবরাহ করে।

২. ব্যভিচার ও কুৎসিত রোগের প্রসার ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যভিচার ও কুৎসিত রোগ প্রসারের সুযোগ হয়েছে অত্যধিক। নারী জাতি খোদাভীতি ছাড়া আরও দুটি বিষয়ের কারণে উচ্চমানের নৈতিকতা রক্ষা করতে বাধ্য হয়। একটি হচ্ছে তাদের জন্মগত স্বভাবিক লজ্জাশীলতা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অবৈধ সন্তান জন্মের ফলে মায়ের সামাজিক মর্যাদা বিষ্ট হবার অশংকা। প্রথম প্রতিবন্ধকতাটি তো আধুনিক সভ্যতার বদৌলতে বহুলাংশে দূর্র হয়ে গিয়েছে। নাচ- গান, আমোদ- ফূর্তি, নৈশক্লাবে ও শরাবের মজলিসে পুরুষদের সাথে অবাধে মেলা-মেশার পর লজ্জা বহাল থাকতে পারে কি ? বাকী ছিল অবৈধ সন্তান জন্মানোর আশংকা। জন্মনিয়ন্ত্রণকে সর্বসাধারণে প্রচারের ফলে এ প্রতিবন্ধক টুকুও আর থাকলো না। এখন নর ও নারীদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার প্রকাশ্য সাধারণ লাইসেন্স (O.G.L) প্রবর্তিত হয়েছে। আর ব্যভিচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত রোগ বৃদ্ধিও অপরিহার্য।

ইংল্যান্ডে প্রতি বছর ৮০ হাজারেরও বেশী সংখ্যক অবৈধ সন্তান জন্মায় ডায়োসিজেন কনকারেন্সের (Diocesan Conference) রির্পোট মুতাবিক দেশে ১৯৪৬ সালে যেসব শিশু জন্মায় তাদের প্রত্যেক ৮ টি শিশুর মধ্যে ১টি অবৈধ ছিল এবং প্রতি বছর এক লক্ষ নারী বিয়ে ব্যতিরেকেই গর্ভবতী হয়। ডা. অসওয়াল্ড শোয়ারজ লিখেন ঃ

"প্রতি বছর গড়ে ৮০ হাজার স্ত্রীলোক অবৈধ সন্তান জন্মায়। (অর্থাৎ গর্ভধারিনীদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ) অতি সতর্কতার সাথে সঙ্গে গৃহীত হিসাব এই যে, প্রত্যেক দশজন নারীর মধ্যে একজন বিয়ে ছাড়াই যৌন সম্পর্কস্থাপন করে। এদলে যেসব নারী স্থান পেয়েছে তাদের অবৈধ সন্তান জন্মের সময় শতকরা ৪০ জনের বয়স ২০ বছরেরও কম, শতকরা ৩০ জনের বয়স ২০ বছর এবং শতকরা ২০ জনের বয়স ২১ বছর ছিল। এ সংখ্যাতত্ত্ব অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে উপরোক্ত সংখ্যা কিছু না কিছু দুর্ঘটনার ফল। জন্মনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যারা দুর্ঘটনাবশত গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল এশুধু তাদের সংখ্যা। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যে হারে ব্যভিচার হচ্ছে তার অতি নগন্য সংখ্যাই এখানে পাওয়া গিয়েছে।"[৭৬]

৭৬। Sehwary Oswald, The psycology of Sex, pelican Book 195,

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার শোয়ারজ প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন নারী পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। কিন্তু সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য আরও ভয়াবহ চিত্র পেশ করে। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত চেসার রিপোর্টটি (Chesser Report) টি ৬০০০ রমনীর নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে তৈরা করা হয়েছে। এতে দাবী করা হয়েছে যে, প্রতি তিনজন নারীর একজন বিয়ের পূর্বেই সতীত্ব সম্পদ হারিয়ে বসে।[৭৭] ডাক্তার চেসার তাঁর "সতীত্ব কি অতীতের স্মৃতি ?" শীর্ষক গ্রন্থেও এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[৭৮]

কিনসে রিপোর্ট (Kinsey Report) থেকে আমেরিকা সম্পর্কে জানা যায় যে, সেখানে ব্যভিচার ও কুৎসিত রোগের এত আধিক্য যে, সমাজে ভিত্তিমূল নড়ে উঠেছে। পুরুষের শতকরা ৪৭ জন এবং নারীদের শতকরা ৫০ জন বিনা দ্বিধায় অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।[৭৯]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক ডা. সরোকিন নিম্ন বর্লিত সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করেন এবং অবস্থার জন্য বক্তাশ্রু পেশ করেন ঃ

বিয়ের পূর্বে যৌনসম্পর্ক নারী শতকরা ৭ থেকে ৫০ জন
পুরুষ শতকরা ২৭ থেকে ৮৭ জন
বিয়ের পরে অবৈধ যৌনসম্পর্ক নারী শতকরা ৫ থেকে ১৬ জন
পুরুষ শতকরা ১০ থেকে ৪৫ জন
অবৈধ সন্তান ১৯২৭ সালে হাজার প্রতি ২৮ জন
১৯৪৭ সালে হাজার প্রতি ৩৮৭ জন
গর্ভপাত প্রতি বছর ৩৩,৩০০ থেকে ১০,০০,০০০ জন।

এ তথ্যও কম চিত্তাকর্ষক নয় যে, জন্মনিরোধ ঔষধ ও উপকরণের (Contraceptives) বিক্রয় হার আজ আসমান বরাবর উঁচু।

এরপর সরোকিন বলেন " এ বল্গাহীন যৌন উচ্ছৃংখলতার পরিণামে ব্যক্তি সমাজ ও সমগ্র জাতি যে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে তা প্রকাশ করা আমি দরকার মনে করি না। এর নাম যৌন আজাদী অথবা যৌন স্বেরাচার যাই বলুন না কেন এ বাস্তব সত্য তো পরিবর্তিত হতে পারে না যে, এ অবস্থায় এমন সূদূরপ্রসারী প্রতিফল দেখাদেবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যাবে না।"[৮০]

৭৭। Chesser, Dr. Eustace. The sexual, Marital and Family Relationship of the English Women-1955

৭৮। Chesser, The chastity Outmodedi; Londonl : 960. p. 75

৭৯। Sexual Behaviour in human Male. p. 552

৮০। Sorkin Pitirm A, the Amirican Sax Revolution, Boston, 1956, p. 13-14

কিনসের অনুমান মুতাবিক আমেরিকায় অবৈধ সন্তানের অনুপাত ৫ জনে ১ জন। কুমারী মেয়েদের সন্তান সংখ্যা শতকরা ৪ জন। এ ছাড়া গর্ভপাত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব হচ্ছে এই যে, প্রতি ৪টির মধ্যে একটি গর্ভ নষ্ট করে দেয়া হয়। বরং টাইম প্রতিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৪৫ সালে ১৬, ৪০০ শিশু জন্মায় এবং ১৮,০০০ গর্ভপাত করে নষ্ট করে দেয়া হয়।[৮১]

এ ভাবে অপবাধ প্রবণতা বিশেষত যৌন অপরাধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, দিন দিন তা কেবল বেড়েই চলেছে। ইংল্যন্ডের যেসব দন্ডনীয় অপরাধ পুলিশের গোচরীভূত হয়েছে তা নিম্ন হারে বেড়ে চলেছেঃ[৮২]

১৯৩৭ সালে.................২৮৩,০০০

১৯৫৫ সালে ৪,৩৮,০০০

উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই যৌন অপরাধের সংখ্যা সমগ্র অপরাধের সংখ্যার শতকরা ১.৭ থেকে মতকরা ৬.৩ এ পৌঁছেছে।

আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন (F.B.I) এর সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৭-৩৯ এর তুলনায় ১৯৫০ সালে ব্যভিচার শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অপরাধের সংখ্যাও শতকরা ৫ থেকে শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮৩]

যদি সকল ধরণের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধগুলো হিসাব করা হয়, তাহলে জানা যায় যে, ১৯৫৮ সালে ২৩ লাখেরও বেশী সংখ্যক অপরাধ পুলিশের গোচরীভূত হয়েছে। অথচ ১৯৪০ সালে এসংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লাখ।[৮৪] কিশোরদের বখাটেপনাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমেরিকার ১৪টি শহরে ১৯৫৭ সালে মে ২০ লাখ ৯৮ হাজার লোককে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার করা হয় তন্মধ্যে ২ লাখ ৫৩ হাজার অপরাধীর বয়স ছিল ১৮ বছরের নিম্নে। যৌনআজাদী সৃষ্ট রোগগুলো উওরোওর বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঐ রোগগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। যদি কেবল সিফিলিস রোগকে ধরা হয় তাহলে আমেরিকার পাবলিক হেলথ সার্ভিসের সার্জেন জেনারেল মি. অমাথ প্যারানোর উক্তি অনুসারে এ অবাঞ্চিত রোগ শিশুদের পক্ষাঘাত রোগের তুলনায় শতগুণ বেশী ধ্বংসাত্মক এবং বর্তমানে এ রোগ আমেরিকার যক্ষা, ক্যান্সার এবং নিউমোনিয়া রোগের সমান ক্ষতিকর। প্রত্যেক চারটি মৃত্যুর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিফিলিসের দরুন হয়ে থাকে।

৮১। Social prolem, p. p. 418-19

৮২। A Survey of social Conditions in England and wales, Oxford, 1258. 266

৮৩। Social problem, p. 386

৮৪। Blaich and Baumgartner. The challenge of Democracy, New York , 4th edition. p. 510

অধ্যাপক পললিন্ডেস ডা. প্যারানোর উক্তির উদ্ধৃতি সহকারে আমাদের জানাচ্ছেন ঃ

"নতুন ধরনের ঔষধের উন্নতি ও ব্যবহারের ফলে ১৯৪৭ সাল থেকে এ অবাঞ্ছিত রোগ কমে যাচ্ছিল, কিন্তু ১৯৫৫ সালে হঠাৎ গতি ফিরে যায়। আমেরিকার বড় বড় শহরে সিফিলিস এবং গানোরিয়া রোগ বিস্তার লাভ করছে এবং বিশ বছরের নিম্ন কিশোরদলই এবার এ রোগ বেশী করে আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মোট রোগীদের শতকরা ৫০ ভাগ যুবকদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।"[৮৫]

১৯৬১ সালের আগষ্টে "রিডার্স ডাইজেষ্ট" জর্জ কেন্ট এবং উইলফ্রে গোটোরেসের একটি প্রবন্ধ ছাপানো হয়। এতে লেখকদ্বয় বলেন যে, বৃটেনের শহর তথা লন্ডন, বার্মিংহাম এবং লিভারপুলে এ অবাঞ্ছিত রোগ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। রোগজীবানু ধ্বংসকারী নতুন ঔষধপত্রের বদৌলতে এসব রোগ কিছুকাল চাপা ছিল, কিন্তু অবশেষে সাফল্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ৪ বছর সময়ের মধ্যে এ অবাঞ্ছিত রোগ শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫৬ সালে গনোরিয়া রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার। অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি। আর এ সংখ্যার মধ্যে শুধু তাদেরকেই দরা হয়েছে যারা চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এসেছে। যারা সাধারণ পেশাদার চিকিৎসক বা প্রাইভেট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা করায় অথবা মোটেই চিকিৎসা করায় না তারা উপরোক্ত হিসেবের মধ্যে নেই। লেখকদ্বয় এও বলেন যে, ১৯৪৮ সালে এ যাবত রোগের গতি প্রকৃতির সংখ্যাতত্ত্বে থেকে দেখা যায় যে, এক বছরে ১৮-১৯ বছর বয়স্ক যুবকদের মধ্যে গণোরিয়া শতকরা ৩৬ ভাগ এবং যুবতির মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। বৃটেনের কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ডালজেল ওয়ার্ড (Dalzell ward) এর অনুমান এই যে, ২০ বছরের নিম্ন বয়স্কদের মধ্যে এ অবাঞ্ছিত রোগ বর্তমানে যে পরিমাণ বেড়ে চলেছে ইতিপূর্বে কখনও এমনভাবে বাড়তে দেখা যায়নি। লন্ডনের একটি মাত্র হাসপালেই এই সময় উক্ত রোগের ৪৯০ জন রোগী বর্তমান ছিল। লিভারপুলের এ অবাঞ্ছিত রোদীদের অর্ধেক সংখ্যক ছিল ১৭ বছর থেকে ২১ বছরের মধ্যবর্তী বয়স্ক।[৮৬]

অন্যান্য দেশেরও অল্প-বিস্তর একই অবস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Heath Organisation WHO) এক সাম্প্রতিক সম্মেলনে ১৬ টি দেশের পক্ষ থেকে পেশকৃত রির্পোটি বলা হয় যে, ও সব দেশে সিফিলিস ও গনোরিয়া ভয়ংকর মহামারী বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের মধ্যে সিফিলিস রোগীর সংখ্যা ইতালীতে তিনগুণ এবং ডেনমার্কে দ্বিগুণ হয়ে গেয়ে।[৮৭]

৮৫। Social poblems, p. 313
৮৬। Ibid.
৮৭। Ibid.

এ অবস্থা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ, আধুনিক দুনিয়ায় পাপের যেসব দরজা খুলে দিয়েছে তার মধ্য দিয়ে ব্যভিচার, যৌন অপরাধ এবং অবাঞ্চিত রোগের বাহিনী নর্তন-কুর্দন করে প্রবেশ করেছে এবং সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের কবলে টেনে নিয়ে চলেছে।

৩. বিবাহ বিচ্ছেদের আধিক্য ঃ যেসব কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে দাম্পত্য জীবনের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছে তারমধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ অন্যতম। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধনকে মজবুত করার ব্যাপারে সন্তানের ভূমিকা খুবই প্রভাবশীল। সন্তানের অবর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর একের পক্ষে অপরকে ত্যাগ করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে। এ কারণেই ইউরোপে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। আর বিয়ে ভঙ্গকারীদের মধ্যে সন্তানহীনদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। কিছু দিন পূর্বে লন্ডনের এক আদলতে মাত্র দেড় মিনিট সময়ের মধ্যে ১১৫ টি বিয়ে বাতিল ঘেষণা করা হয় এবং ১১৫ টি দম্পতির সবকয়টিই নিঃসন্তান ছিল। সমাজবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, সন্তানের অভাব বিয়ে বাতিল করার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশীল বিষয়। এ ব্যাপারে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একমত। টালাকাট পারসন্স **(Talcott parsons) স্পষ্ট হিসাব প্রদান করার পর বলেন ঃ**

"বেশীরভাগ বিবাহ বিচ্ছেদ বিয়ের প্রথম বছরে এবং সন্তানহীন স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে ঘটে থাকে এবং ঘটছে। এ বিয়ের পূর্বে এদের জীবনে বিয়ে এবং বিচ্ছেদ ঘটে থাকলেও ঐ একই অবস্থা এর মূলে কাজ করছে। একবার সন্তানের জন্ম শুরু হয়ে গেলে স্বামী- স্ত্রীর একত্রে বসবাস করার সম্ভাবনা অনেক বেশী হয়ে যায়।"[৮৮]

অনুরুপভাবে বার্ণস এবং রুয়েদী (Barnes and Ruedi) নিজেদের অনুসন্ধানের বিবরণ নিম্ন ভাষায় ব্যক্ত করেনঃ "বিয়ে বাতিলকারীদের দুই তৃতীয়াংশ নিসন্তান এবং মাত্র পঞ্চমাংশ এক সন্তানের পিতা মাতা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সন্তানহীন দম্পতির মধ্যে একটি পরিষ্কার সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।"[৮৯]

বিখ্যাত ইংরেজী প্রত্রিকা সাইকোলোজিষ্ট এর জুন' ১৯৬১ এর সংখ্যায় এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, সাধারণত সকল দম্পতির জন্যে সন্তানের মাতা-পিতা হওয়া জরুরী। যারা সন্তানের জন্মকে বিলম্বিত করে তাদের তজ্জন্যে পরে আফসোস করতে হয়। সন্তানহীন দম্পতি জীবন নিত্য নতুন সমস্যার জন্ম দেয় এবং সাময়িকভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে।

৮৮। Talcott Parsons, the stabity of American Family System, Bell and Vogel (Ed). A Modern Introduction of the family, London: 1961, p. 94

৮৯। Barnes and Ruedi, The American Way of life, New York, 1951, p. 652

এর পরিণতি স্বরূপ দাম্পত্য জীবনে এমন একটা উদ্যমহীনতা এসে যায় যে, তা দেখে মনে হয় পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ আমাদের বার বার সতর্ক করে বলেছেন যে, সন্তানহীন পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। সন্তানহীন অবস্থায় (সন্তানের মাতা বা পিতা হওয়ার) গোপন বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। স্ত্রীদের ব্যাপারে তো এ বিষয়টি আরো জটিল হয়ে ওঠে। জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার জন্মগত সন্তান বাৎসল্যকে গলাটিপে হত্যা করা হয়। ফলে তার দৈহিক অবস্থায় বিশৃখলা দেখা দেয়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং তার জীবনের সকল আনন্দ ও উৎসাহ হিম-শীতল হয়ে পড়ে।[৯০]

ডাক্তার ফ্রিডম্যান ও তার নিজের ও অন্যান্য সঙ্গীদের অনুসন্ধানের ফলও অনুরুপ। তিনি তাঁর নিজের ও অন্যান্য সঙ্গীদের গবেষণার ফল নিম্ন ভাষায় ব্যক্ত করেন ঃ

"বিবাহ বিচ্ছেদের হার সেসব পরিবারের মধ্যেই বেশী যেগুলো বিয়ের পর সন্তান বঞ্চিত থাকে অথবা যেসব পরিবারে সন্তানের সংখ্যা কম।"[৯১]

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনকারী দেশগুলোতে দিন দিন বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ডাক্তার অসওয়াল্ড শোয়ারজ ইংল্যন্ড সম্পর্কে লিখেন ঃ

"গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে হারে বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে মহামারীর মত দ্রুতগতি ও ধ্বংসলীলার আভাস পরিলক্ষিত হয়। এদেশে ১৯১৪ সালে সর্বমোট ৮৫৬টি বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পাদিত হয়েছিল। এ সংখ্যা ১৯২১ সালে ৩৫২২, ১৯২৮ সালে ৪০০০ এবং ১৯৪৩ সালে ৩৫.৮৭৪ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপরও কি বিপদ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না যে, আমাদের তাহযীব নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে ? "[৯২]

ইংল্যান্ডের পারিবারিক আদালতের সংখ্যাতত্ত্ব অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকাদ্দমার ডিক্রী নিম্নহারে বেড়ে চলেছেঃ

১৯৩৬	সালে	৪০৫৭
১৯৩৯	সালে	৭৯৫৫
১৯৪৭	সালে	৬০৭৫৪

এরপরে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের হার কিছুটা কমে যেতে থাকে এবং এর পর থেকে ববাবর বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই চলেছে।

৯০। Alexander, The psycologist Magazine, London, June 1961, p. 5

৯১। Freedman, Whelpton and Campbell, Family planning, Sterility and population Growth, New York, 1969, p. 45

৯২। Sehwary, The philosophy of Sex, p. 243

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, ১৯৩০ সালে সে দেশে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের মৃত্যুর দরুন যদি দশটি দম্পতির সম্পর্কচ্ছেদ হতো তবে তালাকের দরুন হতো একটির। কিন্তু ১৯৪৯ সালে এর অনুপাত ১০ঃ১ থেকে ১.৫৮ঃ ১-এসে দাঁড়ায়। বিয়ে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অনুপাতও বরাবর ভারসাম্য হারিয়ে চলেছে। নিম্নের বর্ণিত সংখ্যা থেকে এসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সম্ভব হবে ঃ

সাল	বিয়ে	বিবাহ বিচ্ছেদ
১৮৭০	৩৩.৭	১
১৯১৫	১০.১২	১
১৯৪০	৬	১
১৯৪২	৫	১
১৯৪৪	৪	১
১৯৪৫	৪.৩	১
১৯৫৮	৩.৭	১

এর অর্থ হলো এই যে, ১৮৭০ সালে ৩৪টি বিয়ে হলে একটি বিবাহ বিচ্ছেদ হতো। কিন্তু এখন প্রতি চারটি বিয়েতে একটি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

১৮৯০ সালে ১০০০ নারীর মধ্যে মাত্র তিনজন হতো তালাক প্রাপ্তা। কিন্তু ১৯৪৬ সালে এ সংখ্যা ১৭.৮-এ পৌঁছে। বুঝা গেল তালাক প্রাপ্তা নারীর সংখ্যা প্রায় ৬গুণ বেড়ে গিয়েছে। এজন্যে অধ্যাপক সরোকিন বলেছেন যে, বিয়ের পবিত্রতা সম্পর্কিত ধারণা পূর্বের তুলনায় এখন দ্রুতগতিতে এবং তীব্রভাবে পালটিয়ে যাচ্ছে এবং গৃহ একটি স্থায়ী বাসস্থান হওয়ার পরিবর্তে গ্যারেজে পরিণিত হতে চলেছে। এটাকে রাতযাপনের স্থান মাত্র বিবেচনা করা হয়, যদিও সম্পূর্ণ রাত এতে থাকা জরুরী নয়।

তালাকের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার (Desertion) প্রবর্তনও দিন দিন বেড়ে চলছে এবং আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে এটা গরীবের তালাক (Poor-Mans Divorce) নামে পরিচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমেরিকায় দশ লক্ষেরও বেশী এ অবস্থায় আছে। আদম শুমারীর হিসাব মুতাবিক আমেরিকায় দশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন স্ত্রী এবং পনের লক্ষ ছাব্বিশ হাজার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন স্বামী রয়েছে।[৯৩]

৯৩। Bergel Egon Ernest, Urban Sociology, New York, 1955, P. 298

Dhaka University Institutional Repository

সরোকিনের অনুমান এই যে, আমেরিকার মোট বিবাহিত নারীদের শতকরা চারজন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করছে এবং সরকারী তহবিল থেকে এসব পরিবারের জন্যে বার্ষিক প্রায় ২৫ কোটি ডলার খরচ হচ্ছে।[৯৪] তালাক, বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতার দরুন আমেকিার মোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১ কোটি বিশ লক্ষ (শতকরা ২৫ ভাগের কিছু বেশী) শিশু আজ মাতা-পিতার ‌েহে থেকে বঞ্চিত। আর এসব ছেলেমেয়েদের দরুনই আমেরিকায় দিন দিন কিশোরদর উচ্ছৃংখলতা বেড়ে গিয়ে দেশের জন্যে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. জন্মের হার কমে যাওয়াঃ এর পরিণতি স্বরূপ বর্তমানে যতগুলো জাতি জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের জন্মহার ভীষণভাবে কমে গেছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৭৬ সাল থেকে এ আন্দোলন প্রচার শুরু হয়েছে। এর পর থেকেই জন্মহার কমতে থাকে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ নিশ্চয়ই। ইংল্যান্ডের রেজিষ্ট্রার জেনারেল নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, জন্মহার হ্রাস প্রাপ্তির শতকরা ৭০ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণের দরুন ঘটে থাকে। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকাতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের জন্মহার হ্রাস প্রাপ্তির কারণগুলোর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপকরণাদির প্রভাব অত্যধিক।

রয়েল কমিশন অব পপুলেশনের ১৯৪৯ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯১০ সালের পূর্বে যারা বিয়ে করেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র ১৬ জন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহন করতো। কিন্তু ১৯৪০-৪২ সালেই এর পর থেকে শতকরা ৭৪টি দম্পতি এ ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ প্রসঙ্গে রয়েল কমিশন পরিষ্কার বলেছেন যে,

"এদেশে এবং আরো অন্যান্য দেশে এমন স্পষ্ট নিদর্শন বর্তমান আছে যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবারকে সীমিত করার প্রবণতার দরুনই জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে। এ পদ্ধতি চালু করার পূর্বে জন্মহার যে ভাবে হ্রাস পাচ্ছিল, তারচেয়ে অনেক গুণ বেশী হ্রাস পেয়েছে এর উপকরণাদি ব্যবহার করার দরুন।"[৯৫]

আমেকিার হোয়েলপটন ও কাইজার (Whelpton and Kiser) এর গবেষণামূলক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, সে দেশে শতকরা ৯১.৫ টি দম্পতি কোন না কোন উপায়ে জন্মরোধ করে থাকে।[৯৬]

৯৪। এ হিসাব ১৯৫৩ সালের আমেরিকার যৌন-বিপ্লব থেকে গৃহীত, পৃ.৮

৯৫। Report of the Royal Commission on Population, London, 1949, P. 34

৯৬। The Planning of Rertility Milbank Fund Quarterly. 1947 PP. 66-67

এ লেখকগণ বৃটেন ও আমেরিকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর আমাদের জানানঃ

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পরিবারগুলোর ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্তির মূলে রয়েছে গর্ভনিরোধের প্রচেষ্টা।"[৯৭]

জন্মনিরোধের ফলাফল এর চেয়েও সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে এসব দেশের বিয়ে ও জন্মের হার তুলনা করে দেখা যেতে পারে। ইংল্যান্ডে ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে বিয়ের হার কমেছে শতকরা ৩.৬ কিন্তু ঐ সময়ে জন্মহার শতকরা ২১.৫। পুনরায় ১৯০১ সাল পর্যন্ত বিয়ের হার অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু ঐ সময়ে জন্মহার হ্রাস পায় শতকরা ১৬.৫। নিম্নে চার্টে ১৯১২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন বিয়ে ও জন্মহার অনুপাত দেখানো হলোঃ

দেশ		বিয়ের হার		জন্মহার
ফ্রান্স	শতকরা	৭.৬ বৃদ্ধি	শতকরা	২৮.২ হ্রাস
জার্মানী	,,	৯.৪ হ্রাস	,,	৪৯.৪ ,,
ইটালী	,,	৯.৮ ,,	,,	২৯.১ ,,
হল্যান্ড	,,	১০.২ ,,	,,	৩৫.০ ,,
সুইডেন	,,	১১.৩ ,,	,,	৪৫.১ ,,
ডেনমার্ক	,,	১২. ৩ ,,	,,	৩৫.৬ ,,
সুজারল্যান্ড	,,	১২. ৯ ,,	,,	৪৪.৮ ,,
ইংল্যান্ড	,,	১৩. ৩ ,,	,,	৫১.০ ,,
নরওয়ে	,,	২৬. ০ ,,	,,	৩৮.০,,

আমেরিকাও এ পথেরই যাত্রী। সে দেশে ঊনিশ শতকের শেষাংশে জন্মহার প্রতি হাজার চল্লিশ ছিল ১৯৩৫ সালে তাদের জন্মহার মাত্র হাজার প্রতি ১৮.৭- এ এসে দাঁড়ায় এবং বর্তমানে সেখানে জন্মহার হচ্ছে প্রতি হাজার ২৩.৬ [৯৮] অপরদিকে বিয়ের হার ১৯০১ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৯.৩ এবং ১৯৩৫ সালে সে দেশের বিয়ের হার দাঁড়ায় হাজার প্রতি ৯.৪। এ হিসাব থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণকারী নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক কিরুপ অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে পরিমাণে বিয়ের হার কমে আসছে। তারচেয়ে বেশী পরিমাণে জন্মহার কমে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ের হার বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও জন্মহার কমে চলেছে। বৃটেনের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেও এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। "বিশ শতকে বিয়ের হার বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও জন্মহার কমেছে। এ সময়ে শুধু যে বিয়ের হার বেড়েছে তা- নয়- বিয়ের বয়সও অনেকটা কমেছে।" [৯৯]

৯৭। Family Planning, Sterility and Population Growth, New York. 1959, P.5
৯৮। Population and Vital statisties, U.N.O. Aprial, 1961
৯৯। Britain and officeal Hand Book, 1954, P.8

জন্মনিরোধের এক ফল হচ্ছে এই যে, পরিবারের সদস্য সংখ্যার গড় ক্রমেই কমে আসছে এবং দুনিয়ার সর্বত্রই পরিবার আকারে ছোট হয়ে আসছে এখন তো ঐ সব পরিবারের সংখ্যা বেশী যাদের কোন সন্তান নেই অথবা মাত্র একটি কিংবা দু'টি সন্তান আছে। এ বিষয়েও জন্মনিরোধ আন্দোলনের আগের ও পরের সংখ্যাতত্ত্বে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

ইংল্যান্ডে ১৮৬০ ও ১৯২৫ সালের মধ্বর্তী সময়ে যেসব বিয়ে হয়েছিল তাদের সন্তান সংখ্যার হিসাব নিম্নরূপঃ

পরিবারের সংখ্যা ঃ

১৮৬০ সালে	১৯২৫ সালে	সন্তানের সংখ্যা
শতকরা ৯	শতকরা ১৭	নিঃ সন্তান
শতকরা ১১	শতকরা ৫০	১টি কিংবা দু'টি সন্তান
শতকরা ১৭	শতকরা ২২	৩টি কিংবা ৪টি
শতকরা ৪৭	শতকরা ১১	৫টি থেকে ৯টি
শতকরা ১৬	শতকরা -	১০ কিংবা তার চেয়ে বেশী

এর ফল হচ্ছে এই যে, পরিবারের জনসংখ্যার গড় কমে আসছে এবং সে জন্যে পরিবার ক্রমেই ছোট হতে চলেছে। ১৮৭০-৭৯ সালে বিবাহিতা নারীদের সন্তান জন্মদানের গড় সংখ্যা ছিল জনপ্রতি ৫.৮। এই সংখ্যা ১৯২৫ সালে মাত্র ২.২ এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ সংখ্যা ২.২ এর সামান্য উর্ধ্বে।[১০০]

১৯১০ সালে আমেরিকার জনপ্রতি গড়ে ৪.৭টি সন্তানের জন্ম হতো এ সংখ্যা ১৯৫৫ সালে মাত্র ২.৪- এ পৌঁছেছে। ১৯১০ সালে আমেরিকার সর্বমোট বিবাহিত নারীদের মধ্যে শতকরা ১০ জন ছিল সন্তানহীনা এবং শতকরা ২২ জন ছিল এক বা দু' সন্তানের মা। কিন্তু ১৯৫৫ সালে মোট বিবাহিতা নারীদের শতকরা ১৬ জনকে সন্তানহীন এবং শতকরা ৪৭ জনকে এক বা দু' সন্তানের মা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। অপর দিকে ১৯১০ সালে সর্বমোট বিবাহিতা নারীদের মধ্যে শতকরা ২৯ জনছিল সাত বা ততাধিক সন্তানের জননী। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এ সংখ্যা শতকরা মাত্র ৬-এ এসে দাঁড়িয়েছে।[১০১]

জন্মহার দিন দিন এভাবে কমে যাওয়া সত্ত্বেও কোন কোন দেশের জনসংখ্যাতে কিছু বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হলো চিকিৎসা বিদ্যা ও ব্যাপক স্বাস্থ্য রক্ষা পদ্ধতির উন্নতির দরুন মৃত্যুতারেরহ্রাস প্রাপ্তি। কিন্তু এখন জন্মহার ও মৃত্যুহার মধ্যে আর বিশেষ পাথক্য নেই। এজন্যেই আশংকা করা যাচ্ছে যে, শীঘ্রই জন্মহার মৃত্যুতার থেকে কমে যাবে। এর মানে হলো ওসব জাতির যত সংখ্যক সন্তান জন্মাবে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক মারা যাবে।

১০০। Britain An official Hand Book, Central office of Information, London, 1961. P. 12

১০১। Frudman and otherss Family Planning Sterility and Population Groth P. 5

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও অষ্ট্রীয়ার কিছুকাল পর পরই বেড়ে যাবার পরিবর্তে কমে যায়। এসব দেশে তাদের সাবেক অবস্থা বহাল রাখতে পারে না। ইংল্যান্ডের জনসংখ্যাও প্রায় অনড় অবস্থাই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকাও এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। অষ্ট্রীয়ার ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুহার জন্মহারের উর্ধেছিল। যদি এ সময় অন্য দেশের লোক হিজরত করে এসে ফ্রান্সে বসবাস করা শুরু না করতো তাহলে এদেশের জনসংখ্যা ভীষনভাবে কমে যেতো। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪-৩৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে ফ্রান্সের মূল অধিবাসীদের সংখ্যা কমে যায়।[১০২]

আমেরিকার শহরের অধিবাসীদের নিয়ে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তারা নিজেদের সমান সংখ্যক সন্তানও জন্মাতে পারেনি। এ সময়ে যে জন্মহার ছিল, তা থেকে অনুমান করা হয়েছিল যে, অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এক পুরুষ পরেই সে দেশের জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ কমে যাবে।

ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা কমিশনের ১৯৪৯ সালের রিপোর্ট মুতাবিক ১৯৪৫ সালের শেষে সে দেশের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যারা দৈনিক পরিশ্রম করে না সে সব উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে বিয়ের পর ষোল থেকে বিশ বছর পর্যন্ত সময়ে জন্মহার ছিল পরিবার প্রতি ১.৬৮। এ অবস্থা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, উল্লেখিত লোক ধীরে ধীরে নির্বংশ হতে চলেছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে :

"যে জনপদে মাত্র দু'টি সন্তানের মাতা-পিতা হবার প্রথা চালু হয়ে যায়। কিংবা যেখানে বিবাহিত নারী-পুরুষের শেষ পর্যন্ত দু'টি সন্তান জীবিত থাকে সে জনপদ উজার হয়ে যাবার পথে এবং প্রত্যেক ত্রিশ বছর পর তার জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় কমে যাবে।"

কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝার জন্যে একহাজার জনসংখ্যাকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলে উল্লেখিত হিসাব অনুসারে ত্রিশ বছর পর তাদের সংখ্যা ৬৩১, ষাট বছর পর ৩৮৬ এবং দেড়শো বছর পর মাত্র ৯২-এ এসে দাঁড়াবে।[১০৩]

অর্থনীতি বিশারদগণ জনসংখ্যার সঠিক গতি সম্পর্কে মতবাদ গঠন করার জন্যে শুধু জন্মহারের উপরই নির্ভর করেন না বরং তারা জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তারকারী সকল উপায় উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃত হার (Net Reproduction Rate) নির্ণয় করে ফেলেন। যদি এ হার এক হয় তাহলে বুঝা যাবে জনসংখ্যা বাড়ছেও না মরছেও না। একের বেশী হলে বুঝা যাবে সংখ্যা বৃদ্ধির পথে এবং একের কম হলে বুঝতে হবে যে, জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তির দিকে। কয়েকটি বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঠিক চিত্র আমি নীচে উল্লেখ করছি। এর সাহায্যে সে সকল দেশগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সহজ হবে।

১০২। Demografic year Book, 148, U.N.O Edition. 1949

১০৩। Dr. Frederic Burghoerier quoted by Jaeques, Lecharque, Marriage and Family, New York, 1949, P. 239; ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৫৫, ১৮শ খন্ড. পৃ. ২৪৩

ইংল্যান্ড - -	১৯৩৩ সাল	-	-	০'৭৪৭
,,	১৯৩৭ সাল	-	-	০'৭৮৫
,,	১৯৪০ সাল	-	-	০'৭৭২
,,	১৯৪৯ সাল	-	-	০'৯০৯
ফ্রান্স	১৯৩০ সাল	-	-	০'৯৩০
,,	১৯৩৫ ,,	-	-	০'৮৭০
,,	১৯৪০ ,,	-	-	০'৮২০
,,	১৯৫৪ ,,	-	-	০'৯৪০
নরওয়ে	১৯৩৫ ,,	-	-	০'৭৪৬
,,	১৯৪০ ,,	-	-	০'৮৫৮
,,	১৯৪৫ ,,	-	-	০'০৭৫
বেলজিয়াম	১৯৩৯ ,,	-	-	০'৮৫৯
,,	১৯৪৭ ,,	-	-	১'০০২

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্যে এ অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে দাড়িয়েছে এবং এর ফলাফল দেশে সমাজের যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রকাশ্যতঃ জন্মনিরোধের সমর্থক তারাও ভয় পেয়ে গিয়েছেন। এরা নিজেদের হাতে রোপন করা ফল দেখতে পেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং অন্তত নিজ নিজ দেশে জন্মনিরোধের পলিসী পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক সমাজ বিজ্ঞানীর মতামত উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

যদি ম্যালথাস আজ জীবিত থাকতেন তাহলে এটা নিশ্চয় অনুভব করতেন যে, পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা জন্মনিরোধ করার ব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী দূরদশীর্তার পরিচয় দিয়েছে। বরং সত্য কথা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের তাহযীবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দান করেছে। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে তো প্রকৃত পক্ষেই কিছুকাল পরপর জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। কারণ সেসব দেশে মৃত্যুহার জন্মহারের চেয়ে বেশী; উপরন্তু পাশ্চাত্যের শিল্প ও নগর ভিত্তিক সভ্যতার দরুন অন্যান্য জাতিরাও বিপদের সম্মুখীন। আমেরিকার জনৈক জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ আমেরিকার জন্ম ও মৃত্যুর গতিধারা পর্যালোচনা করে একথা বলে দিয়েছেন যে, এক পুরুষের মধ্যেই জনসংখ্যা হ্রাস একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হবে।[১০৪]

১০৪। Landis, Paul, Social Problems, PP. 596-97 and Cole, G.D.H. The Intelligent Man's Guide to the post war world, London. 1948. PP. 445-46

Dhaka University Institutional Repository

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি

পূর্বের আলোচনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রসার, এর কারণ ও ফলাফলের যে বর্ণনা দান করা হয়েছে তা মনোযোগ সহকারে গবেষণা করলে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

একঃ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মনে জন্মনিরোধের ইচ্ছা জেগে ওঠা এবং বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের মধ্যে এর প্রসার লাভ করার কারণ তাদের সন্তান জন্মদান ও বংশ বৃদ্ধির প্রতি স্বাভাবিক বৈরাগ্য নয় বরং দু'শতাব্দী যাবৎ সেখানে যে ধরনের কৃষ্টি, সভ্যতা, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তার দরুন তারা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে না পড়তো তাহলে আজও তারা উনিশ শতকের মতই জন্মনিরোধ সম্পর্কে সম্পূর্ন অজ্ঞ থাকতো। কেননা পূর্বে এদের মনে সন্তানের প্রতি যে মহব্বত ও বংশ বৃদ্ধির প্রতি যে, স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল,তা আজও বর্তমান আছে। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে তাদের মনোভাবে কোন বিপ্লব আসেনি।

দুইঃ জন্মনিরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রাশ্চাত্য জাতিগুলো যে সব জটিলতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আন্দোলন স্বাভাবিক ব্যবস্থায় যে রদবদল করতে চায় তা মানব জাতির জন্যে ক্ষতিকর। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তনযোগ্য নয়। পরন্তু সভ্যতা, কৃষ্টি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির যে ব্যবস্থা মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত মুখে ঠেলে দিয়ে ধ্বংসের সম্মখীন করে, তা পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী।

পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতালব্ধ উপরোক্ত দু'টি বিষয় আমাদেরকে ইসলামের মূলনীতির অনেক নিকটবর্তী করে।

ইসলামে মানুষের স্বভাবের অনুসারী জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি ও সমাজক্ষেত্রে তার যাবতীয় আদর্শ এ মূল সূত্রের ভিত্তিতে রচিত যে, মানুষ সমগ্র বিশ্বের স্বাভাবিক গতিধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের উল্টো পথে কখনো চলবে না। কুর'আন মজিদ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জীবকে সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রকৃতিগতভাবে এমন পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন, যা অনুস্বরণ করে এ জীব অস্তিত্ব লাভের পর নিজের কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করার যোগ্য হয়।

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

"আমাদের প্রতিপালক প্রটি বস্তুকে বিশেষ ধরনে সৃষ্টি করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পাদন করার পথও বাতলিয়ে দিয়েছেন।"[১০৫]

১০৬। আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৫০

সৃষ্টির সকল বস্তু নিদ্বিধায় এ হেদায়াত মেনে চলছে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এদের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যে থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবার বা এ পথে চলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার কোন ক্ষমতাই তাদের দেয়া হয়নি। অবশ্য নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহারের দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত করে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পথ আবিষ্কার করা ও সে পথে চলার চেষ্টা করাও তার ইচ্ছধীন। তবে আল্লাহর তৈরী পথ পরিহার করে মানুষ নিজে খায়েশের অনুসরণ করে যে পথ তৈরী করে তা বক্র পথ এবং সে পথ ভ্রান্তিপূর্ন

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

"আল্লাহর হিদায়াত ব্যতীত যে নিজের নফসের অনুসরণ করে চলে তারচেয়ে অধিকতর গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) আর কে হতে পারে?"[১০৬]

এ গোমরাহীকে বাহ্যত যতই কল্যাণকর মনে করা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশিত পথ পরিহার করে ও তার নির্দেশিত সীমা লংঘন করে মানুষ নিজের উপরই যুলুম করে থাকে। কেননা তার ভুলকাজের পরিণাম তারই জন্যে ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে-

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই ওপর যুলুম করে থাকে।"[১০৭]

কুর'আন বলে যে, আল্লাহর সৃষ্ট গঠন-প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করা আল্লাহ প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করা শয়তানী কাজ। আর শয়তান এ ধরনের কাজের কুমন্ত্রনা দাতা-

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

"(শয়তান বললো) আমি আদম সন্তানদের আদেশ দেবো, তারা আল্লাহর প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করবে।"[১০৮]

আর শয়তান কে? সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে মানুষের দুশমন সেই শয়তানঃ

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

"তোমরা শয়তানের অনুসরণ কর না; কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, সে তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ দান করে।"[১০৯]

১০৬। আল-কুর'আন, ২৮: ৫০
১০৭। আল-কুর'আন, ৬৫:১
১০৮। আল-কুর'আন, ৪:১১৯
১০৯। আল-কুর'আন, ২:১৬৮-১৬৯

ইসলাম যে, মূলসূত্রের উপর তার তাহযীব, তামদ্দুন, অর্থনীতি ও সমাজনীতির কাঠামো দাঁড় করেছে তা হচ্ছে, মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিজের প্রকৃতিগত সকল চাহিদা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই পূর্ণ করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শক্তিগুলোকে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারবে না এবং কোন শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লংঘন করবে না। এছাড়া শয়তানের প্রলোভন ও কুমন্ত্রণায় ও প্রকৃতির সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন ভ্রান্ত পন্থায় নিজের কল্যাণ ও উন্নতির উপায় অনুসন্ধানও করবে না।

আল-কুর'আন ও পরিবার পরিকল্পনা

পবিত্র কুর'আনে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভনিরোধ বা কম সন্তান গ্রহনের ব্যাপারে কোন আয়াত নেই। আর আযল করা বা অন্যান্য পন্থা; যা দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় সে, সকল পন্থার ব্যাপারেও কুর'আনে কোন উল্লেখ নেই। ইসলামী ফকীহগণের মতে কোন সমস্যা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে নীরবতা ভুলক্রমে নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞাতা। এটাও কোন যুক্তি নয় যে- তৎকালে জনসংখ্যা একটি বিরাট সমস্যা ছিল না তাই কুর'আন এ বিষয়ে নীরব। কারণ, ইসলাম সর্বকালের জন্যে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আল-কুর'আনের নীরবতাকে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ অনুমোদন হিসেবেও ব্যাখ্যা করে থাকেন। আল-কুর'আনে গর্ভনিয়ন্ত্রণ যে নিষেধ করা হয়নি তা অনেকটা স্বীকৃত।

আল্ আজহারের গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ জাদেল হক এ সম্পর্কে বলেছেনঃ "আল-কুর'আনের পুংখানুপুংখ পর্যালোচনায় এমন কোন আয়াত পাওয়া যায় না, যাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গর্ভধারণ পরিহার করা নিষিদ্ধ অথবা সন্তানসংখ্যা সীমিত করাও নিষিদ্ধ।"[১১০]

তবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণ মতামত প্রকাশ করেছেন।

পরিবার পরিকল্পনা ও শিশু হত্যা

ওয়াদ বা শিশু হত্যা হারাম নয়; এটা গুনাহে কবীরাহ। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধীগণ এটাকে শিশু হত্যা বলে অবিহিত করে থাকেন।

পরিবার পরিকল্পনার প্রতিপক্ষগণ সাধারণতঃ আযল অথবা গর্ভনিরোধক যে কোন প্রক্রিয়াকে শিশু হত্যা বলে অবিহিত করেন এবং আল-কুর'আনে তা নিষিদ্ধ এ যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন।[১১১]

১১০। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

মূল আরবী পাঠ ঃ

وباستقراءا يات القران يتضح انه لم يزد فيه ما يحرم منع الحمل اولا اخلال من النسل من كلام الشيخ جاد الحق -

১১১। Abu Zahra, Tangim al Nosl, P. 79

তাঁরা উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ দারিদ্র্যর ভয়ে সন্তান হত্যাকারীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"[১১২]

যাঁরা দারিদ্র্যের ভয়ে ভীত তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"দারিদ্র্য ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তান হত্যা করো না। তোমাদেরকে ও তাদেরকে আমি রিযিক দিয়ে থাকি। তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"[১১৩]

শিশু হত্যা অথবা জীবন্ত কবর দেয়া সম্বন্ধেও আল-কুর'আনে নিন্দা করা হয়েছেঃ

واذا الموؤداة سئلت باى ذنب قتلت -

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[১১৪]

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট সহিলাদের বা'আত উপলক্ষে আল-কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

ولا يقتلن اولادهن

যখন মু'মিন নারীগণ আপনার নিকট এসে বা'আত করে এ মর্মে যে, তারা .... "নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না".... তখন তাদের বা'আত গ্রহন করুন।[১১৫]

পরিবার পরিকল্পনার বিরোধীগণ আল-কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতসমূহকে পরিবার পরিকল্পনার পরোক্ষ নিষিদ্ধতা হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। অবশ্য তারা স্বীকার করেন যে, কুর'আনে গর্ভনিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট আয়াত নেই।[১১৬] প্রতিপক্ষগণ তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং তাদের স্বপক্ষে হযরত জুদামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বরাত দিয়ে আযলকে গোপন ওয়াদ বলে উল্লেখ করেন।

১১২। আল-কুর'আন, ৬ঃ১৫১
১১৩। আল-কুর'আন, ১৭ঃ৩১
১১৪। আল-কুর'আন, ৮১ঃ ৮-৯
১১৫। আল-কুর'আন, ৬০ঃ১২

১১৬। Maudoudi, Op. Cit, PP. 138-43

জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বপক্ষদলের মতামত

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে তার কনট্রাসেপশন ব্যবহারকেও সমর্থন করে এবং কনট্রাসেপশন ব্যবহার দ্বারা কোন জীবনকে হত্যা করা হয় তা অস্বীকার করেন। তারা আরো মনে করেন যে, যখন কোন নবজাত শিশুকে হত্যা করা হয় বা শিশুকে জীবন্ত সমধিস্থ করা হয় এবং যখন কোন রমণী গর্ভে সন্তান ধারণ এবং উহা অত্মা প্রাপ্ত হয় তখন যদি এটাকে গর্ভপাত ঘটানো হয়। একাজগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তীব্রভাবে নিন্দনীয়। তাঁরা মনে করে থাকেন যে, গর্ভনিরোধের মাধ্যমে গর্ভধারণ নিরোধ করা হয় এর মধ্যে কোন হত্যাকান্ড হয় না।[১১৭]

তাদের যুক্তির সমর্থনে তাঁরা খলিফা ওমর (রা.) এর সম্মুখে তাঁরই শশুর হযরত আলী (রা.) ইবনে তালিবের ভাষ্য উল্লেখ করে থাকেন। যাতে তিনি বলেছেন যে আযল শিশু হত্যা নয়। তিনি আরো বলেন যে, একটা ভ্রূণ যখন সপ্তম স্তরে পৌঁছে তখন একে নষ্ট করলে, তাকে হত্যা করা বুঝাবে। তিনি তাঁর স্বপক্ষে সূরা মু'মিনূন থেকে উদ্ধৃত করেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান খেকে অতঃপর একে শুক্র বিন্দুরূপে নিরাপদ আধারে স্থাপন করি। পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে (জমাট রক্ত) অতঃপর 'আলাককে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিণত করি অস্তিপিঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপিঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা। অতঃপর একে গড়ে তুলি অন্য সৃষ্টিরূপে। সর্বো স্রষ্ট্রা আল্লাহ কত মহান।[১১৮]

১১৭। প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, ***কুর'আন ও হাদীসের আলোক জন্মনিয়ন্ত্রণ***, গর্ভপাত, বন্ধাত্বকরণ ও গভাশয় ভাড়া খাটানো, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০১১, পৃ.১৩৭
দ্রঃ Sheikh al-Najjar Ruyah, P.30; Shcikh Jadel Haq. Falwa and al-Chayali Ihya, Vol. 2, P.53.

১১৮। আল-কুর'আন, ২৩ঃ১২-১৪

খলিফা ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.) এর প্রশংসা করেন তাঁর ব্যাখ্যার জন্যে। আযল যে, শিশু হত্যা নয়, এসম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হ'তেও একটি ব্যাখ্যা আছে। তিনি নিজেও আযল করতেন। তিনি আল-কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতের উপরে নিজের মত নির্ধারণ করেন।[১১৯] কারণ শুক্রাণু যতক্ষণ না ডিম্বানুর সংস্পর্শে এসে উর্বরতা লাভ করে অর্থাৎ জীবন লাভ করে ততোক্ষণ পর্যন্ত জীবনের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নুতফাহ্ এর স্তর থেকে 'আলাক স্তরে এবং পরে মুগদাহ (পিন্ড) স্তর, মুগদাহ স্তর থেকে পরিণত হয় অস্থি পঞ্জরে, অস্থি পঞ্জর ঢেকে দেয় গোশত দ্বারা। শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিশার পর উর্বরতা লাভ করতে যে স্তরগুলো পার হতে হয় তা অতিক্রম করা না হলে শুক্রাণু কোন সময় এবং কোন অবস্থাতেই একাকী জীবন লাভ করতে পারে না। সেহেতু শুক্রাণু একাকী নষ্ট হলেই কোন জীবন নষ্ট হয়ে গেছে বলে বলা যাবে না। যেমন একটা মোরগ মুরগী যখন মিলিত হয় এবং পরে মুরগী ডিম দেয়, ঐ ডিম তা দেয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় পর ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়, তেমনি স্বারী-স্ত্রী মিলনের পর শুক্রাণু ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এসে উর্বরতা লাভ করে এবং ৪২ দিন অতিবাহিত হবার পর নুতফাহ্ (শুক্রাণু) যখন স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থির হয়; আল্লাহ তা'আলা তাকে আকৃতি দান করেন। তখন একে নষ্ট করলেই বলা যাবে 'ওয়াদ বা শিশু হত্যা।[১২০]

জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ নিম্নবর্ণিত মন্তব্য করে থাকেন।

১. কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ এ হাদীসটিকে জ'ঈফ বা দুর্বল মনে করেছেন।

২. গুপ্ত 'ওয়াদ বা শিশু হত্যা কথাটি তুলনা করা হয়েছে গুপ্ত শির্কের সঙ্গে। মুনাফেকী বা কপটতা হলো গুপ্ত শিরক। যদিও এখানে মুনাফেককে গুপ্ত শিরক বলা হয়েছে কিন্তু তা সত্যিকার অর্থে শিরক নয়।[১২১]

৩. ক্ষদ্র শিশু হত্যা বলেও একটা জিনিস আছে। গুপ্ত শিশু হত্যা আর ক্ষদ্র শিশু হত্যা এ দু'টির মধ্যে ক্ষুদ্র শিশু হত্যা শিশু হত্যার নিকটবর্তী কিন্তু এর কোনটি আয়ল নয়।[১২২]

১১৯। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১২০। প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৩৮

১২১। Al- Ghazali, Ihya, Vol. P. 53

১২২। Cited in al Iraqis, Tarh, Vol. 7, P. 59

৪. হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আয্লকে শিশু হত্যা মনে করেন নি। কোন কোন সাহাবা-এ কেরাম আয্ল করতেন। এটা যদি শিশু হত্যা হতো বা কবিরাহ গুনাহ হতো আল কুর'আনে তা নিষিদ্ধ হতো অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) তা নিষিদ্ধ করতেন।

৫. সাহাবীদের অনুসারী কোন কোন তাবে'ঈগন আয্ল করতেন। তাতে মনে হয় না পরবর্তীতে আয্ল নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা ইমাম ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

৬. যারা পরিবার পরিকল্পনা বিরোধীতা করে থাকেন, তারাও অনেকে বলে থাকেন যে, ব্যক্তিগতভাবে আযল করা যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় নীতি হিসেবে তা প্রচলন করা যায় না, এতেও বুঝা যায় গর্ভনিরোধ শিশু হত্যা নয়।[১২৪]

ত্কদীর (ভাগ্য) রিযিক এবং আল্লাহ্র প্রতি আস্থা তাওয়াক্কুল

যারা পরিবার পরিকল্পনা বিরোধিতা করে থাকেন, তারা উল্লেখ করেন যে, কন্ট্রাসেপ্টিক ব্যবহারে গর্ভনিয়ন্ত্রণ হয় যা ত্কদীর বিরোধী। এতে, সন্তানকে খাদ্য দানে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসের অভাব এবং তাওয়াক্কুলের (আল্লাহ্র উপর আস্থার) অভাব প্রতিফলিত হয়।

তাকদীরঃ পরিবার পরিকল্পনার বিরোধীগণ বলে থাকেন যদি আল্লাহ্ কোন শিশুর জন্ম আল্লাহ নির্ধারণ করে থাকেন;পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে তা প্রতিহত করা যাবে না। কারণ, সবকিছু আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আল কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)

তোমাদের ইচ্ছায় কিছু হবে না, যদি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করেন।"[১২৪]

কুর'আনে আরো বলা হয়েছেঃ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বলুন, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রবৃত্ত কল্যাণই লাভ করতাম, এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না।[১২৫]

১২৩। প্রফেসর আবদেল রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩; প্রফেসর আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১২৪। প্রাগুক্ত

১২৫। আল-কুর'আন, ৮১ঃ ২৯

রিযিকঃ (প্রতিপালন)

Dhaka University Institutional Repository

আল কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"ভূ পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি এদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।"[১২৭]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা জীবিকার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। এ ব্যাপারে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। পাথরের মধ্যে যে প্রাণীটি বাস করে তার খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা যোগিয়ে থাকেন। মায়ের গর্ভে যে সন্তান আসে তার খাদ্যও আল্লাহ যোগান ও যোগাবেন। দারিদ্রের ভয়ে কোন সন্তানকে হত্যা করা মহা পাপ।[১২৮]

তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা)

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা যে, সকল মুসলিমই তার নিজস্ব এবং সন্তানের সর্ব বিষয়ের আল্লাহর নির্ভর করবে।আল কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি, এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।"[১২৯]

কুর'আনের অন্যত্র আরো বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথ করে দেন এবং তাঁকে তাঁর ধারণাতীত উৎস হতে রিয্ক দান করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করবেনই। আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।[১৩০] পরিবার পরিকল্পনা যারা সমর্থন করেন, মুসলিম হিসেবে তাদেরকে অবশ্যই তাক্দীর-এ বিশ্বাস করতে হয়, জীবিকা 'রিযিক' প্রদানে আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। সাথে সাথে তারা এও মনে করেন যে, "আল আখজ বিল আসবাব" অর্থাৎ নিজের জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্যে চেষ্টা করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

১২৬। আল- কুর'আন, ৭ ;১৮৮

১২৭। আল-কুর'আন , ১১ঃ৬

১২৮। Jadel Haq, Op. Cit and Al-Nazzar, Op. Cit, PP. 28 আবদেল রহিম প্রাগুক্ত,পৃ.১২৬ মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪০

১২৯। আল-কুর'আন, ৬০ঃ ৪
আল্লাহ্ তা'আয়ালা তাঁর নবী (সা.) কে বলেন ঃ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"যখন তুমি সংকল্প করো আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। [১৩১]

হযরত ওমর (রা.) এর মতে, আল্লাহর উপর নির্ভর করার অর্থ হলো পৃথিবীতে শস্যের বীজ বপন করা। তারপর ভাল শস্যের জন্যে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে, কণ্ট্রাসেপশনের ফলাফলও আল্লাহর উপর নির্ভর করে। কণ্ট্রাসেশপনের ফলাফল সফলও হতে পারে আবার ব্যর্থও হতে পারে। কণ্ট্রাসেপটিক ব্যবহার করলেই যে সন্তান হবে না, এটা সত্য নয়, কারণ যারা কণ্ট্রাসেপশন ব্যবহার করে তাদেরও সন্তান হয়ে থাকে।

এখানে হযরত ওমর (রা.)-এর সিরিয়া সীমান্তের যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিদর্শনের ঘটনাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন সিরিয়া পথে ছিলেন। তখন তাঁকে তখনকার মহামারীরুপে আবিভূর্ত 'প্লেগ' রোগের কথা শুনানো হলো। তিনি প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনে জাররা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ওমর! তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য হতে পলায়ন করছো ! হযরত ওমর (রা.) জবাব দিয়েছিলেন আল্লাহর নির্দেশেই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

আরো একটি উদাহরণ দেয়া হয় সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে বন্যা প্রতিহত করার জন্যে বাঁধ নির্মাণ করা, জলপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ করা অথবা অন্য দিকে খাল কেটে দেয়া কি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী? এতে কি মনে হবে যে মানুষকে রক্ষার জন্যে আল্লাহর ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।[১৩২]

তিরমিযি, বাইহাকী ও তিবরানী শরীফে উল্লেখ রয়েছে- কোন এক ব্যক্তি তাঁর উট ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, উটটির জন্যে তিনি আল্লাহর নিকট তাওয়াক্কুল করেন। প্রত্যুত্তরে আল্লাহর নবী (সা.) বলেছিলেনঃ اعلقها وتوكل। "উটকে ভাল করে বাঁধ, তারপর আল্লাহর উপর নির্ভর কর।"[১৩৩]

১৩০। আল-কুর'আন, ৬৫:২-৩

১৩১। আল-কুরআন, ৩:১৫৯

১৩২। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭ ; প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, পৃ. ১৪২, (Madkur Nayral, PP,94-5)

১৩৩। প্রাগুক্ত

তারা হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা এবং খাদ্য শস্যের অভাব ও দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করনে ৭ বছরের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে থাকেন। তিনি যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্যে ৭ বছরের পরিকল্পনা করেছিলেন তা কি তাওয়াক্কুল বিরোধী বা আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অভাব ছিল। নবীদের সকল কর্মই তো আল্লাহর নির্দেশিত।

ইসলাম অলসতা ও অসহায়তার উৎসাহ দেয় না। কর্মবিমূখতা ও আল্লাহর তাওয়াক্কুল এক নয়। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে থাকা সত্যিকার তাওয়াক্কুল নয়। এতে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় এবং অধঃপতন হতে থাকবে। [১৩৪]

সূরা হুদ -এর ৬ নম্বর আয়াত অর্থাৎ সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর সম্পর্কে তাফসীরে মানার -এ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা পরিবার পরিকল্পনার সমর্থনকারীগণ উল্লেখ করে থাকেন। আল মানার-এর ভাষ্য নিম্নরূপ, উক্ত আয়াতটির অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ অর্থে যে, তারা চেষ্টা করুক আর না করুক তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করবেনই। উক্ত আয়াতের মমার্থ হলো এই যে, সকল প্রাণীর জীবিকার উপকরণ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে জীবিকা আহরণের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়েছেন। যারা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও মেধা ব্যবহার করে চেষ্টা করবে তাঁরা অবশ্যই তা পাবে। [১৩৫]

সূরা ত্বা -হা -এর ৫০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) বললেন, "তিনি তোমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে তার প্রকৃতি আরোপ করেছেন এবং অতঃপর পথ নিদের্শ করেছেন।[১৩৬] এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মানারে বলা হয়েছে, কতিপয় কবি এবং তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা উপরোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ সমস্ত ব্যক্তির ধারণা শ্রম ও অলস্য একই জিনিস। এরা কর্মবিমুখতা এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে কোন পাথর্ক্য দেখতে পায় না। তাঁদের মতে সঠিক পথ হল আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং তাদের জন্যে সবকিছু আল্লাহ তা'আলা করে দেবেন এ বিশ্বাস রেখে চুপচাপ বসে থাকা। আরবী কবির ভাষায় তার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছেঃ

১৩৪। প্রাগুক্ত

১৩৫। প্রাগুক্ত

১৩৬। আল-কুর'আন, ২০:৫০

جرى القلم القضاءبما يكون - فسيان التحرك والسكون

جنون منك ان تسعى لرزق – ويرزق في عشاوته الجنين-

" যা কিছু ঘটবে তাতো আল্লাহর কলমে লেখা হয়ে গেছে, কাজ করে খেটে মরা আর বুদ্দিমানের মত আল্লাহর উপর নির্ভর করা তো একই । জীবিকার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করা পাগলামী ছাড়া আর কি হতে পারে। গর্ভাশয়ে গভীর আচছন্ন ভ্রুনকেও তো আল্লাহ রিয্ক দিয়ে থাকেন। "[১৩৭] এ ধরণের ব্যাখ্যা চরম ভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

সন্তানের জন্মদান ও সন্তানের গুরুত্ব

সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৮] সূরা কাহাফে বলা হয়েছেঃ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"ধন ঔশ্বর্য্য সন্তান সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।"[১৩৯]

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

"যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন সব স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা আমাদের জন্যে নয়ন প্রীতিকর। "[১৪০] হযরত যাকারিয়া (আ.)আল্লাহর নিকট মোনাযাত করে বলেনঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْك ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

" হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি সৎবংশধর দান কর। " [১৪১]

পরিবার পরিকল্পনাকারী সমর্থনকারীগণ অবশ্যই স্বীকার করেন যে, মানব জাতির টিকে থাকার জন্যে সন্তান-সন্ততি প্রয়োজন এবং পিতা-মাতার নিকট সন্তান-সন্ততি সবচেয়ে নয়নপ্রীতিকর ও মূল্যবান সম্পদ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সন্তান -সন্ততির সংখ্যা হবে এত বেশী যাদেরকে প্রতিপালণ করা কষ্টকর হবে এবং তাদের ঈমান আখলাক সম্পন্ধে পিতা মাতা যথাযথ মনোযোগ ও গুরুত্ব দিতে পারবে না। সন্তান- সন্ততিকে অবশ্যই ভাল মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১৩৭। Tafsir Al Marar, Vol. 12, P.13
১৩৮। Aboel Wahid, Al-Usra, PP. 82
১৩৯। আল-কুর'আন, ১৮:৪৬
১৪০। আল-কুর'আন, ২৫:৭৪
১৪১। আল-কুর'আন, ৩:৩৮

ইসলামের এ শিক্ষা নয় যে, সৎজীবন যাপনের দিকে আমরা লক্ষ্য করব না বরং সন্তন-সন্ততির বৃদ্ধির দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করব। বেশী সন্তান হওয়ার কারণে যদি কারো

অসৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে এবং আমল আখলাক খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তবে, এ রূপ অবস্থায় দ্বীনদার জিন্দেগী অধিকতর গুরুত্ব পাবে।[১৪২]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

এ আয়াতটিতে সন্তান-সন্ততি, ধন- ঐশ্বয্য এবং নেক আমলের পারস্পারিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট। ধন- ঐশ্বয্য ও সন্তান-সন্ততি ভাল কিন্তু আল্লাহ্র নিকট থেকে পুরস্কার পাবার জন্যে নেক আমলই শ্রেষ্ঠতর। মানুষের কামনা বাসনা থাকবে ধন ঐশ্বয্য ও নেক আমলের জন্যে। তবে, আকাংখিত বস্তু হিসাবে নেক আমলই উৎকৃষ্ট। এ আয়াতে এটা স্পষ্ট যে, নেক আমলকেই মানব জীবনে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের সন্তান সন্ততি ও ধন সম্পদ আল্লাহকে খুশী করতে পারে কিন্তু তাকওয়া এবং নেক আমলই আল্লাহকে বেশী খুশী করবে। সূরা সাবাতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا

"এটা নয় যে, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকট করবে বরং ঈমান এবং নেক আমলই, যার জন্যে তারা পাবে বহুগুণ পুরস্কার।"[১৪৪]

সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"জেনে রাখ, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে পরীক্ষা এবং ফেতনার কারণ। আল্লাহ্র নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।"[১৪৫]

১৪২। Al- Sharabassi, Al din, PP. 123-4
১৪৩। আল-কুর'আন, ১৮:৪৬
১৪৪। আল-কুর'আন, ৩৪:৩৭
১৪৫। আল-কুর'আন, ৮:২৮

হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা করেছিলেন, কিন্তু তা'হল নেককার সুসন্তান; যে কোন সন্তান নয়। আল্লাহ মানুষকে সন্তান কামনা করতে করতে শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু নেককার সন্তানই কামনা করতে বলেছেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেছিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Dhaka University Institutional Repository

হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দান কর সালেহ বা নেককার সুসন্তান। ”[১৪৬]

ইমরানের স্ত্রী- হান্না আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করেছিলেন, তাঁর কন্যা মরিয়ম সম্পর্কে ঃ

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“ আমি আমার সন্তানের নাম মরিয়ম রেখেছি। অভিশপ্ত শয়তান হতে তাঁর জন্যে এবং তাঁর বংশধরদের জন্যে আশ্রয় কামনা করছি। ”[১৪৭]

যখন জীবন যাত্রা এত কঠিন ছিল না, মানুষের জীবনের চাহিদা এত বেশী ছিল না, বরং সে সময়ে আল্লাহ্র নবী যাকারিয়া (আ.) এবং ঈসা (আ.) এর নানী সুসন্তান কামনা করে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেছিলেন। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দিতে নিজের সন্তানদেরকে এ অনইসলামিক পরিবেশে নেক সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা কঠিন। এ যুগে এমন সন্তান পাওয়া কঠিন যারা হবে নেককার পিতা-মাতার নয়ন প্রীতিকর, সমাজের শোভা আল্লাহর দ্বীনের নিবেদিত প্রাণ। সন্তানের যা প্রাপ্য তা প্রদান করা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব আদায় করা পিতা-মাতার পক্ষে কঠিন। সমস্যাটি আরও কঠিন ও জটিল হয় যদি পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বেশী হয়।

বিবাহ ও সন্তান জন্মদান

পরিবার পরিকল্পনার বিরোধীগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রজনন বা সন্তানদানই বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য [১৪৮] কোন মেয়ের সাথে কোন পুরুষের বিবাহ হলেই তাদের মিলনে সন্তান জন্ম হবে অর্থাৎ মাটিতে শস্যদানা রোপন করলেই চারা বের হবে, এতো সৃষ্টির ধর্ম। তাই তারা কুর'আন থেকে উদ্ধৃতি দেনঃ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

“ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।”[১৪৯]

১৪৬। আল-কুর'আন, ৩৭:১০০

১৪৭। আল-কুর'আন, ৩:৩৬

১৪৮। Abu Zahra, Tanzim-al-Usra, PP. 103-104

১৪৯। আল-কুর'আন, ১৬:৭২

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“তোমাদের পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান -সন্ততি দান করেছিলাম। “[১৫০]

আল-কুর'আনে স্ত্রীদের শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে। তা' দ্বারা অনেকে বুঝাতে চান যে, শস্যক্ষেত্র যদি থাকে, তা চাষাবাদ করতে হবে এবং শস্য উৎপাদন করতে হবে। আয়াতটি হল নিম্নরূপঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

."তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।" [১৫১]

উল্লেখিত আয়াতগুলো সম্পর্কে কারো কোন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা উচিত নয়, তবে বুঝার মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং ব্যাখ্যার মধ্যেও আছে। অনেক ক্ষেত্রে একটি আয়াত বুঝার জন্যে সামাঞ্জস্যশীল আয়াতের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) এর এ সম্বন্ধে অভিমত কি ছিল তাও লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রজনন বা সন্তান জন্মদানই বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় এবং তা হতে পারে না, [১৫২] আল কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

" আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনী যাদের মধ্যে তোমরা পাও শান্তি । তিনি তোমাদের পারস্পারিক ভালবাসা ও রহমত সৃষ্টি করেছেন। "[১৫৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, স্ত্রীগণ পুরুষের শস্যক্ষেত্র। কথা ধ্রুব সত্য। এখন শস্য ক্ষেত্র যদি চাষ না করা হয় তবে অনাবাদি থাকবে, অনুর্বর অবস্থায় ধবংস প্রাপ্ত হবে। ইবনে আব্বাস ও তাঁর সাথীগণ ভূমি কর্ষণ বলতে মনে করেন, তোমার ভূমিতে তুমি পানি দিতে পার এবং ইচ্ছা করলে তোমার ভূমিকে তৃষ্ণার্ত বা অনাবাদি রাখতে পার। কতক সাথী এটাকে সরাসরি এটা আয্ল বলে উল্লেখ করেন।

১৫০। আল-কুর'আন, ১৩:৩৮
১৫১। আল-কুর'আন, ২:২২৩
১৫২। Al- Najjar, Op. Cit, PP. 9.10
১৫৩। আল-কুর'আন, ৩০:২১

সা'ঈদ ইবনে আল মোছায়েব এর অনাবাদি রাখতে পার অর্থাৎ তাদের সাথে আয্ল প্রাকটিস করতে পার এবং নাও করতে পার। তা তোমাদের ইচ্ছা। তবে একথা সত্য, ভূমি ভালভাবে কর্ষণ করলে ভাল ফসল উৎপন্ন হবে। আর যদি ভূমি ভালভাবে কর্ষণ না করা হয় তবে খিলা থাকবে কোন ফসল হবে না। অনুর্বর ভূমি সর্বদা অনুবর্রই থাকে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরোধীগণ

সন্তান -সন্ততিকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলে মনে করেন। ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ন সন্তান চাওয়া উত্তম কাজ। তবে সন্তান ধারণ বন্ধ করা বা বন্ধ রাখা আল্লাহ্‌র আইনের বরখেলাপ। আল্লাহ্‌র নিয়ামত চাইলে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে এটাই তো উচিত। জন্মনিরোধের ব্যাপারে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) বলেন, প্রকৃতির সাথে যারা এ ধরণের ধোঁকাবাজি করে, প্রকৃতি কি তাদেরকে কোন সাঁজা না দিয়েই ছেড়ে দেয় অথবা কোন সাঁজা দিয়ে থাকে? কুর'আন মজিদ বলে যে, এদের অবশ্যই সাঁজা দেয়া হয় এবং সে সাঁজা হচ্ছে এই যে, এ ধরণের কাজে যারা লিপ্ত হয়, তারা লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [১৫৫]

তিনি কুর'আনের উদ্ধৃতি দেনঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

" যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানের হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গন্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপদগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না।"[১৫৬] পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ মনে করেন পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মাওলানা মওদুদীর এ আয়াতটির ব্যবহার বস্তুনিষ্ঠ নয়। এক একটি শুক্রকীট নষ্ট করা যদি এক একটি সন্তান হত্যা করার ন্যায় মনে করা হয় তা'হলে বলতে হবে একজন পুরুষ কোটি কোটি সন্তান হত্যা করার জন্য দায়ী। একবার বীর্যপাতের মধ্যে বহুশত কোটি শুক্রকীট থাকে।[১৫৭]

১৫৪। প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৭ ; আবদেল রহিম উমরান , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

১৫৫। সাইয়েদ আবদুল আলা মওদুদী, ***ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ***, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী , ২০০৪, পৃ. ৬০

১৫৬। আল-কুর'আন, পৃ. ৭.১৪০

১৫৭। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বপক্ষদলের প্রামাণিক তথ্য (দুটি সন্তান জন্মের ব্যবধান)

সন্তানকে স্তন্যদান সম্পর্কীয় আল কুর'আনে উল্লেখিত-আয়াতসমূহকে কেহ কেহ দু'টি সন্তান জন্মের মধ্যে সংগত পরিমাণ বিরতি স্বপক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। [১৫৮]

আল-কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

" জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে দু'বছর স্তন্যপান করাবে, যদি তারা দুধপানের সময়সীমা পূরণ করতে চায়। "[১৫৯]

অন্য আয়াতে সন্তানের পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করার ব্যাপারে উদ্ধৃতি আছে ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

" জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দু'বছর পর। "[১৬০]

এ প্রসঙ্গে কুর'আনে অন্যত্র উদ্ধৃতি আছে ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"তার (সন্তানের) জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে তাকে গর্ভ ধারণ করতে এবং স্তন্য ছাড়াও সময় লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। " [১৬১]

উপরোক্ত তিনটি আয়াত নির্দেশ করে যে, এক সন্তান জন্মদানের পর আরেক সন্তান জন্মগ্রহন করার মধ্যবর্তী সময়কাল ২৪ মাস। এ সময়ের মধ্যে কোন মাকে সন্তান গ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কারণ মা কষ্ট পাবে, অন্য দিকে কোলের সন্তানও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে শিশুর স্তন্যপান কালে গর্ভধারণ নিরুৎসাহিত করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (সা.) স্তন্যদানকালে মহিলাদের গর্ভবর্তী হওয়া সম্পর্কে সর্তক করে দিয়েছেন এবং এটাকে বলেছেন, আল- গায়েল, খায়লাহ অথবা গেয়াল ইত্যাদি যার অর্থ হলো শিশুর প্রতি আঘাত। [১৬২]

১৫৮। Shaltour Fatwa, 1959

১৫৯। আল-কুর'আন, ২: ২৩৩

১৬০। আল-কুর'আন, ৩১:১৪

১৬১। আল-কুর'আন, ৪৫: ১৫

১৬২। আবদেল রহিম উমরান , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩; মুহাম্মদ আবদেল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

এখন প্রশ্ন হলো একটি শিশুর জন্মের পর কিভাবে দু'বছর পযর্ন্ত গর্ভধারণ পরিহার করা যায়। তা সম্ভব হতে পারে যদিও স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জন্যেই কষ্টদায়ক। স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে তার জন্যে তা কষ্টদায়ক নাও হতে পারে, কিন্তু এক স্ত্রীর জন্যে তা ক্লেষকর। সে কারণে স্বামী - স্ত্রী আযলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতো অথবা বনজ ঔষধ সেবন করত, বর্তমানে উদ্ভাবিত কন্ট্রাশেপশণ, পিল ও কনডম ব্যবহার গর্ভধারণ রোধ করা সম্ভব। উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে মনে হয় যে, দু'টি সন্তান জন্মের মধ্যে বিরতিদান আল কুর'আনে সমর্থিত। আল

আজহারের প্রাক্তন গ্র্যান্ড ইমাম শায়খ সালতুতের ধারণাও তাই। তিনি তাঁর ১৯৫৯ সনের ফতোয়ায় বলেছেনঃ " পরিবার পরিকল্পনা শিশুকে স্তন্যদানের দৃষ্টিভংগী হতে প্রকৃতির সাথে অসামাঞ্জস্যশীল নয় এবং এটা - বিবেক বিরুধীও নয়। আল-কুর'আনে স্তন্যদানের সময় কাল দু'বছর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নবী (সা.) শিশুকে গর্ভবর্তী মায়ের দুগ্ধপান করাতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শিশুর স্তন্য পানকালে এমন কিছু পদক্ষেপ নেয়া যায় যাতে গর্ভধারণ না হয়।" [১৬৩]

সন্তানের সংখ্যাধিক্যতা

অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন যে, মুসলিম সংখ্যা গরিষ্টতা আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর নিকট পছন্দনীয়। ঈমানদার মানুষ বে'দ্বীনদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হবে এটা ভাল কথা। যে কোন ধর্মপ্রাণ লোক তা চাবে । এ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনাকাংখিত, সংখ্যা গরিষ্টতার সমর্থনে কুর'আনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হয়। পরিবার পরিকল্পনার বিরোধীগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তা কেহ কেহ করতে পারেন, কিন্তু জাতীয় নীতি হিসেবে সরকারীভাবে এটা উৎসাহিত করা ঠিক নয়। তাঁদের আরো বিশ্বাস যে পরিবার পরিকল্পনার উৎস হলো প্রাশ্চাত্য মুসলমানদের দুশমনরা। তারা চায় যে, মুসলমানরা সংখ্যায় কম থাকুক এবং তাদের সংখ্যা বেশী থাকুক। তারা আরো মনে করেন জনসংখ্যা বেশী হলে দেশের উন্নতি বেশী হবে, উৎপাদন বেশী হবে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হবে। তাঁদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা কষ্টকর। [১৬৪]

১৬৩। প্রাগুক্ত , পৃ. ১৩৩, মূল আরবী পাঠঃ

والتنظيم بهذا المعنى لايجافى الطبيعه ولا ياباه الوعى القوى ولا تمنعد الشريعة ان لم تكن تطلبه وتحت عليه فقد حدد القران مدة الرضاع بحولين كاملين وحذر الرسول صلوات الله عليه ان يرضيع الطفل من لبن الحامل -

১৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪ : Al- Kholi, Tahdi in Mondar al Islam, 1965

পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকদের রয়েছে ভিন্নতর যুক্তি।

তারা মনে করেন মুসলমানদের শক্তি, সামর্থ ও ভবিষ্যৎ নিহিত আছে তাদের নিছক সংখ্যাগরিষ্টতার মধ্যে নয় বরং গুণগতমান ধর্মীয় চেতনা এবং সংগতির উপর। তারা বিশ্বাস করেন না যে, এ দুনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কমনয়। তারা মনে করেন যে বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে যা বেশী প্রয়োজন তা হলে মুসলিমদের মধ্যে অধিকতর পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সংহতি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাতিক উন্নতির দলে বিশ্ব

মুসলিম তাঁর নিজস্ব মর্যাদা ফিরে পেতে পারে। তাদের মতে, অধিকাংশ মুসলিম দেশে জনসংখ্যা স্ফীতি সার্বিক অগ্রগতির অন্তরায়।

মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর শাসনকালের ১ম ১০ বছর জনসংখ্যারোধ কার্যক্রমের বিরোধী ছিলেন। পরে যখন তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি ঘোষণা করলেন,

"জনসংখ্যা বৃদ্ধি মিশরীয় জনগণের অগ্রগতির সবচেয়ে বেশী-অন্তরায়। জনস্ফীতির ফলেই জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা যাচ্ছে না। জনসংখ্যার কারণেই কার্যকর এবং উন্নত পন্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।" [১৬৫]

নিম্নে জনসংখ্যা স্ফীতির সমর্থক এবং পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকদের ভিন্নমুখী অভিমতসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকদের অভিমত

১. মানুষ আল্লাহর খলীফা ঃ জনসংখ্যা স্ফীতির সমর্থকগণ মানব সৃষ্টির আদিকথা এবং এপৃথিবীতে খলিফা হিসেবে তাঁর মিশন।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা সৃষ্টি করছি"। [১৬৬]

মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য স্বরণ করে দেয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে পৃথিবী আবাদ করতে এবং এর উন্নয়ন করতেঃ

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং এতেই তিনি তোমাদেরকে লালন - পালন করছেন। [১৬৭]

১৬৫। President Nasser, National Charter in Speeches, P. 335; আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

১৬৬। আল-কুর'আন , ২ :৩

১৬৭। আল-কুর'আন, ১১ : ৬১

এ পৃথিবী আবাদ করার জন্যে এবং তাকে উন্নত করার জন্যে মানুষকে বলা হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

'হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তাঁদের থেকে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।" [১৬৮]

এতে দেখা যায় ঘরকে সাজালে ঘরের শ্রীবৃদ্ধি পায় সেরূপ পরিবারে যদি সন্তান-সন্ততি বেশী থাকে তাহলে পরিবারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সংসারের উন্নতি হয়।

২. সন্তান জন্মদান: জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রজনন স্রষ্টার লক্ষ্য, তা ’ সম্ভব হয় বিবাহের মাধ্যমে। প্রজননই হলো বিবাহের লক্ষ্য। আল কুর’আনে বলা হয়েছেঃ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

“ আল্লাহ তা’আলা তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। [১৬৯]

আল্লাহ তা’আলা রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান - সন্ততি দিয়েছিলাম। [১৭০]

শো’য়াইবের কাওমে লোক সংখ্যা ছিল স্বল্প। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হযরত শো’য়াইব মনে করতেন এটা ছিল তাঁর কাওমের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর না-হতো তাহলে এটা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্যে আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হতো না। হযরত শোয়াইব তাঁর কাওমকে বলেছেনঃ

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ.

“স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যা কম ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। [১৭১]

সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করা ছাড়াও সন্তান - সন্ততি আনন্দের উৎসঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

“যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্যে হবে নয়ন প্রীতিকর”। [১৭২]

১৬৮। আল-কুর’আন, ৪:১
১৬৯। আল-কুর’আন, ১৬:৭২
১৭০। আল-কুর’আন, ১৩:৩৮
১৭১। আল-কুর’আন, ৭:৮৬
১৭২। আল-কুর’আন, ২৫:৭৪

৩. অধিক সন্তানদানকারী স্ত্রী- পছন্দনীয়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ বলেন, যে আল্লাহর রাসূল (সা.) ঐ সকল নারীদেরকে পছন্দ করতেন যাদের সন্তান সংখ্যা ছিল বেশী তাদের থেকে যাদের সন্তান সংখ্যা ছিল কম। তারা নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে থাকেনঃ

"এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে এমন নারী সম্পর্কে বললেন যিনি সম্পদশালী এবং সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। কিন্তু সন্তান উৎপাদন সম্ভবনাহীন। তিনি (রাসূল স.) কে বললেন, আমার কি তাকে বিয়ে করা উচিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) সম্মত হলেন না। সাহাবী আরো দু' বার এলেন কিন্তু রাসূল (সা.) এর নিকট একই জবাব পেলেন। তৃতীয়বার রাসূল (সা.) বললেন। একজন দানমীল সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্না নারী বিয়ে করবে। আমি অন্যান্য কওমের সম্মুখে তোমাদেরকে প্রদর্শণ করবো"। [১৭৩]

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেনঃ

ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير

" আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞাত শক্তিমান। "[১৭৪]

৪. শস্য ক্ষেত্র হিসাবে স্ত্রী

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ কুর'আনে ঐ আয়াতের উল্লেখ করে থাকেন, যাতে বলা হয়েছে স্ত্রী শস্যক্ষেত্র। স্ত্রী যদি শস্যক্ষেত্র হয় তবে তাতে চাষাবাদ করতে হবে, আবাদে রাখতে হবে তথা সন্তান উৎপাদন করতে হবে। গর্ভনিরোধ হলে এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং কুর'আনের আইনকে অসম্মান ও বিরোধিতা করা হবে। যারা বহু সন্তান- সন্ততির সমর্থক তারা এ ব্যাখ্যাকে বিবাহের আদিম নিয়ম বলে মনে করেন যে, রাসূল (সা.) যেন তার জাতির সংখ্যার আধিক্যতা অন্য জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

১৭৩। হাদীসটির মূল আরবী পাঠঃ

من حديث عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول لله عليه و سلم فقال : يا رسول لله أمبت امراة ذات حسب و منصب و جمال الا انها لا قلة . افتزوجها ؟ ثم اتاه الثانية فهناه ثم اتاه الثالثة فقال : تزوجوا الودود الودود فاني مباه بكم لامم (رواه ابوداؤد والنسائ)

১৭৪। আল-কুর'আন, ২৬: ৫০

৫. অধিক জনসংখ্যা ক্ষমতা এবং উন্নয়নের উৎস

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ বলে থাকেন যে, প্রত্যেক জাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমর্থন করে থাকেন। বিভিন্ন পেশার জন্যে জনবল দরকার সামরিক শক্তির জন্যে বৃহৎ জনসমষ্টি প্রয়োজন। সামাজিক অধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জনসংখ্যা বেশী হলে দেশে মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটবে, দার্শনিক, পণ্ডিত, গবেষক, বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যার ভিত্তি যত প্রশস্ত হবে, প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের প্রাপ্যতাও ততোধিক হবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থকগণ মনে করেন যে, মুসলিম বিশ্ব অতি বিরাট। বর্তমানে যে জনসংখ্যা আছে,তার থেকে কয়েকগুণ বেশী জনসমষ্টির স্থান এখানে সংকুলান হবে। মুসলিম বিশ্বে রয়েছে প্রচুর খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ। এ সম্পদের উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না। মুসলিম দেশ সমূহের মাটির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আছে প্রভূত ঔশ্বর্য্য। এই ঔশ্বর্য্য আবিষ্কারের জন্যে প্রয়োজন অনেক বেশী হাত, অনেক বেশী মেধা ও প্রতিভা। তাছাড়া মুসলিম দেশসমুহের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো তৌহিদী জনতা। [১৭৫]

৬. জন্মনিয়ন্ত্রণ ইসলামের বিরোদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ মনে করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রনের ধারণা মুসলমানদের বিরোদ্ধে তাদের দুশমনদের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তারা চায় না-মুসলিম দেশসমূহে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোক। 'শায়খ আল বাহাঈ আল খুলী' বিশ্বাস করেন যে, জনসংখ্যা সীমিত করা নয় বরং; মুসলিম দেশ সমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো বাড়ানো উচিত। [১৭৬] শায়খ আবূ হাজরা বিশ্বাস করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা ইসলামের বিরোদ্ধে দুশমনদের একটি খৃণ্য ষড়যন্ত্র। [১৭৭]

৮. বিশ্বে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হওয়ার আশংকা

জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধীদের মতে মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা মাটির নিচে যে, গুপ্ত সম্পদ, অর্থ-সম্পদ ও বসবাসযোগ্য জমি দান করেছেন তা ভালভাবে ব্যবহার করলে আদি থেকে অন্ত পযর্ন্ত চলতে পারবে, তাতে কোন সমস্যা হবে না। ইহা সত্ত্বেও যদি তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ম্যান পাওয়ার কমিয়ে দেয় তাহলে একসময় দেখা যাবে যে, তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিহীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়ে পড়বে এবং দুর্বলভেবে সবাই তাদের উপর কতৃর্ত্ব আরোপ করবে। মুসলমানদের এ ভুল কোনক্রমেই করা উচিত নয়। [১৭৮] মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

১৭৫। আবদুল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
১৭৬। Al-Kholi, OP. Cit
১৭৭। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
১৭৮। প্রাগুক্ত

"হে নবী! মু'মিনদেরকে সংগ্রামের জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের কুড়িজন যদি ধৈর্য্যশীল থাকেন তারা দু'শত জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে ২০০জন থাকলে ২০০০জন কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।"[১৭৯]

৮. ওয়াদ বা শিশুহত্যা এবং রিযকের প্রশ্নে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ই মানুষের লালন-পালনকারী ও প্রতিপালক। তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের রিযিকের ব্যবস্থা তিনি করবেন। যারা সন্তান প্রতিপালনের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন, আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা কম। আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়ার বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন করে দেয়। কুর'আন মাজীদে সন্তান হত্যা নিষেধ করে যে, সব আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভিত্তিই হচ্ছে একথার ওপরঃ

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

" আমি তাদের রিযিক দেব, তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি।" [১৮০]

৯. সুন্নাহ হতে অতিরিক্ত যুক্তি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমথর্কগণ তাদের যুক্তির সমর্থনে আলোচিত আয়াতগুলোর পাশাপাশি কতিপয় হাদীসকে প্রত্যক্ষ অনুমোদনকারী সাবস্ত করেন। কতকগুলো হাদীস অবশ্য দুর্বল বা জ'ঈফ। শায়খ আবু জাহরা (মৃত. ১৯৭৩) দাবী করেন যে, দুর্বল হাদীস একটি আর একটি হাদীসকে মজবুত করে যদি তা একই বিষয়ে হয়। [১৮১]

উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর নবী (সা.) এর উক্তি ঃ

" বিয়ে করো এবং সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি কর। অন্যান্য কাওমের সম্মুখে হাশরের দিন আমি তোমাদেরকে প্রদর্শন করবো।" [১৮২]

অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় আছে, " আল্লাহ্ রাসূল (সা.) আনাস ইবনে মালিক (রা.) এর জন্যে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেছিলেন তার সম্পদ ও সন্তান- সন্ততির জন্যে। " আল্লাহর নবী এমন কোন বিষয়ে কোন সাহাবীর জন্যে দু'আ করতে পারেন না যে বিষয়টি পছন্দনীয় নয় বরং মন্দ। আল্লাহর নবী দু'আই বেশী সংখ্যক সন্তানের পছন্দতা প্রমাণ করে।

১৭৯। আল-কুর'আন, ৮:৬৫

১৮০। আল-কুর'আন, ১৭:৩১

১৮১। Abu Zahra, Tanzim al-Uarah, op.cit, P.103-104

১৮২। হাদীসটি মূল আরবী পাঠঃ

تناكح تكثروا (وفي روايه تناكح تناسلوا تكثروا) فانى مباه بكم لامم يوم القياسة رواه ابن مرديه فى تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعفه العراقى رواه كذلك عبد الرزاق مصنفه من حديث ابن ابي هلال مرسلا بسند ضعفه الزبيدي كذلك (رواه ابو داؤد)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-এর দু'আ অবশ্যই উত্তম কাজ এবং এর মাধ্যমে অন্য কাওমের মুসলিমদের মর্যাদা মুচিত হবে। [১৮৩]

পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকদের প্রত্যুত্তর

পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকদের সকল যুক্তির মুখোমুখি হতে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। বিশেষ করে যদি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভীতিপ্রদ হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে বিপুল পরিমাণ মুসলিম জনসংখ্যা বিদ্যমান কিন্তু তারা অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতার শিকার, ঋণগ্রস্ত, দারিদ্র প্রীরিত, অনগ্রসর। তারা বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের করুনা ও কৃপার পাত্র। এ ধরণের মুসলিম জনতা কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের কি সন্তোষের কারণ হতে পারে? পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে, দ্রুত মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যা বয়ে আনবে দুঃখ, দারিদ্র্য, গ্লানি এবং কলংক।[১৮৪] জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থকগণ যে ৯টি যুক্তির অবতারণা করেছেন পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণও উক্ত ৯টি বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে থাকেন।

১. পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর খলীফা হিসেবে আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে আল-কুর'আনে যা বলা হয়েছে এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। তবে তারা মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে আরো যে উদ্দেশ্য ছিল তা উল্লেখ করে থাকেন। এটা সত্য যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দুনিয়া আবাদ করা এবং এ পৃথিবী সুন্দর করে গড়ে তোলা। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির তার চেয়ে আরো একটি বড় উদ্দেশ্য আছে এ মহৎ উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। শুধু ইবাদত নয়, যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করা উচিত সেভাবে ইবাদত করা । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমার ইবাদত - করবে।"[১৮৫]

১৮৩। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; মুহাম্মদ আবদুল হক প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১৮৪। Al-Makki al-Nasiri, Rabat Procecding, Vol. 2 P.67

১৮৫। আল-কুর'আন, ৫১:৫৬

উপরোক্ত আয়াতটি আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। শুধুমাত্র দুনিয়া আবাদ করার জন্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। দুনিয়া আবাদ করার জন্যে আল্লাহ বহু জন্তু, জানোয়ার, গাছ পালা সৃষ্টি করেছেন। তারা নিজস্ব প্রবৃত্তি অনুসারে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। মানুষ অন্য হতে ভিন্নতর। তাদেরকে স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে মানুষকে সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধি বৃত্তিগত এবং অধ্যাতিকভাবে উন্নত ও উপযুক্ত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারো কোন দ্বিমত বা বিতর্ক তখনও ছিল না। আজও নেই। বিভিন্ন রোগ-মহামারী, মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পেত। আজও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু, কি মানের মুসলিম জনসংখ্যা?

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল কিন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীন দুর্বল হয়ে গেল, আল্লাহর বাণী প্রচারিত হলো না এবং আল্লাহর দ্বীন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হলো না এবং যারা তা করতে পারবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো না। অথচ এমন মুসলিম সংখ্যা স্ফীত হলো যাদের অমুসলিমদের অবজ্ঞা, কৃপা, করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে হলো এই যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরণ হয়, তবে আমাদের ধারণার কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। ঘন জনবসতিপূর্ণ বহুদেশ আছে। কিন্তু, তারা তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম সম্মত উপায়ে গড়ে তুলতে পারছে না। বে দ্বীনের মধ্যে দ্বীন প্রচারের যোগ্যতা তাদের নেই। বরং নিজেরাই ঈমান-আকীদাহ হারিয়ে মুশরিক, কাফিরদের আদর্শ তাহাযীব-তামাদ্দুন গ্রহণ করছে, তাদের পিছনে কাতারবদ্ধ হচ্ছে । তাদেরই এজেন্ডা বাস্তবায়নদের বিরোদ্ধে নিজেদের জন্মভূমি এবং পবিত্র স্থান রক্ষা করতে পারছে না। আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখতে পারছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাময়িক শক্তি, জ্ঞানচর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মুসলিমগণ ইসলাম বিরুধীদের পিছনে পড়ে আছে। এ ধরণের মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি কি কাম্য? তারাই কি হতে পারবে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌র নবীর গৌরবের স্মারক? [১৮৬]

১৮৬। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১- ৪২

আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেনঃ

অভুক্ত মানুষ যেভাবে খাদ্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভবিষ্যতে বহু জাতি তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, এটা একারণে হবে যে, তখন তাদের সংখ্যা হবে স্বল্প? আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন ‘না’ ঐ সময় তোমাদের লোকসংখ্যা হবে বিরাট। কিন্তু স্রোত যেভাবে ফেনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তোমাদের অবস্থা তাই। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের সম্পর্কে ভীতি বিদূরিত করবেন এবং তোমাদের

হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হবে শংকা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কি ধরনের শংকা মুসলিমদের হৃদয়ে সৃষ্টি হবে? তিনি বললেন' দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা। "[১৮৭]

উপরোক্ত হাদীস থেকে দেখা যায় যেকোন ধরণের জনসংখ্যাই কাম্য নয় বরং গুনগত সংখ্যাধিকই কাম্য। যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা তাদের আধ্যাতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাংখ্যাতিক ভাবে ব্যাহত করবে। এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন মুসলিম জনসংখ্যাবিদ, চিকিৎসক, সমাজবিজ্ঞানী এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ। আল্লাহর নবী (সা.) মুসলমানদের যে অবস্থা সম্বন্ধে শংকা করেছিলেন তাই পরিস্ফুটিত হচ্ছে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে। [১৮৮]

মানুষের গুনগতমানের উপরে আল-কুর'আনেও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছেঃ

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

"বলো (হে নবী), মন্দ ও ভাল এক নহে। যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে আকৃষ্ট করে।"[১৮৯]

আল-কুর'আনে আরো বলা হয়েছে ঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

" আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বড় দলকে পরাভূত করেছে। "[১৯০]

আল কুর'আনে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুনগত মান অপেক্ষা জনসংখ্যাধিক্য মুসলিমদের জন্যে বিপদজনক হতে পারে।

১৮৭। হাদীসটির আরবী পাঠঃ
توشك لامم ان تتداعى عليكم كما تتداعى الاكلة إلى قصعها قالوا اومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال لا انكم يومئذ لكثير ولكنكم (كثرة) كغشاء السيل ولينزعن الله من قلوب اعد اعكم المهابة منكم وليقذ فن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول لله ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت – رواه ابو داود

১৮৮। Abonnour Manhaj, PP. 409-12

১৮৯। আল-কুর'আন, ৫:১০০

১৯০। আল-কুর'আন, ২: ২৪৯

হুনাইনের যুদ্ধ তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

" আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহুক্ষেত্রে। হুনাইনের যুদ্ধের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। প্রশস্ত পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকোচিত হয়েছিল এবং তোমরা পৃষ্ট পদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। "[১৯১]

২.প্রজনন (সন্তান জন্মদান)

পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ এ বিষয়ে একমত যে, বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রজনন। এটা স্বাভাবিক নিয়ম এবং ফিতরাত হিসেবে গন্য গুনগতমানের উন্নত সন্তান পাওয়া কোনক্রমে বিবাহের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রজননের সাথে অসংগতিপূর্ণ নয়। পিতা-মাতা সন্তান অবশ্যই চায়, তবে তারা ভাল হোক, নেক হোক এবং জীবনে উন্নতি করুক এটা আরো বেশী চায়। কোন পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে এরূপ মুনাজাত করেন না, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সন্তান দাও, অন্ধ হোক, খঞ্জ হোক, রুগ্ন হোক, অশিক্ষিত হোক, যেকোন রকমই হোক না কেন আমরা সন্তান চাই। আল্লাহর নবী (সা.) তাঁর উম্মতের সন্তান বৃদ্ধির জন্যে মুনাজাত করতেন, কিন্তু তা নেক সন্তান বৃদ্ধি, পাপপ্রবণ সন্তান নয়। অনরূপভাবে ঈমানদারগণ সন্তান চায় যা হবে তাদের প্রীতিকর। [১৯২]

সুস্থ, সবল, চরিত্রবান, নয়নপ্রীতিকর সন্তানের চাহিদা মুসলিমদের থাকবে এ বাসনা আল কুর'আনেও প্রতিফলিত হয়েছেঃ

' أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

"তোমাদের কেউ কি চায় যে তাঁর একটি খেজুর ও আংগুরের বাগান থাকুক যার প্রাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফল-মূল আছে। যখন এ ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি হয় শারীরিকভাবে দুর্বল এবং বাগানের উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘুর্ণিঝড় প্রবাহিত হয় এবং সবকিছু জ্বলে যায়। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"[১৯৩]

১৯১। আল-কুর'আন, ৯:২৫

১৯২। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩- ১৪৪

১৯৩। আল-কুর'আন, ২:২৬৬

সন্তান -সন্ততি অধিক হলেই যে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ হবে এরূপ কথা ঠিক নাও হতে পারে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ - نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ -

"তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে যে, ধন ঐশ্বর্য্য , সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তারা সকল মঙ্গল ত্বরান্বিত করি? না, তারা তা বুঝে না।"

৩. অধিক গর্ভধারণক্ষম স্ত্রী-পছন্দ করা

স্বামী যতগুলো সন্তান স্ত্রীর মাধ্যমে চায় ততোগুলো সন্তানের গর্ভধারণক্ষম স্ত্রী-স্বামী পছন্দ করবে এতে সন্দেহ নেই। যে স্বামী বেশী সন্তান পছন্দ করেন, তিনি অবশ্যই চাবেন যে,

তার স্ত্রী ঘন ঘন গর্ভবতী হোক। এক স্ত্রীর মাধ্যমে স্বামী যতগুলো সন্তান চান সবগুলো পেলে তার আর একটি বিয়ে করার প্রয়োজন হবে না। এ রূপ স্ত্রীকে স্বামী স্বাভাবিকভাবেই বেশী ভালবাসবেন। যেমন ভালবাসতেন সম্রাট শাহজাহান বেগম মমতাজ মহলকে, যিনি ১৭ বছর দাম্পত্য জীবনে ১৪টি সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে। যদি কোন নারী গর্ভধারণক্ষম না হন,তিনি কি অবকাশ ও করুণার পাত্র হবেন? সকল নারীই মা হতে চায়, কিন্তু গর্ভধারণক্ষম না হওয়া তার নিজের দোষ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

" তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে করেন বন্ধ্যা।" [১৯৫] কিন্তু কিছু পুরুষ এবং নারী জন্মগত বা বংশগত কারণে সন্তান প্রজননে অক্ষম হন। শতকরা ৪০ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামীই এর জন্যে দায়ী অনেক ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে দায়ী হতে পারে। ফলে নির্বাচন করার সময় সে সন্তান উৎপাদনক্ষম হবে অথবা বন্ধ্যা হবে তা কি করে নির্ধারণ করা যাবে?[১৯৬] যদি কোন মেয়ের অন্যান্য বোনের সন্তান না হয় তা'হলে তারও সন্তান হবে না এরূপ সিদ্ধান্ত ভুল। এ ধরণের পরিবারে বিবাহের পরেও যদি কনেকে সন্তান না হওয়ার জন্যে দায়ী করা হয় তবে তা হবে অন্যায়। যদি কোন নারী বন্ধ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তা'হলে তাকে বিয়ে করা যাবে না এরূপ কোন বিধান ইসলামে নেই। আর বিয়ের পর তার সন্তান হলো না এবং সে-ই এজন্যে দায়ী তা প্রমাণিত হলে একারণেই তাকে তালাক দিতে হবে এরূপ কোন বিধান ইসলামে নেই এবং তা অনুমোদিত নয়। [১৯৭]

১৯৪। আল-কুর'আন, ২৩:৫৫-৫৬
১৯৫। আল-কুর'আন, ৪২:৫০
১৯৬। Dr. Anwarwl Haq, Family Plannirg, P. 50
১৯৭। Al- Najjar, Op. Cit, P. 34-35

কোন এক ব্যক্তি একজন ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন বন্ধ্যা। কিন্তু রাসূল (সা) তাকে এমন নারী বিয়ে করতে বলেছিলেন যার মাধ্যমে সন্তান জন্ম সম্ভব। রাসূল (সা.)-এর এ উপদেশটিও কেহ কেহ বন্ধ্যা নারী বিয়ে না করার স্বপক্ষে ব্যবহার করতে চান। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহর নবী (সা.) উক্ত ব্যক্তির সম্পদের প্রতি লোভ লক্ষ্য করে ছিলেন যার জন্যে তিনি ভিন্নরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন, সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারেই বিয়ের উদ্দেশ্য নয়। প্রাথমিকভাবে এরূপ ভাব থাকলেও পরবর্তীতে অনুশোচনা হয়। [১৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ্যা নারীর প্রতি রাসূল (সা.)-এর যে কোন রকম বিরুক্তি ছিল, তা কোনভাবে প্রমাণিত নয়। বিবি খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ৬টি সন্তান হয়েছিল। বিবি 'আয়েশা (রা.) সহ রাসূল (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীদের গর্ভে তাঁর কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। এজন্য তিনি কখনও দুঃখিত হয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণ মনে করেন যে, বন্ধ্যা নারীরও বিয়ে হওয়া উচিত এবং সুখী দাম্পত্য জীবন-যাপনে তারও অধিকার আছে এবং বন্ধ্যাত্ব কাটার জন্যে যথসম্ভব তার চিকিৎসা হওয়া উচিত। [১৯৯]

৪. স্ত্রী শস্যক্ষেত্র

স্ত্রী-কে স্বামীর শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে। স্ত্রীর মাধ্যমেই সন্তানের জন্ম হয়। শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে বলেই গর্ভনিয়ন্ত্রণ করা যাবে না এটা ঠিক নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইবনে ওমর (রা.) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) এবং জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর ন্যায় ৪জন সুবিখ্যাত সাহাবীর মতামত হলো, তোমরা যদি ইচ্ছা কর স্ত্রীদের সহিত আয্‌ল করতে পার, যদি তা ইচ্ছা না কর তবে তা করো না। অন্যভাবে বলা হয়েছে তোমাদের শস্যক্ষেতে তোমরা ইচ্ছা করলে জল সিঞ্চন করতে পার। আর যদি ইচ্ছা না করো তবে শুস্ক রাখতে পার। [২০০]

১৯৮। Alay Rabal Procedings, Vo. 2. PP. 173-74
১৯৯। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
২০০। প্রাগুক্ত

৫. শক্তি এবং উন্নয়নের উৎস হিসেবে জনসংখ্যাধিক্য

জনসংখ্যা বেশী হলে একটি জাতির শক্তি বেশী হতে পারে এবং যে দেশ উন্নত হতে পারে এটা সম্ভব, তবে শর্ত আছে যে, সে দেশের জনসমষ্টি, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ, ভরণ- পোষণের প্রয়োজনীয় সংগতি পিতা-মাতার থাকতে হবে। সন্তানদের শুধুমাত্র ভরন-পোষণ নয় তাদের আধ্যত্মিক এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের প্রতিও লক্ষ্য রাখা পিতা-মাতার কর্তব্য। সন্তান স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত হলে কিন্তু চরিত্রহীন ও দুর্নীত পরায়ণ হয়ে দেশ ও সমাজের বিপর্যয়ের কারণ হলো এরূপ সন্তানের মাধ্যমে জাতির শক্তি বৃদ্ধি বা দেশের

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ণ সম্ভব নয়। কোন দেশ বা সমাজের নেতৃত্বকে অবশ্যই পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয় এবং পরিকল্পনার মধ্যে ধর্মীয় নির্দেশনা অবশ্যই থাকতে হবে। মুসলিম বিশ্ব বিরাট এবং সম্পদও প্রচুর। কিন্তু সম্পদের বণ্টন সুষম নয়। মুসলিম বিশ্বে রয়েছে পৃথিবীর কয়েকটি অতি সম্পদশালী দেশ, আর সাথে সাথে রয়েছে পৃথিবীর কয়েকটি নিকটতম দেশ, ধনী দেশগুলো কি তাদের সম্পদ দরিদ্র দেশগুলোর সাথে ন্যায়-সংগতভাবে ভোগ করতে চাইবে?

মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশে রয়েছে অত্যন্ত ঘনবসতি। কয়েকটি দেশের লোকসংখ্যা অতি স্বল্প। গনবসতিপূর্ণ দেশগুলো হতে দরিদ্র মুসলিমগণ কি ভ্রাতৃপ্রতীম ঔশ্বর্য্যশালী দেশ সমূহে জীবিকার সন্ধানে বিনা বাঁধায় গমন করতে পারবে?

অধিকাংশ উন্নত সম্পদশালী দেশই স্বাধীন এবং সার্বভৌম। এ স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের কারণেই হয়ত দরিদ্র মুসলিমগণ স্বল্প সংখ্যা অধ্যুষিত সম্পদশালী দেশ সমূহে হিজরত করতে পারে না।

তাছাড়া যাদের সম্পদ আছে তাদের সম্পদ দরিদ্র মুসলিম দেশের ভ্রাতৃবৃন্দের সংগে সমানভাবে ভোগ করার পরামর্শ দেওয়াও বাস্তব সম্মত নয়। আদর্শ হিসেবে সম-বণ্টন এবং সমবন্টনের নীতি খুব ভাল। কিন্তু যে পযর্ন্ত এ আদর্শ আমাদের সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, ততকাল যে দেশে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা উচিত ।[২০১]

২০১। প্রাগুক্ত

৬. ষড়যন্ত্র হিসেবে পরিবার পরিকল্পনার

পরিবার পরিকল্পনাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত্ব করা হয়ে থাকে। মুসলিমদের মধ্যে যারা পরিবার পরিকল্পনাকে সমর্থন করে থাকেন, তারা একথাটি বিশ্বাস করার পূর্বে নিন্মোক্ত বক্তব্যসমূহ অনুধাবন করার জন্যে সুপারিশ করে থাকেন।

১. পরিবার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বিগত এক শতাব্দী যাবৎ। কিন্তু এর শুরু ইসলামের ইতিহাসে ১৪শ বছর পূর্বে দেখা যায়। আযল এর মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আমাদের সম্মানিত সাহাবা-এ কিরামের অনেকেই অবলম্বন করতেন। এ বিষয়টি আমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি?

২. স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম দেশসমূহ উন্নয়নমূলক সাহায্য পেয়ে থাকে। এ সাহায্য গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।[২০২] পরিবার পরিকল্পনার জন্যে উন্নত দেশসমূহকে যে সাহায্য করে থাকে তা'হলো মোট সাহায্যে মাত্র ২%।

৩. পরিবার পরিকল্পনাকে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি যুক্তিসংগত নয়। কারণ, পরিবার পরিকল্পনার বিস্তৃতি এবং প্রসার মুসলিম দেশসমূহ ছাড়া পাশ্চাত্যে বেশী। ষড়যন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হলো ষড়যন্ত্রকারী নিজে যা করে না,অন্যকে তা করতে প্ররোচিত এবং প্রলুব্ধ করে। এ বৈশিষ্ট্য কি পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন? অধিকন্তু, মুসলিম দেশসমূহ তাদের নিজস্ব আদর্শ, দৃষ্টিভংগী, নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা বা না করা তাদের উপরে নির্ভরশীল। তারা কেন স্বেচ্ছায় অন্যের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে? [২০৩]

২০২। S. Huzayyin Rabat Procecdings, Vol. 2, PP. 274-75
২০৩। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯, ১৫০

৭. মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

অমুসলিম দেশসমূহে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব প্রয়োজন, স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত-নীতিমালা নির্ধারণ করতে পারে,দু'টি সন্তান জন্মের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত বিরতি এবং ব্যবধান রেখে অধিক সংখ্যক সন্তান প্রজননের ব্যবস্থা তারা করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে পারে। যাতে তাদের যোগ্যতার মান নিম্নমুখী না হয়।

সম্মান ও মর্যাদার সাথে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম দেশ সমূহে বসবাস করতে পারে। আল কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

"তোমাদের মধ্যে দৃঢ়চিত্ত এবং ধৈর্য্যশীল ২০জন থাকলে তারা ২০০ জনের উপরে বিজয়ী হবে। তোমাদের মধ্যে ১০০ থাকলে এক সহস্র অধিশ্বাসীদের উপরে বিজয়ী হবে। কারণ, তারা এমন সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।"[২০৪]

সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে কি ধরণের গুণাবলী থাকলে তারা ১০ গুণ বেশী অমুসলিমদের মধ্যে বিজয়ী হবে। তা চিন্তা-ভাবনা করে নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান যুগে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দৃঢ়চিত্ততা, উন্নত চরিত্রবল ছাড়া বিরূপ পরিবেশে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। এজন্য শুধুমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি নয় সংখ্যার সাথে গুণমানে সামাঞ্জস্য বিধান করে মুসলিম সংখ্যালঘুর নীতি প্রণয়ন করতে হবে। [২০৫]

৮. শিশু হত্যা বা রিয্ক

জুদামা (রা.) এর হাদীসের আলোকে আযলকে শিশু হত্যা বলা হয়ে থাকে। রিয্ক তাওয়াক্কুল এবং আযল সম্পর্কে এ গবেষণা কর্মের পূর্ববতী অংশে যে ধরণের বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনার সমর্থকগণও একই ধরণের যুক্তি প্রদশর্ন করে থাকেন। সংখ্যাধিক্য বনাম মায়ের নিরাপত্তা একটি ফিকাহগত মূল্যায়ন।

১৯৭৪ সনে শায়খ মুহাম্মদ এ শামসুদ্দিন একজন ফকিহ হিসেবে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন যে, সংখ্যাধিক্য কাম্য হতে পারে, যদি তাতে মায়ের কোন ক্ষতি না হয়। তাঁর অভিমত হলো যে, প্রতিহত করা শরীআতের দৃষ্টিতে অধিকতর করণীয়। [১০৫]

২০৪। আল-কুর'আন, ৮:৬৫
১০৫। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

একটি জনসংখ্যামূলক এবং সাংস্কৃতিক নোটঃ

জনসংখ্যাধিক্য কিভাবে ইসলামিক হতে পারে?

জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণের শিক্ষা এই যে, জন্মের হার অধিক এবং মৃত্যুর হার কম হলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সারা মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যা অমুসলিমদের থেকে অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের নিম্নে বর্ণিত চার্টটি **১৯৯১** প্রণিধানযোগ্য-ঃ [১০৭]

এলাকা	বার্ষিক জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির শতকরা হার	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার বর্ষ মেয়াদ
মুসলিম বিশ্ব	৩.০	২৩
সমগ্র বিশ্ব	১.৭	৪০
জাপানী		
ইউরোপ	০.৩	২৩০

১৯৯১ সনে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ১২০ কোটি। ২৫ বছরে এ জনসংখ্যা ২৫০ কোটিতে উন্নীত হবে। মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। কারণ, জনগণের মধ্যে কমবয়সীদের সংখ্যা বেশী। পরিবার তুলনামূলকভাবে বৃহৎ এবং মৃত্যুর হার কমে যাচ্ছে। যদি পরিবার পরিকল্পনা কঠোরভাবে অবলম্ভন করা হয় তা'হলেও একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। এখন প্রশ্ন হলো মুসলিম জনগণের মানুষ হিসেবে গুণগতমান কেমন হবে এবং মুসলিম হিসেবে ঈমান ও আখলাকের দিক থেকে বিরাট জনসমষ্টি কি স্তরের হবে?

১০৬। প্রাগুক্ত
২০৭। প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০- ১৬১
আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২

মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য এবং ইসলাম সম্মত হওয়ার শর্ত

আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদেরকে এমন অবস্থা সম্পর্কে সর্তক করে গেছেন যখন মুসলিমগণ সংখ্যায় হবে বিরাট কিন্তু গুণগতমানে হবে নিম্ন ও অকর্মন্য। যারা কোন দিক দিয়েই দুশমনদের সমকক্ষ হবে না। যদি অধিকতর ইসলামী এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট অধিকতর গ্রহনীয় ও অনন্দদায়ক হ'তে হয়, তবে কতগুলো শর্ত তাদেরকে কঠোর এবং

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ করতে হবে, এশর্তগুলো ফিগার-৬.১ দেখানো হ’ল। এ শর্তবলী শরী’আহ্ এর আলোকে প্রণয়ন করেছেন আবদেল রহিম উমরান।

ফিগার- ৬.১: মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ঃ

১. উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী সংখ্যাধিক্য

২. স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা সংক্রান্ত সংখ্যাধিক্য

৩. শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন সংখ্যাধিক্য।

৪. এমন সংখ্যাধিক্য যাদের উৎপাদন ভোগ অপেক্ষা বেশী। (আর্ন্তজাতিক ঋণমুক্ত সংখ্যাধিক্য)

৫. সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ না হলেও পারস্পারিক স্বার্থে সমন্বয়কারী সংখ্যাধিক্য (নিজেদের মধ্যে আত্মমুসলিম বিরোধ ও যুদ্ধ বিধবস্ত সংখ্যাধিক্য নয়।

৬. মাতা এবং শিশুর প্রতি ঝুঁকিমুক্ত সংখ্যাধিক্য। [২০৮]

৯. সুন্নাহ হ’তে অতিরিক্ত সমর্থন

আল্লাহর নবী (সা.) বেশী সংখ্যক সন্তান হওয়াকে একটি বিরাট পরীক্ষা হিসেবে গ্রহন করতেন।

“সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা (জাহ্দুল বা’লা) হলে অধিক সন্তান-সন্ততি কিন্তু জীবিকার উপায় না থাকা।”[২০৯]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততি হওয়াকে ক্লেশদায়ক মনে করতেন। তিনি বলেছেন ঃ

“বহুসংখ্যক ছেলে-মেয়ে হওয়া দু’টি দারিদ্র বা অনটনের মধ্যে একটি। কম সংখ্যক ছেলে-মেয়ে হওয়া দু’টি আরামের মধ্যে একটি।”[২১০]

২০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১০৯। আরবী পাঠ:

جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشئ (رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر رض)

১১০। মূল আরবী পাঠ:

قال ابن عباس (رض) ان كثرة العيال احد الفقرين قلة العيال احد اليسارئين (رواه القضاعى في مسند الشهاب)

দু’টি দারিদ্রের মধ্যে একটি হলো বেশী সংখ্যক ছেলে-মেয়ের জীবিকা সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত পিতার জন্যে বিরাট বোঝা। এতে তারা ব্যতিব্যস্ত হয় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত: বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়ে হলে তাদের দিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া যায় না । পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে যতটুকু উপার্জন করা দরকার তা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কম সন্তান হওয়া দু’টি আরাম দায়ক বিষয়। এরমধ্যে প্রথমটি হলো আরামদায়কভাবে তাদেরকে

প্রতিপালন করা যায়। এবং দ্বিতীয়ত: নিজের আয়ের মধ্যে থেকে তাদেরকে মানুষ করে তোলা সহজতর হয়। [২১১]

হযরত ইবনে আব্বাসের কথায় দারিদ্র এবং আর্থিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত থাকলেও কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে হলে তাদের আধ্যাত্মিক, বৃদ্ধিভিত্তিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে খেয়াল দেয়া সজতর হয়। [২১২]

ইমাম শাফে'ঈ (র.) এর মতে, আল কুর'আনের মধ্যেই পরিবারের আয়তন বা জনসংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত আছে। সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতে সেখানে একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতে না পার, তবে একজন নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।"[২১৩] এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিকতর। অধিকাংশ ভাষ্যকারই এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার বিষয়টি স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে বলে মনে করে থাকেন।

কিন্তু ইমাম শাফে'ঈ (র.) মনে করেন যে, আয়াতটির মর্মাথ ব্যাপকতর। আরবী ভাষা সম্পর্কে এবং আল কুর'আনের অর্থ অনুধাবন করায় ইমাম শাফে'ঈ (র.)-এর যোগ্যতা সম্বন্ধে কারো কোন দ্বিমত নেই। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটি প্রসারিত করেছেন এবং তার মধ্যে এক স্ত্রী হলে অধিক সংখ্যক সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব হতে অব্যহতি পাওয়া যাবে এমন ইঙ্গিতও আবিষ্কার করেছেন। [২১৪]

২১১। আবদেল রহিম উমরান, পৃ. ১৪৫

২১২। Al- Mubarak Abdullah, Rabat Procedings, Vol. 2. P. 152-153

২১৩। আল কুর'আন, ৪:৩

২১৪। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

ইমাম ইবনে কাইয়েম (র.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত সন্তান সীমিত রাখার ইঙ্গিত নিয়ে কুর'আনের ভাষ্যকারদের মধ্যে ভাষাসংক্রান্ত বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে।[২১৫]

সুন্নাহ ও পরিবার পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েও কুর'আন মজীদের কোন আয়াতকেই জন্মনিয়ন্ত্রনের সমর্থনে প্রয়োগ করা যায় না। তাই একশ্রেণীর লোক আযল সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন পেতে চায়। যারা আযলের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইসলাম স্বীকৃত বা অনুমোদিত বলে প্রচার করতে চাচ্ছেন, তারা এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে তাদের স্বপক্ষে প্রামান্য যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আয্ল বিষয়ক হাদীসের সংকলণ ও শ্রেণীবিভাগ

আ্যল বিষয়ক হাদীসগুলোকে ৯টি ভাগে ভাগ করা যায়

১. সাহাবীদের মধ্যে যারা আয্ল করতেন তাঁদের বর্ণিত হাদীস

২. তাকদীরের উল্লেখসহ আল্লাহর রাসূল (সা.) কর্তৃক পরোক্ষভাগে অনুমোদিত আযল সংক্রান্ত হাদীস

৩. আল্লাহর নবী (সা.) কর্তৃক আযল অনুমোদিত হাদীস

২১৫। Al-shafei cited Ibn al-Qayyim, Tuhfat, P.8, A The Arabic text in from al-sharabasi, op. cit, see also al Baqouri Al-Usrah, PP. 41-42; এ সম্পর্কে শারাবাচ্ছি (১৯৫৬) যা লিখেছেন তা হুবহু উদ্ধৃত হলো:

فسر الامام الشافعى قوله تعالى:
ذلك ادنى الا تعولوا : بقوله اى لا تكثر عيالكم وهذا القول من الامام بدل على ان قلة العيال اولى وقد نقل هذا القول عن الامام الشافعى الامام ابن القيم في كتابه "تحفة الودود باحكام المولود و ان كان لم يختره ورواه عليه بردود كثيرة كما نقل هذا القول الامام القرطبى فى تفسيره الجامع لاحكام القران وقد شارك الشافعى ان هذا التفسير غيره من لا ئمة وقد ادعى الثعلبى ان هذا الراى لم يقله غير الشافعى لانه كما يدعى لا يقال : عال الرجل معنى كثر اولاده بل يقال فى ذلك اعال الرجل ورد القرطبى عليه بان هذا التفسير الذى قوله الشافعى قد رواه الدار قطعنى بمعنى فى سننه عن زيد بن اسلم وهو ايضا قول جابر بن زيد ثم قال القرطبى : فهذا نان امامان من علماء المسلمين وائمتهم قد سبقا الشافعى اليه
لقد ذكر الكسائى وابو عمر الدروى وابن الاعرابى وهم من العلماء البراء اللغة ـ ان العرب تقول : عال الرجل اى كثر عياله وقال ابو عمر الدروى : ان هذه لغة حمير واستشهد على ذلك بقول الشاعر وان الموت ياخذ كل حتى بلا شك وأمشى وعالا _ أى كثر عياله وذلك قال ابو حاتم كان الشافعى اعلم بلغته العرب منا وفوق هذا فهناك قراءة معتمدة تقول : ذلك ادنى ان تعيلو وهى حجة للشافعى بلا جدال
ومما يوكد قول القرطبى من ان جابر بن زيد قال بهذا الراى ما رواه شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى فى تفسيره المشهور اى جامع البيان وتصدكمايلى : حدثنا يونس قال: اخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد (ذلك ادنى لا تعولوا) ذلك اقل لنفقتك الواحدة اقل من ثنتين وثلاث واربع الا تقولوا) اهون عليك في العيال:

৪. নারী শস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত হাদীস

৫. স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে আযল অনুমোদিত হাদীস

৬. আযল কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এ ধরনের হাদীস

৭. শিশুকে স্তন্যদানকালে গর্ভধারণ সংক্রান্ত হাদীস

৮. আযল গুপ্ত শিশু হত্যা সংক্রান্ত হাদীস

৯. আযল শিশু হত্যা নয় সংক্রান্ত হাদীস [২১৬]

প্রথম গ্রুপের হাদীসঃ

আযল অবলম্বনকারী সাহাবীগণ (হযরত জাবির বর্ণিত হাদীস)

নবী করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় মুসলিমদের মধ্যে যে কেহ কেহ আযল করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যেও কেহ কেহ আযল করতেন। বিষয়টি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কোন সাহাবীকে আযল করতে নিষেধ করেন নি। ঐ সময় কুর'আন নাযিল হতো কিন্তু কুর'আনেও আযল নিষিদ্ধ হয়নি। আযল তৎকালীন প্রচলিত এক প্রকার গর্ভনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

হাদীস ১.১ঃ

وعن جابر بن عبد الله : قال كنا نعزل على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل .

"হযরত জা'বির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সময়ে আমরা (সাহাবীগণ) আযল করতাম। ঐ সময় কুর'আন নাযিল হতো । [২১৭]

হাদীস নং ১.২

كنا نعزل على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك – مالم ينهانا-

ইমাম মুসলিম জা'বির ইবনে 'আবদুল্লাহ হতে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সময়ে আমরা আযল করতাম এ খবর রাসূল এর নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করেননি।"[২১৮]

২১৬। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
২১৭। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, ***সহীহুল বুখারী,*** কিতাবুন নিকাহ হাদীস নং-৪৮০৮
২১৮। সহীহু লি মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ্ , হাদীস নং-২৬১০

হাদীস নং ১.৩

وعن جابر قال: كنا نعزل والقران ينزل – زاد سفيان راوى الحديث, ولوكان شيئا ينهى عنه لنهانا القران-

" হযরত জা'বির ইবনে 'আবদুল্লাহ বলেন, আমরা আযল করতাম এবং কুর'আন নাযিল হচ্ছিল" এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান এই হাদীসের সঙ্গে আরও যোগ করেছেন, "এটা যদি নিষিদ্ধ হতো, আল কুর'আনে ঐটা নিষিদ্ধ হতো। "[২১৯]

উপরোক্ত তিনটি হাদীসেই দেখা যায় সাহাবীদের কেহ কেহ আযল করতেন কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) তা নিষেধ করেননি এবং আল কুর'আনেও তা নিষিদ্ধ হয়নি।

কোন কোন হাদীসকে ধরা হয় শুধুমাত্র বর্ণনা আর কোন কোন হাদীসকে ধরা হয় বর্ণিত বিষয়ে ফয়সালা বা আইনগত সিদ্ধান্ত। হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসটিকে আইনগত সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা হিসেবে ধরা হয়। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল সংকলিত মুসনাদে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে,জা'বির ইবনে আবদুল্লাহকে আযল অনুমোদিত কিনা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে হযরত জা'বির বলেন, "আমরা আযল করতাম।" এ জবাবটি ফয়সালা বা আইনগত সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বহন করে।

নবী করীম (সা.) নিজে যে সমস্ত নির্দেশ বা ফয়সালা দিয়েছেন তা মুসলিমদের নিকট আইন হিসেবে গৃহীত। কোন সাহাবীর (রা.)প্রকাশিত মত যা সম্পর্কে রাসূল(সা.) অবগত ছিলেন, ধরে নিতে হবে যে, উক্ত মতামত নবী (সা.) এর মতামতের মতই গুরুত্ব বহন করে।[২২০]

ইমাম শাওকানীও এ সম্পর্কে 'নায়লুল আওতার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

অধিকাংশ ফকীহ আইনগত সিদ্ধান্তের উৎস বা আহ্‌ল আল উছুল' সম্পর্কে আল ফাতহ্‌ তে যা বর্ণিত হয়েছে," যদি কোন সাহাবী নবী করীম (সা.) এর সময়কার বিষয়ে কোন মত (বা ফয়সালা) প্রকাশ করেন তার এ ফয়সালা নবী করীম (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত ফয়সালার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হয়। আর যদি তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, নবী করীম (সা.) এ বিষয়টি জানতেন এবং অনুমোদন করেছেন, তবে তো আর কোন প্রশ্নই থাকেনা। আযল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আছে যে নবী করীম (সা.) বিষয়টি অবহিত ছিলেন।

২১৯। প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬১১
২২০। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১

ইমাম মুসলিম হযরত জা'বির ইবনে 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন, "আমরা নবী করীম (সা.) এর সময় আযল করতাম, রাসূল (সা.) বিষয়টি জানতেন কিন্তু নিষেধ করেননি।[২২১]

আবূ জা'ফর আল তাহাভী (র.) (মৃ ৯৩৩ খৃ.) ইবনে আল কাইয়েম (মৃ ১৩৫০ খৃ.) ইমাম গাযালী (র.) (মৃ.১১১১খৃ.)-এর ন্যায় প্রখ্যাত ইসলামী ফকীহ চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ আযল সংক্রান্ত হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আযল এর মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণ ইসলাম সম্মত। [২২২]

আযলকারী বা আযল অনুমোদনকারী সাহাবীগণের নামঃ

১. হযরত আলী ইবনে আ'বি ত্বালিব (রা.)

২. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রা.)

৩. হযরত আবূ আয়ূব আল আনছারী (রা.)

৪. হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.)

৫. হযরত জা'বির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

৭. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)

৮. হযরত ইবনে আ'রাত (রা.)

৯. হযরত আবূ সায়ীদ আল খুদরী (রা.)

১০.হযরত "আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ। (রা.) [২২৩]

আল 'আইনীর মতে নিমোক্ত আনসার সাহাবীগণও আযল করতেন বা আযল অনুমোদন করতেন।

১. হযরত সা'দ ইবনে জোবায়ের (রা.)

১. হযরত ইবনে শিরিন (রা.)

২. হযরত ইব্রাহিম আল তা'য়মী (রা.)

৩. হযরত আ'মর ইবনে মুররা (রা.)

৬. হযরত জাবির ইবনে জায়েদ (রা.) [২২৪]

২২১।
جاء فى نيل الا وطار للشوكانى مانصه؛ وقد ذهب الا كثر من اهل الاصول على ما حكاه فى الفتح الى ان الصحابى اذا اضاف الحكم إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع قال؛ لان الظاهران النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك واقره لتوافر دو اعيهم على سؤالهم اياه من لاحكام قال؛ وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك واخرج مسلم من حديث جابر قال؛ كنا نعزل على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبى لله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا

(Al- Shawkani, Naylul Autar, Vol. 5. PP. 197-374)

২২২। Al- Tahawi, Mushkil, Vol, 1, PP. 370-4; Ibn al Qayyiam, Zad, Vol. 4, P.P 16 – 18 ; Al Ghazali, Ihya, Vol. 20, P. 195

২২৩। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

আযলকারী বা আযল অনুমোদনকারী তাবে'ঈন ঃ

১. সা'য়ীদ ইবনে আল মুছাইয়্যাব

২. তা য়ুছ

৩. আতা

৪. আল না’খী

৫. আল কা’মা

৬. আল হাজ্জাজ ইবনে আমর ইবনে গাজীয়া

সাহাবীদের সকলে যে আযল করতেন বা আযল অনুমোদন করেছেন তা নয়। অনেক সাহাবী আযল করা অপছন্দ করতেন। তৎকালীন অবস্থায় আযল অপছন্দ করাটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সাহাবীদের মধ্যে যারা আযল অপছন্দ করতেনঃ

১.হযরত আবু বকর (রা.)

২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)

যদি আরো বহু সংখ্যক সাহাবী আযল অপছন্দ করতেন তার দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, তাঁরা আযলকে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করতেন। আযল ফরজ তা কেউ বলেননি বরং এটা মুবাহ। যারা করতে চায় তারা ইচ্ছা করলে করতে পারে। এই ছিল অনুমোদনের প্রকৃতি। [২২৫]

দ্বিতীয়গ্রপের হাদীস ঃ পরোক্ষভাবে আযল অনুমোদন সূচক হাদীস সমূহ

আযল সম্পকীয় কয়েকটি হাদীসের মধ্যে দু’টি ভাব বা অংশ প্রণিধানযোগ্য। একটি হলো ব্যবহারিক অংশ অপরটি বিশ্বাস বা আস্থাগত অংশ। আযল এর ব্যবহারিক দিক গর্ভধারণ প্রতিহত করার জন্যে আযল পদ্দতি অবলম্বন যার অর্থ হলো সংগ্রামকালে যোনীর বাইরে বীর্যপাত। বিশ্বাস বা আল্লাহ উপর নির্ভরতার অংশটি হলো মানুষ যা ইচ্ছা বা চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে। একটি হলো ইসলামের মৌলিক আকীদাহ্ বা বিশ্বাস এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু,আল্লাহর উপর নির্ভর করে হাত গুঠিয়ে থাকাও তো ইসলাম সম্মত নয়। যে সাহাবী উট না বেঁধে রশি ছেড়ে দিয়ে উটের নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে ছিলেন, তাকে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন উটটি বাঁধ তারপর আল্লাহর উপর নির্ভর কর। এ নির্দেশের মধ্যে দু’টি অংশ আছে। একটি হলো ব্যবহারিক এবং জাগতিক দিক হলো রশি দিয়ে উটটিকে কোন কিছুর সংঙ্গে বেঁধে রাখা। বিশ্বাসের দিক হলো পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখা যে, যত মজবুত ভাবে উটটিকে বেঁধে রাখা হোক না কেন আল্লাহ তা’আলা যা ইচ্ছা করেন তা’ই হবে। অর্থাৎ এটাই যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় যে উটটি হারিয়ে

যাওয়া, তবে কোন মজবুত রশির বন্ধনে এটাকে আটকিয়ে রাখা যাবে না। তেমনিভাবে কেউ যদি গর্ভনিরোধ করতে চায়, তবে আযল করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যা চান তা'ই হবে।

হাদীস নং ২.১ঃ

عن ابى سعيد رضـ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ، فقال ما من كل الماء يكون الولد واذا اراد لله خلق شئ لم يمنعه شئ -

হযরত আবূ সাঈদ বর্ণনা করেছেন, আযল সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন সমস্ত বীর্য হতেই সন্তান হয় না। যদি আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে চান তবে কিছুই তা রোধ করতে পারবে না। [২২৬]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, একটি মাত্র শুক্রকীট প্রয়োজন একটি গর্ভের জন্যে যমজ বা যৌগিক গর্ভের ক্ষেত্রে একধিক শুক্রকীটের প্রয়োজন হয়। অথচ এক বীর্যপাতে কোটি কোটি শুক্রকীট থাকে ।

হাদীস নং-২.২

عن جابر بن عبد لله رضـ قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان عندى جارية وانا اعزل عنها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيئا اراده الله قال : فجاء الرجل فقال : يا رسول الله ان الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا عبد لله و رسوله

জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর (সা.)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, "আমার একটি দাসী আছে। আমি তার সঙ্গে আযল অবলম্বন করি।আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন তা রদ হবে না।" কিছুকাল পরে এ লোকটি ফিরে আসল এবং বলল, ' হে আল্লাহর রাসূল (সা.)। যে দাসীটির বিষয়ে আপনার সংগে আলোচনা করেছিলাম সে গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন আমি শুধুমাত্র আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। [২২৭]

২২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
২২৬। সহীহ লি মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪১৮,
২২৭। প্রাগুক্ত, হাদীস নং -৩৪২১

এ গ্রুপের হাদীস দ্বয়ে দেখা যায় আল্লাহর রাসূল (সা) প্রত্যক্ষভাবে আযল নিষিদ্ধ করেননি। কিন্তু সরাসরি কদর (তাকদীর) যা পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে বলে গেছেন।

তৃতীয়- গ্রুপের হাদীসঃ এ হাদীসে রাসূল (সা.) স্পষ্ট ভাষায় আযল অনুমোদন করেছেন ঃ

পূর্ববতী হাদীসগুলোর মধ্যে আযলের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু স্পষ্ট কথার মাধ্যমে অনুমোদনও নেই। একটি মাত্র হাদীস পাওয়া যায় যাতে আল্লাহর রাসূল (সা.) আযল উল্লেখ করে এর অনুমোদন দিয়েছেন।

হাদীস নং-৩.১

روى مسلم قال : حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا هير اخبرنا الزبير عن جابر قال ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان لى جارية هى خاد متنا وسانيتنا في النخل وانا اطوف عليها وانا اكره ان تحمل فقال – اعزل عنها ان شئت – فانه سيأ تيها ما قدرلها فلبث الرجل ثم اتاه فقال : ان الجارية قد صلت , فقال : قد اخبرتك انه سيأتيها ماقدرلها-

হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমার একজন দাসী আছে যে, আমাদের সেবা করে এবং আমাদের খেজুর বাগানে পানি দেয়। আমি তার সঙ্গে বিধিমত সঙ্গম করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি চাই না। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, তার সংগে আযল করতে পার। তবে যা নির্ধারিত হয়ে গেছে তা অবশ্যই হবে। কিছুকাল পর ঐ লোকটি রাসূল (সা.)-এর কাছে এলেন এবং বললেন ঐ দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন আমি তোমাকে বলেছি, তার সম্বন্ধে যা পূর্বে নির্ধারিত হয়ে আছে, তা তার জন্যে ঘটবেই।[২২৮]

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটিতে একটি বিষয় লক্ষনীয়। প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে আযল শব্দটি উল্লেখ করেননি। তার শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে তার আওতাধীন দাসীটি যেন গর্ভবতী না হয়। যেহেতু নবী (সা.) আযল শব্দটি উল্লেখ পূর্বক তার মতামতটি ব্যক্ত করেছিলেন তাতে মনে হয় আযলের ধারণাটি এত ব্যাপকভাবে মানুষের জানা ছিল যে, শব্দটি উল্লেখ না করেও কথা বললে এটাই যে. বুঝাতে চাওয়া হয়েছে সেরূপ ধারণা হতো। আযল শব্দের উল্লেখ না করেও লোকটি আযলের অনুমতি চেয়েছিল । রাসূল (সা.) আযল শব্দটি উচ্চারণ করেই এটা অভ্যাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২২৯]

২২৮। সহীহ লি মুসলিম, হাদীস নং- ৩৪২০ হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন আবূ আল জুবায়ের তার থেকে শুনেছেন জুহায়ের। জুহায়ের থেকে শুনেছেন আহমাদ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস। যার নিকট থেকে শুনে ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি তাঁর সংকলনে সংকলিত করেছেন। একই ঘটনা সংক্রান্ত হাদীস শব্দের একটু পরিবর্তিতরূপে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

২২৯। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ . ১৬৭

মানবার আল-ইসলাম ম্যাগাজিনের জুন, ১৯৬৫ সংখ্যা শায়খ আল মাদানী (র.) উপরোক্ত হাদীসটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেনঃ "এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আযল বৈধ ছিল এবং এর পদ্দতিও অনেকের জানা ছিল। আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেই প্রশ্নকারীকে আযল অভ্যাস করার সুপারিশ করেছেন।[২৩০]

হাদীসটিতে "তুমি যদি ইচ্ছা কর" এই বাক্যাংশ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আযল অভ্যাস ছিল ঐচ্ছিক। যদি কেউ ইচ্ছা করত তা করতে পারত। [২৩১]

আযল সম্পর্কে আরো দু'টি হাদীস আছে যা উপরের হাদীসটির বিষয়বস্তুর অতি নিকটবর্তী এবং যা হতে মনে হয় তৎকালে আযল অভ্যাসের অনুমোদন ছিল।

হাদীস নং- ৩.২

روى الكاسانى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اعزلوهن اولا تعزلوهن ان الله تعالى اذا اراد خلق نسمة ,فهو خالقها۔

কাছানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বর্ণনা করেছেন, "তোমরা তাদের সঙ্গে আযল কর অথবা না কর, যদি আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষ সৃষ্টি করতে চান তিনি তা করবেন।" [২৩২]

হাদীস নং-৩.৩

عن ابى سعيد الخدرى انهم (اىالصحابة) أرادوا ان يعزلوا أيام معركة حنين قال : فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال اصنعوا ما بدالكم , فما قضى الله فهو كائن ، فليس من كل الماء يكون الولد

হযরত আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন যে, হুনা'ঈনের যুদ্ধের সময় তারা আযল করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা রাসূলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেছেন তোমরা তা কর যা ইচ্ছা কর; আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা হবে। সকল শুক্রকীট থেকে শিশুর জন্ম হয় না। [২৩৩]

এ হাদীসটিতেও রাসূল (সা.) "এটা করনা " এরূপ কথা বলেননি।

চতুর্থ গ্রপের হাদীস

স্ত্রীগণ পুরুষের শস্যক্ষেত্র

আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি গর্ভনিরোধ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

'স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব, শস্যক্ষেত্রে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার'। [২৩৪]

২৩০। Madani, Al- Manbar, 1965, P.66
মূল আরবী পাঠঃ
قال الشيخ مدى ان هذا الحديث يفيد معنى احمق فى الجواز والمشروعية اذ يقدر ان الرسول هو الذى اشار بالعزل۔

২৩১। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৬৭

২৩২। সহীহ লি মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৪২২

২৩৩। আল-কুর'আন , ২ঃ ২২৩

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্বামী তাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছে মিলিত হতে পারে, তবে পায়ুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ পায়ু পথ স্বামী-স্ত্রীর মিলন

ক্ষেত্র নয়। জন্তু-জানোয়ার, কীট পতঙ্গরাও স্ত্রীর যৌন লিঙ্গ ব্যবহার করে থাকে, যেখানে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে কেন সমকামী বা পায়ুকামী হবে?

হাদীস নং- ৪.১

وعن زائدة بن عمر رضـ سألت ابن عباس عن العزل فقال انكم قد اكثرتم فان كان فيه رسول الله شيئا فهو كما قال وان لم يكن قال فيه شيئا فانا اقول : نسأوكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم فان شئتم فاعزلوا او ان شئتم فلا تعزلوا –

জায়েদা ইবনে উমা'ঈর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসকে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, তুমি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছো (আযল সম্বন্ধে বারবার প্রশ্ন করে) কোন বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল (সা.) যদি কিছু বলে থাকেন বিষয়টি সেরূপই যা তিনি বলেছেন এবং যতটুকু বলেছেন, আমি বলি," স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্রের মত, সুতরাং যেভাবে ইচ্ছে শস্যক্ষেত্রে গমন কর। তোমরা যদি চাও তাদের সঙ্গে আযল করতে পার। এ বিষয়ে তোমরা স্বাধীন। যদি আযল করতে না চাও আযল করো না।"[২৩৪]

হাদীস নং- ৪.২

روى ابو بكر الجصاص عن ابن عمر عن قوله تعالىؑ فأتوا حرثكم انى شئتم ؑ قال كيف شئتم – ان شئت عزلا او غير عزل

" স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত আয়াতটি সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা.) বলেছেন; তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার। এর অর্থ হল, " যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর। তুমি আযল অভ্যাস করতে পার যদি তুমি ইচ্ছাকর। আযল অভ্যাস না-ও করতে পার, যদি তুমি ইচ্ছা না কর। " [২৩৫]

২৩৪। আল হাকীম, ফিল মুছতাদরাক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৪২

২৩৫। সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত- আয়াতটি সম্বন্ধে বলেছেন, তোমরা যদি চাও, তবে তাদের সঙ্গে আযল করতে পার এ স্বাধীনতা আছে। যদি চাও আযল না-ও করতে পার। মূল আরবী পাঠঃ

روى الطبرنى عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى قالوا حرثكم انى شئتم قال ان شئتم فاعزلوا ـ وان شئتم فلا تعزلوا ـ (تفسير الطبرى)

হাদীস নং- ৪.৩

Dhaka University Institutional Repository

عن الحجاج بن عمر بن عزية ، انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاء ابن فهد رجل من اليمن – فقال : يا ابا سعيد ان عندى جوارى لي ليس كلهن نساء التى اكن باعجب الى منهن وليس كلهن يعجبنى ان تحمل منى أفأعز؟ نسائ ، فقال : زيد بن ثابت افته ياحجاج قال فقلت : هو حرثك ان شئت سقيته وان شئت اعطشته – قال : وكنت اسمع ذلك من زيد – فقال زيد: صدقت-

" আল হায্যাজ ইবনে 'আমর ইবনে গাজীয়া বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত জায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। ইবনে ফাহাদ নামে একজন ইয়ামেনী তার কাছে এসে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল । জায়িদ ইবনে সাবিত নিজে জবাব না দিয়ে আমার নিকট তাকালেন এবং বললেন, এ বিষয়ে তাকে ফতওয়া দিয়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে মাগফিরাত দিন। আমরা তো আপনার নিকট বসি কিছু শিক্ষা লাভের জন্যে।" হযরত জায়িদ পুনরায় বললেন, "তাকে এ বিষয়ে ফতওয়া দিয়ে দাও।" অতপর আমি বললাম, স্ত্রী তোমার শস্যক্ষেত্র। যদি তুমি চাও, পানি সিঞ্চন কর। আর যদি ইচ্ছা কর তুমি তা শুষ্ক রাখতে পার। এটাই আমি হযরত জায়িদ থেকে শিখেছি, আমার বক্তব্য শুনে হযরত জায়িদ বললেন, তুমি যা বলেছ সঠিকই বলেছ।" [২৩৬]

হাদীস নং ৪.৪

روى البيهقى عن ابن عباس قال: ماكان ابن ادم ليقتل نفسا قضى لله خلقها – حرثك ان شئت عطشته وان شئت شقيته –

হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন আল্লাহ যে সন্তান সৃষ্টি করতে চায় তা কোন মানুষ হত্যা করতে পারে না। তুমি যদি চাও তোমার শস্যক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন কর। আর যদি না চাও, তবে তা শুষ্ক রাখ। [২৩৭]

উদ্ধৃত হাদীসগুলো আযল করাকে সমর্থন করেছে। তবে এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, আযল করা একটা নিরর্থক কাজ।[২৩৮]

গ্রুপ নং-৫. স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল

কতকগুলো হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্বাধীন স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল করা যেতে পারে।

২৩৬। মুয়াত্তা ইমাম মালিক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৮
২৩৭। আল বায়হাকী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৯০
২৩৮। আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮২
হাদীস নং- ৫.

Dhaka University Institutional Repository

عن ابى هريرة عن عمربن الخطاب رض لله عنهما ان رسول لله صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة بدون اذنها

" হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া 'আযল অনুমোদন করেননি। " [২৩৯]

উপরোক্ত হাদীসগুলো হতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর সম্মতিতে ' আযল অনুমোদিত।

গ্রুপঃ ৬ঃ অনুমোদন বা অননুমোদন সৃষ্টি নয়-এরূপ হাদীস সমূহ

এ গ্রপে যে হাদীসগুলো সংকলিত হবে তাতে অনুমোদন বা অননুমোদন দু'টিই ব্যাখ্যা হতে পারে, কোন কোন ফকীহ হাদীসগুলো থেকে অনুমোদনের সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং কোন কোন ফকীহ অনুমোদনের সিদ্ধান্তে এসেছে। শেষোক্ত গ্রুপের ফকীহদের মত হলো যদি কোন বিষয়ে নবী (সা.) অপছন্দ করে থাকেন সেগুলোকে অননুমোদিত হিসেবে ধরে নিতে হবে। এ যুক্তি দোষনীয় নয়। বরং সম্মান জনক। ফকীহদের অন্য গ্রুপের মত হল যে, ইসলামে যা নিষিদ্ধ তা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) ও নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ কোন কাজ করেছেন তা অবগত হওয়ার পরও যদি রাসূল (সা.) তা স্পষ্টভাবে নিষেধ না করে থাকেন,তা হলে ঐ কাজটি ইসলামে আইনত নিষিদ্ধ নয় এবং ঐ ধরণের কাজ কাজীর আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়।[২৪০]

বিবাহকে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর সুন্নাত হিসাবে এবং সাহাবীদের জন্যে তথা সকল মুসলমানের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে গণ্য করতেন। যারা বিয়ে করে না তারা তাঁর অনুসারী নয় এ রকম কথাও আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিয়ে করাটা আল্লাহর রাসূল (সা.) পছন্দ করতেন এবং না করাটা অপছন্দ করতেন। কিন্তু তাই বলে বিয়ে না করাটা হারাম নয়। [২৪১]

হযরত হাসান বসরী অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ফকীহ্ ছিলেন। মহিলা সূফী সাধকদের মধ্যে রাবেয়া বসরী (র.) অতি উচ্চ স্তরের। হযরত শাহজালাল (র.)-এর ন্যায় সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার কারী বহু সূফী-সাধক বিয়ে করেননি। তাই বলে কি ধরতে হবে তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর ইচ্ছার বিপরীতে কাজ করে গুনাহগার হয়েছেন? সাহাবী, তাবে'ঈন এবং তাবে-তাবে'ঈনদের পর সারা মুসলিম বিশ্বের ওলি আওলিয়াদের অনেকেই ছিলেন চির-কুমার।

২৩৯। ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮২

২৪০। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭০

২৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৬৫

হাদীস নং- ৬.১

Dhaka University Institutional Repository

عن ابى سعيد الخدرى ان رسول لله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال : لا عليكم لا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر

হযরত আবূ সাঈদ খুদুরী (রা.) বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌র রাসুল (সা.) কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন " তোমাদের এ ধরনের করা ঠিক নয় " তাতো কদর বা পূর্ব নির্ধারিত। [২৪২]

হাদীস নং- ৬.২

عن ابن محيريز انه قال دخلت انا و ابو صيرمة على ابى سعيد الخدرى فسأله ابو صيزمة فقال يا ابا سعيد هل سمعت رسول لله صلى لله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق (اي بنى المصطلق) .... فاردنا ان نستمع و نعزل – فقلنا ؛ نفعل ورسول لله بين اظهرنا الا تسأله ؟ فسألنا رسول لله صلى لله عليه وسلم فقال؛ لا عليكم الا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة – الا متكون۔

" হযরত ইবনে মুহায়রিজ বলেছেন যে, একদা আমিও আবূ সিজমা আবূ সা'ঈদ খুদরীর নিকট গেলাম। আবূ সিজমা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি আযল সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে শুনেছেন কি না ? তিনি বনীমুস্তালিকের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে জবাব দিয়েছিলেন। ঐ যুদ্ধের সময় কয়েকজন সাহাবী' আযল করতে চেয়েছিলেন। আমরা বললাম আল্লাহর রাসূল (সা.) তো তোমাদের মধ্যেই আছেন। এখন কি আমরা তা করব? আমাদের কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়?

অতঃপর আমরা আল্লাহর রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলাম "তিনি বললেন লা' আলাইকুম আল্লা তাফআলু" এটা তোমাদের জন্যে নির্দেশ নয় যে তোমরা করবে না। কিয়ামত পযর্ন্ত যে সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা তার জন্ম হবেই। " [২৪৩]

হাদীস নং ৬.৩

وان ابى سعيد ذكر العزل عند النبى صلى الله عليه وسلم، فقال : وما ذاكم ؟ قالوا: الرجل تكون له المراة ترضع فيصيب منها، ويكره ان تحمل منه ، والرجل تكون له الا مة فيصيب منها ويكره ان تحمل، قال: فلا عليكم الا تفعلوا ذاكم – انما هو القدر۔

২৪২। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৪১০
২৪৩। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩৪১১

"আবূ সা'ঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, 'আযল সম্বন্ধে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমরা কেন তা কর? তারা বলল, এক ব্যক্তির একটি স্তন্যদানকারী স্ত্রী আছে। তার সংগে তিনি সংঙ্গম করেন কিন্তু তিনি গর্ভবতী হোক তা তিনি চান না এবং এক ব্যক্তির এক দাসী আছে। তিনি তার সঙ্গে বৈধভাবে যৌন সংগম করেন। কিন্তু তিনি গর্ভবতী হোক তা তিনি (স্বামী) চান না। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন- লা আলাইকুম আল্লা তাফ'আলু তোমাদের জন্যে এটা নয় যে তোমরা তা আযল করবে না । কিন্তু এটাতো অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত।"[২৪৪]

উপরোক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে একটি আরবী বাক্যাংশে-দেখা যায় তা হলো "লা আলাইকুম আল্লা তাফআলু" এ বাক্যংশটি নিয়ে দু'টি বিশ্লেষণ হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

একটি অর্থে 'আযলের সমর্থন পাওয়া যায়, 'আযল করার প্রতিকুলে অননুমোদন নাই। এর অর্থ হলো যদি অননুমোদন থাকত বা এটা নিষিদ্ধ হতো তবে আল্লাহর রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবেই তা নিষেধ করতেন এ বলে, "আযল করো না।"

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত হাসান বসরী (র.) এবং ইবনে শিরিন। তাদের মতে, আল্লাহর রাসূলের কথায় অনুমোদন যতটুকু বুঝা যায় তার থেকে অনুমোদন বা বিরুক্তিই বেশী বুঝা যায়। যার অর্থ হতে পারে এই যে, তোমাদের 'আযল করার প্রয়োজন নেই যা হবার তা হবেই। এর অর্থ হলো 'আযল করো না। [২৪৫]

হযরত হাসান আল বসরীর (র) উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ ফকীহ গ্রহন করেন নি। এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন ইবনে হাজর (র) তাঁর ফাতহু আল বারী কিতাবে। [২৪৬]

গ্রুপ ঃ ৭ 'আযল এবং স্তন্যদান

ঘায়েল ঘায়লাহ এবং ঘেয়াল এই আরবী শব্দগুলো গর্ভবতী মা কর্তৃক সন্তানকে স্তন্যদান সম্পকীর্য়। সন্তানকে স্তন্যদানকালে গর্ভবতী হওয়া শিশুর অধিকারের প্রতি চরম আঘাত প্রসঙ্গে এ শব্দগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে।

২৪৪। মুসলিম, হাদীস নং- ৩৪১২

২৪৫। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২৪৬। ইবনে হাজর (র) এর আরবী ভাষ্য নিম্নরূপঃ

روى ابن حجرفى الفتح عن ابن سرين والحسن انهم فهموا ان التعبير ، لا عليكم الا تفعلوا ، أقرب الى الزجر اؤ انه اقرب إلى النهى ثم اورد كلام القرطبى تعليقا على ذلك ووافقه عليه اذ قال: قال القرطبى كأن هؤلاء فهموا من لا النهى عما سألوه عنه فكان عند هم بعد لا حذفا تقديره ، تعزلوا وعليكم الا تفعلوا ويكون قوله وعليكم النهم تأكيد ' للنهى – ونعقب بان الاصل عدم هذا التقدير و انما معناه آ ليس عليكم ان تتركوا ، وهو الذى يساوى ان لا تفعلوا وقال غيره ، قوله لا عليكم إلا تفعلوا أى لا حرج عليكم الا تفعلوا آ ففيه ففى الجرج عن عدم الفعل فانهم ثبوت لحرج في فعل العزل۔

হাদীস নং- ৭.১

وعن اسامة بن زيدان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى اعزل عن امرأتى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ولم تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: اشفق على ولدها (أو على اولادها) فقال الرسول الصلوات الله عليه: لو كان ضارا – اى الغيلة لضر فارس الروم ،

" হযরত উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একজন লোক আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে 'আযল করি। রাসূল (সা.) বললেন তুমি কেন তা কর। উক্ত সাহাবী বললেন, "তার সন্তানের স্নেহেই আমি তা করি। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন "যদি এটা (ঘায়লা) ক্ষতিকর হতো তবে পারস্যবাসী ও রোমানদেরও এতে খুবই ক্ষতিকর হতো।" [২৪৭]

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নবুবী (র.) মনে করেন যে, আল ঘায়লা বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর উপরোক্ত মতামত তাঁর ব্যক্তিগত ইজতেহাদ সম্পর্কীয়। এটা সুস্পষ্ট নিদের্শ নয়। ঐ সময় আরবদের অনেকের মধ্যে আল ঘায়লা [২৪৮] সম্পর্কে ভীতি ছিল। ইমাম নবুবীর মতে, উক্ত হাদীসটির তাৎপর্য হলো আল ঘায়লা হারাম নয় তবে উহা উৎসাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল (সা.) যা বলতে চেয়েছেন তাতে মনে হয় যে, শিশুর কথা চিন্তা করে স্বাভাবিক যৌন সংঙ্গম ত্যাগ করতে হবে এবং 'আযল করতে হবে তা নয় । যদি শিশুর স্তন্যপানকালে স্বাভাবিকভাবে যৌন সংঙ্গম করা ক্ষতি হতো তবে তাতে পারস্যবাসী ও রোমানদেরও ক্ষতি হতো। তবে বক্তব্য এই যে, 'আযল কারাহা তানযিহীয়া। কারাহা তানযিতীয়ার অর্থ হলো সর্বোত্তম, উৎকৃষ্ট এবং নির্দোষ পন্থা হতে কিছুটা বিচ্যুতি। কিন্তু তা মাকরুহ তাহরিমা নয়। [২৫০]

হাদীস নং- ৭.২

وعن اسماء بنت زيد بن السكن قالت : سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا اولاكم سرا ، فان الغيل يدرك الفارس فيد عشره عن فرسه-

---

২৪৭। সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৪৩১

২৪৮। আল ঘায়লা (الغيلة) হলো শিশু স্তন্যপানকালে স্বাভাবিক নিয়মে যৌনসংগম না করা. বরং আযল করে যোনীর বাইরে বীর্যপাত করা। শিশু স্তন্যপান কালে যাতে গর্ভ না হয়, সেজন্যে এসময় অনেকেই আয্ল করতেন এবং ধারণা করতেন যে এ সময় 'আযল না করাই খারাপ অর্থাৎ আয্ল করাই্ ঐ সময় অত্যধিক প্রয়োজন। (আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত ,পৃ, ১৭৬)

২৪৯। Al-Nawawi, Op. Cit. PP. 16-17

২৫০। আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৭

"হযরত আসমা বিনতে জায়দ ইবনে আল সাকান বর্ণনা করেছেন যে আমি শুনেছি আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন অজ্ঞাতসারে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। কারণ, ভবিষ্যতে আল ঘায়লার প্রতিক্রিয়া এমন হতে পারে যে,একজন অশ্বরোহীকে তার পতিপক্ষ পরাভূত করল এবং তাকে অশ্ব পৃষ্ঠ হতে ফেলে দিলো।" [২৫১]

এ হাদীসের দেখা যায়, আল ঘায়লাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এতে গর্ভনিয়ন্ত্রণের কিছু বিরূপ ফল উল্লেখ করা হয়েছে।

৮নং গ্রুপের হাদীসঃ 'আযল গুপ্ত শিশু হত্যা সম্পকীর্য় হাদীস

হাদীস- নং-৮.১

عن جدامه بنت وهب الاسدية اخت عكاشة قالت : حضرت رسول لله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول : لقد هممت ان انهى عن الغيلة – فنظرت فى الروم الفارس، فاذاهم يغيلون اولادهم – فلا يضر اولادهم ذلك شيئا ثم سالوه عن العزل فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ذلك الواد الخفى – زاد عبيد الله في حديثه عن المعرئ : وهى – اذا الموعودة سئلت،

" জুদামা বিনতে ওহাব আল আসদিয়া (উককাছা-এর ভগ্নী) বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যদেরসহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেছেন, "আমি আল ঘায়লা প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি রোমান এবং পারস্য বাসীদের সম্বন্ধে চিন্তা করলাম এবং জানলাম যে তাদের গর্ভবতী মায়েরাও সন্তানদেরকে স্তন্যদান করতো এবং তাতে তাদের ক্ষতি হতো না। অতঃপর সাহাবীরা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে 'আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটা "আল ওয়াদ আল খাফী "গুপ্ত শিশু হত্যা। 'ওয়াদ শব্দের অর্থ শিশু হত্যা।" [২৫২]

৯নংগ্রুপের হাদীস 'আযল শিশু হত্যা নয় সূচক হাদীস

"আযল শিশু হত্যা নয় এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস আছে। আযল শিশু হত্যা এ ধারণার উৎস মদীনার ইহুদীগণ। ইহুদীদের মতে 'আযল হলো "আল-মাওয়াদাতু আল সুগরা" ক্ষুদ্র শিশু হত্যা। মনুষ্য অপচয় করা ইহুদী আইনে নিষিদ্ধ। ইহুদী ঐতিহ্যে উনান নামে এক ব্যক্তিকে এজন্যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। যোনীর বাইরে বীর্যপাতকে ইহুদী ঐতিহ্যে বলা হয় উনানিযম। এ শব্দটি উনানের নাম থেকেই সংকলন করা হয়েছে। মদীনার ইহুদীগণ মুসলিমদেরকে বুঝাতে চেয়েছিল যে, 'আযল ক্ষুদ্র শিশু হত্যা। কিন্তু 'আযল যে, শিশু হত্যা নয়, এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৫১। আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৯০

২৫২। মুসলিম ইবনে মাজাহ নাঈাই আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীসটির আযল সংক্রান্ত-শেষের অংশটি ইমাম মালিকের মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস নং- ৯.১

عن جابر قال: قلنا يا رسول لله : كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموءودة الصغرى , فقال: كذبت – ان لله اذا اراد ان يخلقه كم يمنعه منه شئ ،

"হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবীগণ আল্লাহর রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমরা 'আযল করতাম, কিন্তু ইহুদীগণ-দাবী করেন যে, এটা শিশু হত্যা। " আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন যে ইহুদীগণ মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, কিছুই তা রোধ করতে পারে না।[২৫৩]

এ হাদীস থেকে দেখা যায় যে, 'আযল শিশু হত্যা নয়। তা রাসূল (সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

হাদীস নং- ৯.২

عن جابر بن عبد الله قال: (في رواية اخرى) كنا نعزل فقالت اليهود ان تلك الموءودة الصغرى – فسئل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود – لو اراد الله خلقه ما استطعت رده ،

হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আমরা 'আযল করতাম। ইহুদীগণ বলত যে এটা গুপ্ত শিশু হত্যা। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ইহুদীগণ মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ তা'আলা কিছু সৃষ্টি করতে চান, কিছুই তা প্রতিহত করতে পারে না।[২৫৪]

হাদীস নং ৯.৩

عن ابى هريرة رض الله عنه قال: سئل الرسول لله صلى لله عليه وسلم عن العزل – قالوا ان اليهود تزعم ان العزل هو المؤءدة الصغرى ، قال : كذبت اليهود ،

"হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রশ্নকারীগণ বলেছিল ইহুদীগণ অবশ্যই ' আযলকে ক্ষুদ্র শিশু হত্যা বলে মনে করে থাকে। রাসূল (সা.) বলেছেন ইহুদীগণ মিথ্যা বলেছে।" [২৫৫]

উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীসে ইহুদীদের ধারণাকে রাসূল (সা.) "কিজ্ব" বা মিথ্যা বলেছেন "কিজ্ব" শব্দের অর্থ হলো মিথ্যা এবং গলত শব্দের অর্থ হলো ভুল। পরবর্তী কয়েকটি হাদীসেও দেখা যাচ্ছে এ বিষয়টিকে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইহুদীদের ধারণাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন।

২৫৩। তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০২
২৫৪। তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০০৩

হাদীস নং-৯.৪

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول لله – ان لى جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل , وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل هو المؤءدة الصغرى – قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه – ما استطعت ان تصرفه-

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, একজন লোক আল্লাহর রাসুলের নিকট এলেন। তিনি রাসূল (সা.) কে তাঁর দাসীর সংঙ্গে আযল করেন জানিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। লোকটি বললেন আমি চাইনা সে গর্ভবতী হোক, অন্যান্য পুরুষ যা চায় আমিও তা চাই। কিন্তু ইহুদীরা বলে যে 'আযল শিশু হত্যা রাসূল (সা.) বললেন ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ যদি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান কিছুই তা রোধ করতে পারে না।[২৫৫]

হাদীস নং- ৯.৫

عن عبيد بن ابى رفاعة الانصارى قال: تدوال اصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب في العزل – فاختلفوا فيه فقال عمر : قد اختلفتم وانتم اهل بدر الاخيار – فكيف بأناس بعدكم اذتناجبى رجلان فقال عمر : ماهذه المناجاة ؟ ان اليهود تزعم انها المؤءودة الصغرى، فقال على : انها لا تكون مؤءدة تمر على القادات السبع تكون سلالة من طن ثم تكون نطفة ثم تكون علقة – ثم تكون مضغة – ثم تكون عظاما, ثم تكون لحما ثم تكون خلقا اخر فقال صدقت اطال لله بقاءك ، فكان اول ما قالها في الاسلام-

হযরত ওবায়েদ ইবনে আবি রিফা আনসারী বর্ণনা করেছেন, কয়েকজন সাহাবী হযরত ওমর (রা.) এর সম্মুখে 'আযল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তারা পরস্পরে দ্বিমত প্রকাশ করছিলেন হযরত ওমর (রা.) বললেন, "তোমরা এ বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করছো" অথচ এমন সাহাবী যারা বদর-এ অংশগ্রহণ করেছিল। তোমাদের পরে যারা আসবে তারা কি করবে? হযরত ওমর (রা.)-এর একথা বলার পরেও দু'জন গোপন যুক্তি শুনতে চাইলেন। একজন বলল, ইহুদীরা দাবী করে যে 'আযল ক্ষুদ্র শিশু হত্যা। (মাউ'দাতু আল সুগরা)। হযরত আলী (ইবনে আবূ তালিব) তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, 'আযল শিশু হত্যা হতে পারে না। ভ্রুণ বৃদ্ধির সাতটি স্তর অতিক্রম না হওয়া পযর্ন্ত শিশু হত্যা হয় না।

২৫৫। আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩০৯১

প্রথমতঃ তরল মাটি বা বীর্য (যা সৃষ্টির আদি) ২. অতঃপর শুক্রকীট বা নুতকা ৩. অতঃপর জমাট রক্ত (আলাকা), ৪.অতঃপর ভ্রুন পিণ্ড (মুদগা)। ৫. অতঃপর অস্থি, ৬. অতঃপর গোশত দ্বারা অস্তি আচ্ছাদান, ৭. অতঃপর পরবর্তী সৃষ্টি বা খাল্‌ক। হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.) কে বললেন, তুমি যর্থাথই বলেছ। আল্লাহ তোমার হায়াত দীর্ঘায়িত করুন। তিনিই আলী (রা.) প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামে একথা ব্যক্ত করলেন। [২৫৬]

'আযল সম্পর্কীয় হাদীসের পর্যালোচনা

উপরে 'আযল সংক্রান্ত হাদীস গুলো ৯টি ভাগ করে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীস সংকলকগণ প্রত্যেকটি হাদীসকে প্রামাণ্য হাদীস বলে স্বীকার করেছেন। যদিও বর্ণনাকারীদের ধারা বা সনদ এর উপর প্রামাণ্যের স্তর খানিকটা কম বেশী-হয়। অধিকাংশ হাদীস হতে এটা স্পষ্ট যে গর্ভনিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হিসেবে " আয্‌ল অনুমোদিত। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ এটাকে অনুমোদিত মনে করেছেন এবং কেহ কেহ বাস্তবে অভ্যাস করেছেন। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এ সম্পর্কে জানতেন কিন্তু তিনি তা নিষেধ করেন নি। ঐ সময় কুর'আন নাযিল হতো। কিন্তু ঐ কুর'আনের নিরবতা 'আযলের বৈধতারই স্বীকৃতি অধিকন্তু অন্ততঃ একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'আযল অনুমোদিত। এ হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবীদের ভাষ্যে হাদীস সংকলনে স্থান পেয়েছে। ইমাম গাজালী (র.) এবং ইমাম ইবনে কাইয়েম (র.)-এর ন্যায় ফকীহ এবং ইসলামী চিন্তবিদগণ 'আযলকে সুস্পষ্টভাবে জায়েয মনে করেছেন। কেহ কেহ 'আযল সর্বাস্থায় সংগত বা নির্দোষ বলেননি কিছুটা শর্ত আরোপ করেছেন এবং মাকরুহ তানযিহী বলেছেন।

২৫৬। আল নাসাঈ, আল বায়হাকী- একটি ঘটনার ভিন্নরূপ বর্ণনায় আছেঃ

وفي رواه اخرى : روى القاض ابويعلى باسناده عن عبيد بن رفاعة عن ابه قال: جلس الى عمر كل نم على (ابن إبى طالب) والزبير(ابن العوام) و سعد (ابن ابى وقاض) تذاكروا العزل :فقال عمر رض: لا بأس بهـ فقال رجل : امنهم يزعمون انها الموءودة الصغرى , فرد علمه الامام على قائلا : لا تكون مؤءودة حتى تمر على التارات السبع (وذكر الايات) فعجب عمر من قوله , وقال جزاك الله خيرا –

" কাজী আবূ ইয়ালী হযরত ওবায়েদ ইবনে রিফায়া হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) এর নিকট কয়েকজন সাহাবী উপবিষ্ট ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আলী ইবনে তালিব (রা.) যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর মধ্যে ' আয্‌ল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) এর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই। উপস্থিত একজন বললেন তারা (ইহুদীরা) দাবী করে যে এটা ক্ষুদ্র শিশু হত্যা। হযরত আলী (রা.) বললেন ভ্রুন ৭টি স্তর অতিক্রম না করা পযর্ন্ত শিশু হত্যা হতে পারে না। অতঃপর তিনি সূরা মু'মিনের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত আলীর (রা.) ব্যাখ্যার প্রশংসা করলেন এবং বললেন আল্লাহ্‌ (জাযাকাল্লাহু খায়রা) আল্লাহ তোমাকে বেহেশতের পুরুস্কার দান করুন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প সংখ্যক ফকীহ বা ইসলামী চিন্তাবিদ 'আযলকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলেছেন। এ গ্রুপের প্রধান প্রবক্তা হলেন ইমাম ইবনে হাজম (র.) তাদের বক্তব্যের ভিক্তি হলো তাদের বক্তব্যের প্রধান ভিক্তি হলো জুদামা বর্ণিত হাদীসটি। [২৫৭]

ইসলামের স্বনামধন্য ফকীহ ও চিন্তবিদদের কয়েকজনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

আবু জাফর আত তাহাভী (র.) (মৃঃ ৯৩৩ খৃঃ) [২৫৮]

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত কিতাব "শরহে মানি আল আছার-এ 'আযল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগুলো এবং আরো অন্যান্য হাদীস আলোচনা করে তিনি 'আযল সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে 'আযল অননুমোদিত নয় অথার্ৎ অনুমোদিত্ ইমাম তাহাভী (র) উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি সাহাবীগণকে 'আযল না করার জন্যে নির্দেশ দেননি। তবে,যা অদৃষ্ট হিসেবে নির্ধারিত তা হবেই। ইমাম তাহাভী (র) তাঁর নিজস্ব মতামত হিসেবে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যে শিশুর জন্ম নির্ধারণ করেছেন তা হবেই। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন নির্ধারিত বিষয়ে শুক্রকীট যথাস্থানে পৌছবে এবং গর্ভধারণ হবে। আল্লাহ যদি কোন শিশুর জন্ম নির্ধারণ না করে থাকেন, তবে শুক্রকীট যেকোন পরিমাণই যথাস্থানে প্রবিষ্ট করালেও কিছু হবে না। ইমাম তাহাভী (র.) এ বিষয়ে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। [২৫৯]

২৫৭। প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৭ঃ
আবদেল রহিম উমরান ,প্রাগুক্ত পৃ ১৭৯

২৫৮। ইমাম আবু জাফর আত তাহাভী (র.) (জন্মঃ২৩৯/৮৫৩/মৃঃ৩২১/৯৩৩) এর জন্ম ঐতিহাসিক সাম আনীর (মৃঃ৫৬২/১১৬৬) বর্ণনানুসারে তিনি দশম আব্বাসী খলীফা আল মুতাওয়াককিলের যুগে ৯২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১) জন্ম গ্রহন করেন। আর ঊনিশতম খলীফা কাহির বিল্লাহ এর খিলাফতকালে (৩২১/৯৩৩) ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মাযহাবের অনুসারী। যদিও তিনি প্রথমে শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম তাহাভী (র.) জ্ঞানর্জন করেন আবূ জা'ফর ইবনে আবু ইমরান এবং আবূ খাযিম প্রমখের নিকট থেকে। তিনি কাযী বাক্কার ইবনে কুতায়বাহ এবং আহমদ ইবন আবূ ইমরানের নিকট থেকে প্রার্থমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইবন ইমরান মূসা (মৃ. ২৮৫/৮৯৮) এর নিকট থেকে ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর বিচক্ষণতার কারনে মিসরের শাসক খুমারাওয়ায়হও তাঁকে নাইব এ কাযী পদে নিযোক্ত করেন। হারুন ইবন খুমারাওয়ায়হ-এর শাসনকালে (২৮০/২৯২/৯০৪) ইমাম তাহাভী (র.) ইলম সর্বতোভাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জ্ঞান চর্চার খাতিরে তিনি আর কখনও সরকারী চাকুরীতে ফিরে যান নি। ইমাম তাহাভী (র.) বিরাশি বছর বয়সে যূলকাদাহ ৩২১/২৪অক্টোবর, ৯৩৩সালে বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। (ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী (র) জীবন ও কর্ম) থাকাঃ ই, ফা , বা ১ম প্রকাশ ১৪১৮/ ১৯৯৮) পৃ. ৬১-১০০; মাকরীযী,খিতাত(বৈরুতঃ দারুস সাদির, নতুন সং) ১ম খন্ড-পৃ, ১৮৯

২৫৯। Al- Tahawi sharh, Vol. 3, P. 34; আবদেল রহিম উমরান প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫ প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ . ১৭১- ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাযালী (র) মৃঃ (১১১১খৃ.)[২৬০]

ইমাম গাযালী (র) মুসলিম সমাজে হুজ্জাতুল ইসলাম বা ইসলামের যুক্তি প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত। তাঁর মতে 'আযল মুবাহ বা অনুমোদিত। ইসলামে কোন কিছু নিষিদ্ধ হতে হলে সুস্পষ্ট নছ বা নির্দেশ প্রয়োজন। এ নছ বা সুস্পষ্ট উক্তি হতে হবে কুর'আন ও সুন্নাহ হতে অথবা এরূপ একটি বিষয় হতে কিয়াস করতে হবে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'আযল সম্বন্ধে এমন কিছুই নেই। অধিকন্তু, ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে বিভিন্ন ধরনের কিয়াছ করে এ সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে 'আযল বা যোনীর বাইরে বীর্যপাত অনুমোদিত।

বিয়ে না করা বা বিয়ের পরেও নিয়মিত সংগম না করা, যৌন সংগম সীমিত করা, যৌন সংগম করেও বীর্যপাত না করা এর কোনটিই প্রশংসনীয় কিছু নয়, কিন্তু এর কোনটিই হারাম নয়। এ কাজগুলোর ফল আযল এর অনুরূপই। বিয়ে না করলে কোন ব্যক্তির সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। বিয়ে করেও দীর্ঘ সময় স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংগম না করলে গর্ভধারণ হতে পারে না। যৌন সংঙ্গম করেও কেউ যদি বীর্যপাত না করে তাহলে গর্ভধারণ হতে পারে না। 'আযল করলেও একই ধরনের পরিণতি হতে পারে। তবে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়।

গর্ভধারণের জন্যে শর্ত পূর্ণ হতে হবেঃ

১. বিবাহ

২. যৌন সংগম

৩. বীর্যপাত

৪. শুক্রকীটের জরায়ুতে উপস্থিতি এবং ডিম্বানুর সাথে মিলন।

৪র্থ অবস্থা অর্থাৎ শুক্রকীটের জরায়ুতে উপস্থিতি এবং ডিম্বানুর সাথে মিলন না হতে পারলে গর্ভধারণ হয় না। যৌন সংগম না হলেও গর্ভধারণ হবে না এবং বিবাহ না হলেও বৈধ সন্তান হবে না। এ চারটির মধ্যে 'আযল হলো ৩য় পর্যায়ের অবস্থা অর্থাৎ যথা স্থানে বীর্যপাত না করা। গর্ভধারণের চারটি কারণের মধ্যে ১টি কারণকে আলাদাভাবে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে না। গর্ভধারণের ৩য় কারণটিকে নিষিদ্ধ করলে ২য় কারণ অর্থাৎ বিয়ের পর যৌন সংগম না করা এবং ১ম কারণ অর্থাৎ বিয়েই না করা এর দু'টিকেও নিষিদ্ধ মনে করতে হবে। ১ম তিনটি কারণের মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে যদিও ৪র্থটি তার ইচ্ছা বা ক্ষমতা বর্হিভূত। [২৬১]

২৬০। ইমাম গাযালী (র.) প্রাগুক্ত

২৬১। আবেদল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫; প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, ১৭২.

ইবনে আল কাইয়্যিম (মৃ. ১২৫০ খৃ.)[২৬২]

ইমাম ইবনে আল কাইয়েম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'যাদুল মা'য়াদ- এ স্তিারিত আলোচনা করেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন, উপরের সবগুলো হাদীসকে আমরা সুস্পষ্ট, প্রামাণ্য, দ্ব্যর্থহীন বলতে পারি। এ হাদীসগুলো হতে দেখা যায় যে, 'আযল বা যৌনীর বাইরে বীর্যপাত অনুমোদিত। ১০জন প্রথম কাতারের সাহাবী তাই মনে করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতও উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি বলেছেন, আল্লহর রাসূল (সা.)-এর কয়েক জন সাহাবীর বর্ণনা থেকে দেখা যায় তারা আযল অনুমোদন করেছেন এবং এর মধ্যে দোষণীয় কিছু পাননি। [২৬৩]

ইবনে হাযর আল-আসকালানী (র.) (মৃ. ১৪৮০ খৃ.) :[২৬৪]

ইমাম ইবনে হযর আল আসকালানী (র.) তাঁর রচিত সহীহ আল বুখারীর ভাষ্য "ফাতহ্ আল বাবী"তে 'আযলের বৈধতা বা অনুমোদন নিশ্চিত করেছেন। তাঁর মতে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসটি বাধ্যতামূলক নির্দেশ। কারণ 'আযলের বিষয়টি রাসূল (সা.) জানতেন কিন্তু তা তিনি নিষেধ করেননি। তাছাড়া তিনি পত্যক্ষভাবে 'আযল অনুমোদন করেছেন তা-ও দেখা যায় (হাদীস নং- ৩.১) [২৬৫]

উপরে উল্লেখিত ইমলামী চিন্তাবিদ বা ফকীহদের মতের সাথে অন্যান্য আরও ইসলামী চিন্তাবিদ অনেকাংশে একমত এবং তারাও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন "শারহে ফাতহ্ আল-কাদির"-এর রচয়িতা ইবনে আল-হুমাম। [২৬৬] আরও আছেন অষ্টদশ শতাব্দীর আল জাবিদী এবং উনবিংশ শতাব্দীর আল শওকানী। আল জাবিদী আলোচনা করেছেন তাঁর "ইহইয়া উল্ম আদ দ্বীনের ভাষ্যে"[২৬৭] এবং আশ্ শাওকানী আলোচনা করেছেন তার রচিত 'নায়ল আল-আওতারে "। [২৬৮]

২৬২। ইবনে আল-কাইয়্যিম; ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনন্য শামসুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযী দামিস্কের অধিবাসী ছিলেন। ৬৯১/১২৯১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল খ্যাতিময়। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে তিনিও উস্তাদ ইবনে তাইমিয়ার ন্যায় কাঢ়াবরণ করেছেন। তিনি ছিলেন ইবনে তাইমিয়ার জ্ঞানের যোগ্য উত্তর সূরী। যাদুল মা'য়াদ, ই'লমুল মুওয়াককি'ঈন, ইগাসাতুল লাহফান প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ৭৫১/১৩১১ সনে তিনি মারা যান এবং দামিস্কের "বার সাগীর" গোরস্তানে সমাহিত হন। (তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, খ ২, পৃ. ৯০-৯৩ ; কিতাবুল যায়ল, খ.৪র্থ, পৃ. ৪৪৭-৪৫২)

২৬৩। ইবনে আল কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৮; আবদেল রহিম উময়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫, ; প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল হক. প্রগুক্ত, পৃ. ১৭২

২৬৪। পূর্বে দ্রষ্টব্য :

২৬৫। Ibn Hajar, op. Lit., pp. 245-246

২৬৬। Ibn al-Humam Sharh, vol. 2,pp. 494-495

২৬৭। Al-2abidi, Ithaf, vol, 5, pp. 379-84

২৬৮। Ibn Hazm, op. Lit., pp. 70-77

Dhaka University Institutional Repository

'আযলের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার। বিরোধীগণ তাদের যুক্তির সমর্থনে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নতুন করে যুক্তি প্রদান শুরু করেন। এ যুক্তির সবচেয়ে মজবুত যুক্তি হলো 'হযরত জুদামা বর্ণিত হাদীস। যাতে আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন যে 'আযল একটি গুপ্ত শিশু হত্যা। ইতিপূর্বেও এ বিষয়টি বহু আলোচিত হয়েছে এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সুবিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ 'আযল বিরোধী যুক্তিসমূহ যুক্তিসংগত নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। 'আযল বিরোধী সবচেয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ হলেন ইমাম ইবনে হাজম (র.)। তিনি স্পেনের অন্দোশিয়াতে বাস করতেন এবং ১০৬৩ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। যদিও তিনি তার সমকালীন অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে 'আয্লের নিষিদ্ধতার বিষয়টি সম্বন্ধে নিশ্চিত করতে পারেননি, কিন্তু তার যুক্তিসমূহ ইসলামী ফিক্হে উদ্ধৃত করা হয়।

'আযল সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজম এর চিন্তাধারা পাওয়া যায় তার সুবিখ্যাত কিতাব আল মুহাল্লাতে। তাঁর মতকে অনেকেই ইসলামী ফিকাহ-র জাহেরী মতবাদের সহকারী ভাষ্য বলে মনে করে থাকেন। ইমাম ইবনে হাজম (র.) তাঁর যুক্তিমালা ইসলামী ফিকাহ-র ঐ স্বতসিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে 'আযল' যারা সমর্থন করেছেন তারাও তাদের যুক্তির ভিক্তি হিসাবে তা ধরে নিয়েছেন।

ইসলামী ফিকাহ্ অনুসারে কোন বিষয় ততক্ষণ নিষিদ্ধ গণ্য করা যায় না যে পর্যন্ত কুর'আন বা হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষা তা নিষিদ্ধ না করা হয়। অথবা অনুরুপ কোন নিষিদ্ধ বিষয় হতে কিয়াছ করে তা অনুমোদিত না হয়। 'আযল' যারা সমর্থন যোগ্যমনে করেন তারাও একই কথা বলে থাকেন যে, যেহেতু সুস্পষ্ট ভাষায় 'আযল' নিষিদ্ধ করা হয়নি তাই উহা বৈধ বা অনুমোদিত।

ইমাম ইবনে হাজম (র.)-এর যুক্তি হলো এই, জুদামা ইবনে ওহাব বর্ণিত হাদীসটিতে 'আযল' নিষিদ্ধতার সুস্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। তার মতে, এ হাদীসটি হলে এ বিষয়ে সর্বশেষ হাদীস। ফলে এ সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইতিপূর্বে যা বলেছিলেন তার সবগুলো জুদামা বর্ণিত হাদীস দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

জুদামা (র.) বর্ণিত এ হাদীসটি এ বিষয়ের সর্বশেষ হাদীস এর কোন প্রমাণ তিনি দেননি। তিনি বরং অন্যদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রমাণ করার জন্যে যে 'আয্লে' বৈধতাসূচক হাদীসগুলো জুদামা বর্ণিত হাদীসের পরবর্তীকালের। 'আয্লের বৈধ্যতাসূচক কয়েকটি হাদীসের প্রামাণ্যতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

ইমাম ইবনে হাজম (র.) হযরত আবূ সা'ঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটির দু'ধরণের ব্যাখ্যা হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবনে শিরিন (র.), হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (র.) বর্ণিত হাদীসটি 'আযলের নিষিদ্ধতার কাছাকাছি মনে

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। অন্য দিকে, ইমাম ইবনে হাজম (র.) 'আযলের বৈধ্যতা সম্পর্কীয় হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ্ (রা.) ইবনে আব্বাছ (রা.) সা'দ ইবনে আবি ওযাক্কাছ (রা.), জায়িদ বিন সাবিত (রা.) এবং ইবনে মাস'উদ (রা.) বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এর উপর কোন মন্তব্য করেননি।

ইমাম ইবনে হাজম (র.) যে সমস্ত সাহাবী 'আযল পছন্দ করতেন না বা বৈধ্য মনে করতেন না বা অবৈধ মনে করতেন তাদের একটি তালিকা করেছেন। এ তালিকায় আছে ঃ (১) আলী ইবনে আবী তালিব (২) হযরত ওমর (রা.) ইবনে ওমর (রা.), (৩) হযরত ওসমান (রা.), এবং (৫) ইবনে মাস'উদ (রা.)

এদের নাম 'আযল বৈধতাকারী সাহাবীদের তালিকায়ও অন্তভূক্ত করেছেন। উপরের একটি আলোচনায় দেখা গেছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) উভয়ই 'আযলকে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন।[২৬৯]

'আযলের অবৈধতার যুক্তি প্রত্যাখ্যান

'আযলের বৈধতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজম (র.)-এর যুক্তিসমূহ তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তীকালের বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফকীহগণ যুক্তিসংগত মনে করেননি। তাদের মধ্যে আমরা আল গাযযালী (র.), ইবনে আল কাইয়্যিম (র.) আল জাবিদী (র.) (মৃ. ১৭৯০) শাওকানী (র.) (মৃ. ১৮৩০) উল্লেখ করা যেতে পারে। সমকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে আছেন মাদকুর (র.) (প্রকাশনা ১৯৬৫) এবং আল বুত্তী (র.) (প্রকাশনা ১৯৭৬)

'আযল সম্পর্কে বৈধতার বহুসংখ্যক হাদীস এবং অবৈধতা সম্পর্কীয় হাদীসের সংগতি ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে ইমাম হাজম (র.)-এর ১০০ বছর পূর্বে ইমাম আবূ জ'ফর আত্ তাহাভী (র.) (মৃ. ৯৩৩) তার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

'আযল গুপ্ত শিশুহত্যা ধরণাটি ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইমাম তাহাভী (র.) এর মতে, এ বিষয়ে ইহুদীদের ধরণানুসারে আল্লাহ হয়ত ভাবতেন যে, 'আযল গুপ্ত শিশু হত্যা। কোন বিষয়ে আয়াত নাযিল হওয়র পূর্ব পর্যন্ত রাসূল (সা.) অনেক ক্ষেত্রেই ইহুদীদের মত অনুসরণ করতেন কিন্তু পরবর্তীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ এলে তা তিনি পরিবর্তন করতেন।

২৬৯। Ibn Hazm, op. Cit., vol. b, pp. 346-50

ইমাম তাহাভী (র.)-এর মতে সূরা মু'মিনুন এর ১২-১৪ নং আয়াত নাযিল হবার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (সা.) 'আযল গুপ্ত শিশু হত্যা মনে করতেন। কিন্তু উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি 'আযলকে বৈধ মনে করতেন।[২৭০]

ইমাম তাহাভী (র.) যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাও সকলে মেনে নেননি। উদাহরণ স্বরুপ ইবনে রুশ্‌দ এবং ইবনে আল আরাবী এ বক্তব্য মানতে রাজী নন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রথমত ইহুদীরা যা সঠিক মনে করত তাই সত্য হিসেবে মনে করতেন এবং পরবর্তীতে সমপূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন।[২৭১]

ইমাম গাযালী (র.) হযরত জুদামা বর্ণিত হাদীসটি নিবীড়ভাবে পর্যালোচনা করেছেন। 'আযলের বৈধতা সম্পর্কীয় সহীহ হাদীসগুলোর উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে গুপ্ত শিশুহত্যা কথাটি গুপ্ত শিরক অথবা গুপ্ত বহু ঈশ্বরবাদের ধারণার মত। এর দ্বারা অপছন্দনীয় বুঝায়। কিন্তু অবৈধতা বা নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। ইমাম গাযালী (র.) ভ্রুণে প্রাণ সঞ্চার হওয়া সম্পর্কে হযরত আলী (র.) বর্ণিত ৭টি স্তরের ইল্লেখ করেছেন। ইমাম গাযালী (র.)-এর মত হলো 'আযল ওয়াদ বা শিশুহত্যা এবং গর্ভপাতের অনরুপ নয়। কারণ, 'আযলের মাধ্যমে কোন অস্তিত্বশীল প্রাণীর বিরুদ্ধে অপরাধ করা বুঝায় না।[২৭২]

ইমাম নবুবী (র.) (মৃ.১২৭২ খৃ.) :[২৭৩]

ইমাম আন্ নবুবী (র.) তাঁর সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে 'আযল' সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সামঞ্জস্যতা বিধানের চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়টি তাঁর পূর্বে আল-বায়হাকীও (মৃ. ১০৬৬) আলোচনা করেছেন। তবে আন্ নবুবী (র.) অত্যন্ত রক্ষণশীল বলে তার মতের একটি আলাদা গুরুত্ব আছে।

২৭০। Al- Tahawi Mushkil, vol. 2, pp. 372-4

২৭১। Ibn rushd and Ibn al-Arubi cited in Ibn Hagar Fath, vol. 9, p. 248

২৭২। Al-uhaysli Ihya, vol. 2, p. 53

২৭৩। ইমাম নবুবী (র.): তাঁর পূর্ণনাম মহিউদ্দিন আবূ যাকারিরা ইয়াহইয়া ইবনে শারফ হুরানী আন নবুবী ছিলেন শাফি'ঈ মাযহারের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ফিকহ শাস্ত্রবিদ। তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনটাকে ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন চির কুমার। তিনি বিনা বেতনে দামিস্কে দারুল হাদীস আশরাফীয়ার শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থ শরহুন নবুবী, সহীহ হাদীসের সংকলন রিয়াযুস সালিহীন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দামিস্কের নাওয়া গ্রামে ৬৭৬/১২৭৭ সনে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সুয়ূতী, তাবাকাতুল হুফফায, (কায়রো: মাকতাবা ওয়াহাবী , (১৩৯৩/১৯৭৩) পৃ. ৫১০

আন্ নবুবী (র.)-এর মতে, 'আযল অপছন্দ সূচক হাদীসগুলোকে মাকরুহ তানযিহি প্রমাণিত হয়। কিন্তু, এর দ্বারা 'আযল এর অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। 'আযল এর অনুমোদন সূচক হাদীসগুলোতে 'আযল অবৈধ নয় বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু, 'আযল যে অপছন্দনীয় ছিল এ ধারণাটির অপনোদন।

'আযল সংক্রান্ত হদীসগুলো পর্যালোচনা করে ইমাম নবুবী (র.) এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, 'আযল মাকরুহ তানযীহী। তার এ বক্তব্যের জন্যে কেহ কেহ মনে করেন ইমাম নবুবী (র.) 'আযল বিরোধী ছিলেন কিন্তু আসল ব্যাপার হলো তিনি 'আযল বিরক্তির সাথে সমর্থন করেছেন।[২৭৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মাকরুহ তানযিহি দ্বারা বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিষয়টি বৈধ। এতে কোন পাপ নেই, এবং শাস্তিরও কোন বিধান নেই। এটা দুষণীয় নয়, বরং এটা এমন জিনিস যা পছন্দ করা হয় না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র.) (মৃ. ১৩৫০)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র.) যারা 'আযল' নিষিদ্ধ মনে করেছেন তাদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন। তিনি ইমাম হাজম এর যুক্তিগুলো তাঁর নাম উল্লেখ করে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসগুলোর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে দেখা যায় ফকীহদের মধ্যে একদল 'আযলের বৈধতা স্বীকার করেছেন যদিও এটাকে খুব ভাল মনে করেনি। অন্য একদল মনে করেছেন যে, ইহুদীদের ধারণাটি মিথ্যা। একথাই আল্লাহর রাসূলের হাদীস থেকে বুঝা যায়। ইহুদীরা মনে করত 'আযল করলে গর্ভ হবেই না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) মনে করতেন আল্লাহ তা'আলা যা করতে চান তা হবেই কোন কিছুই তা রোধ করতে পারে না। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) ইমাম ইবনে হাজম (র.)-এর এ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে হযরত জুদামা বর্ণিত হাদীসটি পরবর্তীকালের। কিন্তু তা প্রত্যয়ন করতে যে তথ্য দরকার সে তথ্য পাওয়া যায়।[২৭৫]

২৭৪। Al-Nawawi, v\op. Cit., pp. 9-10
২৭৫। Ibn al- Qayyim, op. Cit., pp. 17-18; আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

আল ইরাকী : (মৃ. ১৪০৪)

ইমাম আল ইরাকী (র.) তিরমিজি শরীফের ভাষ্যে হযরত জুদামা বর্ণিত হাদীসটির একটি নতুন প্রেক্ষিত দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, গর্ভবতী নারীর সঙ্গে সংগমের সময় আযল করা শিশুহত্যার অনুরুপ। কারণ ভ্রুণের ক্রমবিকাশের জন্যে পুরুষের বীর্য সহায়ক এবং এ সময় 'আযল করা হলে ভ্রুণ নষ্ট হতে পারে। তাঁর এ ধারণাটি ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে ভ্রান্ত ধারণা। তিনি অবশ্য একটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তা হল, হযরত জুদামা বর্ণিত গুপ্ত শিশু হত্যা এবং ক্ষুদ্র শিশু হত্যা পার্থক্য নিরুপনে। কিন্তু গুপ্ত শিশুহত্যা কোন বাস্তব শিশু হত্যা নয়। তাঁর মতে 'আযলকে শিশু হত্যা বলা একটি বাগধারা যা শিশু হত্যা বুঝায় না। এর দ্বারা গর্ভ প্রতিরোধ করাই বুঝায়।[২৭৬]

ইবনে হাজর :(মৃ. ১৪৪৯)

সহীহ আল বুখারীর ভাষ্য ফাতাহ আল বারী এর ভাষ্যকার ইবনে হাজর আল আসকালানী (র.) এর মতে হযরত জুদামা বর্ণিত হাদীসটিতে 'আযলে নিষিদ্ধতা প্রমাণ হয় না। তিনি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন যে, গুপ্ত শিশু হত্যা কথাটি একটি আরবী বাগধারা যার দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয়। ইবনে হাজর (র.) গুপ্ত শিশুহত্যা সম্পর্কীত আল ইরাকীর আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। তিনি দু'টি হাদীসকেই প্রামাণিক এবং সহীহ মনে করেছেন তবে গুপ্ত শিশু হত্যা বা ক্ষুদ্র শিশু হত্যা এক নয় মন্তব্য করেছেন।

যখন আল্লাহর রাসূলের নিকট উল্লেখ করা হল যে ইহুদীগণ 'আযলকে গুপ্ত শিশু হত্যা বলে মনে করে, তখন তিনি মন্তব্য করেন যে, এটি মিথ্যা। কিন্তু শিশু হত্যা হল বাস্তব শিশু হত্যা কিন্তু 'ইযল বাস্তব শিশু হত্যা নয়। এ অর্থেই ইহুদীদের ধারণটি ভুল। রাসূল (সা.) বলেছেন 'আযল গুপ্ত শিশু হত্যা। গুপ্ত শিশু হত্যার মধ্যে কোন বাস্তব শিশু হত্যা নেই। এর মধ্যে শিশু হত্যার উদ্দেশ্য থাকে। শিশু হত্যার আরবী শব্দ হল 'ওয়াদ'। 'ওয়াদ' এবং 'আযলের মধ্যে অতিরক্ত সন্তান না পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'ওয়াদ' এর মধ্যে উদ্দেশ্য ছাড়াও বাস্তব হত্যা থাকে। 'আযলে থাকে শুধু উদ্দেশ্য এবং এপর্যায়েই কাজটি শেষ হয়। শিশু হত্যার উদ্দেশ্যটি প্রশংসনীয় নয় কিন্তু উদ্দেশ্যের জন্যে কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। এভাবে ইবনে হাজর (র.) দু'টি হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।[২৭৭]

২৭৬। Cited in al-Praqis, Tarh, vol. 7, p. 39; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
২৭৭। Ibn Hagar, op. Cit., pp. 248-249

Dhaka University Institutional Repository

আল 'আয়নী; (র.) (মৃ. ১৪৫১)[২৭৮]

সহীহ আল বুখারীর ভাষ্যকার বদরুদ্দীন 'আয়নী (র.) বলেন, জুমা বর্ণিত হদীসটি দ্ব্যর্থবোধক। ইবনে আল আরাবীও তা-ই মনে করেন। জুদামা বর্ণিত হাদীসের বিপরীত অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ। তাঁর বর্ণনাটির সমর্থন পাওয়া যায় হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (র.) ও হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে। বিশ্বাস যোগ্যতার দিক দিয়ে হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা.), আবূ সা'ঈদ খুদরী এবং আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে জুদামা বর্ণিত হাদীসের তুলনা হয় না। মককা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এতে মনে হয় তাঁর বর্ণিত হাদীসটি পরবর্তী কালের। তবে তিনি মককা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এরুপ বর্ণনাও আছে।[২৭৯]

আশ্ শাওকানী (র.) (মৃ. ১৮৩০)[২৮০]

ইমাম আশ্ শাওকানী (র.) তাঁর রচিত 'নাইলুল আওতার'- এ আযল সম্পর্কীত বিভিন্ন মন্তব্য পর্যালোচনা করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপণিত হয়েছেন যে, জুদামা বর্ণিত হাদীস দ্বারা 'আযল অবৈধ হয় না। হযরত জাবির (র.) এবং অন্যান্যের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত যে সাহাবীগণ 'আযল করতেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) তা জানতেন এবং তিনি তা নিষিদ্ধ করেননি। জুদামা (র.) বর্ণিত হাদীসটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এ হাদীসটি 'আযল সংক্রান্ত শেষ বাক্যটি ৪টি বিখ্যাত সুনান সংকলনে স্থান পায়নি।[২৮১]

২৭৮। বদরুদ্দীন আয়নী (র.) নাম: বদরুদ্দীন, উপনাম: আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম: আহমদ। তিনি আয়নতাবী নামক স্থানে ৭২৫/১৩২৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কায়রোতে যান এবং বাড়ী ঘর করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পান্ডিত্ব অর্জন করত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর সধ্যে সহীহ বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থ 'উমদাতুল কারী' সার্বশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৮৫৫/১৪৫১ সনে ইন্তিকাল করেন। (উমদাতুনা কারী, (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়া আততুয়াছ আল আরাবী, তা.বি) খণ্ড-৩, পৃ. ২-৮

২৭৯। Al-Ayni, Qmdat, vol. 20, p. 195

২৮০। আশ্ শাওকানী: তাঁর নাম মুহাম্মদ। পিতা: আলী ইবনে মুহাম্মদ। বাহরাইনের 'শাওকান' শহরের প্রতি তাঁর পূর্ব পুরুষের সম্বন্ধ থাকায় তাঁকে শাওকানী বলা হয়। ইয়ামানের 'সান'আ' শহরের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও ইয়ামানের বিচারপতি ছিলেন। তাফসীর, ফিকহ, উসূল প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ফাতহুল কাদীর, নাইলুল আওতার, ইরশাদুল ফুহূল প্রভৃতি তার অমর রচনা। তিনি ১২৫০/১৮৩৪ সনে ইন্তিকাল করেন। (আল-মুফসসিরুন, খ- ২, পৃ. ২২৩)

২৮১। Al- Shawkani, op. Cit., vol. b, pp. 346-50

Dhaka University Institutional Repository

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদদের ধারণা

১. শায়খ এম, এস, মাদকুর (র.):

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাধারা শীর্ষক আরবী ভাষায় রচিত একটি পুস্তিকা শায়খ এম, এস মাদকূর (র.) ইমাম হাজম (র.) মতই পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করে দেখেছেন। ইমাম হাজম (র.)-এর মত খণ্ডনের লক্ষ্যে প্রথমে তিনি নিম্নোক্ত যুক্তি গুলো উপস্থাপন করেছেন ঃ

১. ইবনে হাজম (র.) জুদামা (র.) বর্ণিত হাদীসটি পরবর্তীকালের বর্ণনা বলেছেন এবং এর দ্বারা পূর্ববর্তী হাদীসগুলো বাতিল হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন। এ ধারণার জন্যে হাদীস বর্ণনার সময় সংক্রান্ত তথ্য প্রয়োজন, কিন্তু তা পাওয়া যায়নি।

২. দু'ধরনের হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়, যদি আমরা মনে করি 'আযল মাকরুহ তানযিহি।

৩. হযরত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ 'আযল অপছন্দ করতেন। ইবনে হাজম (র.)-এর বর্ণনার সাথে অবশ্য প্রামাণ্য হাদীসের অসংগতি রয়েছে।

৪. ইবনে হাজম (রা.) দাবী করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) 'আযল করেননি। এটা তেমন প্রয়োজনও নয় যে, সকল সাহাবী যা বৈধ সেরুপ সকল কাজই করবেন। যা বৈধ তা করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে কিন্তু তা করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

৫. ইমাম ইবনে হাজর (র.) জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসগুলোর বিশ্বস্ততা স্বীকার করেছেন; কিন্তু কোন মন্তব্য করেননি।

৬. শায়খ মাদকূর (র.) প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যদি 'আযলের বৈধতা পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে থাকে, তবে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর ন্যায় সাহাবীগণ পরবর্তীকালে তা তাঁদের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করতেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো এই যে, আল্লাহর রাসূলের ইন্তিকালের বহু পরে হযরত ওমর (রা.) অন্যান্য সাহাবীদের উপস্থিতিতে 'আযল যে শিশুহত্যা বা 'ওয়াদ' নয় তা কুর'আনের আয়াতের উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর এ বিষয়ে ভিন্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কষ্টকর।[২৮২]

২৮২। Madkour, Nazrat, pp. 68-69; আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১; প্রফেসার মুহাম্মাদ আব্দুল হক, প্রগুক্ত, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

২. শায়খ ড. সা'ঈদ রামাদান আল বুত্তী (র.) :

শায়খ আল বুত্তী (র.) পরিবার পরিকল্পনা আন্দোদল বিরোধী, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলোর বিরোধী নন। তাঁর রচিত এবং ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত "Birth control: Preventive and Curative Aspect" পুস্তকে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ৮টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের ১.১, ৬.৩, ৬.২, ৬.১, ২.১, ৩.১, ৮.১ এবং ৯.২ নং হাদীস সমূহে তাঁর বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। তাঁর মন্তব্যগুলো নিম্নরুপঃ

১. যদি জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি আমরা বাদ দেই, তবে গর্ভনিয়ন্ত্রণের জন্যে 'আযল যে বৈধ এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও হাদীসগুলোর বর্ণনাতে কিছুটা কারাহা বা নিষিদ্ধতার ভাব আছে।

২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসগুলো খুবই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু কয়েকটি হদীসের দু'ধরণের অর্থ করা যায়। এত বৈধতার উপর সন্দেহের ছায়াপাত হয়।

৩. 'আযল' সম্পর্কে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় ঐ হাদীসটি দ্বারা যাতে আল্লাহর রাসূল (সা.) 'আযল অনুমোদন করেছেন।

৪. জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে উলামাগণ ৪টি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন :

ক) জুদামা বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে 'আযলকে মাকরুহ তানযিহি বলা যায়। যেমন, ধারণা করেছেন ইমাম নবুবী (র.) ইমাম তাহাভী (র.)

খ) জুদামা বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।

গ) 'আযল প্রথমে নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর তা অনুমোদিত হয়। কিন্তু এমত প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হাদীস গুলোর বর্ণনার তারিখ বা কাল দরকার হয় কিন্তু তা নেই।

ঘ) 'আযলের নিষিদ্ধতাই সঠিক যেমন ধারণা করেছেন ইমাম ইবনে হাজম (র.)।[২৮৩]

ইমাম হাজম (র.) জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসেছেন ঃ

ক) জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল এরূপ ধারণা করার সংগত কারণ নেই। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে 'আযল গুপ্ত শিশুহত্যা। এরদ্বারা 'আযল নিষিদ্ধ বা অবৈধ বলা হয়নি। গুপ্ত শিশুহত্যার মর্ম এখানে 'কারাহা তানাযিহী' যাতে প্রতিফলিত হয়।

খ) এরুপ কোন কারণ নেই যে প্রথম দিকে আযল নিষিদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীকালে অনুমোদিত হয়েছে। এধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে হাদীস বর্ণনার তারিখ বা কাল দরকার যা পাওয়া যায় না।

২৮৩। প্রগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

গ) ইমাম ইবনে হাজম (র.) দাবী করেছেন যে, জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসগুলো বাতিল হয়ে গেছে। এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে, হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে দেখা যায় সাহাবীগণ 'আযল করতেন এবং তা রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত এ বৈধতা স্বীকৃত ছিল। যদি তা অবৈধ বলে ঘোষিত হত হযরত জাবির (রা.) অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু তার থেকে তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ঘ) হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটির বিপরীত অর্থবোধক আরো বহুসংখ্যক হাদীস পাওয়া যায় যাতে 'আযল যে, শিশুহত্যা নয় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ঙ) ইবনে হাজর (র.) অন্যান্য বহু ফকীহদের মত অনুস্বরণ করে 'আযল সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। তা সম্ভব হয় যদি আমরা আযলকে অবৈধ মনে না করে কারাহা তানযিহী মনে করি।

শায়খ আল বুত্তী (র.) কিয়াস বা তুলনামূলক উপমার মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিগুলোর বৈধতা বিরুপণের নীতি গ্রহণীয় বলে মন্তব্য করেছেন।[২৮৪]

শায়খ ড. এম. আল মাককী আল নাসিরী মাগরেব (র.)

শায়খ মাককী আল নাসিরী মাগরেব মরক্কো- এর উলামা কাউন্সিলের প্রধান। জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি বিশ্লেষণ করে তিনি যে মতে এসেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটির ফলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ 'আযল সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন এবং হাদীসগুলো সমঞ্জস্য বিধাণের চেষ্টা করেছেন। তারা সিদ্ধান্তে এসেছেন 'আযল একটি অনুমোদিত পদ্ধতি। ইমাম গাযালী (র.) এর 'ইহইয়া আল উলুমুদ্দিন' এর ভাষে মুরতাদা আল জাবিদী। এ ভাষ্যে এবং শাওকানীর 'নায়ল আল আওতার' কিতাবে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে।

ইসলামীচিন্তাবিদ এক গ্রুপের বক্তব্য হলো জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা তানযিহি বা এই কাজ ঠিক কিনা দেখতে হবে মূল্যবোধের ইংগিত রয়েছে অর্থাৎ যৌন সংগমের সঠিক, ত্রুটিমুক্ত, সংগত প্রক্রিয়া হলো যথাস্থানে বীর্যপাত করা।

যৌনীর বাইরে বীর্যপাত করা ত্রুটিমুক্ত সংগত বা প্রশংসিত কর্ম নয়। এঅর্থেই গুপ্ত শিশুহত্যা কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা 'আযল নিষিদ্ধ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

২৮৪। Al-Boutti, Mas'alat, pp. 20-24; আবদেল রহীম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

"চিন্তাবিদদের এ গ্রুপের মতে শিশুহত্যার মধ্যে দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি হলো কাজটি করার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি হলো বাস্তবে কাজটি করা। কাজ হলো বাস্তব, সুস্পষ্ট। কিন্তু 'আযলের মধ্যে বাস্তব শিশুহত্যা নেই একটি উদ্দেশ্য আছে। এজন্যেই "গুপ্ত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইবনে কাইয়্যিমের মতও তাই।"

শায়খ আল মাককী আল-নাসিরী (র.) আরও বলেছেন:

ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে আর এক গ্রুপ হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা যে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, এ হাদীসটি পরীক্ষান্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রমাণিত হয়। পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য হাদীসের সাথে এর স্ববিরোধীতা আছে।

জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি স্তন্যদান সম্পর্কীয় সা'ঈদ ইবনে আবী আয়ুব সেভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ আল-আসাদ এর বর্ণনাতেও স্তন্যদান সম্পর্কীয় অংশটি আছে 'আযল' সম্পর্কীয় অংশ নেই। এ হাদীসে মালিক এবং ইয়াহইয়া বর্ণিত অংশেও 'আযলের কথাটি নেই।

জুদামা (রা.) বর্ণিত স্তন্যদান সংক্রান্ত হাদীসে 'আযল' সংক্রান্ত যে অংশটি যুক্ত আছে তা খুব মজবুত নয়। কারণ, ৪টি বিখ্যাত সুনান সংকলনের 'আযল সংক্রান্ত এই অংশটি একই হাদীসে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সংকলনে যে বর্ণনা আছে তার সাথে স্ববিরোধী।

শায়খ আল মাককী আল নাসিরী (র.) আরও উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আত তাহাভী (র.)-এর বর্ণনায় অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত অংশটি বাতিল।[২৮৫]

২৮৫। Al- Makki al- Nasiri in Rabat proceedings vol. 2, pp. 53-4; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩, ১৯৪

সার সংক্ষেপ পর্যালোচনা

বহুসংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদদের আলোচনা বিশ্লেষণ করে উপরের আলোচনাতে ‘আযল সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেনীবিভাগ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক) মজবুত, দ্ব্যর্থহীন, সমর্থন সূচক হাদীস

৩য় গ্রুপ: হাদীস নং – ৩.১, ৩.২, ৩.৩

১ম গ্রুপ: হাদীস নং – ১.১, ১.২, ১.৩

২য় গ্রুপ: হাদীস নং – ২.১, ২.২, ২.৩, ২.৪

৫ম গ্রুপ: হাদীস নং – ৫.১, ৫.২

৪র্থ গ্রুপ: হাদীস নং – ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, ৪.৫

৭ম গ্রুপ: হাদীস নং – ৭.১, ৭.২

৯ম গ্রুপ: হাদীস নং – ৯.১, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৫, ৯.৬, ৯.৭

খ) দ্ব্যর্থবোধ হাদীস

৬ষ্ঠ গ্রুপ: হাদীস নং – ৬.১, ৬.২, ৬.৩, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬

উপরোক্ত হাদীসে ‘আযলের পক্ষে এবং বিপক্ষের কথা থাকলেও ‘আযলের’ সমর্থন সূচক অন্যান্য হাদীসের আলোচনা এবং বাগধারা সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে যেটুকু দ্ব্যর্থতা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, তা দূরীভূত হয়ে যায়।

গ) ‘আযল বিরোধী হাদীস

৮ম গ্রুপ: হাদীস নং – ৮.১

৯ম গ্রুপ- এ উল্লেখিত আযলের সমর্থকসূচক ৭টি হাদীসের প্রেক্ষাপটে ‘আযলের বিরোধী একটি হাদীসের বর্ণনা ম্লান হয়ে যায়।

ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রখ্যাত ফকীহদের আলোচনা, পর্যালোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তাহলো ‘আযলের বৈধতা। তবে বক্তব্য এই যে, ‘আযল’ ‘কারাহা তানযিহী’। ‘কারাহা তানযিহী’ যার অর্থ হলো, সর্বোত্তম, উৎকৃষ্ট এবং নির্দোষ পন্থা হতে কিছুটা বিচ্যুতি। কিন্তু তা ‘মাকরুহ তাহরিমা’ নয়। ‘আযলের বৈধতার আরও একটি শর্ত হলো স্ত্রীর সম্মতি।[২৮৭]

২৮৭। আবূ দাউদ শরীফের টীকাংশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫

বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা

বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ করে "আযল" সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে মতানৈক্য থেকে মতনৈক্য অনেক বেশী। প্রত্যেক মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠর অভিমত আমরা এ পর্যায়ে আলোচনা করব।

হানাফী মাযহাব :[২৮৮]

হানাফী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের অভিমত হলো গর্ভনিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া হিসেবে "আযল" বৈধ। তবে, স্ত্রীর সম্মতি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। পূর্বেকার 'উলামায়ে কিরাম ও অধিকতর স্বীকৃত অভিমত হলো স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া 'আযল বৈধ নয়। পরবর্তীকালের 'উলামাদের অনেকেই গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্ত্রী বা স্বামীর সম্মতির প্রয়োজনীয়তার উপর কিছুটা নমনীয়।

ধর্মীয় অবক্ষমের পরিবেশ ও যুগে (ফাসাদ আল জামান) এবং নৈতিক চরিত্র বিহীন সন্তান সন্তুতি (আল আওলাদ আস সূ') হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত স্বামী 'আযল করতে পারেন এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতীত স্ত্রী গর্ভনিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম-এ-আজম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর দু'শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ আল- সায়বানীর অভিমত হলো স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে 'আযল বৈধ।[২৮৯]

২৮৮। হানাফী মাযহাব: ইমাম আবূ হানীফা (র.) নুমান বিন সাবিত বিন জাওতা এর নামানুসারে হানাফী মাযহাবের নামকরণ হয়। ৬৯৯ খৃ. ইরাকের কুফায় হযরত আবূ হানীফার জন্ম হয়। আববাসীয়দের ক্ষমতা দখলের প্রায় ১৭ বছর পর ৭৬৭ খৃ. বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইসলামী ফিকাহ-এ তাঁর অবদান এত অধিক ছিল যে, মুসলিম বিশ্বে তিনি 'আল ইমাম আল আজম' বা প্রধান ইমাম নামে খ্যাত। কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ছাড়াও তিনি ইস্তিহছান নামে ইসলামী ফিকহের একটি উৎসের উন্নয়ন করেন। ইস্তিহছান হলো ফকীহদের রায়, ফয়সালা বা অগ্রাধিকার যোগ্য মতামত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর প্রধান দু'জন সহকারী বা শিষ্য ছিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (মৃ.৭৯৮ খৃ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ আল শায়বানী (র.) (মৃ. ৮০৫ খৃ.).যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.), তাঁর দু'জন শিষ্য এবং মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণ পূর্ববর্তীদের অনুকরণে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতেন, তাই এ মাযহাবের ইমামদের বলা হতো "আহালুর রায়" বা যুক্তিপূর্ণ মতের অনুসারী।

হানাফী মাযহাব সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আববাসীয় এবং উসমানীয় খিলাফতে ইহাই সরকারী ফিকহিয়া মাযহাব হিসেবে স্বীকৃত। (আবদেল রহিম উমরান, ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ.২০৩- ২০৭)

২৮৯। ইমাম আল- খাওয়ারিজমী, জামী মাসানিদ আল- ইমাম আল- আজম, খ.২, পৃ. ১১৮-১১৯

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী মাযহাবের অপর এক দিকপাল ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত তাহাভী (র.) (মৃ.৯৩৩ খৃ.) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শরহে মানি আল আসার'- এ 'আযল' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।এ আলোচনায় বিরুপমত প্রতিফলিত হয়নি। আল্লাহর রাসূল (সা.) কে যখন এসম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে নির্দেশ দেননি।[২৯০]

ইমাম তাহাভী (র.) এ অভিমত বিশেষ করে হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল কাসানী (মৃ. ১১৯৮ খৃ.) তাঁর বাদায়ী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে স্ত্রী সম্মতি ভিন্ন 'আযল পরিহারযোগ্য বা মাকরুহ। এ মাকরুহ মাকরুহে তাহরিমার নিকটবর্তী। তাঁর সাথে, সন্তান জন্মের পদ্ধতি হলো বীর্যপাত এবং তা স্ত্রীর অধিকার।'আযলের মাধ্যমে স্ত্রীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্ত্রী যদি সম্মতি দেয় তা'হলে 'আযল' মাকরুহ নয়।[২৯১]

ইমাম আল মারগিনানী (র.) (মৃ. ১১৯৭ খৃ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়াহ-তে স্ত্রীর সম্মতি সংক্রান্ত প্রাচীণ মতেরই পুনরুল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আযলের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের বেলায় স্ত্রীর সম্মতি অপরিহার্য। [২৯২]

ইমাম আল কামাল ইবনে আল হুমাম (র.) (মৃ. ১৪৫৭ খৃ.) তাঁর অতি বিস্তারিত ভাষ্য গ্রন্থ 'শরহে ফাতহ আল কাদীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ 'উলামার মতে, 'আযল' বৈধ। তিনি 'আযলের জন্যে স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন এ বিষয়ে মাশহুর মতের সঙ্গে একমত পোষণ করে তার সাথে আরও বলেছেন যে, কোন জাতির অবক্ষয় এবং দু:খের সময় যদি সন্তানদের আখলাকী অবক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে স্ত্রী সম্মতি ছাড়াও 'আযল করা যেতে পারে, সামাজিক পরিবেশগত কারণে তাঁর মতে বা স্বামী যে কেউ অন্যজনের সম্মতি ছাড়াও গর্ভনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।[২৯৩]

২৯০। ইমাম আবূ জফির আত তাহাভী (র.), শরহে মানি আল আসার, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়াহ, খ.৩য়, ১৯৭৯, পৃ. ৩৪-৩৫

২৯১। আল কাসানী, বাদায়ী, খ.২, পৃ. ২৩৪-২৩৫

২৯২। আল মারগিনানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

২৯৩। ইমাম কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহীদ ইবনে আল হুমাম (র.) শারহে ফাতহ আল কাদীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

ইমাম ইবনে খ্যুজাইম (র.) (মৃ. ১৫৬২ খৃ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল বাহর আর রাইক' এ উল্লেখ করেছেন যে সঠিক ধর্মী অভিমত হলো স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে 'আযল বৈধ। তাঁর মতে দোষণীয় পরিবেশ ও সামাজিক অবক্ষয়ের সময় 'আযলের সময় স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন নেই। গর্ভনিরোধের জন্যে তিনি স্ত্রী কর্তৃক গ্রহণীয় পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন।[২৯৪]

উনবিংশ শতাব্দির ফকীহ ইবনে আবদীন তাঁর রচিত 'রাদ্দ আল মুহতার' এবং 'মিনহাত আল খালিক' কিতাবে স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে 'আযলের বৈধতা সম্পর্কীয় হানাফী মাযহাবের 'উলামাদের মতের উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে খারাপ অবস্থায় এবং বিশেষ কারণে সম্মতির প্রয়োজন নেই তা-ও উল্লেখ করেছেন। যদি স্বামী– স্ত্রী কষ্টসাধ্য সফরে থাকেন তবে সম্মতি ছাড়াই 'আযল অবলম্বন করা যেতে পারে। তিনি সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরণের বিষয়ের যে পরিবর্তন হতে পারে তা-ও উল্লেখ করেছেন।[২৯৫]

মালিকী মাযহাব : [২৯৩]

মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহর মতে গর্ভনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে 'আযল বা যৌনীর বাইরে বীর্যপাত বৈধ। কোন কোন ফকীহ এর মতে প্রকাশ যে, যৌনীতে বীর্যপাত করা স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার। যদি তিনি দাবী করেন তবে তাঁকে এ অধিকার বা আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ফকীহ বা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.) এর অবস্থান ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[২৯৪] ইমাম মালিক বিন আনাস (র.) রচিত মুয়াত্তায় 'আযল সম্পর্কীয় ৭টি প্রামাণ্য হাদীস স্থান পেয়েছে।

২৯৪। ইমাম ইবনে ন্যুজাইম (র.), আল বাহর আর রাইক, খ. ৩, পৃ. ২১৪-২১৫

২৯৫। ইমাম ইবনে আবদীন, রাদ্দ-আলমুহতার, আলা দুররি- আল-মুখতার, পৃ. ৫৬৮; মিমহাত, খ.৩, পৃ. ২১৪-২১৫; আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

২৯৩। মালিকী মাযহাব : ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.) ৭১২ খৃ. মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯৫ খৃ. তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে মদীনায় উদ্ভূত এ মাযহাবের নামকরণ করা হয়। ইমাম মালিক (র.) বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহর রাসূলের বাণী, সাহাবীদের চাল চলন এবং সাহাবীদের সঙ্গী, তাবেয়ীদের জীবন পদ্ধতি হলো ইসলামের উৎকৃষ্টতম মডেল। তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে খোঁজ নিতেন এ বিষয়ে মদীনার লোকদের চাল-চলন কিরুপ। তাঁর নেতৃত্বে উন্নীত মাযহাবে হাদীসের গুরুত্ব সর্বাধিক। মদীনার 'উলামাদের বলা' হতো 'আহলুল হাদীস' বা হাদীসের অনুসারী। ইমাম মালিক তার 'ফিকহিয়া মাযহাবে' ইজমা এবং কিয়াসকে ফিকহের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে, ইজমা এবং কিয়াস মদীনার 'আলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ইমাম মালিকের অবির্ভাব ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পরে। তিনি ইমাম আবূ হানীফার প্রবর্তিত 'ইস্তিহছানকে ফিকহের উৎস হিসেবে ধরেছেন। তবে এর প্রয়োগ সীমিত করেছে। তিনি আল 'মাছালিহ আল মুরসালা' অর্থাৎ জনকল্যানকেও ইসলামী আইনের একটি নীতি বা উৎস হিসেবে উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। মিশর, হেজাজ, উত্তর আফ্রিকা, এবং আন্তালোসিয়ার মালিকী মাযহাব প্রসার লাভ করে। পশ্চিম আফ্রিকা এবং পশ্চিম সুদানে ইহা বর্তমানে প্রধান মাযহাব। (আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭)

২৯৪। Al- Shafe`i Comment in Al- Muwatta; edited ley M. Auel Bapui, front page.

২৯৫। ইমাম মালিক, মুয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৪৬৪

৩, ৪, ৫, ৬। ইমাম মালিক (র.) ‘আযল সম্পর্কে হযরত সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) (২) আবূ আইউব আনসারী (রা.) (৩) ‘আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং (৪) ‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ ৪ জন সাহাবীর মধ্যে হযরত সা‘দ বিন আবী ওয়াককাস (রা.), আবী আইউব আল- আনসারী (রা.) এবং ‘আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নিজেরাই ‘আযল করেছেন। হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ‘আযল’ করেননি এবং ‘আযল’ পছন্দ করতেন না।

৭, ইমাম মালিক (র.) তাঁর মুয়াত্তাতে হযরত জাদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হযরত জুদামা বর্ণিত হাদীসটির দু‘টি অংশের একটি অংশ ‘আল-খায়ল’ বা শিশুকে স্তন্যদান সম্পর্কে। দ্বিতীয় অংশটি আযল সম্পর্কে, কিন্তু, ইমাম মালিক জুদামা বর্ণিত হাদীসের ‘আযল সংক্রান্ত অংশটি উল্লেখ করেননি। ফলে এ অংশটির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

‘আযল সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করে ইমাম মালিক (র.) তাঁর মতামত তাঁর গ্রন্থ মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতই মালিকী মাযহাবের মত হিসেবে পরিগণিত। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত কোন পুরুষ ‘আযল করবে না।”[২৯৬] অর্থাৎ স্ত্রীর সম্মতিতে ‘আযল বৈধ।

‘আযল সম্পর্কে ইমাম মালিকের অভিমত বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন মদীনাবাসী। তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবাদ ছিল।“ লা- ইউফতা ওয়া মালিক ফিল মদীনা” অর্থাৎ মাকি যখন মদীনায় থাকেন, তখন কারো ফাতওয়া দানের দু:সাহস করা উচিত নয়,

মালিকী মাযহাবের ইমাম আল কুরতবী (র.) (মৃ. ১২৭২ খৃ.) তাঁর রচিত ‘আল জামী লি আহকাম আল-কুর’আন’ গ্রন্থে লিখেছেন, বীর্য আপনা আপনিই সন্তান নয়। যদি কোন নারী তা বের করে দেয়, এতে কোন দোষ হয় না। তবে তা যদি জরায়ুতে স্থাপন করা হয় তা ভিন্ন কথা। এতে দেখা যায় যে, জরায়ুতে পৌঁছা পর্যন্ত কোন প্রকারে বীর্য বের হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বীর্য জরায়ুতে স্থাপিত বা জরায়ূর গাত্রে সংযুক্ত হয়ে গেলে তা বের করা ঠিক নয়।[২৯৭]

২৯৬। ইমাম মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪-৫৯৬

২৯৭। আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতবী, আল-জামী লি আহকাম আল- কুর’আন, (কায়রো: দার আল হাদীস, মিশর- ১৯৯৬, খ. ১২পৃ. ৮

শাফি‘ঈ মাযহাব :[২৯৮]

ইমাম শাফি‘ঈ (র.)-এর ‘শাফি’ঈ মাযহাবের সর্বজনবিদিত অভিমত এই যে, ‘আযল’ বৈধ এবং স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও বৈধ। যদি এর মধ্যে কিছু অপছন্দনীয় থাকে তা মাকরুহ তানযিহী অথবা তুচ্ছ বা মার্জনীয়। যখন শাফি‘ঈরা বলে থাকে যে, এটা মাকরুহ অথবা অপছন্দনীয়, তবে যা বুঝানো হয়ে থাকে তাহল এই যে, এটা অতি উত্তম আচরণ থেকে একটু নিম্নস্তরের।

ইমাম শাফি‘ঈ (র.) (মৃ. ৮২০ খৃ.) পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করতেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) তাঁর মতের উদ্ধৃতি এভাবে দিয়েছেন, ‘কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ‘আযল করতেন বা ‘আযলের অনুমতি দিতেন এবং এর মধ্যে দোষণীয় কিছু পাননি। ইমাম শাফি‘ঈ সূরা নিসার ৩য় আয়াতে ذلك ادنى الا تعولوا এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রনিধাণযোগ্য। চারজন স্ত্রীর পরিবর্তে একজন স্ত্রী থাকলে তাতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ কথাটির ব্যাখ্যা প্রসারিত করে সন্তানের সংখ্যা সীমিত হবে পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে।[২৯৯] অর্থাৎ স্ত্রীর সংখ্যা কম তথা একজন সীমিত থাকলে সন্তানের সংখ্যাও কম হবে।

শাফি‘ঈ মাযহাবের আর এক দিকপাল ইমাম গাযালী (র.) (মৃ. ১০৫৮ মৃ. ১১১১ খৃ.) ‘আযল সম্পর্কে তাঁর লেখার মধ্যেই সর্ব প্রথম সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। ‘আযল বা গর্ভনিরোধ সম্পর্কীয় আধুনিক চিন্তাধারা সকল সূত্রের ইঙ্গিত তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। ইমাম গাযালী (র.) ‘আযল সম্পর্কে অতীত মতামতের পর্যালোচনা করেছন এবং সিদ্ধন্তে উপণীত হয়েছেন যে, ‘আযল সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সঠিক এবং বৈধতার বিষয়ে ইসলাম উদার। তৎকালিন জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিবেশে বা ব্যক্তিগত কারণে অনেকেই ‘আযল পছন্দ করতেন না।

২৯৮। শাফি‘ঈ মাযহাব ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফি‘ঈ ৭৬৭ খৃ. প্যালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর মক্কায় কাটে, তাঁরপর ও তিনি অনিদৃষ্টকাল মক্কায় ছিলেন। পরে তিনি বাগদাদে চলে যান। পরে তিনি মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ৮২০ খৃ. তিনি মিশরেই মৃত্যুবরণ করেন। শাফি‘ঈ মাযহাবকে মালিকী ও হানাফী মাযহাবের মধ্যবর্তী মাযহাব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ইমাম মাফি‘ঈ যেকোন বিষয়ে কুর’আন ও হাদীসের দারস্থ হতেন। তিনি কোন সহীহ হাদীসকে পরিহার করতেন না। তাঁর অনুসারী ইমাম আন নববী (র.) এবং ইমাম বায়হাকী (র.) ও একই ধরণের প্রজ্ঞা এবং গুণে গুণান্বিত হন। ইমাম শাফি‘ঈ মতে, ইজমা হতে হবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর। এখানে উম্মাহ বলতে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী ফিকাহ সম্পর্কে গবেষণাকেন্দ্র এবং ‘উলামাদের বুঝানো হতো। কুর’আন ও হাদীসে কোন বিষয় সুস্পষ্ট থাকলে ‘উলামাদের ইজমা কোন সমস্যাই নয়। কেহ দ্বিমত প্রকাশ করলে এবিষয়ে তৃতীয় মতের প্রয়োজন হয় না। নীরবতাব মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এ বিষয়ে কুর’আন হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সে বিষয়ে ‘উলামাদের একমত হওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন সমস্যা।

ইমাম শাফি‘ঈ ইসলামী ফিকাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা, ধারণা সুনিশ্চিত করেন ইরাকে। অত:পর তিনি মিশরে চলে যান এবং সেখানে তাঁর ফিকাহর চুড়ান্ত রুপ দেন। ইমাম নববী (র.) বায়হাকী (র.) এবং ইমাম গাযালী (র.)-এর চিন্তাধারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পুষ্ট হয়ে শাফি‘ঈ মাযহাব মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল প্রসারিত হয়। (আবদেল রহিম উমরান, ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২০৯)

২৯৯। আল শারাবাচ্ছি, আদ-দ্বীন, পৃ. ১০৪-১০৬

কিন্তু তা অবৈধতার কারণে নয় বরং সর্বোত্তম পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতির কারণে। ইমাম গাযালী (র.) এর মতে, 'আযল হত্যাও নয়। শিশু হত্যা নয় এবং গর্ভপাত ও নয়, তাঁর মতে 'আযল বা যোনীর বাইরে বীর্যপাত অবৈধ নয়। কিন্তু শুক্রকীট এবং নারীর ডিম্বানুর মিলনে ভ্রুণ সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর ভ্রুণ জঠর থেকে বের করে নিয়ে আসা অবশ্যই অবৈধ এবং পাপ।

ইমাম গাযালী (র.) এর মতে, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কারণে 'আযল বৈধ। স্বামীকে আনন্দ প্রদানের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার কারণে সন্তান বেশী হলে অর্থনৈতিক হয়রানীর সৃষ্টি হতে পারে। তাকওয়ার জন্য স্বল্প সংখ্যক সন্তানই সুবিধা।

ইমাম গাযালীর মতে, 'আযল অবৈধ করার কোন যুক্তি নেই এবং 'আযল অবলম্বন করার শর্ত সংশ্লিষ্ট করারও প্রয়োজন নেই। বিয়ে না করা অথবা বিয়ে বিলম্বিত করা যদি হারাম বা অবৈধ না হয় তবে গর্ভধারণ বিলম্বিত বা পরিহার করাও হারাম বা অবৈধ হতে পারে না।[৩০০]

ইমাম নববী (র.) (মৃ. ১২৭৭ খৃ.) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের আর একজন সুবিখ্যাত ফকীহ। তার মতকে কেহ কেহ 'আযল বিরোধিতা করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম নবুবী (র.) তাঁর রচিত সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে লিখেছেন "আমাদের মতে সর্বাবস্থায় 'আযল মাকরুহ, স্ত্রীর থাকুক আর না থাকুক। কারণ, 'আযলের ফলে সন্তান সংখ্যা সীমিত করা হয়। প্রকৃতার্থে নিষিদ্ধতা বলতেও এখানে 'কারাহায়ে তানযিহিয়া' বুঝানো হয়েছে। আবার বৈধতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হল 'আযল অবৈধ নয়, কিন্তু এর দ্বারা এ অর্থও করা ঠিক হবে না যে, এটা একটা পছন্দনীয় কাজ। [৩০১]

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইমাম হাফেজ আল- ইরাকী এবং তাঁর পিতা আবদেল রহমান ইবনে আল হুসাইন আল ইরাকী 'আযল সম্পর্কে দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে 'আযল বৈধ এতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে যদি স্ত্রী সম্মতি না দেয় তাহলেও তা আইনগত ভাবে বৈধ।

৩০০। ইমাম আল-গাযালী (র.) প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩-৫৪

৩০১। ইমাম আল নববী (র.) শরহে মুসলিম, দার আল ইয়াহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত: ২য় সং, ১৯৭২, খ. ১০, পৃ. ৯-১০

শাফি‘ঈ মাযহাবের তিনজন ফকীহ ‘আযলকে অনুমোদিত মনে করছেন। তাঁরা হলেন ইবনে হাব্বান ইবনে ইউনুস (র.) এবং ইবনে আবদেস ছালাম (র.)। কিন্তু হাফেজ আল ইরাকী (র.) এবং তাঁর পিতা উপরোক্ত তিনজনের অভিমতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বর্ণনা করছেন যে, তাদের মাযহাবের মত হল অত্যন্ত উদারভাবে ড‘আযলের প্রতি সমর্থন এবং এটা স্ত্রীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল নয়।[৩০২]

ইবনে হাজার আল আসকালানী (র.) (মৃ. ১৪৪৯ খৃ.) তাঁর রচিত সহীহ বুখারীর ভাষ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন শাফি‘ঈ মাযহাবে ‘আযল বৈধ। শাফি‘ঈ মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণের মতামত পর্যালোচনা করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ মাযহবের কারো কারো মতে, স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে ‘আযল বৈধ। শাফি‘ঈ মাযহাবের কারো কারো মতে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও ‘আযল বৈধ। সহীহ তরিকা হল ইবনে হাজরের মতে ‘আযলের বৈধতা।[৩০৩]

হাম্বলী মাযহাব : [৩০৪]

হাম্বলী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ট ‘উলামা এবং ফুকাহর অভিমত হল যে, স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে ‘আযলের মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণ বৈধ। স্ত্রী তরুণী কিংবা বয়স্কা যে কোন বয়সেরই হোক না কেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীর অভিমত উপেক্ষা করা যায়। শত্রু এলাকায় বসবাসকালে কোন কোন হাম্বলী ফকীহর মতে, ‘আযলের মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনবোধে অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

৩০২। ইমাম আল হাফেজ আল-ইরাকী, তারাহ আতু তাদুরীর, খ. ৭, পৃ. ৫৯-৬৩

৩০৩। ইমাম আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল আসকালানী (র.), ফাতহ আল বারী শাহরে সহীহ বুখারী, মাকতাবা দার আস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব- ১৯৯৭, পৃ. ২৪৪-২৪৯.

৩০৪। হাম্বলী মাযহাব : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আল শায়বানী (র.) ৭৮০ খৃ. বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫৫ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরই নামানুসারে হাম্বলী মাযহাবের নামকরণ হয়। বাগদাদের ফকীহগণ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর প্রভাবে ইস্তিহছান বা ফকীহদের যুক্তিপূর্ণ রায়ের উপর গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) অত্যন্ত কঠোর ভাবে কুর‘আন ও হাদীসের অনুসরণ করতে চাইতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হাদীস সংকলন করেন। তাঁর মুসনাদ অশেষ ক্লেশ ওযত্ন সহকারে সংকলিত হয় এবং প্রামাণ্যতার দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মাযহাবে ইজমা ও কিয়াসের গুরুত্ব অতি নগন্য। তাঁর মতে, অত্যন্ত মজবুত যুক্তিপূর্ণ কিয়াস অপেক্ষা একটি দুর্বল হাদীস ও অগ্রাধিকারযোগ্য। অন্যান্য মাযহার গুলোর মধ্যে হাম্বলী মাযহাবে ফিকাহ সংক্রন্তি বিষয়ে কড়াকতি অত্যাধিক। তার ফলে এর গ্রহণযোগ্যতাও সীমিত। যে যে দেশে অন্যান্য সুন্নী মাযহাব গুলো আছে ঐ সমস্ত দেশে সীমিতভাবে হাম্বলী মাযহাবের অসুশীলন আছে। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ আহলে হাদীস নামেও কোন কোন দেশে পরিচিত। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ১০৩)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (মৃ. ৮৫৫ খৃ.) তাঁর সুবিখ্যাত হাদীস সংকলন মাসনাদে ‘আযল সংক্রান্ত বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন । তাঁর মতে, ‘আযল বৈধ, তবে স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে।[৩০৫] বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ইমাম ইবনে তাইমিয় (র.) বলেছেন, কোন কোন ফকীহ ‘আযল নিষিদ্ধ মনে করেছেন। কিন্তু সুন্নী মাযহাবের চারজন প্রধান ইমাম ‘আযল বৈধ বলে তাদের মত প্রকাশ করেছেন।[৩০৬]

ইমাম জাবিদী (র.) ‘আযলে বৈধতার বিষয়েও ইমাম ইবনে তাইমিয় (র.) এর মতকেই সমগ্র হাম্বলী মাযহাবের মত বলে গ্রহণ করেছেন।[৩০৭]

ইমাম আশ শাওকানী (র.) (মৃ. ১৮৩৯ খৃ.) তাঁর স্বীয় গ্রন্থে নায়ল আল আওতার এ ‘আযলের বৈধতা সূচক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।[৩০৮]

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) (মৃ. ১৩৫০ খৃ.) আযল সম্পর্কে ফকীহদের মতামত বিশ্লেষণ করে ‘আযলের মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যারা হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটির প্রেক্ষিতে ‘আযলের বিরোধিতা করে থাকেন। তিনি তাদের মত খণ্ডন করেছেন। ইবনে কাইয়্যিম ‘আযলের পক্ষে নিম্নের যুক্তিগুলো উল্লেখ করেন ঃ

১. ‘আযল অনুমোদন সূচক পর্যাপ্ত হাদীস আছে।

২. জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা পূর্বের হাদীসগুলো বাতিল করা হয়েছে এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কোন হাদীস কখন বা কোনটি আগে বা পরে বর্ণিত হয়েছে তা জানা দরকার। কিন্তু তা অসম্ভব।

৩. হযরত ওমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের সমর্থনে হযরত আলী (রা.) যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, ‘আযল শিশুহত্যা হতে পারে না।

৪. ইহুদীরা দাবী করত যে ‘আযল “ক্ষুদ্র শিশুহত্যা” বহু সংখ্যক হাদীসে মহানবী (সা.) ইহুদীদের এ মতকে মিথ্যা বলেছেন।

৫. হযরত জুদামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি অন্যান্য হাদীসের সংগে সামঞ্জস্যশীল এবং সুসংগতিপূর্ণ হয় যদি ‘আযলকে ‘কারাহা তানযিহীয়া’ মনে করা হয়।[৩০৯]

৩০৫। আহমদ ইবনে হাম্বল, মাসনাদে আহমদ, সূত্রঃ আবূ দাউদ, পৃ. ১৬৮

৩০৬। আহমদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া, মুখতাছার আল-ফাতওয়া আল- মাছরিয়া, মাতবাআতি আল-মাদানী, কায়রো, মিশর- ১৯৮০, পৃ. ৪২৬

৩০৭। ড. আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৩০৮। মুহাম্মদ ইবনে আল ইবনে মুহাম্মদ আশ শাওকানী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৪৮-৩৫০

৩০৯। ইমাম ইবনে আল-কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬-২১

বিংশ শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

বিংশ শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইসলামী ফিকাহবিদগণের চিন্তাভাবনা, গবেষণা বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছে। এ নব বিশ্লেষণের মধ্যে নতুন সমস্যা, নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীও রয়েছে। অতীতে জনসংখ্যা বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা হতো। কারণ তখন জনসংখ্যা কোন সমস্যা ছিল না। এখন তা সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জনকল্যাণ কর্মসূচী এবং জনসংখ্যানীতি মুসলিম দেশসমূহে নব আংগিকে গৃহীত হচ্ছে। নতুন নতুন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে। মুসলিম সমাজে এগুলোর প্রবর্তন কতটুকু সংগত এবং ইসলাম সম্মত তাও মূল্যায়িত হচ্ছে, কমিটি গঠিত হচ্ছে, জাতীয় ও আন্তজাতিক সেমিনার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নত্তোরে ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞ 'উলামায়ে কিরাম ফকীহ মুফতিগণ কর্তৃক ফাতওয়া জারী হয়। উলামাগণ যে শুধুমাত্র ফিকাহ-এর দৃষ্টিতে মতামত প্রকাশ করেন তা নয়। বাস্তবতা ও পরিবেশের সংযুক্ত হয়ে বিষয়টি জটিল হয়ে উঠেছে। এ সমস্ত দিক এখানে আলোচিত হবে।

বর্তমান শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়নত্রণ সম্বন্ধে ধর্মীয় মতামত এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে আন্দোলিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও গর্ভনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ অনুমোদিত হচ্ছে। অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম মনোভাব অন্যন্ত বিরুপ হচ্ছে।

মুসলিম সমাজের ৯টি মাযহাবের মধ্যে ৮টি মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ জমহুর আল উলামা) র মতে দেখা গিয়েছে যে, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ নিন্দনীয় নয়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যা বিষ্কোরণমূলক সমস্যা রয়েছে সে সমস্ত দেশের ফকীহগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন। অন্য দিকে যে সমস্ত ধনীদেশ সমূহে জনসংখ্যা কোনসমস্যা নয়, সেখান 'আলিমদের সমর্থন সীমিত। তা ছাড়া একই দেশে পরসপর বিরোধী অভিমতও পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ ডব্লিউ আহমেদের এব প্রতিবেদনে দেখা যায় অতীতের 'উলামাদের ফাতওয়ার ভিত্তিতে দেওবন্দী রক্ষণশীল 'উলামা গ্রুপ এর অনেকেই 'আযল সমর্থন করেন। এধরনের বেশ কিছু ফাতওয়া এসেছে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), মুফতী আজিজুর রহমান (র.) এবং মাওঃ রশীদ আহমদ গাংগুহী (র.)-এর ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট থেকে। তা সত্ত্বেও ডব্লিউ আহমদ বলেন অতীতের এ সমস্ত উপমহাদেশ খ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বর্তমান সময়কালীন অনুসারীবৃন্দ পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণে তীব্র বিরোধীতা করে থাকেন। [৩১০]

৩১০। ওয়াজউদ্দীন আহমদ, আল মুজতামা, রাবাত ঘোষণা, খ. ১, পৃ. ৩৩৭

পরিবার পরিকল্পনার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী ইসলামী চিন্তাবিদগণ

ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশ্ব শতাব্দীতে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখা হয়েছে, বহু পুস্তক রচিত হওয়া তা সত্ত্বেও দেখা যায় বেশ কিছু লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী চিন্তাবিদ তীব্রভাবে পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধীতা করে থাকেন। মুসলিম দেশসমূহে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সংক্রান্ত পদক্ষেপ ও প্রকল্পগুলোর বিরোধীতা হচ্ছে। যে যে কারণে মুসলিম চিন্তাবিদগণের কেহ কেহ পরিবার পরিকল্পনা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী, এর অনেকগুলোই পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিরোধী আল কুর'আন থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

তাদের অভিমত হলো:

১. মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ইসলামে অত্যধিক পছন্দনীয়

২. সন্তান জীবনের অলংকার

৩. বিয়ের উদ্দেশ্য হলো সন্তান প্রাপ্তি

৪. গর্ভনিয়ন্ত্রণ 'ওয়াদ' বা শিশুহত্যা

৫. পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী। এতে সন্তান প্রতিপালনে তাঁর সামর্থের উপর সন্দেহ সূচিত হয়।

তদুপরি, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন:

১. পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ইসলামের বিরুদ্ধে একটি যড়যন্ত্র। এর লক্ষ্য মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস, কোন কোন দেশে মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বিলুপ্তি।

২. পরিবার পরিকল্পনার সংগে আসবে অবাধ যৌনাচার, নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশ্চাত্যে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত বিপর্যমের জন্ম দিয়েছে তার বিস্ময় ফল।

৩. তথাকথিত জনসংখ্যা সমস্যা ইসলামী বিশ্বের জন্যে প্রয়োজ্য নয়। কারণ মুসলিম বিশ্বে যে সম্পদ রয়েছে তা দ্বারা বর্তমান জনসংখ্যার কয়েকগুন বেশী জনসংখ্যা প্রতি পালন সম্ভব। [৩১১]

৩১১। ড. আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৫

শায়খ আবূ জাহরা [৩১২]

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শরী'আহ বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ আবূ জাহরা ১৯৬২ সনে 'লিওয়া আল ইসলাম' ম্যাগাজিনে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর তীব্র সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। উক্ত প্রবন্ধে শায়খ আবূ জাহরা (র.) দারিদ্র্যের ভয়ে অথবা দারিদ্র্যের কারণে কুর'আনের সন্তান হত্যা শীর্ষক আয়াতগুলো উল্লেখ করেছেন: ... ولاتقتلوا اولادكم من املاق – نحن نرزقكم واياهم

"তোমরা দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকেও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"[৩১২]

ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق ،نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان حطا كبيرا

"তোমাদের সন্তান দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমি রিযিক দিয়ে থাকি।[৩১৩]

উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে হত্যা বলতে হত্যা এবং গর্ভপাত এ দু'টোই বুঝায় বলে ব্যাখ্যা করেছেন শায়খ আবূ জাহরা (র.) তাঁর মতে, গর্ভপাতের মধ্যেও মানুষের (আত্মা) হত্যা করা হয়। তিনি বলেছেন-

জন্মনিয়ন্ত্রণ হলো পরোক্ষ হত্যা। কারণ এতে রিযিক প্রদানে আল্লাহর অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। যদি মুসলিমগণ সত্যিই আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করেন তবে, তাঁরা তাঁদের বংশ যেভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সেভাবে হতে দেবে এবং তাদের প্রতিপালনের কাছে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করবে। তাঁর মতে, উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের নিষিদ্ধতা প্রতিফলিত হয়। যা করা হয় বন্ধ্যাকরণ ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে। এর কারণ হলো দাবিদ্র্যের ভয় এবং দারিদ্র্য জনিত যুক্তি। শায়খ আবূ জাহরা (র.) আরো বলেন, প্রাচীণকাল থেকে দেখ যায় মানুষ গর্ভসঞ্চারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩১২। আল কুর'আন, ৬: ১৫১
৩১৩। আল-কুর'আন, ১৭:৩১

আল্লাহর রাসূলের সময়ও তাই হতো। ঐ সময় ইহুদীরা 'আযলের মাধ্যমে গর্ভনিয়ন্ত্রণ করত। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'আল্লাহ যদি চান তবে তারা গর্ভসঞ্চারে বাঁধা দিতে পারবে না"

আল্লাহর রাসূলের (সা.) উপরোক্ত বক্তব্য থেকে শায়খ আবূ জাহরা (র) এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, রাসূল (সা.) আযল অনুমোদন করেননি। তাঁর মতে, ইহুদীদের মধ্য থেকে আযল মুসলিম সমাজে প্রসারিত হয়েছিল। সেকারণেই কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রাসূলের (সা.) সময় আমরা 'আযল অভ্যাস করতাম।"

শায়খ মনে করেন সাহাবীরা নিজেরা 'আযল করতেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করতেন। কিন্তু, তাঁরা এসম্পর্কে এল্লাহর রাসূল (সা.) কে অবগত করেননি। আবূ জাহরা (র.) বলেন যে, ইসলামী ফিকাহবিদদের উচিত এটা ক্ষমারযোগ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা এবং ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায় বৈধ্যমনে করা। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত কারণে এবং ব্যক্তির জন্যেই 'আযল অনুমোদিত। তদুপরি, শায়খ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আযল সমর্থনযোগ্য মনে করেছেন। যেমনঃ

১. যখন নারী এত অসুস্থ যে, তার পক্ষে বার বার গর্ভধারণ সম্ভব নয়। এ অবস্থায় কোন নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিকিৎসক সুপারিশ করলে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করা যায়।

২. যদি কোন স্বামী অথবা স্ত্রী বংশগত রোগে ভোগেন এবং সন্তান-সন্ততিতে তা সংক্রমিত হবার ভয় থাকে, তখন তিনি প্রজনন বন্ধ করতে পারেন।

তিনি মনে করেন যে, সন্তান মানব সম্পদ এবং জাতীয় উন্নয়নের উৎস। তাই সন্তান সংখ্যা সীমিত নয়, বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল উৎস ইসলাম বহির্ভূত এবং এর পরিণতিও ইসলাম বহির্ভূত বা ইসলাম বিরোধী ।[৩১৪]

Dhaka University Institutional Repository

৩১৪। ড. আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭

শায়খ ড. মাদকুর (র) এর প্রত্যুত্তর

ড. মোহাম্মদ সাল্লাম মাদকুর (র.) কায়রো বিশ্ববিদ্যলয়ের শরী'আহ বিভাগের অধ্যাপক। তিনি তাঁর সহকর্মী শায়খ আবূ জাহরার বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

শায়খ ড. মোহাম্মদ সাল্লাম মাদকুর (র.)-এর মতে, আল কুর'আনের হত্যা সংক্রান্ত দু'টি আয়াতের মধ্যে গর্ভপাত এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভূক্ত করা ভূল। আয়াত দু'টিতে 'ওয়াদ ' শব্দ নয় বরং 'কাতাল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যে পর্যন্ত না ফকীহগণ কর্তৃক 'রুহ' আসা সম্পর্কে নির্ধারিত ৪ মাস অতিক্রান্ত হয় সে পর্যন্ত উক্ত আয়াত দু'টি গর্ভপাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হতে পারে না। 'কাতাল' সংক্রান্ত উপরোক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রন অন্তর্ভূক্ত করা অযৌক্তিক এবং 'আযলের অনুমোদন সংক্রান্ত হাদীসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। বিষয়টি অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এবং সাহাবীদের অভিমতের সংগে সংগতিহীন।

শায়খ আবূ জাহরা (র.) মনে করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ আল- কুর'আনেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কথাটি সঠিক নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে জীবন্ত সত্ত্বার হত্যা নেই, আর এটা পূর্ব নির্ধারিত তাকদীরের ও পরিপন্থী নয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর হাদীস হতে বিষয়টি পরিষ্কার। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি তুমি ইচ্ছা কর তার সাথে 'আযল কর।' "বিয়ে কর ও সংখ্যা বৃদ্ধি কর" এবং প্রজনন সক্ষম নারীকে বিয়ে করো এ কথাটির সাথে পরিবার পরিকল্পনার কোন বিরোধ নেই।

'আযল ইহুদীদের প্রথা। তাদের থেকে এটা মুসলিমদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রাসূল (সা.) ইহুদীদের কথাই বলেছিলেন। এরুপ কথাগুলো ঐতিহাসিক ভুল।

কোন হাদীসের বর্ণনাকারী এরুপ কথা বলেননি যে ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বরং সঠিক কথা হল এই যে, সাহাবীদের মধ্যে যারা 'আযল করতেন অথবা 'আযল করার অনুমতি চান তারাই আল্লাহর রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করেছেন। জবাবে রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "যদি তুমি ইচ্ছা কর তাঁর সাথে 'আযল করতে পার।" আল্লাহর (সা.)-এ অনুমতি দিয়েছিলেন একজন মুসলিমকে কোন ইহুদীকে নয়।

শুধুমাত্র চরম স্বাস্থ্য ঘটিত অসুবিধার জন্যেই 'আযল বৈধ শায়খ আবূ জাহরা (র.) এ ধরণের অভিমত অত্যন্ত কঠোর। 'আযলের অনুমোদন এবং বৈধতা অন্যান্য কারণ পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় এবং ফকীহগণ তাই করেছেন।

"পরিবার পরিকল্পনা একটি বিদেশী ষড়যন্ত্র শায়খ আবূ জাহরার এ মতের সঙ্গে অনেকেই একমত নন। ড. মাদকুর এসম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন যে, "তিনি জানেন আরব ও মুসলিম দেশসমূহে আমাদের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেছেন। মুসলিম জনগনের কল্যানের জন্যেই তা করেছেন। তাঁরা কোন বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশীদার নয়। [৩১৫]

মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.)

পাকিস্থানের ধর্মীয় নেতা মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.) ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি তাঁর "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক পুস্তকে পরিবার পরিকল্পনার কঠের বিরোধীতা করেছেন। মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.) চিন্তাধারা সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন:

১. জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন পশ্চিমাচক্রের একটি ষড়যন্ত্র।

২. অনুন্নত দেশসমূহে পরিবার পরিকল্পনা আমদানী করা হলে নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা করা হবে। পরিবারিক বন্ধন ও পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাবে। যৌনযথেচ্ছাচার সৃষ্টি হবে। যৌনব্যাধির সয়লাব বয়ে যাবে।

৩. নারী পরিবারে তার চিরাচরিত ভূমিকা পরিত্যাগ করবে এবং ঘরের বাইরে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.) অবশ্যই বলেছেন যে, কুর'আনে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধজ্ঞা নেই। তবে তাঁর মতে, যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে তারা, যারা শিশুহত্যা করে তাদের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ নন। তাঁর এ বক্তব্য প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছেন: "যারা নিবুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতা বশত: নিজেদের সন্তান হত্যা করে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[৩১৬]

মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.) আরো বলেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ আল্লাহর সৃষ্টিধারা বিকৃত করার মত নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তভূক্ত। আল কুর'আনে শয়তানে দাবী উল্লেখিত হয়েছে : ....ولامرنهم فليغيرن خلق الله "নিশ্চয় আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে"।[৩১৭]

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, "স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের শস্যক্ষেত্র"– এ আয়াতটি সন্তান বৃদ্ধির স্বপক্ষে এবং গর্ভনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে।

৩১৫। ড. মোহাম্মদ মাদকুর (র.), The Islami look at the Birth CanTrol: A Comparative Study of Islamic Schools, দারুল হাদীস, কায়রো : মিশর-১৯৬২
৩১৬। আল কুর'আন, ৬: ১৪০
৩১৭। আল কুর'আন, ৪: ১১৯

ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণে মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.)-এর চিন্তা সাধনা ও গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলা যায় যে, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ অন্দোলন সম্পর্কে মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.) ছিলেন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। আত্মরক্ষার তাগিদে অনেকটা নেতিবাচক। তবে তিনি 'আযলের বৈধতা স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীস উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সাহাবীদের 'আযল অনুশীলনের কথাও বলেছেন। তবে, 'আযল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রাখা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে প্রযোজ্য বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গর্ভনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিগুলোর অবাধ প্রচলনের পরিণতি সম্পর্কে মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল (র.) মুসলিম সমাজকে সতর্ক করতে চেয়েছেন।[৩১৮]

শায়খ আহমেদ শাহনুন (র.)

মরক্কোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ শায়খ আহমেদ শাহনুন (র.) ১৯৭১ সনে অনুষ্ঠিত রাবাত সম্মেলনে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণের উপর একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে বেশ কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছিলেন। শায়খ আহমেদ শাহনুন (র.) স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) এর অবগতিতে 'আযল পদ্ধতিতে গর্ভনিয়ন্ত্রণ করতেন। তবে, এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী একটি হাদীসের অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো বুখারী শরীফে সংকলিত হযরত আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণিত।[৩১৯] 'আযল' সম্পর্কে রাসূল (সা.) কে জানানো হলে তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন " তোমরা কি সত্যি তা কর ? তোমরা কি সত্যি তা কর ? তোমরা কি সত্যিই তা কর।"

শায়খ শাহনুনের মতে, এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় সাহাবীদের 'আযল' সম্বন্ধে রাসূল (সা.) অবহিত ছিলেন না। প্রশ্নটি তিনবার করার মধ্যে বিষয়বস্তুর অনুমোদন সূচিত হয়।

'আযল অভ্যাস করার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে একটি ভিন্ন বাকীগুলো তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধুমাত্র স্তন্যপানকারী শিশুর স্বার্থের দিকটি তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। এমনকি এ বিষয়েও তিনি সংশয়শীল।

Dhaka University Institutional Repository

৩১৮। ড. আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯১; প্রফেসর আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; Anwarul Hoq, Family planning, p.45

৩১৯। প্রাগুক্ত,

তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ইবনে হাজম (র.) এবং অনুরুপ চিন্তাধারার ফিকাহবিদদের উদ্ধৃতি ছিয়েছেন। অবশ্য বন্ধ্যাত্বকরণকে শায়খ শাহনুন আল্লাহর বিধান লংঘন এবং সৃষ্টিধারার পরিবর্তন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সংখ্যা সীমিত করা হলে মুসলিম উম্মাহর শক্তি হ্রাস করা হবে। যদিও গর্ভপাত এবং বন্ধ্যাকরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে দু'টোই মুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস এবং পরিণতিতে আদম বংশ নির্মূলের সম্ভাবনার কথাই তিনি চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে, গর্ভপাত হত্যার সমতুল্য। এটা অত্যন্ত জঘন্য এবং ঘৃণিত কর্ম। ইসলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে এ ধরণের আচরণের নিন্দা করে। [৩২০]

মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম (র.) [৩২১]

মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম (র.) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সেকালের 'আযলকে জায়েয মনে করে একালের জন্মনিয়ন্ত্রণ (Birth Control) কে কেউ কেউ জায়েয বলতে চান। তাঁরা বলেন, প্রাচীনকালের 'আযল ছিল সে কালেরই উপযোগী জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থা। একালে বৈজ্ঞানিক পন্থায় যা করা হচ্ছে, ঠিক তাই করা হতো সেকালের এ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে। কিন্তু এরুপ বলা যে, কতখানি ধৃষ্টতা ও নির্বুদ্ধিতা এবং আল্লাহর শরী'আতের সাথে তামাসার শামিল তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

প্রথমত দেখা দরকার, এ কালের জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি ? এবং ঠিক কোন কারণে জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণ করতে লোকেরা প্রস্তুত হচ্ছে। এ কথা সত্য যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই বর্তমান দুনিয়ার লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছে।

৩২০। প্রগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২

৩২১। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩৩৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ মালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুর'আন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় বিরত থাকেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০ টিরও বেশী অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কালেমা তাইয়্যেবা, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, বিজ্ঞান ও জীবন বিধান, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিত্ত্ব, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম দেশের সূধীমহলে আলোড়ন তুলেছ। এই যুগ শ্রেষ্ঠ্র মনীষী

Dhaka University Institutional Repository

১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এনশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। (মাওঃ মুহাঃ আবদুর রহীম, ***পরিবার ও পারিবারিক জীবন,*** ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, বাংলা বাজার, গ্রন্থাকার পরিচিতি অধ্যায়)

কখনো কখনো পরিবারিক সুখ-শান্তি ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথাও বলা হচ্ছে। বর্তমানে এ এক ব্যাপক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সেকালের ‘আযল কোন দিনই এরুপ ছিল না। অর্থনৈতিক কারণে সেকালে ‘আযল করা হতো না। বড় জোড় বলা যায়, সামাজিক ও সাময়িক জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যেই তা করা হতো, আর কারণের দিক দিয়ে এ দু‘টোকে কখনই অভিন্ন মনে করা যায় না। বিশেষত খাদ্যা ভাব ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ‘আযলকে জায়েয প্রমাণকারী হাদীসসমূহ আল্লাহর বিযিকদাতা হওয়ার বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন করে দিচ্ছে। কুর‘আন মজীদে সন্তান নিষেধ করে যে সব আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভিত্তিই হচ্ছে এ কথার উপর: نحن نرزقهم واياكم “আমিই তাদের রিযিক দেব, তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি।” এক্ষণে দারিদ্র ও অভাবের ভয়ে ‘আযল করা যদি সংগত হয়, তাহলে তার মানে হবে, আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়ার বিশ্বাসই খতম হয়ে গেছে এবং যে ভিত্তিতে সন্তান হত্যা নিষেধ করা হয়েছে, তাই চুরমার হয়ে যায় ‘আযলকে শরী‘আত সম্মত মনে করলে।[৩২২]

তিনি মনে করেন, এ ব্যাপারে লোকদের বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝিই হচ্ছে এরুপ ধারণার প্রধান কারণ। ‘আযলের অনুমতিকে তার আসল পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত ওথেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার মনে করে নিলে এ ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন কোন হাদীস পাওয়া যাবে না, যাতে দারিদ্র ও অভাবের কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণকে ঘৃনা সহকারে হলেও বরদাশত করার কথা বলা হয়েছে। আর নবী করীম (সা.) ই বা কেমন করে এমন কাজের অনুমতি দিতে পারেন, যে কাজকে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন ? কুর‘আন মজীদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধবানী উচ্চরিত হয়েছে। সূরা ‘আল-আন‘আম’-এ বলা হয়েছে: ولا تقتلوا اولادكم من املاق – نحن نرزقكم واياهم “এবং তোমরা তোমাদের সন্তানের হত্যা করোনা দারিদ্র্যের কারণে, আমিই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও আমিই করব।”[৩২৩]

এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত দারিদ্র্যের কারণে সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করছে। যারা বর্তমান দারিদ্র্য, অভাব গ্রস্থ, নিজেরাও খাবে সন্তানদেরও খাওয়াবে এমন সম্ভল যাদের নেই, তারা আরো সন্তান জন্মদান করতে রীতিমত ভয় পায়; মনে করে আরো সন্তান হলে মারাত্মক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতে হবে, দেখা দেবে চরম খদ্যাভাব। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তা হবে একান্তই দুর্বহ। উপরোক্ত আয়াত কিন্তু তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট নিষধবাণী এবং রিযিকদানের নিশ্চিয়তা সূচক ওয়াদার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩২২। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭
৩২৩। আল- কুর'আন, ৭: ১৫১
ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا -

এবং তোমরা হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে। আমিই তাদের রিযিক দেব এবং তোমাদেরও; নিশ্চয় তাদের হত্যা করা বিরাট ভুল।"[৩২৪]

মাওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম (রহ.) উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেন , যে, কুর'আন মজীদ কেবল আরব জাহিলিয়াতের ন্যায় জীবন্ত সন্তান হত্যা করতেই নিষেধ করেনি বরং যে কোন ভাবেই হত্যা করা হোক না কেন, তাকেই নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়, শুক্র নিষ্ক্রমিত হওয়ার পর তার জন্যে আসল আশ্রয় স্থান হচ্ছে স্ত্রীর জরায়ু গর্ভধারা। সেখানে তাকে প্রবেশ করতে না দিলে কিংবা কোন ভাবে তাকে বিনষ্ট, ব্যর্থ ও নিস্ফল করে দিলেই তা এ নিষেধের আওতায় পড়বে এবং তা হবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হারাম কাজ। প্রাচীন কালের 'আযল এবং এ কালের জন্মনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সবই এ দৃষ্টিতে হারাম কাজ হয়ে পড়ে। কেননা, এ প্রক্রিয়ায় ব্যহত প্রাণী হত্যা বা জীবন্ত সন্তান হত্যা না হলেও প্রথমত শুক্রকে বিনষ্ট করা হয় এবং দ্বিতীয়ত শুক্রকীট যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন্ত তাকে তার আসল আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করতে না দিয়ে পথিমধ্যেই খতম করে দেয়া হয়। ঠিক যে কারণে জীবিত সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ, ঠিক সে কারণেই জীবিত শুক্রকীট বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ। কেননা, এ শুক্রকীটই তো সন্তান জন্মের মৌল উপাদান ।[৩২৫]

তাফসীরে "রুহুল বয়ান'-এ একথাই বলা হয়েছে ঃ

সন্তান হত্যা করাকে হারাম করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর ফলে আল্লাহর সংস্থাপিত মানব বংশের ভিত্তিই চূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহর সংস্থাপিত এ ভিত্তিকে যারা ধ্বংস করে, তারা অভিশপ্ত। কেননা, এতে করে আল্লাহর ব্যাপিত বৃক্ষের ফল নষ্ট করা, তাকে কেটে নেয়া এবং মানুষের বংশকে শেষ করে দেয়া হয়।[৩২৬]

শুধু তাই নয়, একাজ তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহকে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না আল্লাহর উপর নির্ভর করতে রিযিকের ব্যাপারে। তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ কথাই বলা হয়েছেঃ

'একাজে রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল পরিহার করা হয় তার ফলে আল্লাহর ওয়াদাকে অবিশ্বাস করা হয় অথচ তিনি বলেছেন ঃ জমিনে কোন প্রাণী ই নেই যার রিযিক সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহর উপর অর্পিত নয়।"[৩২৭]

৩২৪। আল-কুর'আন, ১৭: ৩১
৩২৫। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮-৩২৯
৩২৬। রুহুল বয়ান, খ. ১২ পৃ. ৪৫১; মূল আরবী ঃ

وانما حرم قتل الاولاد لما فيه من هدم بنيان الله وملعون من هدم بنيانه وفيه ابطال ثمرة شجرته ومحصوده وقطع نسله -

৩২৭। প্রাগুক্ত, মূল আরবী পাঠ ঃ

وفيه ترك التوكل فى امر الرزق يؤدى الى تكذيب الله تعالى قال لانه : وما من دابة الا على الله رزقها -

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও 'আযল-এ দু'টোর মাঝে এ দিক দিয়েও পার্থক্য আছে যে, 'আয্‌লে যেখনে শতকরা নব্বই ভাগই গর্ব সঞ্চারের সম্ভাবনা থেকে যায়, সেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনাকে একেবারেই বিলুপ্ত করে দেয়া হয়, রাসূল করীর (সা.) থেকে 'আযল সম্পর্কে বর্ণিত প্রায় সব হাদীসেই এ ধরনের একটি কথা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করতে চান, তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। চেষ্টা করলেও তা সম্ভব নয়।" ফলে 'আযল ও জন্মনিয়ন্ত্রণে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই নিছক বোকা লোক ছাড়া এ দু'টো প্রক্রিয়াকে এক ও অভিন্ন আর বড়জোড় সেকাল ও একালের পার্থক্য মাত্র বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। এ সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ এমন এক প্রক্রিয়া অবলম্বন, যার ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত কিংবা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। একাজ কোন দিক দিয়েই বিন্ধুমাত্র কল্যাণকর হতে পারে না; না পারিবারিক জীবনে কোন সুখ-শান্তি আসতে পারে, না অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। [৩২৮]

কুর'আন মাজীদ এ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষী ঃ

قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين -

"যারা নিজেরা নিজেদের হত্যা করে নির্বুদ্ধিতাবশত কোন প্রকার জ্ঞান তথ্যের ভিত্তি ছাড়াই এবং আল্লাহর দেয়া রিযিককে নিজেদের জন্যে হারাম করে নেয় আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আরোপ করে তারা সকলেই ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনো সঠিক পথে আসবে না। [৩২৮]

সন্তান হত্যা আধুনিক পদ্ধতি জন্মনিয়ন্ত্রণ, জন্মনিরোধ কোন বুদ্ধিসম্মত কাজ নয়, চরম নিবুদ্ধিতার কাজ। কোন অকাট্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জ্ঞান তথ্যের ওপর ভিত্তিশীল নয়, নিছক আবেগ উচ্ছাস মাত্র; এতে করে আল্লাহর দেয়া রিযিক সন্তানকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া হয়। সন্তান হতে দিতে অস্বীকার করা হয় অথবা এ সন্তানের ফলে আল্লাহ যে অতিরিক্ত রিযিক দিতেন তা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করা হয়; আর তা করা হয় আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা পোষন করে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে যে, কারো সন্তান হলে তিনি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না বা করবেন না। তার ফলে এ কাজ যারা করে তারা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এ ক্ষতি কেবল নৈতিক নয়, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও তা অপূরণীয়; ইহকালীন ও পরকালীন সব দিক দিয়েই তার ক্ষতি ভয়াবহ। আর এ

ক্ষতির সম্মুখীন তারা হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহর দেয়া বিধানকে তারা মেনে চলতে অস্বীকার করছে অথবা হেদায়েতের পথ তাদের সামনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়েছিল।

৩২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯
৩২৮। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) প্রাগুক্ত পৃ. ৩২৯-৩৩০

তারা অনায়াসেই সে পথে চলে চিরকল্যাণের দাবিদার হতে পারত। আর সত্যি কথা এই যে, হেদায়াতের সুস্পষ্ট পথ সামনে দেখেও যারা নিজেদের ইচ্ছানুক্রমে সুস্পষ্ট গোমরাহীর পথে অগ্রসর হতে থাকে, তারা যে কোন দিনই হেদায়েতের পথে একবিন্দু চলতে পারবে এ দিকে ফিরে আসবে এমন কোন সম্ভাবনাই নেই। এসব কথাই হচ্ছে উপরোক্ত আয়াতের ভাবধারা। বস্তুত জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রচেষ্টা প্রায় সবই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এর জন্যে ব্যয় করা কোটি কোটি টাকা যে একেবারে নিষ্ফল হয়ে যায় তা আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। [৩২৯]

দ্বিতীয়ত এরূপ কাজের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়ার কথায় কোন বিশ্বাস নেই। এ কাজ ষোল আনাই বেঈমানী, নিতান্ত বেঈমান লোক দ্বারাই সম্ভব এ ধরনের কাজ। তাতে কোনই সন্দেহ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা এ কাজ চরম নির্মমতার পরিচায়ক। মনুষ্যত্বের সুকোমল বৃত্তিসমূহ মানুষকে একাজ করতে কখনো রাজি হতে দেয় না। তাই কুর'আন মজীদের ঘোষণায় এ কাজ কেবল মুশরিকদের দ্বারাই সম্ভব বলে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

"এমনিভাবে বহু মুশরিকদের জন্যে তাদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে তাদের শরীক উপাস্য দেবতা ও শাসক নেতৃত্ববৃন্দ খুবই চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় কাজ হিসেবে প্রতিভাত করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাদের জীবন বিধানকে করে দিতে পারে তাদের নিকট অস্পষ্ট ভ্রান্তিপূর্ণ।[৩৩০]

সন্তান হত্যা জন্মনিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ যে একটা মনভুলানো ও চাকচিক্যময় কাজ। এ কাজের অনিবার্য ফল একটা জাতিকে নৈতিকতার দিক দিয়ে দেউলিয়া করে দেয়া, বংশের দিক দিয়ে নির্বংশ করে যুবশক্তির চরম অভাব ঘটিয়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, দুনিয়ার জন্মনিয়ন্ত্রণকারী জাতি সমূহের অবস্থা চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ পর্যায়ে উপরোক্ত আয়াতটি পুনরায় বিবেচ্য। এ বিবেচনায় আমাদের সামনে এও পেশ করছে যে, 'সন্তান হত্যার' যে কোন ব্যবস্থারই পরিণতিতে সমাজে ব্যাপক নির্লজ্জতা, অশ্লীলতার ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়া অতীব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। সম্পূর্ণ আয়াতটি এই ঃ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

৩২৯। প্রাগুক্ত
৩৩০। আল-কুর'আন, ৭:১৩৭

বল হে নবী, তোমরা শোন। তোমাদের আল্লাহ তোমাদের জন্যে কি হারাম করেছেন। তা হলোঃ তোমরা তাঁর সাথে একবিন্দু শিরক করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাইতো তোমাদের রিযিক দেই, তাদেরও দেব। তোমরা নিলজ্জতার কাছেও যেও না, তা প্রকাশ্যই হোক কি গোপনীয়। আর তোমরা মানুষ হত্যা করো না যা আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এই আশায় যে, তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।" [৩৩১]

বিংশশতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর কনফারেন্স

প্রাচীণ ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর বিংশশতাব্দীতে উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণের মতামত পর্যালোচনার জন্যে সম্মেলন, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত ইসলামী সম্মেলন, সেমিনার গুলোর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত সম্মেলনগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

The Rabat Conference on Islam and Family Planning, 1971.
The Baninl Conference on Islam and Family Planning, 1979
The Daker Conference on Islam and Family Planning, 1982
The Acch Congress on Islam and Family Planning, 1990
The Mogadishu Conference on Islam and Family Planning, 1990. [৩৩২]

রাবাত কনফারেন্স

১৯৭১ সনে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইসলামী অবস্থান সম্পর্কে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাসমূহ হতে মুসলিম 'আলিম ও ব্যক্তিবৃন্দ সমবেত হন। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, দূরপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মুসলিম পণ্ডিতবর্গ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীগণ প্রায় ৪৫টি গবেষণা প্রবন্ধ উক্ত সম্মেলনে উপস্থাপন করেন।

কনফারেন্সে অভিমতের সারসংক্ষেপটি নিম্নরূপ

পরিবার সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী শরী'আর বিধি-বিধান পর্যাপ্ত। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা, লালন-পালন, যত্ন এবং সমস্যা সংক্রান্ত বিধি-বিধান এত সুস্পষ্ট যে, পরিবারের সংহতি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া অথবা অবক্ষয়ের কোন সুযোগই রাখা হয়নি। ইসলামী বিধান এবং শরী'আহ এরূপ যে, অনুসরণ করা হলে নব নব উদ্ভূত সমস্যা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সমাধান করা যায়। যে কোন পরিস্থিতিরই সঠিক ও সুবিবেচিত পদ্ধতিতে সমাধান ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আল-কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশ এবং ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী বিধি-নিষেধগুলো খুঁজে বের করা এবং সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কষ্ঠসাধ্য নয়

বরং অতি সহজ। ইসলামের বিধি-নিষেধগুলো এরূপ যে, মুসলিম পরিবারের সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান সম্ভব তা সন্তানসংখ্যা বেশী হোক বা কম হোক।

৩৩১। আল-কুর'আন, ৭:১৫১
৩৩২। ডা. আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১

বন্ধ্যাত্ব সমস্যারও সমাধান ইসলামী ব্যবস্থায় রয়েছে। গর্ভের মধ্যে সংগত বিরতি সংরক্ষণ করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজন বোধে নিরাপত্তা এবং আইনগত বৈধ গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অবলম্বন করা যায়। সম্মেলন বন্ধ্যাত্বকরণ বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে এবং অভিমত প্রকাশ করে যে, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইষলামী গবেষণা একাডেমীর সুপারিশমালা এ বিষয়ে অনুসৃতঃ হতে পারে। এ সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে যে কোন বিবাহিত দম্পত্তি অথবা অন্য কারো জন্যে এমন কোন বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি বৈধ নয় যদি বন্ধ্যাত্বকরণ স্থায়ী হয়। গর্ভপাত সম্পর্কে রাবত সম্মেলনের অভিমত হলো এ গর্ভধারণের ৪র্থ মাস অতিবাহিত হবার পর জরায়ু থেকে ভ্রূণ বের করে নেয়া বা নষ্ট করা নিষিদ্ধ। তবে, মায়ের জীবন রক্ষার চরম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যতিক্রম করা যায়। ৪র্থ মাস অতিবাহিত হবার পূর্বে গর্ভপাত সম্পর্কে এবং ফকীহদের মধ্যে বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। সংগত অভিমত এরূপ মনে হয় যে, যে কোন অবস্থায় গর্ভপাত অনাকাংখিত এবং নিষিদ্ধ। মায়ের জীবন রক্ষার চরম ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যতীত। যে ক্ষেত্রে ভ্রূণের বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই সেরূপ ক্ষেপে গর্ভপাত করা যেতে পারে। [৩৩৩]

বানজুল কনফারেন্স

১৯৭৯ সনে গাম্বিয়ার বানজুল শহরে সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলে ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার উপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে গিনী এর প্রতিনিধি Islamic World Legacy এর Constitutional Council-এর একটি বিবৃতি উদ্ধৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের বিরুদ্ধে পরিবার পরিকল্পনার চিন্তাধারা একটি আগ্রাসন। গিনি এর প্রতিনিধি আরো উল্লেখ করেন যে, গিনি-এর সরকারী দল এবং সরকার সামগ্রিকভাবে পরিবার পরিকল্পনাও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। গিনি সরকারের বৈশিষ্ট্য হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা এবং প্রত্যেকটি মানুষকে সম্মান ও স্বাধীনতার মধ্যে জীবন-যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাহীন। এ সম্পদ আহরনের জন্যে অধিকতর জনসংখ্যার প্রয়োজন।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বহুপ্রতিনিধি উপরোক্ত অভিমতের বিষয়ে গভীর মতানৈক্য পোষন করেন। তারা উল্লেখ করেন যে, বহু শতাব্দী যাবৎ অনেক গুলো আফ্রিকানদেশ ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সংঘাত সৃষ্টি হয়নি। ইসলাম পরিবার পরিকল্পনার বিরুধী নয়। ইহা একটি

গতিশীল এবং প্রগতিশীল ধর্ম। এর লক্ষ্য হলো অনুসারীদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নয়ন এবং মুসলিম দেশ সমূহের উন্নতি ত্বরান্বিতকরণ।

৩৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩, ৩০৪; Islam and Family Planning in Rabat Proccedings, Voll-02

সম্মেলনে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিবৃন্দ উত্থাপিত প্রবন্ধগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। কুর'আন এবং সুন্নাহে উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং ইসলামে পরিবার পরকিল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন। অতঃপর সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ সুপারিশ করেছেন যে, আফ্রিকার সকল মুসলিম সমাজে ইসলামী বিধি-বিধানের আওতায় পরিবার পরিকল্পনা উৎসাহিত করা উচিত। বিশেষ করে দায়িত্ব পিতৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। [৩৩৪]

ডাকার সেমিনার

১৯৮২ সনে এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকার নগরীতে ইসলাম ও পরবিার পরিকল্পনার ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের আলোচনায় আফ্রিকার অভিমতই প্রতিফলিত হয়।

২০০-এর অধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সেনেপাল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ।

ডাকার সোমনারে নিম্নলিখিত অভিমত অভিব্যক্ত হয় ঃ

১. ইসলামী বিধান মতে পরিবারই হলো সমাজের মৌলিক একক এবং সকল জাতির মৌলিক ভিত্তি। একারণেই প্রাপ্ত বয়স্ক সকল মুসলমানের জন্যে বিবাহ প্রাথমিক কর্তব্যের একটি। কারণ, বিবাহ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গুণগতমানের জাতিগঠন সম্ভব নয়।

২. এ বিষয়টি ইসলামে স্বীকৃত যে, পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম পরিকল্পনা পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

৩. অধিকন্ত, ইসলামে পরিবার পরিকল্পনাকে সন্তানের অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টিভংগী হতে দেখা যায়। দারিদ্র, অজ্ঞতা, রোগ হতে শিশুদের প্রতিরক্ষা, শরীরিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনাকে ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে দেখতে হবে।

সম্মেলনে উত্থাপিত নিবন্ধের প্রণেতাগণ মুসলিম সমাজে কি কি শর্ত এবং প্রেক্ষাপটে পরবিার পরিকল্পনাকে অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।

নিম্নবর্ণিত অবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা অবলম্বন করা যেতে পারে বলে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ একমত হন।

১. যদি নারীর পক্ষে ঘন ঘন গর্ভধারণ এবং সুস্থ্য সন্তান প্রসব সম্ভব না হয়।

২. যদি নারী এমন কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয় যা তার সন্তানে সংক্রমিত হতে পারে।

৩. যদি মাতা-পিতার এরূপ আশংকা থাকে যে, তারা সন্তানকে যথাযথভাবে প্রতিপালনও রক্ষা করতে পারবেন না এবং তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে পারবেন না।

৪. শিশুকে স্তন্যদানকালে গর্ভধারণ পরিহারের লক্ষে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

৩৩৪। Banjul Conference Report, 1979; ডা. আবদেল রহমান উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জাতীয় কর্মসূচী অবলম্বকেও বেশ কিছু মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয়। একজন প্রবন্ধকার উল্লেখ করেন যে, ইসলাম ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করে। কিন্তু সমগ্র সমাজের উপরে পরিবার পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয়া ইসলাম সম্মত নয়। অন্যেরা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উপর ছিলেন অধিকতর সহনশীল এবং উল্লেখ করেন যে, জনগণের কল্যাণ সাধনে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্বের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সম্মেলনে এমন একটি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক, যাতে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও নির্দেশের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সেনেগালী পরিবারের সুখ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির উপরেও যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়। [৩৩৫]

অচেক কংগ্রেস

১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দোনেশিয়া সরকারের উদ্যোগে অচেক নগরে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েরInternational Islamic Center for Populatiuon Studies and Research. উক্ত কংগ্রেসে সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে জনসংখ্যা নীতি ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ একটি ঘোষণাপত্র প্রণীত হয়। নিম্নে তারই উল্লেখ করা হলোঃ

১. সম্মেলনের প্রত্যয়যুক্ত অভিমত যে, আল-কুর'আন ও সুন্নাহে জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যে নির্দেশ ও নির্দেশের সূত্র রয়েছে। এর মধ্যে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ও পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত।

ان هذا القران يهدى للتى هى اقوم -

এ সম্মেলন দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে যে, উপরোক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হল।

২. এ কংগ্রেস ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি দায়িত্বের উপর গুরুত্বারোপ করে বিশেষ করে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে। কারণ, এ বিষয়ে কোন একটি যুগের বা বিশেষ কালের জনগণের সিদ্ধান্ত এবং কার্যাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনধারার গুণগতমানের উপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এ কংগ্রেসে বিষয়টি স্বীকৃত যে, জনসংখ্যা সম্পদ, এবং পরিবেশ একটি আর একটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এসব বিষয় এবং সমস্যা গুলোর মধ্যে একটি সুষম এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের উপর এ সম্মেলন গুরুত্বারোপ করছে।

৩৩৫। আবদেল রহীম উমরান প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৬, Dakar Canference Report. 1982

৪. এ কংগ্রেস আশংকা প্রকাশ করে যে, যদিও কয়েকটি মুসলিম দেশ তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম দেশ সমূহের জন্যে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, নাগরিককরণ পরিবেশের ক্রমবর্ধিত দূষিতকরণ এবং এতদজাতীয় সমস্যাগুলো জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি হুমকি স্বরূপ।

৫. এ কংগ্রেস স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, মুসলিম সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য মুসলিম নারীর ভূমিকা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নারীদের মর্যাদা সচেতনতা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, মুসলিম জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ জীবনমান উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির হার উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৬. এ কংগ্রেস আরো স্বীকার করে যে, মুসলিম দেশ সমূহকে জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সুসংহত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ সুসংহত কারণ এমন ভাবে করতে হবে যা প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি ও সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব এবং যার ফলে মুসলিম দেশ সমূহে ক্রমবদ্ধমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

৭. এ কংগ্রেস গুরুত্বারোপ করছে যে, সুসমন্বয়কৃত সুষম এবং নিবির প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবন যাত্রার গুনগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব। আর ইসলামী নীতিমালা ও আওতার মধ্যেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন অর্জন করতে হবে।

৮. এ কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্যে মুসলিম উম্মাহকে উদ্যোগী হতে হবে। আর এ বিষয়ে সকল নেতৃত্বদানের মহান দায়িত্ব ইসলামী চিন্তাবিদ, 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃবৃন্ধের উপর ন্যস্ত করতে হবে। তাদেরকে এ দায়িত্বে গভীর নমনীয়তা, নিঃস্বার্থ, ত্যাগ ও নিবেদিত প্রাণে পালন করতে হবে।

৯. এ কংগ্রেস স্বীকার যে, প্রত্যেক দেশেরই ইসলামী নীতিমালার আলোকে নিজস্ব জনসংখ্যানীতি ও কর্মসূচী গ্রহণের সার্বভৌম অধিকার আছে। নিজস্ব বিশেষ প্রয়োজনের আলোকে এ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে, তবে প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব কার্যক্রম অথবা ইহার অনুপস্থিতি সীমান্তের বাইরে অন্যান্য দেশেও প্রক্রিয়া ফেলতে পারে।

১০. এ কংগ্রেস লক্ষ করছে যে, বিগত যুগ সমূহে জনসংখ্যা কর্মসূচী সারা বিশ্বে এবং মুসিলম দেশ সমূহে জনসংখ্যা সংক্রান্ত চেতনা বৃদ্ধি করেছে। সংগে সংগে এটাও সত্য যে, প্রসূতিসেবা, শিশু পরিচর্যা, মাতৃমঙ্গল, পরিবার পরিকল্পনা, বন্ধ্যাত্ব সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান এবং গুণমানের সেবা এখনো অপর্যাপ্ত এবং তা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে।

উপরে উল্লেখিত বিষয় সমূহের প্রেক্ষাপটে এবং এ কংগ্রেসের সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ অতীতের জনসংখ্যা কার্যক্রম সমূহ পর্যালোচনা করে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা সহজতর হবে। অনাগত ভবিষ্যৎ এবং পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দীতে এ সংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সমূহ ছায়া করবে এ আশা পোষণ করে অচেক কংগ্রেসের ঘোষনাপত্র জারী করা হল। [৩৩৬]

৩৩৬। ড. আবদেল রহীম উমরান (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩০৮

মুগদিসু কনফারেন্স

১৯৯০ সনের জুলাই মাসে সুমালিয়ার রাজধানী মুগাদিসুতে ইসলাম ও শিশু জন্মের বিরতি (Child spacing) সম্পর্কে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন অনুষ্ঠান সহযোগীতা করে International Islamic Center for Population Studies and Research. এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা নিম্নরূপ ঃ

১. সোমালিয়া সরকার গর্ভধারণ বিরতি ও পরিবার পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্বরোপ করে ঘোষণাপত্র স্থায়ী করেছেন। এ সম্মেলন উক্ত ঘোষণাপত্র সমর্থনযোগ্য মনে করে এবং সমালোচনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে।

২. জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পর্যালোচনার জন্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করছে যাতে সোমালিয়ার জনসংখ্যা সমস্যার সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সোমালিয়ার উন্নয়ন প্রকল্পে জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং গ্রাম হতে শহরে জনসংখ্যা স্থানান্তর সমস্যাগুলোর বিশেষজ্ঞ পদ্ধতিতে পর্যালোচনার সুপারিশ করছে।

৩. এ কনফারেন্স দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে ইসলামী শরী'আহ এর আওতায় এবং আবেগমুক্ত হয়ে জনগণের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের জন্যে সুসংহত জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করতে হবে। এ কনফারেন্স আরো সুপারিশ করে যে, জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান কল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নের জন্যে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪. এ কানফারেন্স ঘোষণা করছে যে, মুসলিম শিশুকে ইসলামী পদ্ধতিতে প্রতিপালন এবং শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মাতৃজরায়ুতে অবস্থান কাল হতে শিশুর অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কতে হবে।

৫. বন্ধ্যাত্ব প্রতিহতকরণ ও আঁটকুড়াত্ব সমস্যার সমাধান কল্পে আল আজহার 'উলামাদের ফাতওয়া মক্কা এবং জেদ্দা ভিত্তিক ফিকাহ কাউন্সিলের ফাতওয়াসমূহ কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করা হয়। উক্ত ফাতওয়ায় চিকিৎসা এবং সহায়ক পদ্ধতিতে নিষিক্তকরণের (Fertilize) বৈধতা স্বীকার করা হয়, যদি এ বিষয়ে নিশ্চিত করা

যায় যে, উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত শুক্র বা ডিম্বকোষ বিবাহিত দাম্পতির নিজেদেরই এবং এ পদ্ধতিটি অভিজাত ও মুসলিম চিকিৎসকের তত্ত্বাধানে সম্পন্ন করা হয়।

৬. কনফারেন্সে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ ‘আযল পদ্ধতি অবলম্বন করতেন এবং তা করতেন রাসূল (রা.) এর জীবদ্দশায় যখন কুর‘আন নাযিল হতো। এ সম্পর্কীত হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত দু‘টি হাদীস মুসলিম ও বুখারীতে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। যদি ‘আযল নিষিদ্ধ হতো কুর‘আনেই এর নিষিদ্ধতার উল্লেখ থাকতো। মুসলিম শরীফে অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবীগণ কর্তৃক অবলম্বিত ‘আযল সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন কিন্তু, তিনি তাদেরকে তা করতে নিষেধ করেন নি। কনফারেন্স এ বিষয়ে কিয়াস বা উপমামূলক যুক্তির ভিত্তিতে একমত যে, বর্তমান যুগে অবলম্বিত অনুরূপ পদ্ধতি সমূহ বৈধ, যদি তা স্বল্পকালীন, অস্থায়ী, নিরাপদ এবং আইন সম্মত পন্থায় হয়ে থাকে আর এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সম্মতি থেকে থাকে।

৭. উপরোক্ত জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে এ কানফারেন্স মনে করে যে, ইসলামী শরী‘আহ এবং মুসলিম কফীহগণ কর্তৃক অনুমোদিত গর্ভধারণ বিরতির মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই বরং এর মধ্যে শিশু এবং প্রসূতির স্বাস্থ্য ও কল্যাণসূচক উপকারিতা রয়েছে। বরং এ বিষয়টি ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী নির্দেশ, নীতিমালা ও কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত।

৮. এ সম্মেলন আরো সুপারিশ করে যে, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের International Islamic Center for Population Studies and Research এবং সোমালিয়া Family Health Care Society-র মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হোক। এ সহযোগীতার প্রারম্ভ হিসেবে যথাশীঘ্র এ সম্মেলনের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কার্যবিবরণী, সুপারিশমালা আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশের সুপারিশ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এ সম্মেলনের অনুরুপ সম্মেলন অনুষ্ঠান ও এর সুপারিশমালা সারা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। [৩৩৭]

কুর‘আন ও সুন্নাহ অনুসারে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিশ্লেষণ

১. কুর‘আনের উল্লেখিত তিনটি আয়াত এবং হাদীস সমূহের বিশ্লেষণ ঃ

কুর‘আনে উল্লেখ আছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্যে জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূণ্য দু-বছর স্তন্যপান করাবে। জকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ পোষন করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্যে এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্যে ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না এবং উত্তরাধিকারদেরও অনুরূপ কর্তব্য।

৩৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০ -৩১২

কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায় তবে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত চেয়েছিলে তা যদি অপূর্ণ করো তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে চাইলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করো আল্লাহ তা'আলা এর সম্যক দ্রষ্টা। ৩৩৮

এখন স্তন্যপানকারী শিশু যদি মায়ের বুকের দুধ না পায় তবে সন্তানের স্বাস্থ্যহানী ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অন্য দিকে সন্তানের মাও ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন। কারণ তার স্বাস্থ্যহানী ঘটতে বাধ্য। কারণ একদিকে গর্ভে সন্তানধারণ অন্য দিকে কোলের শিশুর লালন-পালন, সেবা-যত্ন এবং বুকের দুগ্ধ সেবন করানো। তবে এ সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী তার যৌবিক চাহিদা মিটাবেই। তাই এতে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী ও স্ত্রীকে আর একটা সন্তান লাভ করতে দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কোন প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে গর্ভে সন্তান আসবে না। অথার্ৎ স্ত্রীর গর্বে সন্তান আসাটা সঙ্গম করতে হবে যে সময় গর্ভধারণ হবে না বা কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে গর্ভে সন্তান ধারণ করবে না। অন্য আয়াতে আরো উল্লেখ আছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আমি তো মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্য ছাড়ানো হয় দু'বছর। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট"। [২]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি মানুষকে তার মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তাকে স্তন্য ছাড়াতেও সময় লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে

Dhaka University Institutional Repository

সামথ্য দাও যাতে আমি তোমার পতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, ও আমার পিতা মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎ কর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো। আমার জন্য সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্ম পরায়ন করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং অবশ্যই আত্ম সমপনকারীদের অন্তর্ভূক্ত।[৩৪০]

৩৩৮। আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৩

৩৩৯। আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৪

৩৪০। আল-কুর'আন, ৪৬ঃ ১৫

উপরোক্ত তিনটি আয়াত থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় ঃ দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে মাতা দু'বছর বুকের দুধ পান করাবেন। সূরা আল আহকাকে ৩০ মাসের কথা বলা হয়েছে যার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

সূরা আহকাফের ১৫ আয়াত, সুরা লুকমানের ১৪ আয়াত এবং সুরা বাকারার ২৩৩ আয়াত থেকে একটি আইনগত বিষয় পাওয়া যায়। একটি মামলায় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস সে বিষয়টিই তুলে ধরেছিলেন এবং তার উপর ভিত্তি হযরত ওসমান (রা.) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে, হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর গর্ভ থেকে একটি সুস্থ ও ত্রুটিহীন শিশু ভুমিষ্ট হয়। লোকটি হযরত ওসমান (রা.)-এর কাছে ঘটনাটা পেশ করে। তিনি উক্ত মহিলাকে ব্যভিচারিনী ঘোষণা করে তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দেয়। হযরত আলী (রা.)-এ ঘটনা শোনা মাত্র হযরত ওসমান (রা.)-এর কাছে পৌঁছেন এবং বলেন আপনি এ কেমন ফয়সালা করলেন ? জবাবে হযরত ওসমান (রা.) বললেন, বিয়ের ছয় মাস পরেই সে জীবিন ও সুস্থ সন্তান প্রসব করেছে। এটাকি তার ব্যভিচারিনী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয় ? হযরত আলী (রা.) বললেন : না, এরপর তিনি কুর'আন মজীদের উপরোক্ত আয়াত তিনটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করলেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ যে পিতা পূর্ন সময় পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায় মায়েরা তার সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।" সূরা লুকমানে বলেছেন "তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে।" সূরা আহকাফে বলেছেন ঃ তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে।" এখন ত্রিশ মাস থেকে যদি দুধ পানের দু'বছর বাদ দেয়া হয় তাহলে গর্ভধারণকাল ছয় মাস অবশিষ্ট থাকে। এতে জানা যায় গর্ভধারণের স্বল্পতম মেয়াদ ছয় মাস। এ সময়ের মধ্যে সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বাচ্ছা ভূমিষ্ট হতে পারে। অতএব, সে মহিলা বিয়ের ছয় মাস পরে সন্তান প্রসব করেছে তাকে ব্যভিচারিনী বলা যায় না। হযরত আলী (রা.)-এর এ যুক্তি প্রমাণ শুনে হযরত ওসমান (রা.) বললেন ঃ আমার মন-মস্তিস্কে এ বিষয়টি আদৌ আসেনি। অতঃপর তিনি মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। [৩৪১]

২. কুর'আনের আয়াতগুলোর বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

১. কোনো জননী তার সন্তানকে স্তন্য পান করাতে চাইলে তাকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাতে পারবে।

২. তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ২৪ মাস কারণ ক্রমে ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এ সময় জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরন-পোষন করা।

৩. কাউকে তাদের সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না।

৩৪১। ইবনে জারীর, আহকামুল কুর'আন জাসসাস, সূত্রঃ ইবনে কাসীর, সুরা কাহাফ, টীকা নং-১৯

৪. কোন জননীকে তার সন্তানের জন্যে এবং জনককে তার সন্তানের জন্যে ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না।

৫. উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য।

৬. পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ ক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করে দিলে তাতে কারো কোন গুনা হবে না।

৭. ইচ্ছা করলে ধাত্রী দ্বারা স্তন্য পান করাতে পারেন।

৮. আর গর্ভধারণ এবং দুগ্ধ ছাড়াতে ৩০ মাস সময় লাগে। অর্থাৎ দু'বছর দুগ্ধ পান এবং ছয় মাস গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব।

এখন পূর্ণ দু'বছর অর্থাৎ ২৪ মাস দুগ্ধ পোষ্য সন্তানকে স্তন্যপান করার যে নির্দেশ আছে তাতে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, কোন জননী যদি এ সময়ের মধ্যে গর্ভধারণ করে তবে সে দুগ্ধ পোষ্য সন্তানকে স্তন্যপান করাতে পারবেন না। কারণ জননীর বুকে দুধ আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এ দ্বারা দুগ্ধপোষ্য শিশুটি মায়ের দুধ না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং পেটের সন্তানও মাতার স্বাস্থ্যহানীর কারণে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে। আর স্তন্যপান কারী শিশু যদি মায়ের বুকের দুগ্ধ না পায় তবে সন্তানের স্বাস্থ্যহানী ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্য দিকে গর্ভবর্তী মাও ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন।

এতে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী ও স্ত্রীকে আর একটা সন্তান লাভ করতে হলে দু-বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো কোন প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মিল ঘটলে গর্ভে সন্তান আসবে না। অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়ায় চললে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসাটা বন্ধ থাকবে। তবে এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীকে সর্তক হতে হবে এবং Safe Peried হিসেব করে সহবাসে মিলিত হতে হবে। অতীতকালে 'আযল' করা ব্যতীরেকেও মহিলারা বনাজী ঔষধ বা গাছপালার লতা-পাতার ওপর নির্ভর করতো বা স্ত্রীর Uterus- এর মুখে কাপড় বা তুলা ব্যবহার করে শুক্রানুকে জরায়ুর মধ্যে প্রবেশে বাধা দেয়া হতো বা বাঁধার সৃষ্টি করা হতো, সে পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল হাকীমে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সকলই বর্ণনা করেছেন। মানুষকে তা থেকে চয়ন করতে হবে।

আর বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রকম জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষনিক কালেরও হতে পারে বা স্থায়ীও হতে পারে। ঔষধ সেবনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা উত্তম পদ্ধতি বলে বিবেচিত হতে পারে। কুর'আন হলো বিজ্ঞানময় আর বিজ্ঞানের প্রসারে ফলে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হচ্ছে যা মানুষই ব্যবহার করে আসছে। কুর'আনে কোন আয়াতেই গর্ভধারণকে নিষেধ করা হয়নি বা সন্তান সংখ্যা হ্রাস করার কথাও বলা হয়নি। তবে বংশ বৃদ্ধির জন্যে সন্তান উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে ঘোষণা করেন ঃ

الذى احسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الانسان من طين - ثم جعل نسله من سلله من ماء مهين -

" যিনি তার প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" [৩৪২]

সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে ঃ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্চিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট। [৩৪৩]

এখন দু'বছরের মধ্যে যদি মায়েরা সন্তান গর্ভধারণ না করেন তবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলেও স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসবে না বা গর্ভধারণ করবে না। এ সময়টা হল নিরাপদ সময়কাল। আল্লাহ তা'আলা গর্ভে গর্ভধারণের জন্যে গভাশয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অন্য দিকে স্ত্রীলোকের মধ্যে কামউদ্দিপনার জন্যে মাসিক ঋতুস্রাবের ব্যবস্থা করেছেন। ঋতুস্রাবের পর পর এক সময়ে স্ত্রীলেকের গর্ভাশয়ে ডিম্বাণু তৈরী হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে ডিম্বানুর আগমন ঘটলে সে সময় যদি স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে তখনই পুরুষের শুক্রানু স্ত্রী গর্ভে ডিম্বানুর সাথে উর্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং সন্তান উৎপাদন হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্নে হলো, স্ত্রীর গর্ভে কখন ডিম্বানুটা শুক্রানু গ্রহন উম্মুখ্য হয় এবং সে সময় কালটা কখন ? এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, প্রত্যেকটা মাসিক ঋতু স্রাবের পর পরই একটা সময় আসে যখন ঐ সময়টায় স্ত্রীরা গর্ভে সন্তান ধারন করে না, সে সময়টাকে নিরাপদ কাল বলা বা ধরা হয়। আবার যে সময় স্ত্রী গর্ভে সন্তান ধারণ করে সে সময়টাকে গর্ভধারণ কার বলে। এ্ সময়কালটা রিদম বা Calender পদ্ধতিতে

মহিলাদের মাসিক শুরু এবং শেষ হিসাব-নিকাশ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ স্থির করেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে যে সময় স্ত্রীরা গর্ভবতী হতে পারে ... বা উর্বর সময় কেবল তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি ধারণা করা হয়েছে ঃ

৩৪২। আল-কুর'আন, ৪১ঃ ৭-৮

৩৪৩। আল-কুর'আন, ১৮:৪৬

১. ডিম্বানুর পরিপক্কতা আসে পরবর্তী মাসিকের ১৫ দিন + ২ দিন পূর্বে।

২. শুক্রানু ২-৩ দিন বেঁচে থাকে।

৩. ডিম্বানু বাঁচে মাত্র ২৪ ঘন্টা।

এ সময়ের মধ্যে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রানুর মিল না ঘটলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়। এ হিসাব রাখলেই নিরাপদকাল পাওয়া যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঃ

Natural Methods

1. Natural Family Plannig methods are based on fertility awareness, with abstinece from intercousse during the fertile time. These methods include the basal body temperature (BBT) method, the ovulation or Billings methods, calender rhythm method, and the sympto themal method. The natural signs and symptoms (e.g. BBT, cervical mucus and menstrual blecding) associated with the menstrual cycle are observed, recorded and in terpreted to identify the fertile time.

2. Festility awareness is basic information that helps people Undersland how to become pregnent and how to avoid pregnancy by abslaining from inter course or by using barrier methods during her fertil days.

3. Couples should be advice that the methods can be most effective when inter course occurs only after ovulation However these methods are extremely unforgiving of imperfect use.

1. The Rhythm Method (safe period)

Safe period : It in the sterile period in menstrual cyele during which coneetion does not occur. Fertile period : The time during which a viable egg in available for fertilization by sperm.

A. Calender Rhythm melhod (calender charting) Calendar charling allows women to calcutate the onset and durating of their fertile period. Calculation of the fertile dperiod sests on 3 assmptions (i) ovulation occums on day 14 (+ 2 days) before the onset of the next menses; (ii) sperm remain viable for 2-3 days; and (iii) ovum survives for 24 hours.

Calculalion of safe period : There are two methods.

1. "Minus 10, minus 20" rule : Find the longest and shortest of the menstrual eycle. A cycle begins on day 1 of menstrual bleeding and continues period through the day before the next period starts. Apply the minns 10, mims 20" rule look at the fertile days chart (givenbelow) Use the shortest cyele to find the first fertile day by subtracting 20 days from the length of the shortest cycle.

Use the longest cyele to find the last fertile day. The lotest day an which she in likely to be fertile in calculated by subtracting ten days from the length of her longest cyele. For example, if the shortest cyeee has been 22 days the first fertile day will be day 2 (22-20), if the longest eycles has been 28 days, the last fertile day will be day 18 (28-10) For example, if the period start september 6 and the chart says the first fertile day 6 (shortest cyele 20 days), then the first bertile day will be september 11. If the last fertile day will be day 20 (longest cyele 30 days) then the last fertile day will be september 25. In this example, the fertile days are september 11 through september 25. Rest of the days before and the ofter bertile period are safe period.

If your shotest cycle has been	your first fertile (Unsafe days in	If your longest cyele has been	Yur lasf fartile unsafe day in

(# of day		(# of days	
21	1^{st} day	21	1^{st} day
22	2^{nd}	22	2^{nd}
23	3^{rd}	23	3^{rd}
24	4^{th}	24	4^{th}
25	5^{th}	25	5^{th}
26	6^{th}	26	6^{th}
27	7^{th}	27	7^{th}
28	8^{th}	28	8^{th}
29	9^{th}	29	9^{th}
30	10^{th}	30	10^{th}
31	11^{th}	31	11^{th}
32	12^{th}	32	12^{th}
33	13^{th}	33	13^{th}
34	14^{th}	34	14^{th}
35	15^{th}	35	15^{th}

2. Other method of calculation of safe period: The begining of the fertile period can be estimated by subtracting 18 days from the shortest cycle and end of the fertile period can be estimated by subtracting 10 days from the length of the longect cycle.

(i) In a shortest menstrual cyele (28 days) 28-18=10^{th} day is first fertile day 28-10=18^{th} day is the first fertile day so fertile period is from days 10 to day 18 of the cyche. All other, days of the cyele before and ofter fertile period are safe period.

(ii) in an irreqular menstrual cyche (say 26-31) 26-18 =8^{th} day is the first fertile day 31-10=21^{st} day is the first fertile day
So the fertile period in from the day 8 to dad 21, Rest of the days are the safe period.[৩৪৫].

৪. প্রাকৃতিক নিয়মাবলী

১. স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার নিয়ম হলো কেবল উর্বরতার সময় স্ত্রীসহবাস থেকে সচেতনতা অত্যাবশ্যক। এ নিয়ম বা ধারাা মধ্যে বেজালবডি টেমপারেচার (বিবিটি), ওভেশন বা বিলিং, ক্যালেন্ডার রিদম এবং সিমটেথারমাল মেথড অন্তর্ভূক্ত। প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং লক্ষণ (বিবিটি, সারভিক্যাল মিউকাস এবং ঋতু স্রাবের রক্ত) মাসিক ঋতু স্রাবের সাইকেল দ্বারাই উর্বর সময় চিহ্নিত করা সম্ভব।

৩৪৫। Contraceptive tecnology, Irvington. 16th revised P. 327-339; obstetries Illustrated, 5th ed. P. 411.

২. উর্বরতার সচেতনতার মূখ্য হিসেব রাখলেই মানুষ বুঝতে পারবে যে, কখন স্ত্রীরা গর্ভবর্তী হয়ে পড়ে এবং কিভাবে এবং কোন সময় সহবাস করলে মহিলারা গর্ভধারণ করবে না বা উর্বর সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস বন্ধ রাখা বাঞ্চনীয় এবং উর্বর সময় স্ত্রী সহবাস করলে জরায়ু পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা বা অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৩. স্ত্রী গর্ভে যখন ডিম্বাণু শুক্রানুকে গ্রহণ করার জন্যে উম্মুখ হয়ে থাকে সে সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা উত্তম। স্বামী যদি কনডম বা স্ত্রী যদি পিল ব্যবহার করে তবেই স্ত্রী গর্ভধারণ করা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

৫. রিদম মেথড (নিরাপদ সময়)

নিরাপদ সময় ঃ মাসিক ঋতুস্রাব চক্রের অনুর্বর সময়টায় স্ত্রী সহবাস করলে স্ত্রীরা গর্ভেধারন করে না বা করবে না।

উর্বর সময় ঃ স্ত্রীর গর্ভে ডিম্বাণু যখন শুক্রানু গ্রহণে উম্মুখ হয়ে থাকে সে সময়কালকে উর্বর সময় বলে। ঐ সময় স্ত্রী সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা স্ত্রীরা গর্ভধারণ করবে অথবা ঐ সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কেবল স্ত্রীরা গর্ভধারণ করা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ক. ক্যালেন্ডার রিদম মেথ্ড (ক্যালেন্ডার চার্ট)

ক্যালেন্ডার মেথডের মাধ্যমে একজন স্ত্রী লোক কখন তার মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় এবং কতদিন উর্বর সময়ের স্থায়িত্বে থাকে তা নির্ণয় করতে হবে।

উর্বর সময় তিনটা ধারণার উপর নির্ভরশীলঃ

১. ডিম্বানুর পরিপক্কতা পরবর্তী মাসিকের ১৪ দিন + ২ দিন পূর্বে

২. শুক্রানু ২-৩ দিন বেঁচে থাকে।

৩. ডিম্বাণু বেঁচে থাকে মাত্র ২৪ ঘন্টা।

নিরাপদ সময়ের হিসাব ঃ দুটো মেথ্ড

মাইনাস ১০, মাইনাস ২০ পদ্ধতি ঃ মাসিক ঋতু স্রাব চক্র অল্প সময় এবং দীর্ঘ সময়। মাসিক ঋতু চক্র যদি কোনো মাসের ১ তারিখ আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী মাসিক ঋতুচক্র আরাম্ভ হবার ১ দিন পূর্ব পর্যন্ত চলে সে ক্ষেত্রে মাইনাস ১০, মাইনাস ২০ পদ্ধতির ক্ষেত্রে উর্বরতার চার্ট লক্ষণীয়। উর্বরতার প্রথম দিন অনতিদীর্ঘ চক্র ব্যবহার করে সেই অনতিদীর্ঘ চক্র থেকে ২০ দিন বিভাজন করলেই উর্বরতার দিন পাওয়া যাবে।

সর্বশেষ উর্বর দিন বের করতে হলে দীর্ঘ চক্র ব্যবহার করতে হবে। মাসিক ঋতু স্রাব চক্রের শেষ দিন যে দিন কোন স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করতে পারে তা থেকে ১০ দিন বিভাজন করলেই উর্বরতার দিন পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি অনতিদীর্ঘ চক্র ২ (২২-২০) এবং দীর্ঘ চক্র ২৮ দিনের হয় তবে উর্বরতার শেষ দিন হবে ১৮ (২৮-১০)
যদি মাসিক ঋতু চক্র ৬ সেপ্টেম্বর হতে আরম্ভ হয় তবে চার্ট অনুযায়ী প্রথম উর্বর দিন হবে ৬ দিনের দিন (অনতিদীর্ঘ চক্র ২০দিন) তখন প্রথম উর্বর দিন হবে ১১ সেপ্টেম্বর। যদি উর্বরতার সর্বশেষ দিন ২০ দিনের দিন হয় (দীর্ঘতম চক্র ৩০ দিনের) তখন ২৫ দিনের দিন শেষ হবে। এ উদাহরণে দেখা যায় যে, উর্বর দিন ১১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর। বাকী দিনগুলো নিরাপদ দিন।
খ. উর্বরতার চার্ট ঃ (উর্বর সময় কিভাবে গণনা করা হয়)

অনতিদীর্ঘ চক্র	প্রথম উর্বর দিন (নিরাপদ নয়)	দীর্ঘতম চক্র	শেষ উর্বর দিনগুলো (নিরাদপ নয়)
২১	১ম দিন	২১	১ম দিন
২২	২য় ,,	২২	২য় ,,
২৩	৩য় ,,	২৩	৩য় ,,
২৪	৪র্থ ,,	২৪	৪র্থ ,,
২৫	৫ম ,,	২৫	৫ম ,,
২৬	৬ষ্ঠ ,,	২৬	৬ষ্ঠ ,,
২৭	৭ম ,,	২৭	৭ম ,,
২৮	৮ম ,,	২৮	৮ম ,,
২৯	৯ম ,,	২৯	৯ম ,,
৩০	১০ম ,,	৩০	১০ম ,,
৩১	১১তম ,,	৩১	১১তম ,,
৩২	১২তম ,,	৩২	১২তম ,,
৩৩	১৩ তম ,,	৩৩	১৩ তম ,,
৩৪	১৪ তম ,,	৩৪	১৪ তম ,,
৩৫	১৫ তম ,,	৩৫	১৫ তম ,,

গ. নিরাপদ সময়ের হিসাবকাল

অনতিদীর্ঘ চক্র থেকে ১৮ দিন বিভাজন করে উর্বর সময়ের আরম্বকাল পাওয়া যাবে এবং দীর্ঘতম চক্র থেকে ১০ দিন বিভাজন করলেই উর্বরতার শেষদিন পাওয়া যাবে।

ক. সংক্ষেপে মাসিক ঋতু চক্র (২৮ দিনের)

২৮-১৮ = ১০ তম দিন হলো প্রথম উর্বর দিন

২৮-১০ = ১৮ তম দিন হলো শেষ উর্বর দিন

সুতরাং উর্বরতার সময়কাল হিসাব মতো মাসিক ঋতু চক্রের ১০ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে। এতদ্ব্যতীত মাসিক ঋতু চক্রের সকল দিনগুলো নিরাপদ।

খ. অনির্ধারিত মাসিক ঋতু চক্র (যেমন ২৬-৩১)

২৬-১৮=৮তম দিন প্রথম উর্বর দিন

৩১-১০ =২১ তম দিন হলো প্রথম উর্বর দিন

সুতরাং উর্বর সময় ৮ থেকে ২১। বাকী দিনগুলো নিরাপদ কাল।[৩৪৬]

৩৪৬। Contracptive tecnology, Irvington, 16^{th} revised P. 327-339; obstetries Illustrated, 5^{th} ed. P. 411.

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ শিরোনামে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ এর পক্ষে বিপক্ষে প্রামান্য দলীল তথা কুর'আন ও হাদীসের প্রমাণসহ বিভিন্ন যুগের ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য নিবন্ধে। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে যে সেমিনার সিম্পোজিয়াম হয়েছে দেশে বিদেশে। তাও সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সারা বিশ্বের ইসলামী বিন্তাবিদদের যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে এর পক্ষে বিপক্ষে উপরিউক্ত সার্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণায় আমার কাছে তিনটি অভিমতের সন্ধান মিলেছে। যা নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

১. " আমি তাদের রিযিক দেব তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি"। আল্লাহর এ কথাকে ভিত্তি করে সারা দুনিয়ার ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই মনে করেন 'আযল ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ইসলাম সম্মত নয়। দারিদ্র ও অভাবের ভয়ে 'আযল' করা যদি সঙ্গত হয় তাহলে মনে হবে, আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়ার বিশ্বাসই খতম হয়ে গছে এবং যে ভিত্তিতে সন্তান হত্যা নিষেধ করা হয়েছে, তাই চুরমার হয়ে যায়। 'আযলকে শরী'আত সম্মত মনে করলে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কেবল মাত্র অর্থনৈতিক কারণেই বর্তমান দুনিয়ার লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং জোর গলায় তাই প্রচার করা হয়। যদিও কখনো কখনো পারিবারিক সুখ-শান্তি ও স্ত্রী স্বাস্থ্যের দোহাই দেয়া হয়। কিন্তু সেকালের 'আযল' কোনো দিনই এমন ছিল না। অর্থনৈতিক কারণে সেকালে 'আযল' করা হতো না। বড় জোর বলা যায়, সামাজিক ও সামায়িক জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যেই তা করা হতো।

ভবিষ্যতে দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকায় যারা সন্তান জন্মদানে ভয় পায়, যারা মনে করে আরো অধিক সন্তান হলে জীবন যাত্রার বর্তমান মান (Standard) রক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং এজন্যে জন্মনিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের পন্থা গ্রহণ করে, কুর'আনে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কেই নিষেধ বানী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে বর্তমান তোমাদের যেমন আমিই রিযিক দিচ্ছি, তোমাদের সন্তান হলে ভবিষ্যতে আমিই তাদের রিযিক দেব, ভয়ের কোন কারণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, কুর'আনে তো সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে , নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ তো নিষিদ্ধ হয়নি, আর 'আযল' এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রক্রিয়ায় গর্ভসঞ্চার হওয়ার পথই বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাতে তো সন্তান হত্যার কোন প্রশ্নই নেই। তাই কুর'আনের এ নিষেধবাণী এ কাজকে নিষিদ্ধ করেনি এবং এ প্রসঙ্গে তা প্রযোজ্যও নয়। কিন্তু একথা যে, কতখানী ভ্রান্ত, দুর্বল ও অমূলক তা সূরা আন 'আমের ১৫১ আয়াত ও সূরা বনী ইসরা'ঈলের ৩১ আয়াতটি সম্পর্কে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দু'টো আয়াতে সর্বাবস্থায়ই সন্তান হত্যা নিষেধ করে দিয়েছে, প্রতিক্রিয়া তার যাই হোক না কেন।

এ আয়াত দুটো অর্থ-বিশ্লেষণে বলা যায়, কুর'আন মজীদ কেবল আরব জাহিলিয়াতের জীবন্ত-সন্তান হত্যা করতেই নিষেধ করেনি বরং যে কোনো ভাবেই হত্যা করা হোক না কেন, তাকেই নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়। শুক্রনিষ্ক্রমিত হওয়ার পর তার জন্যে আসল আশ্রয় স্থান হচ্ছে জরায়ুগর্ভধারা। সেখানে তাকে প্রবেশ করতে না দিলে কিংবা কোনভাবে তাকে বিনষ্ট, ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিলেই তা এ নিষেধের আওতায় পড়বে এবং তা হবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হারাম কাজ। প্রচীনকালের 'আযল' এবং একালের জন্মনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সবই এ দৃষ্টিতে হারাম কাজ হয়ে পড়ে। কারণ এ প্রক্রিয়ায় বাহ্যত প্রাণী হত্যা বা জীবন্ত সন্তান হত্যা না হলেও প্রথমত শুক্রকে বিনষ্ট করা হয় এবং দ্বিতীয়ত শুক্রকীট যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন্ত, তাকে তার আসল আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করতে না দিয়ে পথিমধ্যেই খতম করে দেয়া হয়। ঠিক যে কারণে জীবিত সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ, ঠিক সে কারণেই জীবিত শুক্রকীট বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ। কেননা এ শুক্রকীটই তো সন্তান জন্মের মৌল উপাদান।

এ সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের এমন কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন, যার ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত কিংবা অবরুদ্ধ হয়ে যায় কোন দিক দিয়েই কল্যাণকর হতে পারে না। না পারিবারিক জীবনে তার ফলে কোন শান্তি সুখ আসতে পারে, না অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিরোধ একটা মন-ভুলানো ও চাকচিক্যময় কাজ। এ কাজের অনিবার্য ফল একটি জাতিকে নৈতিকতার দিক দিয়ে দেউলিয়া করে দেয়া, বংশের দিক দিয়ে

নিবংশ করে যুবশক্তির চরম অভাব ঘটিয়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ার জন্মনিয়ন্ত্রণকারী জাতিসমূহের অবস্থা চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, বর্তমান জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি ? এ সম্পর্কে তাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, উৎপাদন বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণাদির উন্নয়নের মধ্যে এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত। আর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবকাশও রয়েছে যথেষ্ট। এখন শুধু সাহস, যোগ্যতা, সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তব কর্মচেষ্টা ও তৎপরতার প্রয়োজন। আমাদের সাহসের অভাব, অযৌক্তিক ধরনের হীনমন্যতাই প্রকৃত সমস্যা। অথচ প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জন্যে যাবতীয় উপকরণ মওজুদ আছে। এ গুলোকে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করে আমরা দুনিয়াকে পুনরায় সবক দিতে পারি।

২. জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যদি শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য ঠিকরাখা। স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনেই ঘন ঘন সন্তান যাতে না হয় সেজন্য সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কুর'আনে শিশুকে দুবছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাবার অধিকার দিয়েছে। মায়ের দুধ যে শিশুর শ্রেষ্ঠতম খাদ্য সে কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। এর পক্ষে সরকারী প্রচার সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতা নারী দেহের সৌন্দর্য বহাল রাখার হীন স্বার্থে শিশুকে আল্লাহর দেয়া ঐ মহান নি'আমত থেকে বঞ্চিত করছে। যা গর্ভবতী হয়ে গেলে দুধ বন্ধ হয়ে যায় বলেই দুবছর যাতে গর্ভ না হয় সে চেষ্টা করা দোষনীয় নয়।

এক সন্তানের পর কয়েক বছর গর্ভবতী না হলে মাও তার পূর্ণ স্বাস্থ্য সহজে ফিরে পেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে যদি শিশুকে নিয়মিত দুধ খাওয়ায় এবং শিশুর প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ উৎপাদনের উপযোগী খাদ্য খায়, তাহলে গর্ভধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে গর্ভধারণ বিলম্বিত করার চেষ্টা করা অবৈধ নয়। অবশ্য কে কি নিয়তে জন্মনিয়ন্ত্রণ করছে তা আল্লাহর নিকট গোপন থাকতে পারে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে স্থায়ীভাবে ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ করা জায়েজ নয়। একমাত্র বিভিন্ন জন্মনিরোধ সরঞ্জাম বা ঔষধ ব্যবহার করা যাবে, যাতে সাময়িকভাবে গর্ভরোধ করা যায়। ডেসেকটমী ও লাইগেশন পদ্ধতি রোগীর জীনব রক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া প্রয়োগ করা অবৈধ হওয়া উচিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম যাতে অবিবাহিতদের কাছে না পৌঁছে তার জন্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসার জন্যে বিষের ব্যবহার যেমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তেমনি শুধু বিবাহিত দম্পত্তির মধ্যেই এর ব্যবহার সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের সামগ্রিক

কার্যক্রম থেকে 'আলেম সমাজ ও ধার্মিক জনগণের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হতে হবে যে সরকার ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সরকারের উপর এ ব্যাপারে আস্থা সৃষ্টি না হলে মেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রণের বেলায়ও তাদের সহযোগীতা পাওয়া যাবে না। ইমাম ও 'আলেমদের সহযোগিতা ছাড়া জনগণের মধ্যে যে গঠনমূলক কোন চিন্তাধারা চালু করা যাবে না তা সরকার অনুভব করেন বলেই ইমাম ও আলেমদেরকে জনসংখ্যা সমস্যা বুঝাবার এত প্রচেষ্টা চলছে।

৩. ইসলাম জনসংখ্যার আধিক্য কামনা করে, তবে, সে জনসংখ্যা হতে হবে গুণগতমান সম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান, সুশিক্ষিত, সুদক্ষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, শ্রমশীল, ধার্মিক এবং সর্বপরি একই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে এক উম্মাহ হিসেবে সুসংঘবদ্ধ। এমন সন্তান নয় যারা দুর্বল, অক্ষম, অকর্মন্য কিন্তু সংখ্যার অধিক। মানব সন্তান সমাজের উপর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বোঝা স্বরূপ হয়ে দাড়াবে এরূপভাবে সন্তান বৃদ্ধি কাম্য নয়।

মুসলিম জনসংখ্যা এমন হতে হবে যাদেরকে নিয়ে হাশরের দিন আমাদের প্রিয় নবী (সা.) গৌরববোধ করবেন, আনন্দিত হবেন। যাদেরকে নিয়ে তিনি পেরেশান হবেন, দুঃখবোধ করবেন এরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য হওয়া অদৌ উচিত নয়। সন্তানের পারিবারিক অধিকারের মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র অধিকার হলো তাদের জন্যে ১০ বছর বয়সের সময় থেকে অন্ততঃ পৃথকভাবে শান্তিতে নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিতে । এক সঙ্গে এক বিছানায় গাদাগাদি করে নয় বরং প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিজের বিছানায় ঘুমাতে পারবে। পারিবারে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সন্তানের এ মানবিক অধিকার প্রদান করা সম্ভব হয় না। সন্তানের এ মৌলিক অধিকারের সমাধান কল্পে ইমাম গাযালী (র.)-সহ হাল জামানার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুমোদনযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন ঃ

১. আমাদের জানা মতে আমরা এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, আল-কুর'আনে পরিবার পরিকল্পনা বিরোধী কোন সুস্পষ্ট আয়াত নেই অথবা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য প্রামানিক তথ্যের স্বামী বা স্ত্রীর জন্য পরিবার পরিকল্পনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি।

২. সন্তান হত্যা সম্বন্ধে আল-কুর'আনে দু'টি আয়াত আছে (সুরা আন'আম:১৫১ এবং সুরা বনী ইসরাঈল :৩১) কিন্তু দুটি আয়াতে এমন ব্যক্তি হত্যা অথবা এমন কোন সত্তার হত্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যার রূহ আছে। উপরোক্ত দু'টি আয়াত বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার রিুদ্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্তমানের পরিবারের পরিকল্পনায় রূহ এসেছে এরূপ কোন হত্যার অনুমোদন দেয় না। এতে শুধমাত্র গর্ভধারণ যেন না হয় তারই ব্যবস্থা করা হয়।

৩. আল-কুর'আনের পরেই সুন্নাহর স্থান। সুন্নাহ খোঁজ করেও আমরা এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদীস খুঁজে পাই না যাতে 'আযল' করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. মুসলমানগণ পরিবার পরিকল্পনা এ চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই করেই থাকে যে আল্লাহ যা করতে চান তাই হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত মানুষ যা চায়, তা হয় না, তা হতে পারে না। বিষয়টি খারাপ স্বাস্থ্য ও অথবা রোগের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। মানুস চিকিৎসার জন্যে যে ধরনের যা যতুটুকই ব্যবস্তা করুক না কেন আল্লাহ রোগীর ভাগ্যে যা রেখেছন তা-ই হবে। ডাক্তার, রোগীর আত্মীয়-স্বজন হাজার চেষ্টা করেও আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) চিকিৎসা করার শুধু অনুমোদনই দেননি বরং নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু পিতা-মাতাকে সন্তান পতিপালনের যোগ্য হতে হবে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অনুমোদিত। তবে কখন কি অবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, তা পরিবারই নির্ধারণ করবে। ইমাম গাযালী (র.) সহ কতিপয় ইসলামী গবেষক কয়েকটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নরূপ ঃ

১. স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় প্রয়োজনে গর্ভনিয়ন্ত্রণ বৈধ।

২. পরিবারের সদস্য বেশী গেলে যদি পরিবার প্রতিপালনের জন্যে অসৎ উপায়ে আয় বৃদ্ধি করতে হয় এবং আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হবার ভয় থাকে, তবে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সংগত।

৩. সংগত স্বাস্থ্যে সম্মত জরুরী কারণ ছাড়া রূহ সঞ্চারের পর গর্ভপাত সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। রূহ সঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত প্রথম চার মাসে গর্ভপাত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি মনে করে থাকেন যে জাতীয় নীতি হিসেবে আইন করে সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। মুসলিম সমাজে এট অচিন্তনীয় এবং প্রত্যাখান যোগ্য।

৪. কোন নারী যদি ঘন ঘন সন্তান গর্ভধারনের প্রবণতা থাকে।

৫. যদি পিতা-মাতা এমন কোন রোগ থাকে যা সন্তানে সংক্রমিত হতে পারে।

৬. কিয়াছের মাধ্যমে আযলের অনুরূপ গর্ভনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ অনুমোদিত।

৭. সাময়িক বা ক্ষনস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত। স্বাস্থ্য সম্মত কারণ ভিন্ন বন্ধ্যাকরণ অনুমোদিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮. নতুন গর্ভধারণ বা শিশু জন্মের ফলে বর্তমানে স্তন্যপানকারী শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

৯. স্বামীর শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বের সাহায্যে কৃত্রিম প্রজনন বৈধ। স্ত্রী ভিন্ন অপরের গর্ভের জন্যে শুক্রদান বা শুক্রব্যাংক করা নিষিদ্ধ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা: ইতিহাস ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের ও সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পকিল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির একটি রূপরেখা প্রণীত হয়।[১]

জনসংখ্যা নীতির রূপরেখায় মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াসে পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পুনর্গঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ রূপরেখায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কর্মসূচীগুলোর অন্যতম ছিল পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা , মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে জোরদার করা, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন। এতে আইনগত ব্যবস্থার আওতায় বিয়ের বয়স বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক তথ্য নিবন্ধন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয়। কারণ সরকার মনে করে উন্নয়নশীল বাংলাদেশে জনসংখ্যার এত দ্রুততর বৃদ্ধির হার

আধুনিক সভ্যতার পক্ষে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান বিশ্বে পারমানবিক যুদ্ধ ব্যতীত জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি বড় সমস্যা। তাই বাংলাদেশ সরকার এ জনসংখ্যা সমস্যাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্যে বিগত ১৯৬৫ সাল হতে সরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬১.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate TFR) ১৯৭৫ সালে ৬.৩ থেকে ২০১১ সালে ২.৩-এ নেমে এসেছে।[২]

১। বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-একটি রূপরেখা, জন-১৯৭৬, ঢাকা: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

২। Bangladesh Demography and Health Survey (BDHS), Preliminary Report-2011.

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৩ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ১.৩৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।[৩] তবে সরকার মনে করে এ সফলতা জনগনের জীবনমান উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৬৪ জন, বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশসমূহের অন্যতম।) ছাড়াও বনভূমি ও চাষযোগ্য জমি হ্রাস, বায়ু দুষণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অপর্যাপ্ত বাসস্থান, বেকারত্ব, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতের ধীর অগ্রগতি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০০৪-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার-১ অর্জন করা, যাতে ২০৬০ সালে স্থিতিশীল জনসংখ্যা অর্জিত হয়। কিন্তু ২০১০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নীট প্রজনন হার-১ অর্জন সম্ভব হয়নি বিধায় কর্মসূচীতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান জনসংখ্যা নীতিকে হালনাগাদ করা হয়েছে।

এছাড়া ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ Millenium Development Goals (MDG'S), ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত International Conference on Population and Development(ICPD) এবং Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।[৪]

২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারির প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ১৪ কোটি ২৩ লাখ।[৫] এই জনসংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ১৮-২০ লাখ করে বাড়ছে। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্তমানের ৯৬৪ থেকে ২০১৫ সালে ১০৫০-এ দাঁড়াবে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়:নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামো প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির বর্তমান

হার অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের সীমিত ভৌগলিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, পরিবেশ ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা কষ্টসাধ্য হবে। জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যাবহারের উপর সৃষ্ট চাপ মোকাবিলা করে জনগনের জীবনমানের কাঙ্খিত উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবধর্মী এবং ব্যপকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা তৈরী এবং ওই নীতিমালার আলোকে কর্মসূচী ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এহেন বাস্তব অবস্থাকে সামনে ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কাঙ্খিত মানে ধরে রাখার জন্যে ১৯৬৫ সাল হতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। নিম্নে তারই ইতিহাস ও কার্যক্রম বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হবে।

৩। Population and Housing Census, Preliminary Result-July-2011.
৪। Ibid.
৫। জনসংখ্যা নীতি ২০১২, পৃ. ৩

পরিবার পরিকল্পনা পরিচিতি

পরিবার পরিকল্পনা বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বুঝায় যার দ্বারা পরিবারের দম্পতির আকাঙ্খা অনুযায়ী সন্তানের জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসা সাপেক্ষে নি:সন্তান দম্পতিদেরকে সন্তান লাভে সহায়তা করা হয়। পরিভাষাগত দিক দিয়ে 'Family Planing' পরিভাষাটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থের চাহিদা ছাড়িয়ে বিকৃত বিষয় উপস্থাপনা করে। 'Family Planing' বলতে মূলত 'Birth Control' বা জন্মনিয়ন্ত্রণই বুঝানো হয়।[৬]

সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে বুঝায় কোন পরিবার তার আয়ের সাথে সংগতি রেখে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের পরিবেশ ও সুস্থ জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের নিশ্চয়তা বিধানকারী পরিবার গঠন করা।[৭] বিস্তৃত অর্থে জন্মহার ও মৃত্যুহার কাম্য স্তরে আনার পাশাপাশি মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, বৈবাহিক পরামর্শ এবং নির্দেশনা, যৌন শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাকে পরিবার পরিকল্পনা বলা হয়।[৮]

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর রিপোর্টে বলা হয়েছে- æA way of thinking and living that is adapted voluntarily on the basis of knowledge attitudes and responsible derision by individuals and couples in orders to promote the health and welfare of family planning group and thus contributing offectively to the social development of a country" [৯]

Dr. Rodhinorton বলেন, æFamily planning means activities of defer mining the time period between the birth of children and the member of required children for the couple themselves along with the health and family welfare,"[১০]

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির ভাষ্য মতে, " পরিবারের সামর্থ্য এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিবেচনা করে বিরতিতে সীমিত সংখ্যক সন্তান জন্মদানকে পরিবার পরিকল্পনা বলে।"[১১] মোটকথা, পরিবার পরিকল্পনা হলো এমন এক কর্মসূচী যা সামর্থ্য বিবেচনার আলোকে পরিবার গঠনের ব্যবস্থা। সেখানে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকে।

৬। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, সোসাল সিস্টেম এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইন ইসলাম, (ঢাকা, গ্রন্থ কুটির, নভেম্বর-২০১২) পৃ.৩১০

৭। কে, এম, আওরঙ্গজেব, লিষ্টিমানচিত্র, কিমোগ্রাফী এণ্ড ফ্যামিলি প্লানিং, (ঢাকাঃ কবির পাবলিকেশন্স, ২০০৭,) পৃ.২৩৮

৮। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১০

৯। উদ্ধৃত: ড. মোঃ তবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১০

১০। উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত

১১। মডিউল, উপজেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ছোট পরিবার ধারণার উন্মেষ, পুষ্টি, গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য, স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার ও ধর্মীয় নেতা/ইমামদের দেশব্যাপী অবহিতকরণ কর্মশালা, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, পৃ.৪

পরিবারের স্বচ্ছলতা ও উন্নয়নের জন্যে স্বামী-স্ত্রী আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনকে পরিবার পরিকল্পনা বুঝায়। একটি দম্পতি তার আয়ের সাথে ও পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে কয়টি সন্তান জন্মগ্রহন করবে বা তার পরিবারের আয়তন কি হবে তা ঠিক করাটাই হলো পরিকল্পিতভাবে পরিবার গড়ে তোলা।

পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of family planning) :

পরিবার পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিবাহিত দম্পতির দাম্পত্য জীবন সুখকর করে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সুর্নিদিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, তাদের জীবনমান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখাই পরিবার পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াও আরো কিছু গৌণ বিষয়কে সামনে রেখে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিচালিত হয়।

ক. সম্পদ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সীমিত সদস্যের পরিবার গঠন করা।

খ. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

গ. পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সচ্ছলতা নিশ্চিত করা।

ঘ. জন্মহার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

ঙ. সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে সহায়তা করা।

চ. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২% এ উন্নীত করে মোট প্রজনন হার (TFR) ২.১ এ হ্রাস এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ (NRR=1) অর্জন করা।

ছ. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

জ. মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঝ. নারী-পুরুষের সমতা (Gender equity) ও নারীর ক্ষমতায়ন Women's empowerment নিশ্চিত করা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination) নিরসনে কর্মসূচী জোরদার করা।[১২]

১২। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি-২০১২,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,পৃ,৩-৪।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background of family planning in Bangladesh:)

বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে কর্মসূচীটি চলমান রয়েছে তার নাম পরিবার পরিকল্পনা বা family planning । ইউরোপে ও আন্দোলনের সূত্রপাত হর অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস (Malthus) এর ভিত্তি রচনা করেন।[১৩] ম্যালথাস (Malthus) ১৭৯৮ সালে æAn Essay on population and as it effects, the future Improvement of the sociaty" নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রচার করেন।[১৪] এরপর ফ্রান্সিস প্ল্যাস (Francis place) ফরাসী দেশে জনসংখ্যা রোধ করার প্রতি জোর দেন।[১৫]

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকার জনগনের জীবন-যাত্রার মান, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবাদে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়া শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপহারে অর্থনীতিবিদগণ সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করেন। সীমিত সম্পদ ও বিপুল জনসংখ্যা যাতে নাগরিক জীবনে কোন সংকট সৃষ্টি করতে না পারে তা নিরসন কল্পে অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস জনসংখ্যা হ্রাসের একটি ফর্মূলা উপস্থাপন করেন। যা পরবর্তীতে "ম্যালথাসের তত্ত্ব"[১৬] হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৩৩ সালে আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার চার্লস নেলটন (Charles Knowlton) "দর্শনের ফলাফল" (The Fruits of philosophy) নামক পুস্তকের মাধ্যমে গর্ভনিরোধ সম্পর্কে যুক্তি, ব্যাখ্যা ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[১৭]

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে নতুন ম্যালথ্যাসী আন্দোলন (New Malthusian Movement) নামে এক নতুন আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৭৬ সালে মিসেস এ্যানী বাসন্ত ও চার্লস ব্রাডর ডাঃ নেলটনের রচিত 'দর্শনের ফলাফল' পুস্তক ইংল্যান্ডে প্রকাশ করে। ১৮৭৭

সালে ডাক্তার ডাইসডেল (Drysdale) এর সভাপতিত্বে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

১৩। সে সময় ইংরেজদের প্রাচুর্যময় জীবন-যাপনের ফলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে মিঃ ম্যালথাস হিসাব করতে শুরু করেন যে, পৃথিবীর আবাদযোগ্য জমি ও অর্থনৈতিক উপায় উপাদান সীমিত। কিন্তু বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাহীন। যদি স্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে পৃথিবীর বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে যাবে-অর্থনৈতিক উপকরণাদি, তখন মানুষের ভরণপোষণের ভার বইতে পারবে না এবং মানুষের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবার ফলে জীবন-যাত্রার মান নিম্নগামী হয়ে যাবে। সুতরাং মানব জাতির স্বাচ্ছন্দ, আরাম, কল্যাণ ও শান্তির জন্যে মানব বংশ বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক উপাদান বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে হবে। জনসংখ্যা যেন কখনো অর্থনৈতিক উপাদানের উর্ধ্বে যেতে না পারে। এই হচ্ছে ম্যালথাসের প্রস্তাব। (ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭)

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

১৭। প্রাগুক্ত

দুবছর পরে ১৮৭৯ সালে মিসেস বাসন্ত এর Law of Population (জনসংখ্যা আইন) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং প্রথম বছরেই এর এক লক্ষ পচাত্তর হাজার কপি বিক্রি হয়।

১৮৮১ সালে ইউরোপের হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ও জার্মানিতে ও আন্দোলন ছড়িয়ে যায় এবং ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব দেশে এ উদ্দেশ্যে রীতিমত বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয় এবং এসব সমিতি বক্তৃতা ও লেখার মারফত জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা ও বাস্তব উপায় শিক্ষাদান করতে শুরু করে। এর স্বপক্ষে প্রচার চালানো হয় যে, এ পদ্ধতি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু বৈধই নয়; বরং উত্তম এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু লাভজনকই নয় বরং অপরিহার্য। এজন্যে ঔষধ আবিষ্কার করা হয়, যন্ত্রাদি তৈরী করা হয় এবং এসব ঔষধ ও যন্ত্র জনগণের জন্যে সহজলভ্য করার ব্যবস্থাও করা হয়। স্থানে স্থানে জন্মনিরোধ ক্লিনিক (Birth Control Clinic) খুলে দেয়া হয় এবং এসব ক্লিনিক থেকে বিশেষজ্ঞগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে পরামর্শ দিতে থাকেন। এভাবে এ নতুন আন্দোলন অতি দ্রুত শক্তি অর্জন করে। ক্রমেই এই আন্দোলন প্রসার লাভ করে।[১৮]

বিংশ শতকের শুরুর দিকে পাক-ভারত উপমহাদেমে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ দেশের মানুষকে এ কর্মসূচী গ্রহণে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। মানুষকে এর প্রতি আকৃষ্ট ও এর বাস্তব কর্মপন্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার জন্যে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পুস্তকাদী ছাপানো হয়। সর্বপ্রথম লন্ডন বার্থ কন্ট্রোল ইন্টারন্যাশনাল ইনফরম্যাশন সেন্টারের ডাইরেক্টর মিসেস এডিথ হো মার্টিন (Mrs, Edith How Martyn) এ আন্দোলন প্রচারের জন্যে এদেশ সফর করেন। ১৯৩১ সালে আদমশুমারীর কমিশনার ডা: হার্টন (Dr. Hurton) তার রিপোর্টে ভারতের ক্রমবর্ধমান

জনসংখ্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারত সরকার সে সময় উক্ত প্রস্তাব বাতিল করে দিলেও মহিলাদের এক নিখিল ভারত সংস্থা লাক্ষ্মৌয়ে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে এর সমর্থনে একটি প্রস্তাব পেশ করে। করাচী ও বোম্বাই পৌরসভায় এর বাস্তব শিক্ষা প্রচারের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এসব ব্যাপার থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পাশ্চত্য দেশ থেকে আগত নানাবিধ বিষয়ের সঙ্গে এ আন্দোলনও নিশ্চিতরূপে এ দেশে বিস্তার লাভ করে। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলে উভয় দেশ আস্তে আস্তে নিজ নিজ জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে এ বিষয়টিকে শামিল করে নেয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পৃথক হলে এ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং দ্রুতগতিতে এর প্রসার লাভ করে।[১৯]

১৮। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, *সোসাল সিস্টেম এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইন ইসলাম,* (ঢাকা, গ্রন্থ কুটির, নভেম্বর-২০১২,) পৃ. ৩১৪-৩১৫; বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, ১৯৯৮, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিবিসি ইউনিট।

১৯। প্রাগুক্ত

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীর ইতিহাস

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। দেশটি ৭টি প্রশাসনিক বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৫০৭টি থানা/উপজেলা এবং ৪৪৪৮ টি ইউনিয়নে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি হিসেবে মোট ৪০,৩৫৬টি ওয়ার্ড রয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা বিতরণের জন্যে ওয়ার্ডগুলোকে ২৩,৫০০টি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ১৪ কোটি ২৩ লাখ।[২১] প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১০১৫ লোকের বাস।[২২] প্রতি হাজারে জন্মহার ২০.১ জন এবং মৃত্যুহার ৬.১ জন।[২৩] অর্থাৎ জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭।[২৪] ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে এদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সূচনা হয়।

প্রথম পর্যায় (১৯৫৩-৬০)ঃ বেসরকারী পর্যায়ে ক্লিনিক ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

১৯৫৩ সালে কিছু সমাজ সচেতন, প্রগতিশীল ও মানব হিতৈষীদের প্রচেষ্টায় জনসংখ্যা কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত হয় পরিবার পরিকল্পনা সমিতি; পরিবার পরিকল্পনা সমিতি বড় বড় শহরগুলোতে ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। জনগণকে অবহিতকরণ এবং সচেতন করার জন্যে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি 'মুখ্য জীবন' নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করে।[২৫]

Family planning Association initiated family planning program in 1953 as a voluntary effort. The effort was limited to the small scale contracepdtive distribution services in urban areas particularly through hospitals and clinics.

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৬০-৬৫) ঃ ক্লিনিক ভিত্তিক সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। (Government sponsored clinic based family planning program) :

এ সময়ে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য সার্ভিসের অংশ হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র যেমনঃ হাসপাতাল, ডিসপেনসারী এবং ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী হিসেবে শুধুমাত্র কনডম বিতরণ করা হয়।[২৬]

২০। সূত্রঃ Bangladesh Demography and Health Survey (BDHS),2011
২১। প্রাগুক্ত
২২। সূত্রঃ বিবিএস-২০১০
২৩। প্রাগুক্ত
২৪। বি. পি. এন্ড এইচ শুমারী-২০১১
২৫। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, সোসাল সিস্টেম এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইন ইসলাম, (ঢাকা, গ্রন্থ কুটির, নভেম্বর-২০১২) পৃ.৩১১ http://www.cgdev.org/doc/millions/ms-case-13.pdf; বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, ১৯৯৮, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিবিসি ইউনিট।
২৬। প্রাগুক্ত, পৃ.৩১১

In that strage the government set-up a target of providing family planning services to 6-7 percent of eligible couples and opened a family planning center in every hospital and rural dispensary.[২৭]

তৃতীয় পর্যায় (১৯৬৫-৭০): মাঠভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ঃ (Field-based Government family planning program)

১৯৬৫ সালে সরকারী পর্যায়ে জোরালোভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ড এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে গঠিত বোর্ডের উপর সার্বিক কার্যক্রমের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং এ দায়িত্ব একজন পরিচালকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে জেলা পর্যায়ে একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং ক্লিনিক্যাল সেবা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন জেলা টেকনিক্যাল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। থানা পর্যায়ে এজন থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্তকর্তা এবং একজন মহিলা ও দুজন পুরুষসহ মোট ৩জন সহকারী নিয়োগ করা হয়। থানা পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে দেয়া হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাভিত্তিক CMO (Chief Male Organizer) নিয়োগ করা হয়। মহিলা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা নামে একটি নতুন প্যারামেডিক্স ক্যাডার গঠন করা হয়। তাদের আইইউডি এবং খাবার বড়ির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালে কার্যক্রম প্রায় বন্ধ থাকে।[২৮]

The Family planning program was launched through out the country as a priority program. Full time field staff and part-time village organizers known as dai (a female village mid-wife) were recruited and trained to provide motivation and service close to the doorsteps of the rural people, Selected clinical and non-clinical methods were offered.[২৯]

২৭। Eleanor Randall, Bangladesh family planning programmes Review, (Dhaka: Januany2012) p.no-05

২৮। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

২৯। Eleanor Randall, Ibid, p.n.5

চতুর্থ পর্যায় ঃ (১৯৭২-৭৪): অন্তবর্তীকালীন সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম : (Integrated health and family planning program):

বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত থাকায় স্বাধীনতা উত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন বিলম্বিত হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে পরীক্ষমূলক ও অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আলাদাভাবে পরিচালিত তিনটি Vertical Program যথাঃ স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া নির্মূল ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীত্রয়কে একীভূত করে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী চালু করা হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপরিমিত গতিকে কার্যকরভাবে রোধকল্পে প্রক্রিয়াধীন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, একটি স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো গঠন এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে মা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পৃক্ত করা সহ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকারী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। পাশাপাশি সাবেক সরকারের অবকাঠামো নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো অব্যাহত থাকে।

১৯৭৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ গঠন করা হয়।[৩০]

পঞ্চম পর্যায় ঃ (১৯৭৫-৭৮) মা ও শিশুস্বাস্থ্য ভিত্তিক সুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমঃ (Maternal and child-health (MCH) – based multi sectoral program) :

১৯৭৫ সালে উপরাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে গঠিত প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর। ১৯৭৫ সালে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধিকে সরকার ১৯৭৬ সালে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করে। একই বছর জুন মাসে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা প্রণীত হয়। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ পুনর্গঠিত হয়।

৩০। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫ ; বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১৯৯৮ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রতিবেদন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিসিসি ইউনিট।

১৯৭৬ সালে মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় স্বাস্থ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা। এ বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্যে দুজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এ দুটি বিভাগ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণায়য়ের মর্যাদা লাভ করে। এবং ১৯৭৭ সালের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যহত থাকে। ১৯৭৬ সালে ওয়ার্ড ভিত্তিক পুর্ণকালীন মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয়। প্রতিগ্রামে একজন দাইকে নিরাপদ প্রসবের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রমের সূচনা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (রিপোর্ট), ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয়।[৩১]

ষষ্ঠপর্যায় ঃ (১৯৭৮-৮০) থানা ও নিম্ন পর্যায়ে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন :

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদান্তে (১৯৭৮-৮০) দুবছর মেয়াদি Two years approach plan গ্রহন করা হয়। এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা। এ সময়ে পরিচালক (কর্মসূচী উন্নয়ন) এর একটি নতুন পদ সৃষ্টি এবং পূরণ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক ও জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক (সাধারণ ও আইইএস) এবং সহকারী পরিচালক (এমসি এইচ) পরিচালক (সাধারণ ও আইইএস) ও সহকারী পরিচালক (এমসি এইচ) এবং থানা মেডিক্যাল অফিসারের পদ সৃষ্টি ও পূরণ করা হয়। থানা ও নিম্ন পর্যায়ে থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণাধীনে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার

পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব দুজন সচিবের স্থলে একজন সচিবের কাছে ন্যস্ত করা হয় এবং তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়।[৩২]

সপ্তমপর্যায় ঃ (১৯৮০-৮৫) সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম:

থানা ও নিম্ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, মেডিক্যাল অফিসারসহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। একক নেতৃত্ব (United Command) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় 'স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়'। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এক মন্ত্রী ও এক সচিবের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে (Co-ordinated Service Delivery System) চালু করা হয়। জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[৩৩]

৩১। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬
৩২। প্রাগুক্ত
৩৩। প্রাগুক্ত

অষ্টম পর্যায় ঃ (১৯৮৫-৯০): জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম:

জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় ইউনিয়ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি। থানা পর্যায়ে সাংসদদের সভাপতিত্বে গঠিত হয় থানা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি। উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত হয় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি। জেলা পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়। জেলার মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় জেলা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত হয় জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি। সুষ্ঠুভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্যে মাঠ পর্যায়ে এফ ডব্লিউ এ রেজিস্ট্রার প্রবর্তন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সেবার প্রাপ্যতাকে আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, যুগ্ম সচিব, এবং সাংসদদের মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম তদারকীতে সম্পৃক্ত করা হয়। দু'সন্তান বিশিষ্ট আদর্শ দম্পতিদের সংবর্ধনা দেয়ার রীতি প্রচলন করা হয়। ভাল কাজের জন্যে মাঠকর্মীদের পুরস্কার দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩৪]

নবম পর্যায় (১৯৯০-৯৫) নিবিড় সেবাদান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (Intensive family planning program) :

মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান অবকাঠামো বিস্তৃতকরণ অব্যহত থাকে। মাঠকর্মীদের তথ্য, শিক্ষা, ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং কাউন্সেলিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। মা ও শিশু মৃত্যুরোধ জরুরী প্রসূতি সেবার প্রচলন করা হয়। নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসেবে স্বল্প পরিসরে নরপ্ল্যান্ট পদ্ধতি প্রচলন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা সহকর্মীদের মাধ্যমে বাড়ীতে ক্লায়েন্টকে ক্লিনিকাল পদ্ধতি ইনজেকশন প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থায়ী পদ্ধতি সেবা প্রদান কেন্দ্র খোলা হয়। পুরুষদের এবং নবদম্পতিদের পদ্ধতি গ্রহণের উদ্বুদ্ধকরণের বিশেষ জোর দেয়া হয়। ক্লিনিকাল পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[৩৫]

৩৪। প্রাগুক্ত, http://www.dgfp.gov.bd/history population pro.htm : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১৯৯৮ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রতিবেদন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিসিসি ইউনিট।

৩৫। প্রাগুক্ত

দশম পর্যায় (১৯৯৫-৯৮): স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের নতুন কর্মকৌশল গ্রহণের প্রস্তুতিকাল:

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (ICPD)। উক্ত সম্মেলনের গৃহীত সুপারিশের আলোকে কার্যক্রমকে প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এ সময়ে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদের জন্যে নতুন আঙ্গিকে কার্যকমে গ্রহনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার সকল উপাদানকে সম্পৃক্ত করে এবং সেবা প্রদানের নতুন কৌশল অন্তর্ভূক্ত করে ৫বছর মেয়াদী (১৯৯৮-২০০৩) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম Health and population sector program (HPSP) গ্রহণ করা হয়।[৩৬]

একাদশ পর্যায় (১৯৯৮-২০০৩): স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম (Health and population sector program):

এইচপি এস পি এর লক্ষ্য ছিল দেশের জনগনের বিশেষত মহিলা, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার মান উন্নয়ন করা। এর অন্যতম কৌশল ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একীভূতকরণ এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকের (ইএসপি) এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের চাহিদা, সেবা সরবরাহের মান বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন।

কিন্তু এইচপিএসপিতে উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে একীভূত কাঠামো গ্রহনের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী তার পৃথক সত্তা ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং কর্মসূচী প্রায় স্থবির

হয়ে পড়ে। এ বাস্তবতার আলোকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর গুরুত্ব অনুধাবন করে জানুয়ারী ২০০৪ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পূর্ববর্তী পর্যায়ের ন্যায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩৭]

দ্বাদশ পর্যায় (২০০৩-২০১০) ঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম (Health Nutrition and population sector program):

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ দুটি পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সময় থেকে পরিবার কল্যাণ সহকারীদের দ্বারা বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সেবা দান এবং কর্মসূচীতে পরিবার কল্যাণ রেজিষ্টার পুন:প্রবর্তন করা হয়।

৩৬। প্রাগুক্ত
৩৭। প্রাগুক্ত

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রমের আওতায় অগ্রাধিকারমূলক সেবাসমূহ হচ্ছে: স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, নব দম্পতি, কম বয়সী ও কম সন্তানের দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা ; পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে পুরুষের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা; নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা ; যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর সচেতনতা সৃষ্টি করা : কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাগ্রহন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; পুষ্টি মান উন্নয়নে জনগনকে পরামর্শ প্রদান করা এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি; নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।[৩৮]

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (Birth control mathods)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপহার যেমন সরকারের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক তেমনি ঘন ঘন ও অধিক সন্তান জন্মদান ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর মৃত্যুহার সরকার পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনে সহায়তা করার জন্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিকে প্রধানত: দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. নন ক্লিনিক্যাল বা অস্থায়ী পদ্ধতি। ২. ক্লিনিক্যাল বা স্থায়ী পদ্ধতি। নিম্নে তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

ক্লিনিক্যাল বা স্থায়ী পদ্ধতি	নন ক্লিনিক্যাল বা অস্থায়ী পদ্ধতি	
	দীর্ঘমেয়াদী	স্বল্পমেয়াদী

পুরুষদের জন্যে স্থায়ী পদ্ধতি এনএসভি (ভ্যাসেকটমি) মহিলাদের জন্যে স্থায়ী পদ্ধতি টিউবেকটমি (লাইগেশন)	ইমপ্ল্যান্ট আইইউডি	খাবার বড়ি, কনডম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন

ক্লিনিক্যাল বা স্থায়ী পদ্ধতি (ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি)

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একটি বহুল প্রচলিত, নিরাপদ, অধিকতর কার্যকর, প্রায় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াবিহীন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে যে সকল দম্পতির কাঙ্খিত সংখ্যক সন্তান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে আর কোন সন্তান নিতে চান না তাদের অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা রোধ করা হয়। ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে মহিলাদের জন্যে স্থায়ী পদ্ধতি 'টিউবেকটমি' শুধুমাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সমূহে সীমিতভাবে চালু ছিল।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩

১৯৬৬ সাল হতে সরকার কর্তৃক সমর্থিত ও পরিচালিত মাঠভিত্তিক স্থায়ী পদ্ধতি কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হয় এবং তারপর থেকে ক্রমান্নয়ে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ঐ সময় হতে পুরুষ স্থায়ী পদ্ধতি 'ভ্যাসেকটমি' বহুল পরিচিত পদ্ধতি হিসেবে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। বিগত ১৯৭০ দশকের শেষের দিক হতে ৮০' দশকে বাংলাদেশে স্থায়ী পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা পায় এবং প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ২.৫ হতে ৩.০ লক্ষ করে স্থায়ী পদ্ধতি সম্পাদিত হতো। ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে সর্বোচ্চ ২.১৬ লক্ষ পুরুষ এবং ৩.৩৭ লক্ষ মহিলাকে স্থায়ী পদ্ধতি প্রদান করা হয়।[৩৯]

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এক ধরণের অপারেশন। অন্য অপারেশনের সাথে এর অনেক ব্যতিক্রম রয়েছে। স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশন করার জন্যে ডাক্তার বা সার্জনকে এ পদ্ধতির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। গ্রহীতার স্বেচ্ছায় সম্মতিক্রমে অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সন্তান না হওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বিধায় স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 'ভিএসসি (VSC- Volutauy Surgical Coatracaption)' হিসেবেও বিশ্বব্যাপী পরিচিত। অপারেশনের মাধ্যমে প্রজনন ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হয় বিধায় "বন্ধ্যাকরণ (Sterilization)" হিসেবেও পরিচিত।

স্থায়ী পদ্ধতি ২ (দুই) ধরণের

১. ভ্যাসেকটমি (Vasectomy)

পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রনের স্থায়ী পদ্ধতিকে বলা হয় ভ্যাসেকটমি। ভ্যাসেকটমিতে ছোট অপারেশনের মাধ্যমে শুক্রবাহী নালীর কিছু অংশ বেঁধে কেটে ফেলে দিয়ে বা কটারী করে

স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। পুরুষদের স্থায়ী পদ্ধতি বাংলাদেশে 'ভ্যাসেকটমি' বা 'পুরুষ বন্ধ্যাকরণ' নামে অধিক পরিচিত। ইদানিং বিশেষ পদ্ধতিতে একটি ছোট ছিদ্র করে এই অপারেশনটি করার ফলে এটি 'এনএসভি' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।[৪০]

ভ্যাসেকটমি অপারেশন দুই ভাবে করা যায়।

১. ইনসিশনাল বা সনাতন পদ্ধতি (Incisional or Convertional Technique) :

এ পদ্ধতিতে সার্জিক্যাল ব্লেডের সাহায্যে অন্ডথলির দুইপার্শ্বে ২টি বা মাঝ রেখা বরাবর (Mediom raphe) একটি ইনসিশন দিয়ে শুক্রবাহী নালী বের করে এনে কিছু অংশ কেটে ফেলে দেয়া হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না।

৩৯। পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল, পরিবার, পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, (ঢাকা: সেপ্টেম্বর-০৭) পৃ. ১৮৯।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ.-২১৮-২১৯

২. এন এস ভি (No scalpel vasectomy) বা ছুরিবিহীন ভ্যাসেকটমি:

এ পদ্ধতিতে ছুরি বা সার্জিক্যাল ব্লেডের প্রয়োজন হয় না। সার্জিক্যাল ব্লেডের পরিবর্তে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত সরু ও ধারালো ফরসেপের সাহায্যে অন্ডথলির মাঝরেখা বরাবর মাত্র একটি ছিদ্র করে উভয় পার্শ্বের শুক্রবাহী নালী বের করে এনে বেঁধে কেটে ফেলা হয়। ফলে কোন সেলাই লাগে না এবং রক্তপাতও হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে 'এনএসভি' পদ্ধতিতে ভ্যাসেকটমি করা হয়।

১৯৭৪ সালে চীনের ডা. লী শাং কিয়াং ' এনএসভি' এবং তার প্রয়োজনীয় যন্ত্র দুটি উদ্ভাবন করেন। এর দশ বছর পর ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম বর্হিবিশ্বে এ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে 'এনএসভি' চালু করা হয়।[৪১]

ভ্যাসেকটমি যেভাবে কাজ করে

শুক্রকীট পুরুষের অন্ডকোষে তৈরী হয় এবং শুক্রবাহী নালী দিয়ে তা বীর্যথলীতে আসে ও জমা থাকে। বীর্যপাতের ফলে শুক্রকীট বীর্যের সাথে বের হয়ে আসে। ভ্যাসেকটমিতে শুক্রবাহী নালী কিছু অংশ বেঁধে কেটে ফেলে দেয়া হয়। ফলে শুক্রবাহী নালীর ধারাবাহিকতা থাকে না। এতে শুক্রকীট অন্ডকোষ থেকে শুক্রবাহী নালী দিয়ে বীর্যথলিতে আসতে পারে না। ফলে বীর্যপাতের সময় শুধু বীর্য বের হয়। তাতে কোন শুক্রকীট থাকে না। এর ফলে স্ত্রীর ডিম্বের সাথে শুক্রকীটের মিলন না হওয়ার ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না।[৪২]

এন এস ভি (ভ্যাসেকটমি)-এর সুবিধাসমূহ

* এটি ছুরিকাটা বিহীন স্থায়ী পদ্ধতি;
* স্থায়ী পদ্ধতি অত্যন্ত নিরাপদ কার্যকারী;

* যৌন ও শারীরিক শক্তি কমে না এবং সহবাসে কোন সমস্যা হয় না, আগের মতই ঠিক থাকে;
* স্ত্রী-গর্ভসঞ্চার হওয়ার চিন্তা না থাকায় যৌন মিলনের ইচ্ছা, ক্ষমতা, ও তৃপ্তি বেড়ে যেতে পারে;
* দীর্ঘমেয়াদী কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা স্বাস্থ্যহানির কোন ঝুঁকি নেই;
* অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ অপারেশন। অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না। অপারেশনে স্থানটুকু অবশ করে নেয়া হয় ফলে ব্যাথা পাওয়া যায় না;
* এনএসভি পদ্ধতিতে চামড়া কাটা লাগে না ফলে সেলাইও লাগে না, খুবই অল্প সময় লাগে (৫-৭ মিনিট) এবং রক্তপাত হয় না;
* অপারেশন পরবর্তী তেমন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না; [৪৩]

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ.২২০

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ.২০১

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ.২০২

এন এস ভি (ভ্যাসেকটমি) এর অসুবিধাসমূহ

* এ পদ্ধতি একবার গ্রহন করলে আর সন্তান হবে না, তাই পদ্ধতি গ্রহনের পূর্বে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন;

* পরবর্তীকালে গ্রহীতা সন্তান চাইতে পারে, এ ক্ষেত্রে পুনসংযোজন অপারেশনের প্রয়োজন হয়। এ অপারেশন খুবই জটিল, ব্যায়বহুল ও সহজপ্রাপ্য নয়। এ অপারেশনের সফলতার হার অনেক কম অর্থাৎ সফলতার কোন নিশ্চয়তা নেই;

* খুব ছোট হলেও এটি একটি অপারেশন এবং কম হলেও কিছুটা ঝুঁকি আছে;

* সংগে সংগে কার্যকরী হয় না। কার্যকরী কমপক্ষে তিনমাস সময় লাগে। অপারেশনের পর ঐ তিনমাস গ্রহীতাকে কনডম ব্যবহার করতে হয় বা স্ত্রীকে অন্য কোন কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়;

* অপারেশনের জন্য সেবা কেন্দ্রে আসতে হয়;

* প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়;

* যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধ করে না;

* পূর্বাবস্থায় সহজে ফিরে যাওয়া যায় না; [৪৪]

২. টিউবেকটমি (Tubectomy)

মহিলাদের জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিকে টিউবেকটমি (লাইগেশন)বলে। যেসব মহিলার কাঙ্খিত সংখ্যক সন্তান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে আর কোন সন্তান নিতে চান না তাদের জন্যে টিউবেকটমি বিশ্বজুড়ে একটি পুরাতন, পছন্দনীয়, নিরাপদ ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

টিউবেকটমি অপারেশন দু পদ্ধতিতে (Procedures) করা হয়-

১. মিনিল্যাপ টিউবেকটমি (Minilap tubectomy) :

এ পদ্ধতিতে মহিলাদের তলপেটের নিম্নাংশে মিনিল্যাপারটসির (Minilaparotomy) মাধ্যমে পেটের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ডিম্ববাহী নালী উপরে তুলে আনতে হয়। পরে মডিফাইড পমেরয় টেকনিক অবলম্বন করে ডিম্ববাহী নালীর কিছু অংশ (সর্বোচ্চ ১.০ সে.মি.) বেঁধে কেটে ফেলে দেয়া হয়, ফলে নালীপথের ধারাবাহিকতা (Continuily) বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে এ পদ্ধতিতে টিউবেকটমি করা হয়ে থাকে এবং এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত টিউবেকটমির ব্যর্থতার হার খুবই কম।

২. ল্যাপরোস্কোপির মাধ্যমে টিউবেকটমি (Laparoscopie Tubectomy):

ল্যাপরোস্কোপির মাধ্যমে ডিম্ববাহী নালীতে স্প্রিং ক্লিপ বা ফেলপ রিং (Spring-clips/Falope-rings) আটকিয়ে দিয়ে অথবা ইলেক্‌ট্রো কটারী করে ডিম্ববাহী নালী পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে ডিম্ববাহী নালীপথের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে ও পদ্ধতিতে টিউবেকটমি করার হার খুবই কম। এ পদ্ধতির ব্যর্থতার হার তুলনামূলকভাবে বেশী।[৪৫]

টিউবেকটমি যেভাবে কাজ করে

মিনিল্যাপ টিউবেকটমিতে ডিম্ববাহী নালীর কিছু অংশ (সর্বোচ্চ ১.০ সে.মি.) লপ তৈরী করে দুই প্রান্ত একত্রে বা আলাদাভাবে বেঁধে কেটে ফেলে দেয়া হয়। ল্যাপরোস্কোপির মাধ্যমে টিউবেকটমিতে ডিম্ববাহী নালীতে স্প্রিং-ক্লিপ বা ফেলপ-রিং আটকিয়ে দিয়ে অথবা ইলেক্রো কটারী করে ডিম্ববাহী নালী পথকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে টিউবেকমি করার পর ডিম্ববাহী নালী পথের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। এতে ডিম্বাশয় থেকে প্রস্ফুটিত ডিম্ব ডিম্ববাহী নালী দিয়ে জরায়ুতে আসতে পারে না এবং শুক্রকীটও যেতে পারে না। এতে ডিম্বের সাথে শুক্রকীটের মিলন না হওয়ার ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না।[৪৬]

টিউবেকটমির সুবিধা অসুবিধা সমূহ

সুবিধা

* অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকরী হয় এবং খুবই নিরাপদ ও কার্যকরী;
* প্রতিদিন কোন পদ্ধতি খাবার বা ব্যবহারের ঝামেলা নেই;

* ক্লিনিকে বা কর্মীর কাছে বারবার যেতে হয় না;
* যৌন শক্তি ও শারীরিক শক্তি কমে না, সহবাসে কোন সমস্যা হয় না বরং পূর্বের মতই অটুট থাকে;
* গর্ভবতী হওয়ার চিন্তা না থাকায় যৌন মিলনের ইচ্ছা, ক্ষমতা, ও তৃপ্তি বেড়ে যেতে পারে;
* দীর্ঘমেয়াদী কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই;
* প্রসবের পর পরই করা যায় এবং সেক্ষেত্রে বুকের দুধের উপর প্রভাব ফেলে না;
* পরবর্তী গর্ভধারণে ও হরমোনাল পদ্ধতি ব্যবহারে স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে এমন মহিলার জন্যে খুবই ভাল পদ্ধতি;
* স্ত্রী হরমোন শরীরে ঠিক থাকে, কারণ ডিম্বাশয় স্ত্রী হরমোন আগের মত তৈরী করে থাকে। ফলে মেয়েলীভাব ঠিক থাকে;

৪৪। প্রাগুক্ত,পৃ.২০২
৪৫। প্রাগুক্ত,পৃ.২০৩
৪৬। প্রাগুক্ত

* অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ অপারেশন। অজ্ঞান করার প্রয়োজন পড়ে না। অপারেশনের স্থানটুকু অবশ করে নেওয়া হয় এবং ব্যথা নাশক ইনজেকশন দেওয়া হয়; ফলে ব্যথা পাওয়া যায় না;
* অপারেশনের দিনই বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়।[৪৭]

অসুবিধা

* স্থায়ী পদ্ধতি বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা প্রয়োজন আছে;
* এটি একটি ছোট অপারেশন হলেও ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে;
* অপারেশনের পর কয়েকদিন ব্যথা থাকতে পারে;
* অপারেশন গ্রহীতা সন্তান চাইলে চাইতে পারেন, এ ক্ষেত্রে পুন;সংযোজন অপারেশনের প্রয়োজন হয়। এই অপারেশন খুবই জটিল, ব্যয়বহুল ও সহজপ্রাপ্য নয়। এই অপারেশনের সফলতার হার অনেক কম অর্থাৎ সফলতার কোন নিশ্চয়তা নেই;
* নগন্য ক্ষেত্রে গর্ভবতী হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে জরায়ুর বাইরে গর্ভধারনের (Ectopic Pregnancy) সম্ভাবনা বেশী থাকে;
* অপারেশনের জন্যে সেবা কেন্দ্রে আসতে হয়;
* প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়;
* যৌনরোগ বা এইডস প্রতিরোধ করে না।[৪৮]

নন-ক্লিনিক্যাল বা অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি (ইমপ্ল্যান্ট)

এটি মহিলাদের জন্যে অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী নন-ক্লিনিক্যায় পদ্ধতি। ইমপ্ল্যান্ট একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অত্যন্ত কার্যকরী শুধুমাত্র প্রজেষ্টোজেন সমৃদ্ধ জন্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। বর্তমানে বাংলাদেশে নরপ্ল্যাট ব্রান্ডের ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। নরপ্ল্যান্ট ইমপ্ল্যান্টে ৬টি ছোট ছোট (দিয়াশলাই এর কাঠির মত) নরম ও চিকন ক্যাপসুল থাকে যা দৈর্ঘ্যে ৩৪ মিলিমিটার ও প্রস্থে ২.৪

মিলিমিটার। প্রতিটি ক্যাপসুলের আবরণ সাইলাষ্টিক (Silastic) অর্থাৎ এক ধরণের সিলিকন রাবার জাতীয় নমনীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী যা শল্য চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরণের টিউব ও প্রস্থেসিস তৈরীতে এবং পেসমেকারে ব্যবহৃত হয় এবং মানুষের শরীরের জন্যে সহজেই সহনীয়। প্রতিটি ক্যাপসুলে ৩৬ মি:গ্রা: করে লেভোনরজেষ্ট্রিল (Levonorgestrel) নামক এক ধরণের কৃত্রিম প্রজেষ্টোজেন হরমোন ভরা থাকে যা গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে। ক্যাপসুল ৬টি একজন মহিলার বাহুর ভিতরের দিকে, কনুইয়ের ভাঁজ থেকে ৮ সেন্টিমিটার উপরে ঠিক চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয়। স্থাপনের পর পর ক্যাপসুলের গায়ের অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার (অনুবিক্ষণীক) ছিদ্র দিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় এই হরমোন নি:সৃত হতে শুরু করে এবং ২৪ ঘন্টা পর থেকেই পূর্ণমাত্রায় গর্ভনিরোধক কার্যকারিতা আরম্ভ হয়। নরপ্ল্যান্ট ইমপ্ল্যান্ট খুলে ফেলার কিছুদিন পরই মহিলারা আবার স্বাভাবিক গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে পান। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এক-রড বিশিষ্ট ইমপ্যান্টন (ইটোনজেষ্ট্রিল) বা দুই-রড বিশিষ্ট জ্যাডেলি (লেভোনরজেষ্ট্রিল) ব্যবহৃত হতে পারে।[৪৯]

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

গর্ভনিরোধের বিভিন্ন ধরনের ইমপ্ল্যান্ট[৫০]

ইমপ্যান্টের ধরণ	উপাদান	রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত দেশ	কার্যকারীতার মেয়াদ (বছর)	কার্যকারীতার হার
নরপ্যান্ট Norplant	৬টি সিলিকন ক্যাপসুল থেকে লেভোনরজেষ্ট্রিল নি:সরন হয়। প্রতিটি ক্যাপসুলে ৩৬ মি:গ্রা: লেভোনরজেষ্ট্রিল থাকে।	প্রায় ১০০টি দেশে	৫	<১
জ্যাডেলি Jadelle	২টি সিলিকন ক্যাপসুল থেকে লেভোনরজেষ্ট্রিল নি:সরন হয়। প্রতিটি ক্যাপসুলে ৭৫ মি:গ্রা: লেভোনরজেষ্ট্রিল থাকে।	ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশে, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া	৫	<১
ইমপ্ল্যানন (Implanon)	১টিপলিমার (রেজিন) দন্ড থেকে ইটোনজেষ্ট্রিল নি:সরন হয়। প্রতিটি ক্যাপসুলে ৬৮ মি:গ্রা: ইটোনজেষ্ট্রিল থাকে।	অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশীয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশ কিছু দেশে, যুক্তরাষ্ট্র।	৩	<১
নেষ্টোরন (Nestorona)	২টি সিলিকন ক্যাপসুল থেকে নেষ্টোরন নি:সরন হয়।	ব্রাজিল	২	<১
ইউনিপ্যান্ট	২টি সিলিকন ক্যাপসুল থেকে নোসেজেষ্ট্রেল নি:সরন হয়।		১	<১

ইমপ্ল্যান্ট কিভাবে কাজ করে

ইমপ্ল্যান্ট (নরপ্যান্ট) ক্যাপসুলগুলো স্থাপনের পর ক্যাপসুলের গায়ের অসংখ্য অনুবিক্ষনীক ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র দিয়ে ভিকিউশনের মাধ্যমে স্বল্প মাত্রার প্রজেষ্টেরণ হরমোন বের হতে থাকে। প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিদিন ৮৫ মাইক্রোগ্রাম হরমোন নি:সৃত হয়। তারপর নি:সৃত হরমোনের মাত্রা কমতে শুরু করে এবং নয় মাসের মধ্যে নি:সৃত হরমোনের পরিমাণ কমে প্রতিদিন ৫০ মাইক্রোগ্রাম, ১৮ মাসের মধ্যে প্রতিদিন ৩৫ মাইক্রোগ্রাম ও তারপর থেকে প্রতিদিন ৩০ মাইক্রোগ্রাম দাঁড়ায়।

৫০। প্রাগুক্ত,পৃ.১০৮

ইমপ্যান্টের হরমোন মূলত: তিনভাবে গর্ভনিরোধ করে:

১. জরায়ুর মুখের (Corvix) শ্লেষ্মা ঘন করে, যার ফলে শুক্রকীট সহজে জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।

২. ডিম্বস্ফুরণ (Ovulation) বন্ধ করে ৫০% ক্ষেত্রে।

৩. জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লির (Endomatrium) বৃদ্ধির মন্থর (Hypoolasec) করে, ফলে নিষিক্ত ডিম্ব (যদি নিষিক্ত হয়) জরায়ুতে গ্রথীত হতে পারে না।[৫১]

ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারীতা

ইমপ্ল্যান্ট (নরপ্যান্ট) ব্যবহারীর প্রথম বছর ১০০ জন মহিলার মধ্যে ০.১ এক জন (হাজারে ১জন) এবং পাঁচ বছরে ১০০ জন মহিলার মধ্যে ১.০ জন গর্ভধারণ (৬২ জনের মধ্যে ১ জন) করেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সে সব গ্রহীতার ওজন ৭০ কেজি বা তার বেশী তাদের ক্ষেত্রে গর্ভধারনের হার বেড়ে যায়, ৫ বছরে ১০০ জন গ্রহীতার মধ্যে ২.৪ জন (৪২ জনে ১ জন) পদ্ধতিটি খুলে ফেলার কিছুদিন পর গ্রহীতা আবার তার স্বাভাবিক গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে পান। অন্যান্য ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারীতাও নরপ্ল্যান্টের মত। নরপ্ল্যান্টের মত জ্যাডেলির কার্যকারীতা পাঁচ বছর এবং ইমপ্ল্যাননের কার্যকারীতা তিন বছর স্থায়ী থাকে।[৫২]

ইমপ্ল্যান্টের সুবিধা

* অত্যন্ত কার্যকরী, অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির যা একটানা প্রকারভেদে ৩-৫ বছর গর্ভধারণ প্রতিরোধ করতে পারে।

* স্থাপনের ২৪ পর গর্ভনিরোধ কার্যকারীতা শুরু হয়ে যায়।

* খুলের পর পরই পুনরায় গর্ভধারন ক্ষমতা ফিরে আসে।

* প্রতিদিন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

* যৌন মেলামেশা কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

* নির্ধারিত ফলো-আপ ছাড়া পুনঃ পুন; ক্লিনিকে ভিজিটে আসতে হয় না।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৫২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

* মায়ের বুকের দুধের গুনগত বা পরিমাণগত কোন তারতম্যের সৃষ্টি করে না বিধায় শিশু জন্মের ৬ সপ্তাহের পর পরই ইমপ্ল্যান্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

* ইস্ট্রোজেন হরমোনজনিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নাই।

* রক্ত স্বল্পতা দুর করে।

* প্রয়োজনে যে কোন সময়ে খোলার সুবিধাঃ যদি কোন কারণে গ্রহীতা ইমপ্ল্যান্ট আর ব্যবহার করতে না চান বা সন্তান নিতে চান তবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার দিয়ে এটা খুলে নিতে পারেন।

ইমপ্ল্যন্টের অসুবিধাঃ

* সাধারণ কিছু পাশ্ব-প্রতিক্রিয়া। যেমনঃ

- দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব।
- বেশী দিন ধরে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব। এই সমস্যাটির হার খুবই কম এবং সাধারণত প্রথম কয়েক মাস পরে সমস্যা এমনিতেই ভাল হয়ে যায়।
- মাসিক বন্ধ থাকা (কিছু কিছু মহিলা এটিকে সুবিধা হিসেবে গন্য করে) ।
- মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, ওজন বৃদ্ধি হওয়া।
- অবসাদ
- স্তনে ব্যথা বা ভারী লাগা।

* ইমপ্ল্যান্ট নিজে নিজে ব্যবহার করা যায় না, লাগানো বা খোলার জন্যে সেবা দান কেন্দ্রে যেতে হয়। গ্রহীতা ইচ্ছা করলে নিজে খুলতে পারবেন না।

* লাগানো এবং খোলার জন্যে ছোট অপারেশনের প্রয়োজন হয় যার জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর প্রয়োজন।

* অন্যান্য ছোট খাট অপারেশনের মতো কিছু সমস্যা যেমন : সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, ফুলে যাওয়া, ইত্যাদি। তাবে এসব সমস্যা সহজেই নিরাময় যোগ্য এবং বিরল।

* যৌনরোগ এবং HIV/AIDS প্রতিরোধে কোন ভূমিকা রাখে না।[৫৩]

৫৩। প্রাগুক্ত,পৃ.১১০

আইইউডি

আইইউডি (Intrautenine Desice) মহিলাদের জরায়ুতে স্থাপন উপযোগী একটি দীর্ঘমেয়াদী অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সারা পৃথিবীতে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মহিলা আইইউডি ব্যবহার করার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করেন। বাংলাদেশে প্রচলিত সাতটি আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে আইইউডি অন্যতম। প্রাচীনকালে আরব দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের কাফেলায় মানুষ ও মালামাল পরিবহনের জন্যে উট ছিল প্রধান বাহন। কাফেলা গুলোকে ব্যবসা বাণিজের প্রয়োজনে দীর্ঘসময় পথে পথে ও বিভিন্ন স্থানে থাকতে হতো। এ সময় প্রধান বাহক গর্ভবতী হলে বা বাচ্চা প্রসব করলে পরিবহন কাজ ব্যহত হত। পথের এ বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবার জন্যে বাণিজ্য কাফেলা রওনা দেয়ার পূর্বে উটের জরায়ুতে ছোট পাথরের টুকরা ঢুকিয়ে দেয়া হত। ফলে উটের গর্ভসঞ্চার হত না। প্রাচীনকালে আরব দেশের সেই ধারণা থেকেই বর্তমানে ব্যবহৃত আইইউডি এর উৎপত্তি হয়েছে। ১৯০৯ বৈজ্ঞানিক রিকটার সিল্ক ওয়ার্মগাট প্রথম আইইউডি তৈরী সম্পর্কে ধারণা দেন।তারপর থেকে বিভিন্ন ধরনের ও আকার আকৃতির আইইউডির প্রচলন শুরু হয়। যেমন- কয়েল, স্পাইরাল, শীল্ড, স্প্রিং, রিং, ইংরেজী T ও সাত (7) আকৃতির ইত্যাদি। বিভিন্ন আইইউডি তৈরীর উপরকরণও বিভিন্ন যেমন, রূপা (Silver), তামা (Copper) ও প্লাষ্টিক উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রজেষ্টোজেন হরমোন সম্বলিত আইইউডিও ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে আধুনিক আইইউডির প্রচলন হয়, যা অধিকতর কার্যকর এবং নিরাপদ। কপার যুক্ত আইইউডি পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী কর্মসূচীতে কপার-টি ৩৮০ ব্যবহৃত হচ্ছে।

আইইউডি'র ধরন

নাম	কার্যকারিতার মেয়াদ	মূল উপাদান
কপার টি ৩৮০ এ	১০ বৎসর	কপার
কপার টি ২০০ বি	৫ বৎসর	কপার
লেভোনরজেষ্ট্রেল সমৃদ্ধ আইইউডি Lernorgustrel Inrauterive System, LNG-IUS(Minerar)	৫ বৎসর	লেভোনরজেষ্ট্রেল হরমোন

কপার-টি ৩৮০ এ

মেডিকেটেড আইইউডি পদ্ধতির মধ্যে কপার- T বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ইংরেজী ' T ' অক্ষরের মতো দেখতে এ পদ্ধতি পলিথিলিন প্লাষ্টিকের তৈরী এবং এর দন্ডে তামার সূক্ষ্ম তার ও বাহুতে তামার সূক্ষ্ম পাত জড়ানো থাকে। লম্বা দন্ডে ১৭৬ মি.গ্রাম এবং প্রতি বাহুতে ৬১.৫ মি: গ্রা: মোট ৩০৯ জড়ানো থাকে। এতে তামার মোট আয়তন ৩৮০+২৩ বর্গ মিলিমিটার। এখান থেকে কপার অনু ধীরে ধীরে জরায়ুতে নি:সৃত হয়। কপার-টি'র লম্বা দন্ডের সাথে ২টি নাইলনের সুতা লাগানো আছে। কপার-টি ৩৮০ খুব কার্যকরী। কপার-টি ৩৮০ এর প্রথম বছরে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা শতকরা ০.৭ ভাগ মাত্র। দ্বিতীয় হতে দশম বছর পর্যন্ত এর সম্ভাবনা আরো কম।

আমাদের দেশে প্রতিটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং স্বীকৃত এনজিও/বেসরকারী ক্লিনিকে আইইউডি সেবা পাওয়া যায়। তাছাড়া পর্যাপ্ত সুবিধাদি থাকলে স্যাটেলাইট ক্লিনিকেও এই সেবা দেওয়া সম্ভব।

কপার-টি ৩৮০ কিভাবে কাজ করে

১. শুক্রকীট চলাচলে বাধা দেয়, বিশেষত যোনি পথ থেকে কেলোপিয়ান টিউব পর্যন্ত শুক্রকীটের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে ফলে নিষিক্তকরণ হতে বাধা দেয়।

২. কেলোপিয়ান টিউবে ডিম্ব চলাচলের গতি বৃদ্ধি করে ফলে প্রস্ফুটিত ডিম্ব দ্রুততার সাথে ডিম্ব নালী চলে আসার কারণে ডিম্বনালীর সঠিক স্থানে (এ্যাম্পুলা) নিষিক্ত হতে পারে না।

৩. ফরেনবডি হিসেবে কাজ করে ও জীবাণুমুক্ত প্রদাহের ফলে জরায়ুর গহবরে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ফলে জরায়ুর গায়ে ভ্রূণ গ্রথিত হতে পারে না।[৫৪]

আইইউডি কার জন্যে উপযোগী

* সে সব মহিলার অন্তত একটি জীবিত সন্তান আছে এবং দীর্ঘ দিনের গর্ভরোধ করতে চান।

* যে সব মহিলা হরমোন সমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না।

আইইউডি ব্যবহারের সময়

মাসিকচক্রের যে কোন সময় আইইউডি পরানো যায়। কিন্তু মাসিকে ১-৭ দিনের মধ্যে পড়ানোই উত্তম। কারণ-

* এ সময়ে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না।

* এ সময়ে মারাডিক্স কিছুটা নরম নরম এবং খোলা থাকে

* মাসিকের সময়ে বা ঠিক পরে আইইউডি পরালে জরায়ুর মুখ নরম থাকে, রক্তপাত ও মাংসপেশীতে ব্যথা কম হয়। ফলে গ্রহীতার ভয় পাওয়ার আশংকা অনেক কমে যায়।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ.১৫০

আইইউডি ব্যবহারের সুবিধা

* খুবই কার্যকরী ৯৯.৯%

* দীর্ঘমেয়াদী (১০ বৎসর)

* সহজে প্রয়োগ করা যায়

* প্রয়োগ করার সাথে সাথেই কার্যকর হয়।

* ব্যবহারে বুকের দুধের কোন তারতম্য হয় না।

* পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই গর্ভধারণ ক্ষমতা ফিরে আসে।

* যৌন সঙ্গমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

* হরমোন জনিত সমস্যা নেই।

* প্রতিদিন ব্যবহার (কনডম) বা খাওয়ার (বড়ি) ঝামেলা নেই।

আইইউডি ব্যবহারের অসুবিধা

* কোন কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক মাস তলপেটে ব্যথা হতে পারে।

* কোন কোন গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক মাস মাসিকের সময় রক্তস্রাব বেশী হতে পারে।

* কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইইউডি জরায়ু থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

* নগন্য ক্ষেত্রে আইইউডিসহ গর্ভসঞ্চার হতে পারে।

* কদাচিৎ জরায়ু ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।
* আইইউডি পরার এবং খোলার জন্যে অভিজ্ঞ প্রয়োগকারী প্রয়োজন।
* মাসিকের পর সূতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়।
* যৌনরোগ এবং HIV/AIDS প্রতিরোধ করে না।
* প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ/প্রদাহের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
* জীবাণুমুক্ত উপায়ে দক্ষ প্রয়োগকারীর দ্বারা পরানো না হলে অথবা যৌনরোগের ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রহীতাকে পরালে তলপেটে প্রদাহের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।[৫৫]

৫৫। প্রাগুক্ত,পৃ.১৫১-১৫২

নন-ক্লিনিক্যান বা অস্থায়ী পদ্ধতি (খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, এমকোঃ জেলী ও ফোম, এম,আর)

গর্ভনিরোধের মিশ্র খাবার বড়ি সাধারণত মানুষের কাছে 'খাবার বড়ি' হিসেবেই পরিচিত। খাবার বড়ি গর্ভনিরোধের অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি। ২০০৪ সালের এক সর্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে গর্ভনিরোধের পদ্ধতি ব্যবহার কারীর হার শতকরা ৫৮.১ ভাগ এবং তম্মধ্যে খাবার বড়ি ব্যবহার কারীর হার শতকরা ২৬.২ ভাগ।[৫৬] বাংলাদেশে খাবার বড়িই হলো সর্বাধিক ব্যবহৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। পঞ্চাশের দশকে প্রজেষ্টরন (progesterone) ব্যবহার করে ডিম্বস্ফোরণ রোধ করার ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রজেষ্টরন হরমোন নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে যতদিন খুশি ডিম্বস্ফোরন বন্ধ রাখা যায়। পরবর্তীতে পবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, ডিম্বস্ফোরনে প্রজেষ্টেরনের নিষ্ক্রিয়কারী ভূমিকাকে এষ্ট্রোজেন আরো শক্তিশালী করে। এর ফলে মিশ্র বড়ি ব্যবহারে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়। বিভিন্ন গবেষণার অভিজ্ঞতা জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা অক্ষুন্ন রেখে পার্শ প্রতিক্রিয়া কমানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বড়ির উপাদান হিসেবে এষ্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টেরনের মাত্রা কমতে শুরু করে এবং বিভিন্ন ধরনের এষ্ট্রোজেন ও প্রজেষ্টরন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খাবার বড়ির প্রকারভেদ

বর্তমানে প্রচলিত খাবার বড়ির উপাদান হলো এষ্টোজেন ও প্রজেষ্টেরন হরমোন। মূলতঃ এষ্টেজেন হরমোন এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করে খাবার বড়ির প্রকার নির্ণয় করা হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ খাবার বড়ির ধরনঃ [৫৭]

খাবার	বড়ির ধরন	হরমোনের মাত্রা	মন্তব্য
মিশ্র cambined খাবার বড়ি। প্রতিটি বড়িতে একই মাত্রায় এষ্টোজেন ও প্রজেষ্টেরন থাকে	স্বল্প মাত্রার মিশ্র বড়ি (Low doge pill)	৩০-৩৫ মাইক্রোগ্রাম এষ্ট্রোজেন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রজেষ্টরন	বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার মাত্রার বড়িটির নাম হলো 'সুখী' এতে ৩০ মাইক্রোগ্রাম ইথিনাইল ইষ্টাডিয়াল (এষ্ট্রোজেন) এবং ১৫০ মাইক্রোগ্রাম লেভোনর জেষ্ট্রিল রয়েছে।

৫৬। Demography Health servies, 2004

৫৭। পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল ২০০৭, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ মন্ত্রনালয়, পৃ.৫৮

খাবার	বড়ির ধরন	হরমোনের মাত্রা	মন্তব্য
	সাধারণমাত্রার উচ্চ মাত্রার মিশ্র বড়ি (slomdorg sore pill)	এষ্ট্রোজেন ৫০ মাইক্রো গ্রাম প্রসেষ্টরন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম	সাধারণ মাত্রার বড়ির নাম "c-5 (combinatiam-5)" ওভরাল (Ovral) লিনডিয়ল
প্রজেষ্টরন নির্ভর খাবার বড়ি (শুধুমাত্র প্রজেষ্টরন হরমোন থাকে)	মিনি পিল (Mini pill)	০.০৭৫ মিলিগ্রাম প্রজেষ্টরন (নরজেস্ট্রিল) বা সম ক্ষমতা সম্পন্ন অন্যান্য প্রজেষ্টরন যথা নরএথিনড্রন বা ডেসোজেসট্রিল	এখানে কোন এষ্ট্রেজেন হরমোন থাকে না। যে কারণে যে সব মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্যে এ বড়ি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ এ হরমোন মায়ের দুধের পরিমান ও গুণাবলীর উপর কোন প্রভাব ফেলেনা। এটা বাজারে 'মিনিকন' পিল নামে পাওয়া যায়।

কার্যকারিতাঃ

- মিশ্র বড়ি সঠিকভাবে গ্রহন করলে প্রীয় ৯৯.৯ শতাংশ কার্যকরী।
- প্রজেষ্টেরন নির্ভর মিনিপিল শতকরা ৯৭ থেকে ৯৮ ভাগ কার্যকরী। মিনিপিল প্রতিদিন ১টি করে বিরতিহীনভাবে গ্রহণ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- মিনিপিলের কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত কম। সেজন্যে এক বা একাধিক বড়ি খেতে ভুলে গেলে (বা ৪৫ দিন বা তার বেশী সময় ধরে মাসিক বন্ধ থাকলে) গ্রহীতাকে গর্ভধারণের ব্যবহারে পরীক্ষা করা উচিত। খাবার বড়ির কার্যকারীতা মূলত ঃ নির্ভর করে নিয়মিত এবং সঠিকভাবে গ্রহন করার উপর।
- মহিলারা হঠাৎ করে খাবার বড়ি ব্যবহার করা বন্ধ করে দিলে (পরিবর্তে অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার না করে কিংবা কোন প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা না নিয়েই সহবাস করলে) গর্ভসঞ্চার হতে পারে।
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা জটিলতার কারণে অথবা ভিন্ন ব্যক্তিগত কারণে অনেক মহিলা খাবার বড়ি খাওয়া বন্ধ করে রাখেন। সেজন্যে সকল বড়ি গ্রহীতাকেই জন্মনিয়ন্ত্রনের বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করে রাখা ভাল।

খাবার বড়ি কিভাবে কাজ করে

প্রধানত নিম্নোক্ত উপায়ে খাবার বড়ি জন্মনিয়ন্ত্রণ করে।

- ডিম্বস্ফোটনে বাঁধা দেয় (Prevents Ovulation) স্বাভাবিক মাসিক চক্রের মাঝামাঝি সময়ে নিউটেনোলাইজিং হরমোন (এলএইচ) হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ার ফলে ডিম্বস্ফোটন হয় (অর্থাৎ প্রায় পরিণত ডিম্বনু গর্ভাশয় থেকে বেরিয়ে আসে) খাবার বড়ি (এলএইচ) হরমোনের এই হঠাৎ বেড়ে যাওয়াকে প্রতিহত করে ডিম্বস্ফোটন হতে দেয় না।
- জরায়ুর মুখের (cervix) শ্লেস্মাকে ঘন এবং চটচটে করে শুক্রকীটকে জরায়ুতে প্রবেশে বাঁধা দেয়।
- ডিম্ববাহী নালীর (ফ্যানোপিয়ান টিইব) স্বাভাবিক চামড়ার গতি কমিয়ে দেয়, ফলে শুক্রকীটের গতিও কমে যায়। ডিম্বের কাছে পৌঁছতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সময় লেগে যায় এবং শুক্রকীটগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে বা মারা যায়।
- জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লির বৃদ্ধি রোধ করে, ফলে নিষিক্ত ডিম্ব (যদি নিষিক্ত হয়) জরায়ুতে গ্রহিত হবার মত কোন পরিবেশ পায় না এবং গ্রহিত হতে পারে না।[৫৮]

খাবার বড়ি যাদের জন্যে উপযুক্ত

- যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের অত্যন্ত কার্যকরী একটি অস্থায়ী পদ্ধতি নিতে চান। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটা শতকরা ৯৭ হতে ৯৯.৯ ভাগ কার্যকরী।
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাবের দরুন যারা রক্ত স্বল্পতায় ভোগেন। মিশ্র বড়ি মাসিক স্রাব নিয়মিত করে মাসিকের রক্তস্রাবের পরিমাণ কমায়।

- মাসিকের সময় যাদের তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা হয়। মিশ্র বড়ি মাসিকের সময়কার তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা কমায়।
- মাসিক চক্র যাদের অনিয়মিত। বড়ি সেবনের ফলে তাদের মাসিক নিয়মিত হয়।
- যে সব মা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তারা বাচ্চার বয়স ছয় মাস হবার পর জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে মিশ্র খাবার বড়ি খেতে পারেন।
- মিশ্র খাবার বড়ি বুকের দুধের পরিমাণ ও মান কমায়।
- যে সব মা শিশুকে "বুকের দুধ" দিচ্ছেন না তাদের সন্তান প্রসবের ৪ সপ্তাহ পড়ে খাবার বড়ি শুরু করতে হবে।
- সাধারণত প্রসবের ৪ সপ্তাহের মধ্যে কোন গর্ভনিরোধকের প্রয়োজন হয় না।
- জরায়ুর বাইরে গর্ভধারনের ইতিহাস থাকলে। মিশ্র বড়ি ডিম্বস্ফুটন প্রতিরোধ করে ডিম্বাশয়ের সিস্টকে বড় হতে দেয় না।
- অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বন্ধ করার সাথে সাথে গ্রহীতাকে মিশ্র বড়ি দেয়া যেতে পারে।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯

- এমনকি ইনজেকশন বন্ধ করার পর পর মিশ্র বড়ি দেয়া যেতে পারে পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা না করে।
- ডিম্বাশয়ে ক্যানসার হওয়ার পরিবারিক ইতিহাস থাকলে মিশ্র বড়ি ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- এন্ড্রোমেট্রিয়াল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকলে। খাবার বড়ি এন্ড্রেমেট্রিয়াল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমায়।
- পলিসিস্টক ওভারির উপসর্গ থাকলে। মিশ্র বড়ি এ সমস্যাগুলো দূর করে।
- যাদের Premenstrual symptoms (PMS) আছে। মিশ্র বড়ি (PMS) কমায়।
- এন্ডোমেট্রিয়োসিস থাকলে মিশ্র বড়ি খাওয়াকালিন সময়ে মাসিকের পরিমাণ কমে যায়। ফলতঃ রেট্রোগ্রেড মাসিকও প্রতিরোধ করে।[৫৯]

খাবার বড়ির সুবিধা ও অসুবিধা সমূহঃ

সুবিধা

- সকল বয়সী মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে খাবার বড়ি ব্যবহার করতে পারেন।
- এটি একটি অস্থায়ী পদ্ধতি যে কোন সময় বড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য পদ্ধতি গ্রহন করা যায় অথবা গর্ভধারণ করা যায়।
- সঠিক বড়ি খেলে এটি অনেক কার্যকরী শতকরা ৯৭-৯৯.৯ ভাগ।
- জরুরী গর্ভনিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- মাসিক চক্রকে নিয়মিত করে।
- মাসিক স্রাবের সময়কাল ও পরিমাণ কমায় এবং রক্তস্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে।

- ☐ সহজে পাওয়া যায় এবং ব্যবহারবিধিও সহজ।
- ☐ মাসিকের সময় জরায়ুর মোচড়ানো ব্যথাও কমায়। এন্ডোমেট্রিওসিস নামক ব্যধির প্রকোশ কমায় এবং এর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।
- ☐ স্তনের কাইব্রোসিস্টিক ব্যাধির সম্ভাবনা কমায়।
- ☐ ডিম্বাশয়ের সিস্ট ও ক্যান্সার হওয়ার ঝাঁকি কমায়।
- ☐ জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণের (Ectopil pregmeney) ঝুঁকি কমায়।
- ☐ জরায়ুর ভেতরের আবরণ বা ঝিল্লির (এন্ডোসেট্রিয়ামের) ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।
- ☐ কিছু ক্ষেত্রে এমাটিআই পরবর্তী তলপেটের প্রদাহের PID আক্রান্ত হতে রক্ষা করে।
- ☐ একটানা (রজঃনিবৃত্তি) (Menopause) পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।
- ☐ পরবর্তীতে বাচ্চা নিতে চাইলে খাবার বড়ি বন্ধ করার কিছুদিন পরেই সাধারণতঃ গর্ভধারণ হয়ে যায়। বেশির ক্ষেত্রে)
- ☐ মাসিক পূর্ববর্তী উপসর্গ (PMS-Premenstrual Symptoms) যেমন শরীর ব্যথা, ম্যাজম্যাজ ভাব, মাথা ব্যথা, মন খারাপ হওয়া, শরীরে পানির আধিক্য ইত্যাদি কমায়।
- ☐ Dysfunctional Uterin Bleeding (DUB) এর অবস্থান উন্নতি করে।

অসুবিধা

- ☐ প্রতিদিন খেতে হয়।
- ☐ মাসিক স্রাব বন্ধ থাকতে পারে।
- ☐ যোনি পথের পিচ্ছিলতা কমে যেতে পারে।
- ☐ বুকের দুধ কমে যেতে পারে।
- ☐ বিমর্ষতা দেখা দিতে পারে।
- ☐ জন্মনিয়ন্ত্রণ খাবার বড়ি ব্যবহারের প্রথম দিকে (বিশেষত ৩–৪ মাসের মধ্যে) ছোটখাট পাশ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন
- ☐ স্তন স্পর্শ করলে ব্যথার অনুভূতি (Tenderness), বেদনা
- ☐ দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব
- ☐ বমি বমি ভাব
- ☐ মাথা ধরা
- ☐ মুখে ব্রণ
- ☐ ওজন বৃদ্ধি
- ☐ যৌন রোগ (HIV/AIDS, RTI/STI) প্রতিরোধ করেনা।

- ☐ যে সমস্ত মহিলার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardin Infarction MI) এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান, খাবার বড়ি তাদের ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে দেয়।
- ☐ যে সমস্ত মহিলার ষ্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি আছে (যেমন ধুমপান/তামাক পাতা গ্রহন, উচ্চ রক্তচাপ) খাবার বড়ি ব্যবহার তাদের ষ্ট্রোকের ঝুঁকি আরো বাড়ায়।
- ☐ শিরার রক্তজমাট বেধে যাওয়ার (Venous Thrombocmbolism) সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই অতীতে বা বর্তমানে যাদের এ সমস্যা হয়েছে তারা এষ্ট্রোজেন সমৃদ্ধ মিশ্র বড়ি খেতে পারবেন না।[৬০]

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬০

কনডম

কনডম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত একটি রাবার বা ল্যাটেক্সের পাতলা আচ্ছাদন। শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে নয়, কনডম যৌনবাহিত সংক্রমনের বিস্তার রোধ করতে পারে। কনডম বহু নামে এবং বিভিন্ন রং, আকার ও আকৃতিতে পাওয়া যায়।

কনডম পুরুষদের জন্যে একটি নিরাপদ এবং কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এর ব্যবহার অনাকাংখিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করে এবং যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে। সারা বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধের জন্যে আজ কোটি কোটি দম্পতি কনডম ব্যবহার করছেন।

আধুনিক রাবার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কনডম এখন "ল্যাটেক্স" হতে তৈরী হয়। গ্রহনযোগ্যতার জন্য কনডম এখন খুবই পাতলাভাবে তৈরী হয়। এতে শুক্রনাশক ও পিচ্ছিলকারক পদার্থ এখন যোগ করা হয়েছে। বর্তমানে কিছু কনডম ফোটাযুক্ত হওয়াতে এর গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দলে কনডম এখন আরো বেশী স্বাচ্ছন্দ্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কনডমের মান পুরঃ পরীক্ষা করে সংশোধন করেছে। ১৯৯১ সালের অকটোবর মাস থেকে কনডমের উন্নতি সাধনের জন্যে যে সংশোধন করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- ☐ লম্বা (Length) :

  বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক কনডমের নির্ধারিত মান হচ্ছে লম্বায় ১৮ সেন্টিমিটার।
- ☐ প্রশস্ত (width):

  চাওড়া ৪৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। গড়ে সাধারণত ঃ ১ মিলিমিটার কম বা বেশী হতে পারে।
- ☐ পুরুত্ব (Thickness):

  গড়ে কনডমের পুরুত্ব ০.০৬ মিলিমিটার থেকে + ০.০৫ মিলিমিটার পর্যন্ত।
- ☐ পিচ্ছিলতা (Lubricant):

প্রতিটি কনডমে পিচ্ছিল কারকের পরিমাণ হবে ২০০-৪০০ মিঃ গ্রাঃ পর্যন্ত আর ন্যূনতম আঠালোতার পরিমাণ হবে ২০০ সেন্টিস্টেক্স। কনডম প্যাকেট হতে খোলার পরের অবস্থায় এই পিচ্ছিলতার পরিমাপ উল্লেখ করা হয়েছে, কনডম প্যাকেটে রাখার সময় নয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিটি কনডমে ৪০ মিঃ গ্রাঃ অসংবেদনশীল (non-Mergic) কর্নষ্টার্চ বা শস্য গুড়ো দেবার সুপারিশ করেছে। এ গুড়ো রেশমী কোমল অনুভূতি এনে দেয় এবং সেই সাথে কনডম খুলতে সাহায্য করবে।

☐ প্যাকেট করা (Individual Packages):

যদি স্ট্রিপ কাগজে কনডম প্যাকেট করা হয় তবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা করার জন্যে দুই প্যাকেটের মাঝখানে ছিদ্র বা আংশিক ফাটা থাকতে হবে। সর্বস্তরে ফয়েল ল্যামিনেশন অক্ষত থাকতে হবে।

☐ ঘ্রান ও স্বাদ (oiur and taste):

যতটা সম্ভব ঘ্রান ও স্বাদ মুক্ত থাকা ভাল।[৬১]

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

গর্ভ প্রতিরোধে কনডম কিভাবে কাজ করে

কনডম একটি প্রতি বন্ধক বস্তু (Physical barrier) হিসেবে কাজ করে। বীর্যপাতের পর শুক্রকীট কনডমের ভিতরেই থেকে যায় ফলে কনডম শুক্রকীটকে যোনিপথে থাকতে বাঁধা দেয়। যার ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলতে পারে না, ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না। কনডমের সঠিক ব্যবহার জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে। ফলে কনডমের ভুল ব্যবহার ও ফেটে গেলে গর্ভধারনের সম্ভাবনা থাকে।

যৌন বাহিত রোগ প্রতিরোধে কনডম কিভাবে কাজ করে

☐ বীর্যের সাথে রোগজীবাণুকে যোনীপথের সংস্পর্শে আসতে বাঁধা দেয়।

☐ পুরুষাঙ্গ হতে কোন রোগ জীবণুর সংক্রেমণ হতে যোনীপথকে রক্ষা করে।

☐ একইভাবে যোনীপথের কোন রোগ জীবাণুকে পুরুষাঙ্গের সংস্পর্শে আসতে বাঁধা দেয়।

কনডমের কার্যকারিতা

সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে কনডম খুবই কার্যকর একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে ব্যথ্যতার হার শতকরা মাত্র ২ ভাগ। যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা না করা হয়ে থাকে তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনরোগ (STDS) প্রতিরোধে কনডমের কার্যকারিতা অনেক যৌনরোগ হ্রাস পায়। কনডম সঠিক নিয়মে ব্যবহারের মাধ্যমে এইচ আইভি, এইডস, গণোরিয়া, সিফিলিস, ক্ল্যামাইডিয়া, ট্রাইকোমোনিসিস রোগ হতে নিশ্চিত রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়াও হারপিস, জেনিটাল ওয়ার্ট ও অন্যান্য যৌন রোগ হতে কনডম সুরক্ষা দেয়।

কনডম ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ

সুবিধাঃ

কনডম শরীরের বাইরে প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি কোন ঔষধ নয়, সুতরাং অন্যান্য ঔষধ/হরমোন নির্ভর পদ্ধতির মত এর কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর প্রভাব নেই।

- ☐ সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে জন্মনিয়ন্ত্রণের পাশপাশি এইচ আইবি/এইডস ও অন্যান্য যৌনরোগ STDS হতে রক্ষা করে।
- ☐ সন্তান জন্মদানের পরে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে কনডম।
- ☐ শুধুমাত্র যৌন মিলনের সময় ব্যবহার করতে হয়।
- ☐ অনির্ধারিত যৌন মিলনের জন্যে পূর্ব হতে সংরক্ষণ করা যায়।
- ☐ সব পুরুষের জন্য উপযোগী।
- ☐ সেবাদান কারীর সাহায্য ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।
- ☐ যে কোন স্থানে বিক্রি হয় তাই সহজপ্রাপ্য, দাম কম, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে।
- ☐ গর্ভধারণের ভয় থাকে না বলে যৌন মিলনের আনন্দ পাওয়া যায়।
- ☐ জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌনমিলন প্রতিরোধে পুরুষের অংশগ্রহন ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে।
- ☐ যে সব দম্পতি গর্ভধারণ সচেনতা পদ্ধতি মেনে চলেন, তারা উর্বর দিন গুলোতে (মাসিক চক্রের নবম থেকে ২০ তম দিন পর্যন্ত) সহবাস করলে কনডম ব্যবহার করতে পারেন।
- ☐ নব বিবাহিত দম্পতিদের জন্যে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি।
- ☐ যাদের দূত বীযূপাত হয়ে যায়, চিকিৎসকগন তাদের অনেক সময় কনডম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ যদি সহবাসের সময় যৌন উত্তেযনা বজায় রাখতে ব্যর্থ হন (বিশেষ করে বাধক্য বা তলপেটে কোন অপারেশনের জন্যে) তবে কনডম ব্যবহারে এই সমস্যার কিছু সমাধান হতে পারে। কারণ কনডমের মুখের রাবার আঁট সাঁট বলে উত্তেজনা বজায় রাখতে কিছুটা সাহায্য করে।
- ☐ পিচ্ছিল কনডম কোন কোন দম্পতির জন্য ঘর্ষণজনিত অস্বস্তি কমায়।
- ☐ কনডম ব্যবহারের ফলে জরায়ুর মুখের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা কমে যায় বলে ধারণা করা হয়।
- ☐ কোন নারীর বীর্য বা শুক্রকীটে এলার্জি হলে সে ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা যায়।
- ☐ বিরল ক্ষেত্রে পুরুষের বীর্যের বিপরীতে নারী দেহে যে এন্টিবডি তৈরী হয়, তা বন্ধ্যাত্ত সৃষ্টি করতে পারে। ক্রমাগত কনডমের ব্যবহারে তা অনেক সময় প্রশমিত হয় এবং নারী গর্ভবতী হতে পারেন।

অসুবিধা

- ☐ কারো কারো 'ল্যাটেক্স' বা কনডম ব্যবহৃত পিচ্ছিলকারী পদার্থ হতে এলার্জি হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- ☐ অনুভূতি কমতে পারে, তাই কোন কোন দম্পতির যৌন মিলনে আনন্দ কমাতে পারে।
- ☐ কখনো কখনো কনডম ছিড়ে যেতে পারে বা খুলে পড়ে যেতে পারে।
- ☐ যৌনক্রিয়ার পূর্বমূহূর্তে কনডম পড়ার জন্যে কিছু সময় প্রয়োজন হয়।
- ☐ বহুদিন রেখে দিলে বা স্যাঁত স্যাঁত স্থানে রাখলে এর কার্যকারিতা হ্রাস হয়।
- ☐ গর্ভরোধে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।
- ☐ যৌনমিলন নির্ধারিত না হলেও কনডম মওজুদ রাখতে হয়।
- ☐ ব্যবহারের পর ব্যবহৃত কনডম ফেলে দেওয়ার জন্যে সচেনতা ও সাবধানতা প্রয়োজন হয়।
- ☐ অনেক সময় কনডম কেনা, পরা ও খোলা কারো জন্যে লাভজনক মনে হতে পারে।[৬২]

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

গর্ভনিরোধের ইনজেকশনঃ ডি.এম.পিএ

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন মহিলাদের জন্য কার্যকর অস্থায়ী ও স্বল্প মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। গর্ভনিরোধ খাবার বড়ির অনুরুপ দুই ধরনের গর্ভনিরোধক ইনজেকশন রয়েছে।

১. শুধুমাত্র প্রোজেস্টোজেন সমৃদ্ধ এবং

২. মিশ্র (ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টোজেনের মিশ্রন)

দুই ধরনের গর্ভনিরোধক ইনজেকশন থাকলেও বিশ্বব্যাপী "শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন" সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে দুই রকমের প্রজেস্টরন সমৃদ্ধ গর্ভনিরোধক উনজেকশন পাওয়া যায়। যথা–

১. ডিপো–মেড্রোক্সি প্রজেস্ট্রেরন এসিটেট (Depot Medroxy Progesterone Acetate) যা ডিএমপিএ নামে পরিচিত।

২. ননত্রথিষ্টারোন ইনানথেষ্ট (Norethisterone Enanthate) এর বানিজ্যিক নাম "নরিষ্টারেট"।

ডিএমপিএঃ বাংলাদেশ জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে "শুধুমাত্র প্রজেস্ট্রেরন" সমৃদ্ধ ডিএমপিএ (DMPA) গর্ভনিরোধক ইনজেকশন প্রচলিত আছে যার বানিজ্যিক নাম "ডিপো–প্রোভেরা"। এ ইনজেকশনটির প্রজেস্টেরন হরমোনের নাম ডিপো-মেড্রোক্সি প্রজেস্টেরন এসিটেট (Depot Medroxy Progesterone Autate) বা যা DMPA নামে পরিচিত। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত এবং অত্যন্ত কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যা তিন মাস পর পর গভীর মাংস পেশীতে প্রয়োগ করা হয়। DMPA পানিতে দ্রবীভূত সাদা রং-এর কৃত্তিম প্রজেষ্টরন হরমোন। এই ইনজেকশনটি ১ মি.লি. ভায়ালে সরবরাহ করা হয়। প্রতি ভায়ালে ১৫০ মিলি গ্রাম ডিএমপিএ থাকে। ডিএমপিএ মাইক্রোক্রিষ্টালাইজড সাসপেনশন হিসেবে তৈরী করা হয় এবং সরাসরি কার্যকর ষ্টেরয়েড হিসেবে কাজ করে।

ইনজেকশন কিভাবে কাজ করে

১. ডিম্বাশয়ে Ovary ডিম্ব Ovum পরিস্ফুটনে (Ovulation inhibition) বাঁধা দেয়।

২. জরায়ুর মুখে নিঃসৃত রসকে ঘন ও আঠালো করে যার ফলে জরায়ুতে শুক্রকীট প্রবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে।

৩. জরায়ুর ভিতরের দেয়ালকে (এন্ডোমেট্রিয়াম) গর্ভসঞ্চারের জন্য উপযোগী হতে দেয় না এন্ডোমেট্রিয়ামের গ্ল্যান্ড এর সংখ্যা এবং আকভরে কমার ফলে এটি পাতলা হয়ে যায়।

কার্যকারিতাঃ

১৫০ মিলিগ্রাম ডিএমপিএ' এর একটি ইনজেকশন প্রতি ৩ মাস পরপর দেয়ার পর দেখা গেছে যে, প্রতি ১০০ জন মহিলার ক্ষেত্রে বছরে পদ্ধতি ব্যর্থতার হার শতকরা ০.৩ জনেরও কম (প্রতি ১০০০ জনে মাত্র ৩ জন মহিলা গর্ভধারণ করে)। বাস্তব ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা খাবার বড়ির চেয়েও বেশী।

ইনজেকশনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সুবিধাঃ

১. অত্যন্ত কার্যকরী (প্রায় ১০০ ভাগ) এবং নিরাপদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

২. গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।

৩. প্রতিদিন খাওয়ার বা ব্যবহার করার ঝামেলা থাকে না। একটি ইনজেকশন কমপক্ষে ৩ মাস পর্যন্ত গর্ভসঞ্চারে বাঁধা দান করে।

৪. অস্থায়ী পদ্ধতি কাজেই পদ্ধতি ছেড়ে দিলে পুনরায় সন্তান করা সম্ভব।

৫. সহবাসের সাথে এর ব্যবহারের কোন সম্পর্ক নেই।

৬. ডিএমপিএ ইনজেকশন বুকের দুধের পরিমাণ ও গুণগত মানের উপর কোন প্রভাব পড়ে না ফলে বাচ্চা জন্মদানের ৬ সপ্তাহ পরেই এটি ব্যবহার করা যায়।

৭. অবাঞ্চিত গর্ভধারণ দূর করে যৌন মিলনকে আরো আনন্দঘন করে তুলতে সাহায্য করে।

৮. এষ্টোজেনজনিত ঝটিলতা যেমন রক্ত জমাট বাধা/হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা দেখা যায় না এবং যেসব ক্ষেত্রে এষ্টোজেন ব্যবহার নিষিদ্ধ সেসব ক্ষেত্রে ডিএমপিএ ব্যবহার করা যায়।

৯. জরায়ুর বাইরে গর্ভসঞ্চারের (একটোপিক প্রেগনেন্সি) ঝুঁকি কমায়।

১০. যে কোন বয়সের প্রজনন সক্ষম মহিলা এই ইনজেকশন নিতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ডাক্তার/পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী এই ইনজেকশন নিতে পারেন।

১২. এই ইনজেকশন জরায়ুর ভিতরের দেয়ালে (এন্ডোমেট্রিয়াম) ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

১৩. এই ইনজেকশন জরায়ুতে টিউমার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

১৪. এই ইনজেকশন ডিম্বাশয়ে (Ovary) ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

১৫. কিছু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে ডিএমপিএ নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করেঃ

-অনেক সময় মাসিক বন্ধ করে দেয় বলে রক্তস্বল্পতা কমায়

-মৃর্গী রোগীদের খিচুনীর প্রকোপ কমিয়ে দেয়।

-সিকল সেল এনিমিয়ায় আক্রান্ত রোগিরা এটি ব্যবহার করলে রক্তস্বল্পতা কম হয়ে থাকে।

-কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার স্ত্রী -রোগের অবস্থার উন্নতি করতে পারে যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস, ডিম্বাশয়ের সিস্ট ইত্যাদি।

অসুবিধাঃ

১. গর্ভনিরোধক ইনজেকশন গ্রহীতাদের প্রায় সকলেরই ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত কোন না কোন ধরণের মাসিকের পরিবর্তন ঘটে, যেমনঃ

-ফোটা ফোটা রক্তস্রাব বা অনিয়মিত রক্তস্রাব। এটিই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। দীর্ঘদিন মাসিক বন্ধ থাকতে পারে। সাধারণত একটানা একবছর ব্যবহার করারপর কারো কারো মাসিক দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোন কোন মহিলা এটিকে সুবিধা হিসেবে গণ্য করে।

-কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তস্রাব বেশী হয়ে থাকে। যদিও অতিরিক্ত খুব কম হয়ে থাকে।

২. ওজন বৃদ্ধি হওয়া।

৩. ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পর পুনরায় সন্তান ধারণ করতে সাধারণতঃ ৬–১২ মাস সময় লাগতে পারে। গ্রহীতা ইনজেকশন নেয়া বন্ধ করার পর শতকরা ৯২-৯৭ জন ২ বছরের মধ্যে গর্ভবর্তী হয়ে থাকেন।

৪. ইনজেকশন নিজে নেয়া যায় না। এ জন্যে ৩ মাস পরপর ক্লিনিকে বা পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর নিকট যেতে হয়।

৫. কোন কোন গ্রহীতার মাথা ধরে স্তন ভারী ও ব্যথা অনুভূত হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, স্বামী সহবাসের ইচ্ছা কমে যায় এবং মাথা ঝিমঝিম করে।

৬. রক্তে কোলেষ্টেরলের HDLহ্রাস পেতে পারে এবং কোলেষ্টেরলের HDL পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলার্জীক রি-অ্যাকশন দেখা দিতে পারে। এজন্যে গ্রহীতাকে ইনজেকশন নেয়ার পর কমপক্ষে ২০ মিনিট ক্লিনিকে অপেক্ষা করতে হয়।

৮. দীর্ঘ ব্যবহারে অস্থির ঘনত্ব কমে যেতে পারে।

৯. যৌনরোগে বা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না।[৬৩]

এমকো, জেলী ও ফোমঃ

যারা পিল, কনডম ও ইনজেকশন ব্যবহার করে স্বস্থিবোধ করেন না, তারা অনায়াসে এ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে এমকো, জেলী ও ফোম টেবলেট। এগুলো গর্ভসঞ্চার প্রতিরোধ করে। বিশেষ করে যারা কনডম ব্যবহার করেন তাদের জন্য এগুলো খুবই উপযোগী। কেননা কনডম ব্যবহারের সাথে সাথে এগুলো ব্যবহার করলে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৫

এমকো ও জেলীঃ এমকো ও জেলী হচ্ছে তরল পদার্থ। দেখতে ফেনা জাতীয়। 'নজল' নামক একটি প্লাষ্টিকের সিরিঞ্জে এমকো বা জেলী ভরে নিতে হবে। তারপর সিসিঞ্জের সাহায্যে তা স্ত্রী অঙ্গের ভিতর ঢুকিয়ে যোনীপথে মুখে দিতে হবে। এই তরল পদার্থে পুরুষের শুক্রকীট আটকে যায় এবং সাথে সাথে মরে যায়। স্ত্রী ডিমের সাথে মিলিত হতে না পারায় গর্ভসঞ্চারের কারণ ঘটতে পারে না।

স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর এই তরল পদার্থ আবার স্রাবের মত বের হয়ে যায়। ফলে শরীরে কোনরূপ বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে এমকো বা জেলী ব্যবহার করতে হয়। এর স্থায়িত্ব হচ্ছে মাত্র ছয় ঘন্টা। প্রতিবারই মিলনের পূর্বে মিলনের পূর্বে এমকো বা জেলী ব্যবহার করতে হবে। একটি টিউবের বা শিশির এমকো ও জেলী দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা চলে। এমকো জেলী ব্যবহার কালে স্বামীর সাহায্য দরকার। তিনি এ কাজ করতে পারলে ভাল হয়। স্ত্রীর পক্ষে একা এ কাজ করা সম্ভব নয়।

ফোম টেবলেটঃ এমকো ও জেলীর মত ফোম টেবলেট (দেখতে নভালজিন টেবলেটের মত) স্ত্রী অঙ্গের ভিতর দিয়ে যোনী পথের মুখে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। এ টেবলেট ভিতরে যাওয়ার সাথে সাথে তরল হয়ে যায়। এর ফলে পুরুষের শুক্রকীট তরল পদার্থে আটকে যাবে এবং সাথে সাথে মরে যাবে। স্ত্রীর ডিম্বানুর মিলিত হতে পারবে না। যার ফলে গর্ভসঞ্চারের কোন আশংকাই থাকবে না।

ফোম টেবলেট ব্যবহার করলে শরীরিক কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। কারণ স্রাবের মত তা বের হয়ে যায়। এই টেবলেটের স্থায়িত্বকাল মাত্র ছয় ঘন্টা। প্রতিবার স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে একটি নতুন টেবলেট ব্যবহার করতে হন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। কারণ স্রাবের মত তা বের হয়ে যায়। এই টেবলেটের স্থায়িত্বকাল মাত্র ছয় ঘন্টা। প্রতিবার স্বামী-স্ত্রীর

মিলনের পূর্বে একটি নতুন টেবলেট ব্যবহার করতে হয়। স্ত্রী একাই নিজহাতে এ টেবলেট ব্যবহার করতে পারবেন। যারা কনডম ব্যবহার করেন তাদের পক্ষে ৩ পদ্ধতির যে কোন একটি ব্যবহার করা ভাল। কনডমটি ফেটে গেলেও এ পদ্ধতির যে কোন একটির দরুন গর্ভসঞ্চারের কোন সম্ভাবনাই থাকে না ডাক্তারের মতে কনডম ও ফোম বা জেলী একটি আদর্শ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির উপকরণগুলো ব্যবহারের ঝামেলা থাকলেও মহিলারা পছন্দ করছেন। কেননা, এগুলো কোন শরীরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না এবং মানসিক দুশ্চিন্তাও সৃষ্টি করে না। দাম্পতি জীবনেও পরিপূর্ণ ও স্বাচ্ছন্দ থাকে।[৬৪]

৬৪। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, নিবন্ধ লিখন সংস্থা, তথ্য দপ্তর-২০১০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃ. ১৭-১৮

এম আর বা মাসিক নিয়মিতকরণ পদ্ধতি

এম আর বা (মিনিস্ট্রুয়েল রেগুলেশন) হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও পরিবার পরিকল্পনার একটি আধুনিক পদ্ধতি। যা সংশ্লিষ্ট মহিলাকে আকস্মিক গর্ভধারণ থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। মাসিকের তারিখ পার হবার ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ডাক্তারের কাছে এলে যান্ত্রিক উপায়ে অনিচ্ছুক গর্ভসঞ্চারের আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে ঘন ঘন এর আর (মিনিষ্ট্রুয়াল রেগুলেশন) করা ঠিক নয়। কেবলমাত্র আকস্মিক বা অনিচ্ছুক সন্তান জন্মরোধের জন্যে এম আর একটি ভাল পদ্ধতি।

এ পদ্ধতি গ্রহন করা যায় তখনি যদি কোন মহিলা আকস্মিকভাবে গর্ভধারণ করে ফেলেন। তাহলে মাসিক হবার তারিখ পার হবার পর ১৪ দিনের মধ্যে ক্লিনিকে যেতে হবে। ডাক্তার আগে মেডিক্যাল চেক-আপ করে নিবেন। যদি শরীরিক দিক থেকে সুস্থ ও উপযুক্ত হয় তাহলেই কেবল এম আর করানো হয়। হার্টের কঠিন অসুখ, অত্যন্ত জ্বর হলে, সংক্রামন ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী এবং মরণাপন্ন কোন রোগীকে এম, আর করানো হয় না। অন্যান্য পদ্ধতির মত এম, আর এরও ভাল মন্দ আছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এম আর করানো হলে কোনরকম শরীরিক অসুবিধা হয় না।

এম আর করতে সময় লাগে মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিট। এরপর ক্লিনিকে আধাঘন্টা মিশ্রাম নেবার পর বাড়ী ফেরা যাবে ও আগের মত হালকা ভারী সব রকম কাজ করা যাবে। এম আর করার পর শুধু ভিটামিন খাবারের পরামর্শ দেয়া হয়। তারপর ইচ্ছমত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহন ও বন্ধ্যাকরণ করা যাবে। কোন কোন মহিলার ইনফেকশন হতে পারে। তবে সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকে এলে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা যাবে।

এম আর ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যারা পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের পরও আকস্মিকভাবে গর্ভধারণ করে বসেন এবং কোন ক্রমেই আর সন্তান

চান না, তাদের জন্যে এম আর সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। মানসিক দুশ্চিন্তা ও আশংকা থেকে এম আর পদ্ধতি দ্রুত স্বাভাবিক করে তুলতে পারে।[৬৫]

রিদ্‌ম বা ক্যালেন্ডার পদ্ধতি

রিদ্‌ম বা ক্যালেন্ডার পদ্ধতি একটি অস্থায়ী পদ্ধতি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমঝোতার মাধ্যমে এ হিসাব (রিদ্‌ম বা ক্যালেন্ডার) অনুযায়ী চললে, আর কোন পদ্ধতি ব্যবহার না করলেও চলে। অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহনে যাদের আপত্তি রয়েছে তারাও এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যেসব মহিলাদের নিয়মিত মাসিক হয়, তাদের জন্যে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। বিশেষ করে পুরো এক বছর ধরে যদি কোন মহিলা তার মাসিকের তারিখটি হিসাব করে সযত্নে রাখেন যে তার মাসিক ঠিক নির্ধারিত সময়ে হচ্ছে তাহলে তিনিই এ পদ্ধতি গ্রহন করতে পারবেন।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

এ হিসাব অনুযায়ী একজন মহিলা তার নিরাপদ ও বিপদজনক তারিখ বা গর্ভসঞ্চারকালীন সময়টি বের করে নিতে পারবেন। সুতরাং এ পদ্ধতির একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে আপনার মাসিক চক্রের হিসাবটা অবশ্যই সযত্নে রক্ষা করতে হবে এবং মাসিক শুরুর দিনটা নিয়ামিত ক্যালেন্ডারের তারিখে দাগ দিয়ে রাখতে হবে। সেই সাথে প্রতিটি মাসিক কতদিন থাকলো তারও হিসাব রাখতে হবে।

কিভাবে হিসাব করবেন

যেদিন মাসিক শুরু হবে সেদিনকে মাসিক চক্রের প্রথম দিন ধরতে হবে এবং তারপর আবার যেদিন মাসিক শুরু হবে সে পর্যন্ত দিনগুলোকে একটি মাসিক চক্রের হিসাব ধরতে হবে। এই নিয়মে দেখা যায় বেশীর ভাগ মহিলার ২৮ দিন পর পর মাসিক হয়। নিম্নে তা টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

১নং টেবিল ৬৬
নিয়মিত মাসিক চক্র ২৮ দিনের

১ মাসিক শুরুর দিন	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১ পুনরায় মাসিক শুরু						

উপরের কালো ঘরগুলো বিপদজনক দিন, বাকী তারিখগুলো নিরাপদ দিন।

নিরাপদ সময়

২৮ দিন মাসিক চক্রের ১০ থেকে ১৭ তারিখ এই ৮ দিনকে সাধারণতঃ বিপদজনক দিন বাকী দিনকে নিরাপদ দিন ধরা হয়েছে। নিরাপদ এই কারণেই যে এই দিনগুলোতে স্ত্রী ডিম বের হয় না। কেবলমাত্র বিপদজনক দিনগুলোর ডিম্বকোস থেকে ডিম বেরিয়ে এসে টিউবে অবস্থান করে এবং উর্বর হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং এই দিন গুলোতে যদি স্ত্রী ডিম পুরুষের শুক্রের সাথে মিলিত হয়ে যায় তাহলেই সন্তান জন্মের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

নিরাপদ ও বিপদজনক সময়ের হিসাব

যাদের মাসিক খুব নিয়মিত বা অংকের মত নিয়ম মেনে চলে তাদের জন্যে মাসিক চক্রের মাত্র ৮ দিন বিপদজনক সময়। তার জন্যে একটি অংক আছে, যেমনঃ- মাসিক চক্র থেকে প্রথমে ১৮ দিন বিয়োগ দিন (২৮-১০) ও পরে আবার ১১ বিয়োগ দিন (২৮-১১=১৭)। মাসিক চক্র থেকে প্রথমে ১৮ বিয়োগ দিলে প্রথম বিপদজনক দিনগুলো বের হবে এবং পরে ১১ দিন বিয়োগ দিলে বিপদজনক দিন শেষ হবে। অর্থাৎ যাদের ২৮ দিন মাসিক চক্র তাদের বেলায় এই নিয়মে মাসিক চক্রের ১০ থেকে ১৭ দিন এই আটটি দিন গর্ভসঞ্চারের জন্য উপযোগী।

১০ এর আগে ১৭ এর পরের দিনগুলোতে গর্ভসঞ্চারের সম্ভবনা মোটামুটি কম। (১নং টেবিলে) প্রথমে ক্যালেন্ডারটি লক্ষ্য করুন। ২৮ দিন চক্রের নিরাপদ ও বিপদজনক সময় নির্দেশ করা হলো।[৬৭]

অনিয়মিত মাসিক চক্রের হিসাব

যাদের মাসিক অনিয়মিত তাদের ক্ষেত্রে বিপদজনক সময়টা ৮ দিন না থেকে মাসিক চক্রের ওঠামার উপর নির্ভর করবে। এই ক্ষেত্রেও সেই ১৮ ও ১১ এর অংক কষতে হবে। তবে এবারে দেখতে হবে গত একবৎসরে সবচেয়ে ছোট চক্র কতদিনের ও সবচেয়ে বড় চক্র কতদিনের ছিল। ধরা যাক, মাসিক কোন বার ২৪ দিন ও কোন বার ৩২ দিন পর হয়। এক্ষেত্রে ২৪ থেকে ১৮ বিয়োগ দিন (২৪-১৮=৬) ও ৩২ থেকে ১১ বিয়োগ দিন (৩২-১১=১) অর্থা ছোট চক্র থেকে ১৮ ও বড় চক্র থেকে ১১ বিয়োগ দিলে বিপদজনক সময় বের হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিপদজনক সময়টা হচ্ছে ৬ থেকে ২১ দিন অর্থাৎ ১৬ দিন। নিয়মিত মাসিক চক্রের মহিলাদের বেলাতেও দু চারদিন এদিক সেদিক হতে পারে। তাই এই পদ্ধতিতে সব সময় মাসিকের হিসাব রাখতে হবে। যদি মাসিকের অনিয়ম ৭ থেকে ১০ দিন হয় তাহলে এই পদ্ধতি গ্রহণ করাই ভাল।

২নং টেবিল থেকে নিয়মিত অনিয়মিত সকল মহিলাই তাদের বিপদজনক সময় বের করে নিতে পারেন। এখানে নিয়মিত ২১ থেকে ৩৮ দিন মাসিক চক্রের হিসাব দেয়া আছে। যাদের নিয়মিত মাসিক চক্র তারা লাইন বরাবর দেখলেই বিপদের দিন বের করতে পারবেন। যেমন ২১ দিন চক্রের প্রথম বিপদজনক দিন (২১ হলে ৩ দিন, ২৪দিন হলে ৬ দিন ইত্যাদি) খেয়াল করুন এবং তাদের বড় চক্রে শেষ বিপদজনক দিনটা দেখে নিবেন ২৮ হলে ১৭, ৩০ হলে ১৯ ইত্যাদি)।[৬৭]

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২নং টেবিল [৬৮]

অনিয়মিত মাসিক চক্র

মাসিক চক্র	প্রথম বিপদজনক দিনের শুরু	বিপদজনক দিনের শেষ
২১ ,,	তৃতীয় দিন	দশম দিন
২২ ,,	৪র্থ ,,	একাদশ দিন
২৩ ,,	৫ম ,,	দ্বাদশ দিন
২৪ ,,	ষষ্ঠ ,,	এয়োদশ ,,
২৫ ,,	৭ম ,,	চতুর্দশ ,,
২৬ ,,	৮ম ,,	পঞ্চদশ ,,
২৭ ,,	৯ম ,,	ষষ্টদশ ,,
২৮ ,,	১০ম ,,	সপ্তদশ ,,
২৯ ,,	একাদশ ,,	অস্টাদশ ,,
৩০ ,,	দ্বাদশ ,,	উনিশতম ,,
৩১ ,,	এয়োদশ ,,	বিশতম দিন
৩২ ,,	চর্থদশ ,,	একুশতম দিন
৩৩ ,,	পঞ্চদশ ,,	বাইশতম ,,
৩৪ ,,	ষষ্ঠদশ ,,	তেইশতম ,,
৩৫ ,,	সপ্তদশ ,,	চব্বিশ ,,
৩৬ ,,	অস্টাদশ ,,	পঁচিশতম ,,
৩৭ ,,	উনিশতম ,,	ছাব্বিশত ,,
৩৮ ,,	বিশতম ,,	সাতাশতম ,,

বিঃ দ্রঃ নিয়মিত হলে লাইন বরাবর দেখে হিসাব করে নিন।
অনিয়মিত চক্রের প্রথম বিপদজনক ঘর ও বড় চক্রের শেষ বিপদজনক ঘর ধরতে হবে।

মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম।

বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারীভাবে দেশব্যাপী যে ব্যবস্থা চালু আছে তাতে দেখা যায়, স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ সবার কাছে পৌঁছায় না। যে সব জায়গায় স্বাস্থ্য সুবিধাদি আছে তার ১.২ মাইল থেকে ১.৯ মাইলের মধ্যে যারা বাস করেন, তারাই এই সুবিধা গ্রহন করতে পারেন। অথচ শতকরা ৮.৩ ভাগ থেকে ১৫ ভাগ পুরুষ শতকরা ৯.৮ ভাগ থেকে ১৭.৪ ভাগ মহিলা সবসময় অসুস্থ্য থাকেন। এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৩-১৯ ভাগ রোগী সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহন করতে পারেন। যে সব কারণে অধিকাংশ রোগী সরকারী সুবিধার সুযোগ নিতে পারেন না, তারমধ্যে দূরত্ব অন্যতম। এ জন্যে সরকার সেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার নীতি গ্রহন করেছেন। এ বেকেন্দ্রীকরণের অন্যতম কৌশল হল স্যাটেলাইট ক্লিনিক। এ নীতির অধীনে সপ্তাহে দুদিন স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন করা হয়।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনার উদ্দেশ্য সংগঠন কার্যাবলী এখানে তুলে ধরা হলোঃ

কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্দেশ্য

গর্ভবতী, প্রসুতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া।

গর্ভবতী, প্রসুতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি শিক্ষা দেয়া।

গর্ভবতী, প্রসুতি মা শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া।

ঝুঁকিপূর্ন গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র/উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

পরিবার অপুষ্টিজনিত কারণে রোগগ্রস্থ শিশুকে (০-৫ বৎসর) চিকিৎসার জন্যে উপরোক্ত কেন্দ্র সমূহে প্রেরণ করা।

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের প্রতি গ্রাম এলাকায় অধিক আগ্রহ সৃষ্টি করা ও সেবা প্রদান করা।

টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা। কমিউনিটি ক্লিনিকে ই পি আই কর্মীরা উপস্থিত থেকে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

মাঠকর্মী ও ক্লিনিকের কর্মীদের একত্রে কাজ করার মাধ্যমে কর্মসূচীকে সফল করা।

স্যাটালাইট ক্লিনিক সংগঠন

উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র,ভাড়া করা অস্থায়ী ক্লিনিক ও রুরাল ডিসপেনসারীতে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসা সহকারীদের প্রত্যেকে সপ্তাহে দুইদিন অর্থাৎ মাসে ৮ দিন স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন করবেন। পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসা সহকারী সপ্তাহে ২ দিন অর্থাৎ মাসে ৮ দিন স্ব স্ব ইউনিয়ন স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন করবেন।

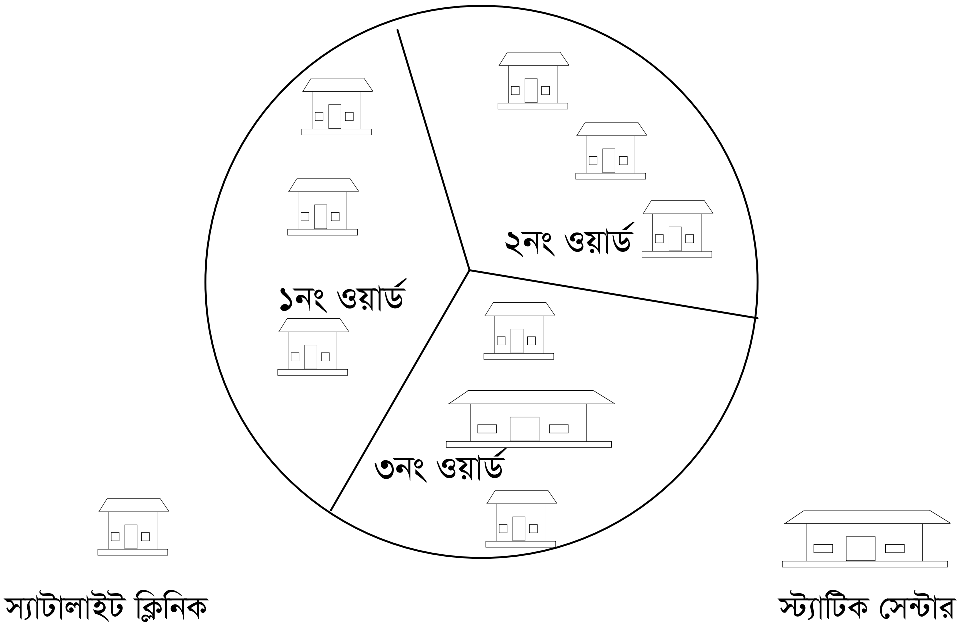

চিকিৎসা সহকারী কর্তৃক স্যাটালাইট ক্লিনিক

কার্যাবলীঃ

- ☐ ইউনিয়ন স্কুলগুলোতে প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর ডায়রিয়া, কৃমি, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, অপুষ্টি, সেনেটারী পায়খানা বা নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মলত্যাগ করা, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা সভা করা।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীদের সাথে প্রতি ১৫ দিন অন্তর পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী জোরদার করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কাজে অংশ গ্রহন করা।
- ☐ মাঠকর্মীদের সমন্বয়ে গর্ভবতী মায়েদের টি টি বা শুধুদের টিকা বাস্তবায়ন করা।
- ☐ মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে ১৫ দিন অন্তর মাঠকর্মীদের সাহায্যে গ্রামে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার আলোচনা করা।

স্থান নির্বাচন

- ☐ চিকিৎসা সহকারী ইউনিয়ন স্তরের স্কুলগুলোতে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার স্থান নির্বাচন করবেন।
- ☐ স্থান নির্বাচনের কাজে এফ পি এ, এফ, ডব্লিউ,এ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ভিডিপি সদস্য/সদস্যা বা সমাজকর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিতে হবে।
- ☐ মাঠকর্মীদের মাসিক ভ্রমনসূচীর সাথে সংগতি রেখে যৌথ কাজের পরিকল্পনা করবেন।
- ☐ কোন এক স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম একাধারে ৫/৬ মাস চলার পর নতুন স্কুলে কর্মসূচী গ্রহন করবেন।
- ☐ মাঝে মাঝে স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের সহযোগিতায় গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যাক্তির বাড়ীতে / মাদার্স ক্লাবে / বেসরকারী সংস্থার কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা সভা করা।

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা কর্তৃক আয়োজিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক

কার্যবলী

১. গর্ভবতী মা ও (০৫ বৎসর) শিশু স্বাস্থ্য সেবা

- ☐ প্রতি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এলাকায় মোট সক্ষম দম্পতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করত হয়।
- ☐ এলাকার সকল গর্ভবতী মায়েদের তালিকাভুক্তিকরণ এন্টিনেটাল কার্ড পূরণ ও সংরক্ষণ করতে হয়।
- ☐ গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা যেমন রক্তচাপ, ইডিমা দেখা, রক্তশূন্যতা, প্রস্রাব পরীক্ষা করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা ও টিটি দান নিশ্চিত করা।
- ☐ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবস্থা নির্ণয় এবং মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

- ☐ ঝুঁকিবিহীন গর্ভবতী মায়েদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাই/ধাত্রীদের মাধ্যমে প্রসবের পরামর্শ দেয়া।
- ☐ শিশুদের জন্মের প্রথম দিন হতে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্যে মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া ও উৎসাহিত করা।
- ☐ পাঁচমাস বয়স থেকে মায়েদের দুধের সাথে পরিপূরক খাওয়ানোর উপদেশ দেয়া ও উৎসাহিত করা।
- ☐ গ্রোথ চার্টের মাধ্যমে শিশুর পুষ্টির মান তদারক করা, পুষ্টি শিক্ষা দান করা এবং পুষ্টিজনিত কারণে রুগ্ন শিশুকে এস সি ডব্লিউসি বা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা।
- ☐ প্রসবোত্তর সেবা, চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনের উপদেশ প্রদান করা।
- ☐ অনুর্ধ ৫ বছরের শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়া ও টিকাদান কমূসূচীতে সম্পৃক্ত করা।
- ☐ মাঠকর্মীদের অনুরোধে গর্ভবতী/প্রসুতী মায়ের বাড়ী পরিবেশন করা।

২। পরিবার পরিকল্পনা সেবা

- ☐ প্রতিটি স্যাটালাইট ক্লিনিক এলাকার মোট সক্ষম দম্পতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করা।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহন কারীদের সুষ্ঠু ফলো আপ, জটিলতা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা করা।
- ☐ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কপারটি প্রয়োগ ইনজেকশন, খাবার বড়ি, কনডম ইত্যাদি সামগ্রীর নিয়মিত সরবারহ নিশ্চিত করা।
- ☐ যে সকল দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহন করেননি, তাদেরকে পোষ্টার, লিফলেট, ফোলডার, ইত্যাদির সাহায্যে উদ্বদ্ধ করা ও পদ্ধতি গ্রহনে পরামর্শ দেয়া।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনকারীদের মধ্যে যারা জটিলতায় আক্রান্ত তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিদর্শন করা।

স্থান নির্বাচন

- ☐ পরিবার কেন্দ্রে অবস্থিত ওয়ার্ড ও বাকী দুটি ওয়ার্ডের যে সব এলাকায় পরিবার পরিকল্পনার উদ্বুদ্ধকরণ কাজ পিছেয়ে আছে অথবা যে, গ্রাম পরিবার কেন্দ্র থেকে দূরে সেখানেই স্যাটেলাইট ক্লিনিকের স্থান নির্বাচন করতে হবে।
- ☐ স্থান নির্বাচনে মাঠকর্মী ও টিবিএ-র সাহায্য নিতে হবে।
- ☐ স্থানীয় মাদার্স ক্লাব বা মহিলা ভিডিপি সংগঠন এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- ☐ স্থান নির্বাচনে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনায় গুরুত্ব দিতে হবে। নির্বাচিত স্থানগুলোতে মায়ের উপস্থিতি যাতে সহজতর হয় ও মায়েরা স্বাচ্ছন্দবোধ করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।
- ☐ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে টিবিএ/পরিবার পরিকল্পনা ক্লায়েন্টদের বাড়ী নির্বাচন করা যেতে পারে।
- ☐ ইউনিয়নের যে ওয়ার্ডে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা রুর‌্যাল ডিসপেনসারী বা ভাড়া করা ক্লিনিক আছে সে ওয়ার্ডে ২টি এবং যে ২টি ওয়ার্ডে এধরনের কোন ক্লিনিক নেই সে ২টি ওয়ার্ডে ৩টি করে মোট ৮টি স্যাটালাইট ক্লিনিকের স্থান নির্বাচিত হবে।

স্যাটেলাইট ক্লিকিকে এফ ডব্লিউ এ-র ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ☐ নিজ ওয়ার্ডে সক্ষম দম্পতি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনকারী দম্পতি ও গর্ভবতী মায়ের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে দিবেন। তিনি এটা প্রতি দু'মাস অন্তর নবায়ন করবেন।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের স্থান নির্বাচন করে ক্লিনিকের সকল সেবা প্রদানে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে সাহায্য করবেন। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের তালিভূক্ত করা এবং ঝুঁকিপূর্ন গর্ভবতী মা ও জটিলতায় আক্রান্ত পদ্ধতি গ্রহনকারীদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তিনি পরিদর্শিকাকে সাহায্য করবেন।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতাদের কোন অসুবিধা বা জটিলতা দেখা দিলে কেন্দ্রে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।
- ☐ এলাকার গর্ভবতী মায়েদের স্যাটালাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- ☐ স্থানীয় টিবিএ-র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করবেন।
- ☐ ক্লিনিকে আসতে অপারগ অস্থাস্থ্য রোগীদের বাড়ীতে প্রয়োজনে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা নিয়ে পরিদর্শন ও চিকিৎসা নিশ্চিত করবেন।
- ☐ নির্দিষ্ট দিনে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে আই ইউডি ইনজেকশন ইত্যাদির ক্লায়েন্ট নিয়ে আসতে সাহায্য করবেন।

স্যাটেলাইট ক্লিকিকে পরিবার পরিকল্পনা সহকারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা

- ☐ স্থান নির্বাচনে চিকিৎসা সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবেন।
- ☐ স্থানীয় নেতৃবর্গ ও জনগনকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত করবেন।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিকে গর্ভবতী মা ও শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করবেন। এফ ডব্লিউ এ যাতে গর্ভবতী ও সম্ভাব্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনকারীদের দিয়ে নিয়ে আসেন সেটা নিশ্চিত করবেন।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিকে উপস্থিত থেকে ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করবেন।

- ☐ মাসিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক প্রোগ্রাম তৈরীর ব্যাপারে এম এ, এবং ডব্লিউ ভি-কে সহায়তা করবেন।

লোকবল

- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ যাবতীয় কার্যক্রমে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের আয়া/পিয়ন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার সার্বক্ষণিক সাহায্য করবেন।
- ☐ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আয়া/পিয়ন কেন্দ্র থেকে যাবতীয় ঔষধপত্র ও সরঞ্জমাদি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে বহন করে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে সাহায্য করবেন।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, টি বি-এ গণ নির্দিষ্ট দিনে মা ও শিশুদের কেন্দ্রে উপস্থিত হতে সাহায্য করবেন।
- ☐ স্থানীয় টিবিএ এবং সেচ্ছসেবী সংস্থার কর্মী, স্বনির্ভর, ভিডিপি এবং মাদার্স ক্লাব বা অনুরূপ মহিলা ক্লাবের কর্মীদের স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

- ☐ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বছরে ৬টি ডিডিএস কিট সরবরাহ করা হয়। ঔ সব কিটের প্রতিটির প্রতিটির এক তৃতীয়াংশ ঔষধ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা কর্তৃক আয়োজিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- ☐ প্রয়োজনীয় এম সি এইচ ঔষধ যেমন আয়রণ ট্যাবলেট, বিবি লোশন, ভিটামিন, ক্রিমির ঔষধ, প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, গজ, তুলা, স্পিরিট, ল্যাম্প ইত্যাদি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ব্যবহারের জন্যে সরবরাহ করা হয়।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী-যেমন খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, কপার-টি ইত্যাদি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ☐ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত মিডওয়াইফারী কিট ও আই ইউ ডি কিটের যন্ত্রপাতি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে এম সি এইচ কিটের যন্ত্রপাতিও নেয়া যাবে।

গর্ভবতী মায়েদের কার্ড গ্রোথ চার্ট পূরণ ও সংরক্ষণ, পোষ্টার ফোলডার

- ☐ গর্ভবতী মায়ের কার্ড ও অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের গ্রোথ চার্ট সঠিকভাবে পূরণ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- ☐ উপরোক্ত কাজের জন্য বিপি মেশিন, ষ্টোথোস্কোপ শিশুদের বহনযোগ্য ওজন মাপার যন্ত্রপাতি পরিবার কেন্দ্র থেকে ব্যবহার করা হবে।
- ☐ প্রত্যেকটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পোষ্টার, ফোলডার, ওয়াল চার্ট ইত্যাদির সরবরাহ থাকতে হবে।

তদারকী

মেডিক্যাল অফিসার (এম সি এইচ-এফপি)

- ☐ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকাকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেবেন।
- ☐ ডি ডি এস কিট ও অন্যান্য ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করবেন ও তা সঠিকভাবে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখবেন।
- ☐ স্থানীয়ভাবে আয়োজিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, মাঠকর্মী ও টিবিএ-দের জ্ঞানবুদ্ধি ও পারদর্শী করে তুলবেন।
- ☐ পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সিনিয়র পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের সাথে আলোচনা পূর্বক স্যাটেলাইট ক্লিকিকের সমস্যাদি সমাধানের চেষ্টা করবেন।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন করে সেবার মান ও পরিমান সম্বন্ধে লিখিত প্রতিবেদন তৈরী করে উপজেলা এম.সি.এইচ সমন্বয় কমিটিতে পেশ করবেন ও আলোচনার সূচনা করে সমস্যা সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইবেন।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠকর্মী ও ক্লিনিকের কর্মীদের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।
- ☐ তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা প্রর্যালোচনা করে দেখবেন। সেচ্ছাসেবী কর্মী, স্বনির্ভর, ভিডিপি এবং মাদ্রার্স ক্লাব ইত্যাদির সদস্যদের স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সংশিষ্ট করার কাজে প্রচেষ্টা নিবেন।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিকে পরিদর্শন করে সেবার মান ও পরিমান সম্বন্ধে লিখিত প্রতিবেদন তৈরী করে উপজেলা এমসি এইচ সমন্বয় কমিটিতে পেশ করবেন এবং আলোচনা করে সমস্যা সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইবেন।

সিনিয়র পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা

- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিক নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান পরীক্ষা করে দেখা।
- ☐ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান এবং সহযোগিতা করা।

- ☐ কেন্দ্রে আগতদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।
- ☐ ক্লিনিক রক্ষণাবেক্ষণ, নথি সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরীতে দক্ষ করে তোলা।
- ☐ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্লিনিক কর্মী ও মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শনের লিখিত প্রতিবেদন এম ও (এম.সি.এইচ) ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে পেশ করবেন।

সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিকিন সংগঠন পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- ☐ স্থানীয় সেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বনির্ভর, ভিডিপি, মাদ্রার্স ক্লাব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের কাজে কম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেবেন।

মাসিক প্রতিবেদন

- ☐ প্রত্যেক স্যাটেলাইট ক্লিনিকের জন্যে পৃথকভাবে রোগী ও সরবরাহ রেজিষ্টার ব্যবহার করতে হবে।
- ☐ প্রতিমাসে সংগঠিত মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের মাসিক প্রতিবেদনের সাথে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে।
- ☐ তদারককারী কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবেন।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিক কিটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র স্যাটেলাইট ক্লিনিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সরবরাহ করা হবে।
- ☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের জন্যে একটি নির্দিষ্ট ব্যানার দেয়া হবে, যাতে জনসাধারণ সহজেই এই ক্লিনিককে চিনতে পারেন।
- ☐ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ঔষধপত্র নিয়ে যাবার জন্যে কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ সরবরাহ করা হবে।[৬৯]

৬৯। মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়।পৃ. ১-১০

মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কর্মসূচীর রূপরেখা

- মা ও শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা
- ইউনিয়নে ৩ ধরনের সেবা কেন্দ্র আছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এইচ এন্ড এফ ডব্লিউ সি) রুর‌্যাল ডিসপেনসারী (আরডি) অথবা ভাড়া করা অস্থায়ী ক্লিনিক রয়েছে। এ ৩টি সেবাকেন্দ্রর মাধ্যামে ইউনিয়ন পর্যায়ে মা ও শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ সব কেন্দ্রে কর্মরত কর্মী এবং ঔষধ ও সরঞ্জাম সরবরাহের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

সেবা কেন্দ্রের নাম	কর্মীর বিবরণ	ঔষধ/সরঞ্জাম এর বিবরণ
ক) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (এইচ এন্ড এফ ডব্লিউ সি)	১. চিকিৎসা সহকারী-১ ২. ফার্মাসিষ্ট- ১ ৩ পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা-১ ৪. আয়া -১ ৫। নিরাপত্তা প্রহরী -১	১. ডিডিএসকিট বৎসরে ৫টি ২. এমসিএইচ ঔষধ বৎসরে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা মূল্যের ৩. আই ইউ ডি কিট ৫ বৎসর ১ বার ৪. এফ ডব্লিউ সি ফিট ৫ বৎসরে ১ বার ৫. মিডওয়াইকারী ফিট ৫বৎসরে ১টি ৭. আসবারপত্র ৩৮০০০/-- ৪২০০০ টাকা মূল্যের
খ) রুর‌্যাল ডিসপেনসারী	১. মেডিক্যাল অফিসার -১ ২. চিকিৎসা সহকারী -১ ৩. ফার্মাসিষ্ট -১ ৪. পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা-১ ৫. মেডিসিন কেরিয়ার-১ ৬. আয়া-১ ৭. এমএল এসএস-১	১. ডিডিএসকিট বৎসরে ২টি যে সব কেন্দ্রে এফ ডব্লিউ সি কর্মরত। ২. আই ইউ ডি ফিট ১ প্রতি ৫ বৎসর ৩. এম সি এইচ কিট-১ প্রতি ৫ বৎসরে ৪. মিডওয়াইকারী ফিট-১ প্রতি ৫ বৎসরে
গ) অস্থায়ী/ভাড়া করা ক্লিনিক	১. পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা-১ ২. আয়া-১	১. ডিডিএস ফিট বৎসরে ২/৩ ২. আই ইউডি ফিট-১ প্রতি ৫ বৎসরে ৩. এমসিএইচ ফিট-১ প্রতি ৫ বৎসরে

প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ডি ডি এস কিট, এফ ডব্লিউ সি কিট এবং মিডওয়াইফারী কিট এর মাধ্যমে সরবরাহ করা থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিটি ডি ডি এস কিট-এ মা ও শিশু পরিচর্যা এবং সাধারণ রোগীর জন্যে প্রায় তিন মাসের ঔষধ থাকে।

এম সি এইচ, আই ইউ ডি, এফ ডব্লিউ সি এবং মিডওয়াইফারী কিট-এ বিভিন্ন যন্ত্রপতি ও সরঞ্জাম থাকে। পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যার কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৭০]

মা, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা

গ্রাম পর্যায়ে

- মা, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় অংশ হিসেবে পুরুষ স্বাস্থ্য সহকারী এবং মহিলা পরিবার কল্যাণ সহকারীবৃন্দ প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার তাঁদের এলাকার প্রতি বাড়ী পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সেবাদান করবেন।
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা।
- গর্ভবতী মায়েদের তালিকাভূক্তি ও যুক্তি নির্ণয়করা ও উপদেশ প্রদান করা।
- অনুর্ধ পাঁচ বৎসর বয়সের সকল শিশুর পুষ্টির স্বাস্থ্য প্রাথমিকভাবে দেখা।
- ডায়রিয়া রোগীদের খাবার স্যালাইন বিতরণ করা জটিল রোগীদের হাসপাতালে পাঠানো ও ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে এলাকাবাসীকে উপদেশ দেয়া।
- অন্ধত্ব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসূল বিতরণ করা।
- পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য দেয়া, ব্যবস্থাদি বিতরণ এবং সেবা দান করা। এর মধ্যে এম আর সহ যেকোন ৫টি পদ্ধতি।[৭১]

ইউনিয়ন পর্যায়ে

প্রতিটি ইউনিয়নে একটি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে। সাধারণ সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়। এখানে অভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলা কর্মীবৃন্দ নিম্নলিখিত সেবা দিয়ে থাকেনঃ

মা ও শিশুদের সাধারণ রোগের চিকিৎসা।

টেনিং প্রাপ্ত মহিলা পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা দ্বারা গর্ভবতী মায়েদের পরীক্ষা করা এবং বিশেষ সেবা দেয়া হয়।

৭০। মাতৃমঙ্গল ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, জুন, ১৯৮৯, পৃ. ৪-৫

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিশেষ সেবা যেমন ইনজেকশন, কপারটি ইত্যাদি। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনকারীদের জটিলতার চিকিৎসা দেয়া হয়। (যদি কোন অসুবিধায় ভুগেন তবে তার চিকিৎসা দেয়া হয়)। এই সব কেন্দ্রে এম আরও করা হয়।

বাড়ীতে প্রসবের ব্যবস্থা, যেমন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বাড়ীতে গিয়ে বন্দোবস্ত করে থাকেন।

জটিল রোগী চিকিৎসাদির প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রদান ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ইউনিয়ন সেবা কেন্দ্রের মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যার মাসিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রত্যেক ইউনিয়নে অবস্থিত সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে উক্ত কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মীরা কর্তৃক প্রতি মাসে মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যার নিম্নবর্ণিত সংখ্যক সেবা প্রদান করতে হয়ঃ

গর্ভবতী পরিচর্যা	প্রসব সেবা	পসূতি পরিচর্যা	শিশু পরিচর্যা
৪০	১৫	১০	২৫০

উপরের এই চারটি বিষয়ের নাম এবং ঠিকানাসহ তালিকাভূক্তি করতে হবে। এ ছাড়াও নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলী উক্ত সেবাকেন্দ্রে সম্পাদন করতে হবে।

ক. গর্ভভূক্তি মায়েদের তালিকাভূক্তি করণ

খ. বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্যে মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দান

গ. খাবার স্যালাইন ব্যবহার বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা দান

ঘ. গ্রোথ চার্টের মাধ্যমে শিশুদের পুষ্টি তদারকি ও পুষ্টি শিক্ষা দান এবং

ঙ. গর্ভবতী মায়েদের ও শিশুদের টিকা প্রদান করা।

ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা দানের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (এফপিএ) এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন পরিবার কল্যাণসহকারী (এফ ডব্লিউ এ) কর্ময়ত আছে। পরিবার পরিকল্পনা সহকারী পুরুষ এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী মহিলা কর্মী। এরা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের অধিবাসী। এদের কয়েকটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছেঃ

প্রতি ২ মাসে অন্ততঃ একবার তাদের এলাকার প্রতিটি দম্পতির বাড়ী পরিদর্শন করবেন।

ইউনিয়নের সকল সক্ষম দম্পতিদের তালিকাভূক্তি করা।

সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহন উদ্বুদ্ধ করা।

পদ্ধতি গ্রহনকারীদের জন্মনিরোধক উপকরণ সরবরাহ করা।

মা ও শিশুদের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কেন্দ্রে প্রেরণ করা।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনে সহায়তা প্রদান করা।

ধাত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা এবং

প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পদ্ধতি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনকারীর নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা আলাদা তালিকাভূক্তি করতে হবে। পরবর্তী মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে স্থানীয় ক্লিনিকে এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে সাহায্য নেবে।[৭২]

প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিমাসে পরিবার পরিকল্পনার নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদানের জন্যে মাঠকর্মীদের নির্দেশ রয়েছে।

বন্ধ্যাকরণ আইইউডি	ইনজেকশন		খাবার বড়ি		কনডম		
	নতুন	পুরাতন	**নতুন**	পুরাতন	নতুন	পুরাতন	মোট
☐ উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২২.৭	৮	২	১৫	১০	৫	৫	৭৪
☐ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/আর ডি/অস্থায়ী ক্লিনিক ৮	৪	১	১২	৯	৭	৮	৪৯
☐ স্যাটেলাইট ক্লিনিক ২	১	১	১	১	১	১	৮

সংশ্লিষ্ট এলাকায় সব পুরাতন গ্রহীতাদের সরবররাহ নিয়মিতভাবে চালু রাখাও তাদের কর্তব্য। উপরোক্ত মাসিক লক্ষ্যমাত্রা প্রতি ইউনিয়নের জন্যে নূন্যতম। যদি কোন মাসে কোন পদ্ধতির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী মাসে উক্ত পদ্ধতির মাসিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে পূর্ববর্তী মাসের ঘাটতির সংখ্যা যোগ করে লক্ষ্যমাত্রা হিসাব করতে হবে।

প্রত্যেক ইউনিয়নে কর্মরত এফ ডব্লিউএ এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত এফ ডব্লিউ ভি ও চিকিৎসা সহকারী একত্রে কাজ করে পরিবার পরিকল্পনার উপরোক্ত মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

৭২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

৭ম অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কল্যাণ সাধনে কতিপয় সুপারিশ

পরিবার রাষ্ট্রের প্রথম স্তর, সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর (Final Foundation Stone)। পরিবারের বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা ভাই বোন প্রভৃতি একান্নভূক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে গঠিত সমাজেরই অপর নাম রাষ্ট্র। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে পরিবার ও সমাজ। মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন-যাপন করছে। প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম স্তর বা প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রাচীনকালে মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা যখন শুরু হয়েছিল, মানবতার সে আদিমকালে পরিবার ছিল সে গুরুত্বের অধিকারী। বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ এবং তাঁর সাহায্য-সহায়তার লক্ষ্যে দুনিয়ায় বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংগ্রঠিত হয়েছে। উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও চিরকার সুনাম-সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর নীচ বংশের ও নিকৃষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ বা আত্নীয়তা লাভ মানুষের হীনতা ও কলংকের চিহ্নরূপে গণ্য হয়েছে চিরকাল। যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের হিফাযত, উন্নতি বিধান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে চিরকালই বংশের গৌরব রূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি মানুষের নিকট। কিন্তু বর্তমান সময় মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুসারী নয়। কোথাও তা পুরাপুরিভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং গোটা পরিবারই ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলেছে। আর কোথাও সম্পূর্ণ না হলেও ইসলামের অনেক নীতিই অনুসৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে না, এতে কোন সন্দেহ নেই যে একদিকে ইসলামের পারিবারিক আদর্শ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাজনিত রক্ষনশীলতা এবং অপর দিকে প্রাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচন্ড আঘাতে উৎক্ষিপ্ত অত্যাধুনিকতা আজ বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনকে এক মহা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারে ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শের জীবন-যাত্রার প্রবর্তন হচ্ছে। পর্দা প্রায় সম্পূর্ণরুপে পরিত্যক্ত হয়েছে, চলছে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা ও প্রেম-ভালবাসার

অভিনয়। নাচ ও গানের অনুষ্ঠান আজ জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্কুল–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে চলেছে সহশিক্ষা। যুবক নারী আজ ঘর সংসারের ক্ষুদ্র পরিবেশ ডিঙ্গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নানা কাজের বিশাল উন্মুক্ত ময়দানে–নাট্যমঞ্চে, ক্লাব–পার্টিতে, সভা–সমিতির টেবিলে। বেতার যন্ত্রে, আধুনিক প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ায় ও ছায়া যন্ত্রের কেন্দ্র স্থলে অবাধ সংমিশ্রণের প্লাবন ছুটছে। নারীসমাজের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছেঃ "রইব না আর বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগতটাকে।"

ফলে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারে শান্তি শৃঙখলা বিনষ্ট হচ্ছে, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বিঘ্নিত হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে শুরু হয়েছে মহা ভাঙ্গনের তরঙ্গাভিঘাত। মহাপ্রলয়ের প্রচন্ডতায় পরিবারিক জীবনের সব মাধুর্য কোমলতা চূর্ণ-বিচূর্ণ। শিশু সন্তান মায়ের স্নেহ বাৎসল্যপূর্ণ ক্রোড় থেকে বঞ্চিত হয়ে লালিত-পালিত হচ্ছে চাকর-চাকরানীর অনুশাসনে। বিগত শতকের শুরুতে পাশ্চাত্য সমাজে যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বিপর্যয়ের প্লাবন এসেছিল এবং চুরমার করে দিয়েছিল সেখানকার পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঠিক সে প্লাবনই এসে দেখা দিয়েছে আমাদের এ সমাজে। এ কারণে ঠিক যে পরিণতি সেখানে ঘটেছিল, আমাদের বাংলাদেশেও ঠিক তাই ঘটতে শুরু হয়ে গেছে প্রচন্ড আকারে। আমাদের দেশেও বর্তমানে গর্ভনিরোধ ও বন্ধাকরণের পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের হিড়িক পড়ে গেছে। এতে অজান্তে সমাজদেহে পাপ জীবাণু সংক্রমিত হয়ে এ আঘাতকে প্রচন্ডতম ও সর্বগ্রাসী করে তুলছে। তাই জ্বেনা-ব্যভিচার আজ এ সমাজের দিন রাতের অতি সাধারণ ঘটনা। অবৈধ সন্তানের চিৎকার আজ ঘাটে-পথে, ঝোঁপে-ঝাড়ে, ড্রেনে-ডাস্টবিনে, বায়ুলোককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। স্বামী-সংসার-সন্তান ছেড়ে স্ত্রীরা আজ ভিন পুরুষের কাধে ভর দিয়ে মহাযাত্রায় মেতে উঠেছে। এক স্ত্রী রেখে বহু স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, স্ত্রীকে এক কথায় তালাক দিয়ে আবার তাকে লাভ করার জন্যে অবৈধ পন্থাবলম্বন কিংবা নতুন স্ত্রী গ্রহণ এসব আজ অতি সাধারণ ঘটনা। পারিবারিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক মূল্যেবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের যুবসমাজের বিরাট একটি অংশ মাদকাসক্তির কবলে পড়ে হতাশা, অশান্তি, চুরিডাকাতি, সামাজিক অনাচারসহ নানান অত্যাচার ও অবিচারমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছে। সর্বশেষে অকর্মণ্য হয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুমুখে ধাবিত হচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আজ আমাদের পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, কাঙ্খিত পারিবারিক শান্তি ও সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে।

এরূপ অবস্থায় অনতিবিলম্বে আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন পুর্নগঠনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা না চালালে পারিবারিক জীবনকে চুড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার কোন উপায় থাকবে না। আমরা চাচ্ছি, সমাজ ও পরিবারের কল্যাণকামী সকল মানুষই এদেশের

সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনের আদর্শভিত্তিক পুনর্গঠনে অতীব দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

আমাদের পারিবারিক জীবনের বর্তমান বিপর্যয়ের কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তার পুনর্গঠনের জন্যে অপরিহার্য পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করা যাচ্ছে। এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের জন্যে সমাজের সুধী ও সকল মহলের দায়িত্ব সমপন্ন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১. প্রাশ্চাত্যের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে

বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের বিপর্যয় রোধে সর্বপ্রথম কাজ হলো, সাধারণভাবে সব নারী-পুরুষের ও বিশেষভাবে যুবক-যুবতীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজ ও পরিবার মুসলমানের সমাজ ও পরিবারের জন্যে কোনো দিক দিয়েই আদর্শ ও অনুসরণীয় হতে পারে না। আমাদের আদর্শ হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গড়া ইসলামী সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা। ইউরোপীয় সমাজ ও পরিবারের রীতিনীতি শুধু পরিবারিক বিপর্যয়েরই সৃষ্টি করে না, মানুষকে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে দেয়। অতএব, তাদের দেখাদেখী তাদের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা কিছুতেই পশুত্বের স্তরে নেমে যেতে পারিনা।

২. পারিবারিক ব্যবস্থায় ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে

পরিবার ও সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের দেখা সাক্ষাত ও মেলামেশার একটা রীতি ও সীমা নিদিষ্ট রয়েছে ইসলামে, পাশ্চাত্য সমাজে এক্ষেত্রে নেই কোন বিধি-নিষেধ, কোনো সীমা সরহদ। অতএব, পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুসরণ না করে ইসলামের আদর্শকেই অনুসরণ করতে হবে আমাদের। মুহাররম নারী-পুরুষ ছাড়া দেখা সাক্ষাত ও অবাধ মেলা-মেশার কোনো সুযোগই যেন আমাদের সমাজে না থাকে, তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. নারী ও পুরুষভেদে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র পুনর্বিন্যাস করতে হবে

ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের মেয়ে ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। তাদের কর্মক্ষেত্র কখনো এক হতে পারে না, এক ও অভিন্ন হতে পারে না তাদের উচ্চ শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাঙ্গন। একই ক্লাসকক্ষে পাশাপাশি ও কাছাকাছি বসে পড়াশুনা, একই অফিস কক্ষে সামনা-সামনি বা মুখোমুখী ও পাশাপাশি বসে কাজ করা যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। নিম্নশ্রেনী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেনী পর্যন্ত মেয়েদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। আলাদা করতে হবে নারী ও পুরুষের শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্মক্ষেত্র। নারী সমাজের প্রধান কর্মক্ষেত্র হতে হবে তার ঘর ও পরিবার। কেবল মাত্র প্রয়োজন কালেই মেয়েরা ঘর থেকে বের হবে। অকারণ চলাফেরা করা, পথে-ঘাটে, পার্কে-লেকে, বাগানে-রেস্তোরাঁয় 'হাওয়া খেয়ে' বেড়ানো, দোকানে-বাজারে-শপিং করা এবং হোটেল ক্লাবে, পার্টিতে দাওয়াতে মেয়েদের অবাধ যাতায়াত ও বিচরণ বন্ধ করতে হবে এবং নিতান্ত অপরিহার্য কাজগুলোকে বিধিবদ্ধ ও নিয়মানুগ করতে হবে।

৪. নারী পুরুষের বেশী বয়স পযর্ন্ত অবিবাহিত থাকার রেওয়াজ পরিবর্তন করতে হবে

আমাদের সমাজের বেশী বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা অবিবাহিত থাকার বর্তমান রেওয়াজ পরিবর্তন না হলে অনেক প্রকারের অন্যায়-অনাচারই বন্ধ করা যাবে না। তাই বিয়েকে শুধু সহজসাধ্যই নয়, উপযুক্ত বয়স হলে অবিলম্বে বিয়ে অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে, সেজন্যে সামাজিক তাগিদ এবং চাপ সৃষ্টি করতে হবে, এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, বিবাহিত না হওয়া পযর্ন্ত কি নৈতিক সামাজিক কোন প্রকারেরই দায়িত্ববোধ জাগতে পারে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে। তাই এ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া একান্তই অপরিহার্য। সে সাথে এক সঙ্গে চারজন পযর্ন্ত স্ত্রী গ্রহনের পথ নিয়ন্ত্রণসহ শরী'আতের কড়া বাধ্যবাধকতার মধ্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাকে বন্ধ করা কিংবা অসম্ভব করে তোলা অথবা তার জন্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহন করতে বাধ্য করা, অন্য কথা, ছলচাতুরীর সাহায্যেই একাধিক বিয়ের সুযোগ থাকা কিছুতেই উচিত হবে না।

৫. বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করণ

বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের প্রচলন সাধারণ পর্যায়ের না হলেও সমাজের উচ্চ পর্যায়ে পরিত্যক্ত হতে যাচ্ছে। আর এর দরুন নৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়ে দেখা দিচ্ছে অনেক বিপর্যয় অথচ বিধবা বিয়ের বিধান ছিল বিশ্ব-নারী জাতির প্রতি ইসলামের এক বিশেষ অবদান। আজ তাকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। এক বা দুই সন্তানের যুবতী মা কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলে পরে পুনরায় বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার প্রবণতা বর্তমানে উচ্চ সমাজে প্রবল; বরং একাজকে ঘৃণ্য মনে করা হচ্ছে। এ ভাবধারার আমূল পরিবর্তন জরুরী।

৬. ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার অনুমতি থাকা বাঞ্চনীয়

ইসলামী মূল্যবোধ্য ও মূল্যমানের ভিত্তিতে অপরিহার্য-প্রয়োজনে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার অনুমতি থাকা বাঞ্চনীয়। অবস্থা যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, স্ত্রী স্বামীর আর থাকতেই পারছে না, তখন হয় স্বামীকে আপনা থেকেই তাকে তালাক দিতে রাজি হতে হবে, না হয় স্ত্রী তার নিকট থেকে খুলা তালাক গ্রহন করবে অথবা আদালত বিয়ে ভেঙ্গে দেবে।

৭. নাচ ও গানের বর্তমান ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করা

যুবতী সুন্দরী মেয়েরা কামোন্মত্ত ভিন পুরুষের সামনে নিজের রূপ ও যৌবন সমৃদ্ধ যৌন আকর্ষণমূলক ভাবে অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে নাচবে ও গাইবে-এব্যাপারটি কোন পিতা-মাতারই বরদাশত করা উচিত নয়। উচিত নয় দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের তা বরদাশত করা। এ ধরণের সব কাজ আইনত বন্ধ করে দেয়া উচিত। অন্যথায় পরিবার হবে অশ্লীলতার কালিমায় পংকিল। পারিবারিক জীবন হবে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত।

৮. সুন্দর সম্প্রচার নীতিমালার মাধ্যমে ভারতীয় অশ্লীল চ্যানেলগুলো বন্ধ করণ

বাংলাদেশের আকাশ এখন মূলত ভারতীয় টিভির দখলে। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির কু-প্রভাব। পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে শুরু হচ্ছে নৈতিক অধ:পতন। হু হু করে বাড়ছে হিন্দি স্টাইলে অপরাধ। মাদকের ব্যবহার ও বিকৃত যৌনাচার। আমরা সর্বনাশা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। এদেশে কবে না জানি ধর্ষণকে শিল্পের মর্যাদা দেয়া হয়। আজ আমাদের বালক-বালিকারা মাতৃভাষার পরিবর্তে হিন্দিতে কথা বলছে। কিশোর কিশোরীরা লেখাপড়া বাদ দিয়ে প্রেম করার জন্যে উথালপাথাল করছে। তরুন-তরুনীরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা বলে সারা দিন কোথায় যে হারিয়ে যাচ্ছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। বেশীরভাগ তরুন-তরুনী বিবাহ বহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। হরেকরকম যৌন সম্পর্কের বাইরে ইদানীং বেড়ে চলেছে ধর্ষণ। আর পরিবারের অভ্যন্তরে বাড়ছে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস হানাহানি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। কেউ কেইকে মর্যাদা দিচ্ছে না, আবার কেউ কারো প্রতি নির্ভর করতে পারছেনা। ফলে পরিবারগুলো বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ঐতিহ্যে গড়া সুদৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা পরিবারগুলো আজ ধ্বংসের মুখোমুখী। পরিবার ও সমাজ থেকে মায়া-দয়া উঠে যাচ্ছে। শ্রদ্ধাবোধ, গুণীজনকে সম্মান, মুরব্বিদের সমীহ করা এসব এখন কেতাবি ভাষা। হু হু করে বাড়ছে অপরাধ। কথায় কথায় একজন অপরজনকে মারছে। দরকার পড়লে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। আমানতের খেয়ানত করছে এবং অন্যের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ জোর করে দখল, লুট বা চুরি করার প্রবণতা বাড়ছে। এসব সামাজিক অবক্ষয় এবং নৈতিক অধ:পতনের জন্যে দায়ী ভারতীয় চ্যানেলগুলো বহুলাংশে। বিশেষত স্টার প্লাস, স্টার জলসা, জি বাংলা, সনি, এমটিভি, জিটিভির প্রাত্যহিক প্রচারিত সিরিয়ালগুলো। এহেন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে নিম্নরুপ সুপারিশ তুলে ধরা হচ্ছে।

১. আমাদের মুসলিম পারিবারিক ইসলামী ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

২. জাতীয় সম্প্রচারনীতি এমন হতে হবে যাতে পরিবারের সকল সদস্য মিলে টিভি দেখা যায়।

৩. বিজাতীয় সংস্কৃতি মুক্ত সম্প্রচারনীতি গ্রহণ করতে হবে।

৪. কুরআন সুন্নাহ বিরোধী টিভি প্রোগ্রাম সম্প্রচার বন্ধ করতে হবে।

৯. জিনা-ব্যভিচারের আড্ডাগুলো ভেঙ্গে দেয়া

অবাধ যৌনাচার, জিনা-ব্যভিচার শুধু পরিবারকেই ধ্বংস করে না বরং গোটা মানবতাকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। সমস্ত আসমানী ধর্মগুলো ব্যভিচারকে হারাম করেছে এবং একে মহাপাপ বলে গণ্য করেছে। তাওরাতে যে বিখ্যাত দশ উপদেশ রয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে : হত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না।[১]

নরহত্যা নিষিদ্ধের দ্বারা জীবন-প্রাণকে হেফাযত করা হয়েছে। ব্যভিচার নিষিদ্ধের মাধ্যমে ইজ্জত ও বংশধারাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আর চুরি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সম্পদ ও মালিকানাকে হেফাযত করা হয়েছে।[২]

মসীহ (আঃ) আরো বলেছেন, তোমরা শুনেছো যে, বলা হয়েছে: "তোমরা ব্যভিচার করো না। আর আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ব্যক্তি কোন নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাবে সে তার অন্তরে ব্যভিচার করল। যদি তোমার ডান চোখ দেখে থাকে তা হলে তাকে উপড়িয়ে ফেলে দাও। কেননা, তোমার শরীরের কোন অঙ্গ চলে গেলেও তোমার পুরো শরীর যদি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় সেটিই অনেক উত্তম।[৩]

ইসলাম জিনা-ব্যভিচারকে বলিষ্টভাবে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। শুধুমাত্র হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং জিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেতেই নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"[৪]

১। সাফরুল খুরুজ (মিন আসফারিততাওরাত), ২০/১৩১১৩৫
২। ড. ইউসুফ আলী আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ,৪২
৩। দেখুন ইঞ্জিল মেথি: ৫/২৭/২৯
৪। আল-কুর'আন, ১৭:৩২

এর অর্থ হলো যে সব কাজের মাধ্যমে জ্বিনা-ব্যভিচার সংঘটিত হতে পারে তার পথ বন্ধ করা যেমন একান্ত সাক্ষাত, স্পর্শ করা, অপর লিঙ্গের দিকে কামনার দৃষ্টিতে দেখা।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে জৈবিক চাহিদা মানুষের মনের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে থাকে কিছু কিছু দার্শনিক মনে করেন, এর উপর মানব চরিত্র নির্ভরশীল।[৫]

বর্তমান সভ্যতা যা আজ গোটা দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করছে তা নবুয়তের আলোকে প্রদর্শিত চারিত্রিক মাধুর্যকে এবং যার দিকে নবী-রাসূলগণ আহবান করেছিলেন তা অস্বীকার করছে। এই সভ্যতা সব বন্ধনকে ছিন্ন করার আহবান জানাচ্ছে। সে যেন যে কোন পন্থায় তার লালসা পূর্ণ করে চলে। কিন্তু বাস্তবে কামনা-বাসনা কোন দিন পূর্ণ হবে না। বরং যত পান করবে পিপাসা ততই বাড়বে। এর ফলে মানুষ তার শালিন পোষাক-আশাক ক্রমান্বয়ে খুলে ফেলছে আর একেবারে সম্পূর্ন নগ্ন-বিবস্ত্র হয়ে পড়ছে। নগ্নদের জন্যে খোলা হয়েছে সংঘ, ক্লাব, এর জন্যে চলছে প্রকাশ্য প্রচার ও প্রোপাগান্ডা। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, কোন কোন সমাজে ১৭/১৮ বছরের কোন মেয়ে কুমারী থাকলে সেটাকে কলংকজনক বলে মনে করে। সে এখনো কুমারী রয়েছে! বিবাহ বহির্ভূত গর্ভধারণকারী কুমারী মেয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সর্বত্র নি:শর্ত গর্ভপাত বৈধতার দাবী উচ্চারিত হচ্ছে এবং কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থা এর পক্ষে জোরালোভাবে কাজ করছে। যেমনটি আমরা ১৯৯৪ খৃ. মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত সাকান সম্মেলনের সনদে লক্ষ্য করে থাকি।[৬]

এ ধরনের অবাধ যৌনতার বিষফল হিসেবে মানবতা আজ এক বিপদজনক তৎপরতার মোকাবিলা করছে, মানুষকে এক ভয়াবহ ও কঠিন ব্যাধি এইডস উপহার দিয়েছে, যার চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং মহামারীরূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও রয়েছে চারিত্রিক ও মানসিক রোগ যা বিপন্ন করে তুলেছে গোটা সমাজ ও পরিবার অথচ মানুষ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ করছে। মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

لم تظهر الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الاوجاع التى لم تكن فى اسلافهم-

"কোন সম্প্রদায়ের মাঝে অশ্লিল কাজ প্রকাশ্যে শুরু হলে তাদের মধ্যে এসে দুরারোগ্যের প্রাদুর্ভাব ঘটবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে ছিল না।"[৭]

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন:

اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد اهلوا بانفسهم عذاب الله

"কোন জনপদে ব্যভিচার ও সুদ প্রকাশ্যে চললে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের যোগ্য করে নিল।"[৮]

৫। ড. ইউসুফ আলী আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৬। প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩

৭। ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪০১৯

৮। ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪০২০

ব্যভিচার দ্বারা সামাজিক বিপর্যয় ঘটে আর সুদ দ্বারা অর্থনৈতিক বিপর্যয় সংগঠিত হয়। আর যখন এ দুটিই কোন সমাজে বিদ্যমান থাকে তাহলে বিরাট বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী বিশেষ করে এর

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে যদি প্রকাশ্যে প্রচার প্রোপাগান্ডা চলে থাকে। পশ্চিমা চিন্তাশীল, জ্ঞানীজন, সংস্কারকামী ও সমালোচকগণ অবাধ যৌনতার ভয়াবহতার ব্যাপারে সর্তকবানী উচ্চারণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, মানবতার জন্যে অবাধ যৌনতার বিপদ আনবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ।[৯]

ব্যভিচারের বিপদজনক প্রসারের ফলশ্রুতি সমকামিতা (বিকৃত যৌনচার) যা দুনিয়ার সকল ধর্ম ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেছে। পূর্ব ইতিহাসে এ অপরাধ একমাত্র লুত সম্প্রদায় ব্যতিত কোথাও দেখা যায় না, যারা পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম এ অপকর্ম চালু করে। এটি তাদেরকে নেশাগ্রস্তের মত করে তুলে। তারা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, লুত (আ.)-এর মেহমানদের সাথে জোড় করে হলেও এ অপকর্ম করার জন্যে তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় তারা জড়ো হয় কোন রকমের লজ্জা-জড়তা ছাড়াই। লুত (আ.)তাদের এ অপকর্মের তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বলেন:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

'তোমরা কি পুরুষদের সাথে অপকর্ম করতে চাও? আর তোমাদের প্রভু তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যা করার বৈধতা দিয়েছেন তা পরিত্যাগ কর। বরং তোমরা হলে বিরুদ্ধাচারণকারী জাতি।"[১০]

ইসলামের লক্ষ্য যেহেতু মানব জীবনের সার্বিক পবিত্র ও সর্বাঙ্গীন উন্নত চরিত্র, সেহেতু ইসলাম যৌনাচারের প্রাথমিক হাতিয়ার দৃষ্টিশক্তি কে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"মু'মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন, তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রন করে রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্রময়। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত। মু'মিন মহিলাদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে।"[১১]

৯। ড. ইউসুফ আলী আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ,৪৫-৪৬
১০। আল-কুরআন, ২৬: ১৬৫-১৬৬
১১। আল-কুর'আন, ২৪: ৩০-৩১

এ আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং পবিত্রতা সংরক্ষণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যেই সমানভাবে জরুরী তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে আল্লাহর নৈতিক উপদেশ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ভীতি যে কেবল পরকালের জন্যেই, এমন কথা নয়। এ দুনিয়ায়ও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা রক্ষা না করা হলে তার অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখা দিতে পারে। আর

Dhaka University Institutional Repository

তা হচ্ছে স্বামীর মন অন্য মেয়েলোকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং স্ত্রীর মন সমর্পিত হওয়া অন্য পুরুষের কাছে। আর এরই পরিণতি হচ্ছে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আশু বিপর্যয় ও ভাঙ্গন।

আল্লামা ইমাম বায়যাবী (র.) গায়র–মুহাররম মেয়েলোকের প্রতি বারবার দৃষ্টি দেয়াকে "বিশ্বাস ঘাতক দৃষ্টি" বলে অভিহিত করেছেন।[১২] এরূপ দৃষ্টিকে ইমাম গাযালী (র.) পারিবারিক দন্ধ–সংঘাতের–বিপদ বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। [১৩]

এজন্যেই দৃষ্টি নিয়ন্ত্রনের জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ও পুরুষের প্রায় একই অবস্থা। বরং স্ত্রীলোকের দৃষ্টি পুরুষের মনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে। প্রেমের আবেগ–উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি অত্যন্ত নাজুক ও ঠুনকো। কারো সাথে চোখ বিনিময় হলে স্ত্রীলোক সর্বাগ্রে কাতর এবং কাবু হয়ে পড়ে, যদিও তাদের মুখ ফাটে না। এ তার স্বাভাবিক দুর্বলতা– বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে। এ কারণে স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমন হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয় যে, কোনো সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন যুবকের প্রতি কোনো মেয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, আর তার সর্বাঙ্গে প্রেমের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল, সৃষ্টি হলো প্রলয়ঙ্কর ঝড়। ফলে তার বহিরাঙ্গ কলংকমুক্ত থাকতে পারলেও তার অন্তর্লোক পংকিল হয়ে গেল। স্বামীর হৃদয় থেকে তার মন পাকা ফলের বৃন্তচ্যুতির মতো একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল, তার প্রতি তার মন হলো বিমুখ, বিদ্রোহী। পরিণামে দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখা দিল, আর পারিবারিক জীবন হলো ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন।

মহানবী (সা.) পরস্ত্রীকে দর্শন করা, পরস্ত্রীর রসালো কথা শুনা, পরস্ত্রীর সাথে রসালো কথা বলা জ্বিনার সাথে তুলনা করেছেন।[১৪]

১২। আল্লামা ইমাম বায়যাবী (র.), ***আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল***, খ.৬, পৃ.২২৫ মূল আরবী পাঠ :

النظرة الخاءنة كاالنظرة الثانية إلى غير المحرم واشتراق النظر اليه اوخيانة العين

১৩। ইমাম গাযালী (র.), মিনহাজুল আবেদীন, পৃ.২৮ মূল আরবী পাঠ :

ثم عليك الله وايانايحفظ العين فانها كل فتنة اوافة

১৪। "চক্ষুদ্বয়ের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রী দর্শন। কর্ণদ্বয়ের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীর রসাল কথা লালসা উৎকণ্ঠিত কর্ণে শ্রবণ করা। রসনার জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীর সাথে রসাল কণ্ঠে কথা বলা। হস্তের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা-হাত দিয়ে ধরা এবং পায়ের জ্বেনা হচ্ছে যৌন মিলনের উদ্ধেশ্যে পরস্ত্রীর কাছে গমন। প্রথমে মন লালসাক্ত হয়, কামনাতুর হয়, যৌন অঙ্গ তা চরিতার্থ করে কিংবা ব্যর্থ করে দিয়ে তার প্রতিবাদ করে।" মুল আরবী পাঠ :

العينان زناهماالنظر والاذنان زناهما الاستما اللسان زناهما الكلام واليد زناهما البطش والرجل زناهماالخطاء والقلب يهدى ويمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه- مسلم

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, "দেখা ও কথা বলাকে জ্বেনা বলার কারণ এই যে, দু'টো হচ্ছে প্রকৃত জ্বিনার ভূমিকা-জ্বিনার মূল কাজের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জ্বিহবা হচ্ছে বাণী–বাহক, যৌন অঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার–সত্য প্রমাণকারী।"[১৫] কাজেই বলা যায়, দৃষ্টিই হলো যৌন লালসার উদ্বোধক, পয়গাম বাহক। দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌন অঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী

Dhaka University Institutional Repository

করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সব কিছুর মূল কারণ। কেননা, প্রথমত আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা–বিভ্রমে নিমজ্জিত করে আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে, বাস্তবে ঘটনা সংঘঠিত করে। বাস্তবে যখন কোন বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোন উপায় থাকে না।

অতএব, পারিবারিক কল্যাণ সাধনে, প্রলয়ংকারী ভাঙন ও বিপযর্য় রোধে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সা.) প্রদর্শির্ত পারিবারিক জীবনাচরণে ইসলামী শরী'আতের বিধি–বিধানের সীমা রেখা মেনে চলা একান্তভাবে অপরিহার্য। জ্বিনা-ব্যভিচারের প্রাথমিক স্তর লালসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপসহ যাবতীয় যৌন উদ্রেককারী কর্মকান্ড রোধে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ পর্দা ব্যবস্থার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিবারের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে পর্দা ব্যবস্থা একান্তই অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হলে পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ স্থিতি ধারণাতীত। সর্বোপরি জেনা-ব্যাভিচারের আড্ডাগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। এজন্যে ইসলামী শরী'আতের শাস্তি পুরাপুরি কার্যকর করতে হবে। ব্যভিচারের শাস্তি যথার্থভাবে কার্যকর হলে সমাজ থেকে এহেন জঘন্যতম অপরাধ অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজ হবে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

১০. পারিবারিক পরিমণ্ডলে দ্বীন ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করণ

পরিবার মানবীয় গুণাবলীর লালনক্ষেত্র। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, সমঝোতা, উদারতা, সহায়তা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আদব-কায়দা, সাহায্য-সহযোগিতা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, তাহযীব, ও তামাদ্দুন ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলী যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি লালিত পালিত হয়। বৃহত্তম সমাজ গঠনে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এসব গুণাবলী যথাযথ প্রয়োগ নির্ভর করে পরিবারিক পরিমণ্ডলে দ্বীন ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ও এর চর্চার উপর। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে পরিবার থেকেই। যে শিক্ষা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করে। অতঃপর এ শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে।

১৫। মুল আরবী পাঠ :
انما سمى النظر زناواقول زنا لانهما مقدمتان للزنا فان البصر رائد واللسان خاطب والفرج مصدق للزنا ومحقق له بالفعل- معالم السنن- ج-৩-ص২২৩

উল্লেখ্য যে, ইসলামের মূল গ্রন্থ কুর'আন মজীদের প্রথম শিক্ষাই হলো জ্ঞান অর্জন করা "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[১৬]

ইসলামপূর্ব যুগে আরবজাতি বর্বর ও অসভ্য বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু এ জাতিই দ্বীন ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে প্রায় সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব অর্জন করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। মূলত দ্বীন ভিত্তিক এ শিক্ষাই মুসলমানদেরকে উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত করে তুলে।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর পরিবারের কর্তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে পরকালিন জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কুর'আন মজীদে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[১৭]

এ আয়াতের তাফসীরে মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেনঃ "তোমরা তোমাদের নিজেদের ও পরিবার পরিজনদের সুশিক্ষা ও ভাল অভ্যাসের সাহায্যে পরকালিন জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।"[১৮]

ইমামুল মুফসসিরীন ইবনে জরীর তাবারী (র.) লিখেছেন ঃ

فعلينا ان نعلم اولادنا الدين والخير ومالا يستغنى عنه من الدبة

"আল্লাহর এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং অপরিহার্য ভালো শিক্ষা দেব।"[১৯]

হযরত আলী (রা:) এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

علموا انفسكم واهليكم الخير وادبوهم

"তোমরা নিজেরা শেখো ও পরিবারবর্গকে শিখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের সে কাজে অভ্যস্ত করে তোল।"[২০]

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক কল্যাণ সাধনে সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের দ্বীনভিত্তিক আদর্শ শিক্ষা দান ও ইসলামী আইন-কানুন পালনে আল্লাহকে ভয় ও রাসূলে করীম (সা.) কে অনুসরণ করে চলার জন্যে অভ্যস্ত করে তোলাও পরিবারের কর্তা পিতামাতরই কর্তব্য এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অতি বড় হক। সন্তানকে জ্ঞান ও অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে দেয়ার তুলনায় অধিক মূল্যবান কোন দান এমন হতে পারে না, যা তারা সন্তানকে দিয়ে যেতে পারে।

১৬। আল-কুরআন, ৬৫:১

১৭। আল-কুরআন, ৬৬:৬

১৮। সূত্র: মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৩৭

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

২০। আল্লামা শাওকানী (র.) ***ফতহুল কাদীর,*** প্রাগুক্ত,খ.৫,পৃ.২৫৬

১১. শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো

'মানব সম্পদ উন্নয়ন' আধুনিক কালের বহুল আলোচিত কয়েকটি শব্দসমষ্টি। সারা পৃথিবীতে এটা এখন বহুল আলোচিত বিষয়। এটি এমন একটি ধারণা যা নিয়ে পৃথিবীতে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং অধ্যয়ন-গবেষণার শেষ নেই। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া পৃথিবীব্যাপী সকল দেশে এর উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণাটি এখন নানাভাবে ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে মানব উন্নয়ন সংজ্ঞায়িত করেছেন। কয়েক বছর আগে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বলা হয়: "আধুনিক অর্থে মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ অর্থাৎ উৎপাদন কর্মে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে মানুষের কারিগরী দক্ষতা বা ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।"[২১]

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০০১ এ বলা হয়েছে : It is about creating an eavironment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in accord whith their needs and interest."[২২]

মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতার উন্নয়নের (Bulding of human capacitities) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মৌলিকভাবে মানব উন্নয়নে জ্ঞানার্জন, সম্পদের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর এবং মানসম্মত জীবন-যাপনের প্রতি জোর দেয়া হয়। 'Human development- Past, Present and Future' শিরোনামে প্রকাশিত একটি আর্ন্তজাতিক রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে : The most basic capabilities for human development are to lead long and healthy lives, to be knowlegeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the community.[২৩]

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। শিক্ষার মাধ্যমে মানব গোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে। দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা সৃষ্টি ও কর্মদক্ষতা অর্জিত হয়। মানুষের মধ্যে সামর্থ ও উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। বিকশিত হয় মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলী। সৃষ্টি হয় ন্যায়বোধ, দয়া ও সহমর্মিতা এবং ত্যাগ ও সৌহার্দ্যবোধ। একারণে মানব উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। Education is the acquisition of knowledge which can be applied to improve human faculties, behaviour and skills through training and development.

২০। Budapest statment on Human Resoures Development in changine world, New york, UNDP,1987

২১। Human Development Report-2001, UNDP, New York, 1987

২২। Human development- Past, Present and Future, Human Development Report-2001, UNDP, New york, 2001

শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে। এ কারণে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি বলা হয়। শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, অভ্যাস, আচরণ ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জিত হয়। এ কারণেই শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে World book of Encyclopadia- তে বলা হয়েছে ঃ æ Education in the

process by which people acquird knowledge, skills, habits, values or attitudes." [২৪]

প্রফেসর রায়ত্তকিমি হিরোনো–এর মতে, শিক্ষার প্রধাণত দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে– "মানুষের দৈহিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তির মধ্যে মানসিক গুণাবলীর বিকাশ ও চরিত্র গঠন।"[২৫]

শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ঃ

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি মেকানিজম গড়ে উঠে;

২. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে নাগরিকবৃন্দকে কর্মক্ষম করে তোলে;

৩. মানবীয় ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত ও বিকাশিত হয়;

৪. শক্তিশালী অনুপ্রেরণামূলক শক্তি সৃষ্টি হয়;

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইতিবাচক ও শক্তিশালী কর্মপন্থা নির্ধারণ করার যোগ্যতা তৈরী হয়; এবং

৬. প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাসের কলাকৌশল অর্জিত হয়।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে তিন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমনঃ

প্রাথমিক পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে মানব গোষ্ঠির মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমনঃ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা–পূরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানুষ মৌলিক চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে এবং এতোদ্দেশ্যে তার কর্মতৎপরতা পরিচালিত হতে থাকে। তার আচরণেও ইহা প্রতিফলিত হতে থাকে। মানব জীবনে জাতীয় অনুভূতি, ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা তথা কর্মক্ষম বা উপার্জনক্ষম হতে অনুপ্রেরণা জোগায় ও উদ্ধুদ্ধ করে। মানব কল্যাণে আরো সম্পদ আহরণ, অনুসন্ধান ও কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করতে নির্দেশনা ও উদ্দিপনা সৃষ্টি হয়।

23. Hisham Alitalib, Training Guide for Islamic Workers, The international islamic thught, USA.
২৪. World book of Encyclopadia.
২৫. প্রাগুক্ত,

মাধ্যমিক পর্যায়ঃ এ পর্যায়ে ব্যক্তির মধ্যে মানবীয় এবং চারিত্রিক গুণাবলী–তৈরী ও বিকশিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে সততা, ন্যায়বোধ, দয়া, আত্মত্যাগ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মত গুণাবলী–অর্জিত হয়। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি হয়। মানবিক ও আত্মিক গুণাবলীর উম্মেষ ঘটে। শুধু তাই নয়, মানব চরিত্র চারিত্রিক ও মানবীয় যত উত্তম গুণ আছে

ব্যক্তির মধ্যে তা সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে ব্যক্তি ভ্রাতৃত্ববোধ, মানব কল্যাণ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত হয়। এ ছাড়াও এ পর্যায়ে মানব গোষ্ঠির মধ্যে জীবন ও জগত, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়। চিরন্তন উপলব্ধি জন্মলাভ করে।

শেষ পর্যায়: মানব জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে ইহা সর্বোচ্চ পর্যায়। মানব জীবনের এ স্তরে মানব জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং মানবীয় গুণাবলী বিকশিত হয়। এ পর্যায়ে মানুষ সততা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও ত্যাগের অনুভূতিতে উজ্জীবিত হয়ে কল্যাণকর ও সৎকর্ম সৃষ্টি প্রয়াসী হয়ে উঠে। পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে অত্মিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

মানব জীবন লোভ লালসা, রাগ-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত-অপবাদ, বিদ্বেষ-অহংকার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করে সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিনয়, নম্রতা, দয়া ও ত্যাগ এবং আমানতদারী দ্বারা নিজেকে সুশোভিত করে তোলে।

এভাবেই শিক্ষার মাধ্যমে উল্লেখিত ক্রমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়িত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা অন্যতম হাতিয়ার। মানব সম্পদ উন্নয়নে এর কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন

ছক-১

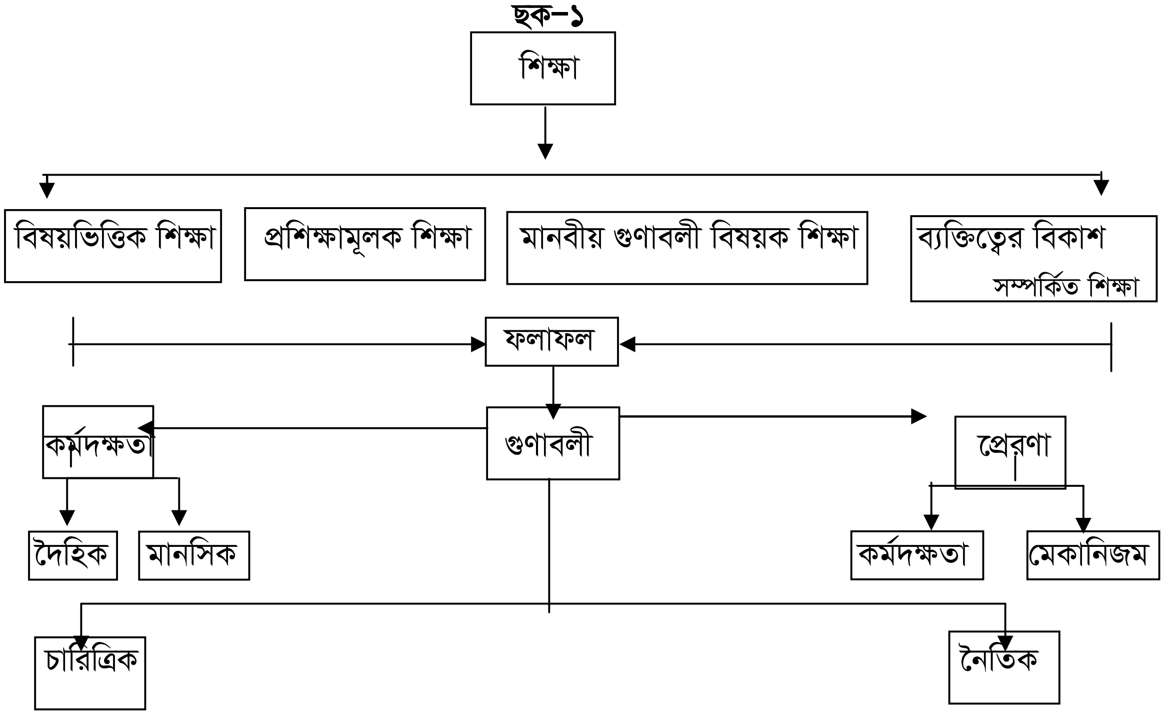

ছক-২

শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে চেতনার ধরণ ও সম্ভাব্য ফলাফল		
পর্যায়	চেতনার ধরণ	ফলাফল
প্রাথমিক পর্যায়	মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণে	বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান বিকৃত হয়

	সচেষ্ট হয়	
দ্বিতীয় পর্যায়	মানসিক চেতনার উম্মেষ ঘটে ও বিবেকবোধ জাগ্রত হয়	স্রষ্টা ও সৃষ্টির জগত ও জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার জাগ্রত হয় ও চিরন্তন সত্যের প্রতি উপলব্ধি জাগ্রত হয়,
তৃতীয় পর্যায়.	সচেতনতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দায়িত্ব ও সম্পর্কিত কাজে	মানবীয় গুণাবলী বিকশিত হয়।

১২. পুত্র কন্যাভেদে বৈষম্য দূর করা

একথা অকপটে বলা যায়, বাংলাদেশের পারিবারিক ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে পুত্র–কন্যা ভেদে বৈষম্য বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান এ জাতীয় অবস্থা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ বৈষম্যমূলক অবস্থাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি:

জন্মের পূর্বে পক্ষপাতমূলক আচরণঃ জন্ম পূর্ববর্তী লিঙ্গ নির্বাচনের মাধ্যমে কন্যা সন্তান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যার ভ্রূণকে গর্ভপাতের মাধ্যমে বিনষ্ট করা হয়।

বংশধারার প্রতিনিধিত্বঃ বংশ অব্যাহত রাখা অথবা বংশ ধারার প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে এবং একের এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করলেও মনে করা হয় কন্যা বংশধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নয়।

কন্যা সন্তান মানে আর্থিক বোঝাঃ পুত্র সন্তানকে বংশ রক্ষা, আয়ের উৎস, পরিবারের উপার্জন এবং আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানকারী মনে করা। অপরপক্ষে কন্যা সন্তানকে আর্থিক বোঝা মনে করা হয়। ধারণা করা হয় কন্যার অর্থ ব্যয়ের দ্বারা অন্যের উপকার করা হয়।

কন্যা সন্তান অবহেলিতঃ কন্যা হওয়ার কারণে বিভিন্ন বয়সে পক্ষপাত ও বৈষম্য মূলক আচরণের শিকার হয়। কন্যা সন্তান অনেক পরিবারের লেখাপড়া, চিকিৎসা, খাদ্য গ্রহণ ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের তুলনায় কম সুযোগ পায়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ কমঃ ১৯৯৭ সালের শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনের বালক বালিকার শিক্ষা গ্রহনের হার যথাক্রমে ৫২ ও ৪৮, মাধ্যমিক ৫৪ ও ৪৬।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বৈষম্যঃ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা সুবিধার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা পুরুষের তুলনায় কম। নারীদের মধ্যে অসুস্থতার হার বেশী, পুষ্ঠিহীনতার মাত্রা বেশী, মাতৃমৃত্যু হারও বেশী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুত্র কন্যাভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ বাংলাদেশের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সন্তান জন্মদানের পর মায়ের দুধ পান করা থেকে শুরু করে নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মায়ের প্রসবোত্তর পরিচর্যা, টিকাদান, শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পড়াশুনা ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্যহীন নীতি গ্রহন করতে হবে। পুত্র কন্যা সন্তান পরস্পরের মধ্যে সর্বতোভাবে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা এবং তাদের মধ্যে সাম্য কায়েম ও রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) বলেনঃ "তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো, তোমরা তোমাদের সন্তাদের মধ্যে সুবিচার করো।[২৭]

ইসলামে সন্তানকে আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে সৎ সন্তান রেখে যাওয়াকে ইসলামে আমল বলে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা, যাকে ইচ্ছা পুত্র কন্যা উভয়ই দান করেন।"[২৮]

১৩. মাদক সেবন প্রতিরোধে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ

মাদকাসক্তি একটি জঘন্যতম বদঅভ্যাস এবং আমর্জনীয় অপরাধ। এটি অসংখ্য পাপকার্য, অপরাধ ও অসামাজিক কর্মের মূল। যে সকল বস্তু পান.ও সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদকদ্রব্য বা 'খামর' বলে। অন্য কথায়, যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং সেবনে বোধশক্তি হ্রাস পায় তাদের সকল শ্রেণীই মাদকদ্রব্যের (খামর) অন্তর্ভূক্ত। মাদকদ্রব্য সেবনের প্রতি আসক্তিকে মাদকাসক্তি বলে।[২৯]

২৭। আবূ দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদ আহমাদ, মূল আরবী :
اعدلوا بين ابناءكم اعدلوا بين ابناءكم اعدلوا اعدلوا بين ابناءكم اعدلوا بين ابناءكم-

২৮। আল-কুর'আন, ৪২:৪৯-৫০

২৯। মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা* (ঢাকাঃ ইসলাম পাবলিকেসন্স, নভেম্বর,২০০৬ইং) পৃ. ১৩৫

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে Narcoties addict means a person physically or mentally dependent on narcaties or a person who habitually takes nareaties."[৩০]

ফেলার মাদকাসক্তির সংজ্ঞায় বলেন, ӕDrug addiction is a psychogenic dependence on or a psychological addiction to ethanal, manifested by the inability of the consistently to control either the stant of drinking are its termination one started.” মাদকাসক্তি একটি ব্যাধি এবং এ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি মাদক গ্রহণের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি ঘটে, অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশা বাধাগ্রস্ত হয়।[৩১]

ডেভিড জেরি ও জুলিয়া জেরি প্রণীত ‘Collins Dictionary of Sociology’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– ӕDrug addiction is a chronic physical and psychological compultion or craving to take a drug in which psychological effects resulting from whthdrawal from the drug.”

অর্থাৎ মাদকাসক্তি হলো মাদক গ্রহণের শারীরিক ও মানসিক বাধ্যতামূলক তীব্র কামনা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অস্বাভাবিক, দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা যা মাদকদ্রব্য গ্রহনের ফলে সৃষ্টি হয়, তা পাবার তীব্র ইচ্ছার জন্যে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। [৩২]

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ অনুসারে,“ মাদকাসক্তি এমন একটি মানসিক অবস্থা যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন দ্রব্য সেবন ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। এবং বারবার তা সেবন করতে বাধ্য হয়।”[৩৩]

৩০। প্রাগুক্ত,

৩১। ড. মোঃ তবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

৩২। আতিকুর রহমান, ***সমাজকর্ম পরিচিতি,*** (ঢাকা ঃ তাসমিয়া পাবলিকেসন্স নভেম্বর ১৯৯৯) পৃ. ৩৭৭

৩৩। আলাউদ্দিন আযহারী, ***বাংলা একাডেমী আরবী বাংলা অভিধান,*** (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমি খ. ১, পৃ. ৪১১।

যে সকল দ্রব্য পান ও সেবনে নেশা সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও সৃতিশক্তি লোপ করে দেয় ইসলামে তাই হারাম বা নিষিদ্ধ। চাই সে প্রাকৃতিক হোক, যেমন– মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি; অথবা রাসায়নিক হোক, যেমন– হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, ইয়াবা ইত্যাদি পরিমাণে অল্প হোক কিংবা বেশী হোক নেশা বা চিত্তভ্রমকারী হলেই তা হারাম। পবিত্র কুর’আনে এ সকল দ্রব্য পান ও

ব্যবহার করাকে অপবিত্র ও শয়তানী কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ কুর'আন মজীদে বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

" হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার দেবী, দেবদেবী ও ভাগ্য নিণায়ক শর নিক্ষেপ–এমনই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। সুতরাং তা বর্জন কর, যাতে তোমরা কল্যাণ–লাভ করতে পার।[৩৪] মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে পারস্পারিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ـ

" শয়তানতো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা তা থেকে নিবৃত হবে না?"[৩৫]

পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা ও শৃংঙ্খলা বিনষ্টকারী মদ ও মাদক এর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ ব্যক্তির উপর মহানবী (সা.) লানত করেছেন(১) যে, নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারী (৩) পানকারী(ব্যবহারকারী) (৪) যে পান করায় (৫) আমদানীকারী (৬) যার জন্যে আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরববাহকারী (১০) লভাংশ ভোগকারী।[৩৬]

৩৪। আল-কুর'আন, ৫:৯০

৩৫। আল-কুরআন, ৫:৯১

৩৬। জামে আত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫২৯

মূল আরবী পাঠ ঃ

عن انس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة عاصر ها معتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشترى لهاو المشتراة له ـ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকাল নানা রকম মাদকদ্রব্য ব্যবহার হয়। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে দৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রের সমস্যা।সুতরাং মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রতিরোধে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ মাদকদ্রব্যের রাহুগ্রাস এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে, তা ছড়িয়ে পড়েছে পারিবারিক থেকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নেশা জাতীয় দ্রব্য আজ এতটাই সহজলভ্য, যে কেউ সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে যে কোন বিপদজনক

মাদকদ্রব্য। এ সহজপ্রাপ্যতার বিস্তৃতি যাতে না ঘটে, সে জন্যে গড়ে তুলতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিরোধ। অভিভাবকদের অতিমাত্রায় সচেতন হতে হবে।

১৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধানকল্পে কতিপয় সুপারিশ

ইসলাম এক অনুপম আদর্শ, পূণার্ঙ্গ জীবন বিধান। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন দিকই এতে উপেক্ষিত হয়নি। আজকের দিনের জন্মনিয়ন্ত্রনের ব্যাপারেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ পাকের প্রতিপালন ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা ও কোনরুপ বিরুপ মনোভাব পোষণ ব্যতিত একান্ত ব্যক্তি ও পারিবারিক কল্যাণ তথা স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্য, স্তন্যদান, সুষ্ঠু প্রতিপালনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ প্রয়োজনে 'আযল' বা তদ্রুপ অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বৈধ। এমনকি স্ত্রী দুরারোগ্য, সংক্রামন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যা তার সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার প্রবল আশংকা বিদ্যমান, তবে কেবলমাত্র এ ক্ষেত্রে ইসলাম স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতিকেও সমর্থন করে। এ সকল পন্থা প্রয়োগের পূর্বে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী শরি'আতের অভিজ্ঞ 'আলেমের স্মরণাপন্ন হয়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া প্রয়োজন।

আমাদের করণীয় উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়:

এক. বিশ্বজগত ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত নতুন নতুন সম্পদ আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের জীবন যাত্রার মান ক্রমেই উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

দুই. সমগ্র বিশ্বজগতেই স্রষ্টা প্রতিটি সৃষ্টিজীবের মধ্যেই এর পরবর্তী বংশধর জন্মানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি জন্মদানের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তিন. প্রতিটি সৃষ্ঠজীবকেই বংশবৃদ্ধির অপরিসীম ক্ষমতাদান করা সত্ত্বেও পরবর্তী বংশধর জন্মানোর সংখ্যা ও পরিমাণ স্রষ্টা কতৃর্ক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অন্যথায় মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীব এবং গাছপালা ইত্যাদির পূর্ণমাত্রায় বংশবৃদ্ধির ফলে পৃথিবী বহু পূর্বেই স্থানাভাব ও তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়া উচিত ছিল।

চার. পৃথিবীতে জনসংখ্যা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে একথা ঠিক, কিন্তু সে জন্যে একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যারোধের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা যুক্তির কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ নয়। কারণ এ হতে চরম স্বার্থপরতা প্রমাণিত হয় এবং মানবতার সাথে চরম দুশমনি করা হয়। এ হতে এ মনোবৃত্তিই প্রকাশ পায় যে, আমরা যারা দুনিয়াতে এসেছি, তারাই যেন এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে ও ভোগ-বিলাস করতে পারি। অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে ভাগ বসাতে না পারে।

পাঁচ. কতিপয় অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা সমস্যা দেখাতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন, তাও সত্য নয়। যেহেতু জনসংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে না, বাড়ে ক্রমিক সংখ্যা অনুপাতে এবং খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনও ঠিক সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. বর্তমান পৃথিবীতে যা কিছু খাদ্য আছে তা শুধু বর্তমান জনসংখ্যার জন্যে নয় এর আয়োজন দিয়েই এর দিগুণ বেশী লোকের জন্যে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে।

সাত. ইসলাম জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রচলিত ঢালাও জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে আদৌ সমর্থন করে না। বর্তমান পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার অংশ অনেক বড়। এই অর্থ দিয়ে বিশ্ব দরিদ্রগোষ্ঠীর কল্যাণে অনেক কিছু করা সম্ভব। পরিবার পরিকল্পনার নামে বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন চলছে তার বিরুপ প্রতিক্রিয়া ক্রমেই ভয়াবহ রুপ নিচ্ছে।

আট. বর্তমান পৃথিবীতে যে অভাব ও দারিদ্র্য দেখা যাচ্ছে তার কারণ সম্পদের অভাব নয়। বরং উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে মানুষের পূর্ণশক্তি নিয়োগ না করা এবং উৎপাদিত সম্পদের অসম বন্টনই এর জন্যে দায়ী।

নয়. অমুসলিমগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত ও পরিচালিত এই জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভোগবাদী সংস্কৃতি ও সভ্যতার লালন। তবে একে অনেকে উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক চাল বলেও মনে করেন।

দশ. বাংলাদেশেও অচিরেই স্থানাভাব অথবা তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ার কোন আশংকা নেই, কারণ বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাষাবাদ যোগ্য জমি রয়েছে তা থেকে বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব এবং সুষম বন্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে বর্তমান জনসংখ্যার থেকে অধিক জনসংখ্যাকে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব।

নিম্নে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধান কল্পে কতিপয় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তাব পেশ করা হলো ঃ

ক. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণতকরণ

বাংলাদেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা আছে, এ জনসংখ্যাকে ধর্মীয় ও আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ দেশের প্রতিটি নাগরিককে যদি দক্ষ জনসম্পদে তথা মানব সম্পদে পরিণত করা যায় তার এ নাগরিকরাই হবে দেশের শ্রেষ্ট সম্পদ। জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়, জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে পারলে দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। যে সকল দেশ আজ বিভিন্ন দেশ থেকে জনসংখ্যা তথা জনসম্পদ ধার করে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রের মিল কারখানা চালায়, তাদের দিকে তাকালেই এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

খ.জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন

সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন করেই জন্ম হার হ্রাস করা যায়। আর এটা জনসংখ্যা কমিয়ে রাখার নিরাপদ ও সুষ্ঠু পন্থা।

গ.ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন

অধিক জনসংখ্যা হেতু এদেশের ব্যাপক কর্মসংস্থান প্রয়োজন। বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্যে ব্যাপক ভিত্তিক শিল্পায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৮০ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল তাই এদেশে ব্যাপকভিত্তিক কৃষি শিল্পায়ন করা প্রয়োজন। এ শিল্পে কাঁচামাল প্রাপ্তি খুব সহজেই হবে। কৃষকদের মৌসুমী বেকারত্বত খুচবে। আবার ব্যাপক কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে।

ঘ. রপ্তানি বহুমুখীকরণ

আমাদের দেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করে ব্যাপক শিল্পয়নের মাধ্যমে যদি কাজে লাগানো যায় তবে ব্যাপক সম্পদ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই সম্পদকে বাজারজাতকরণের জন্যে আমাদের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইসলামী কমনমার্কেট প্রতিষ্ঠা আঞ্চলিক কমনমার্কেট প্রতিষ্ঠাসহ সকল সম্ভবনার চিন্ত–ভাবনা করতে হবে। আমাদের দেশ থেকে বর্তমানে মাত্র কয়েকটি রপ্তানিমুখী পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যেমন তৈরি পোশাক,পাট বা পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া বা চামড়াজাত দ্রব্য,শাক–সবজি মেলামাইন সামগ্রীসহ আর কতিপয় দ্রব্য। রপ্তানিযোগ্য সম্পদের এই সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে আমাদের আরো রপ্তানি সামগ্রী বাড়াতে হবে ব্যাপক ভাবে। অর্জন করতে হবে আরো প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

ঙ. সম্পদের সুষম বন্টন

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধানের জন্যে দ্বিতীয় করণীয় হলো: সম্পদের সুষম বন্টন। আজ আমাদের দেশে সুদভিত্তিক যাকাত–বিহীন অর্থব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় ধনীরা দিন দিন আরো ধনী হচ্ছে আর গরীবেরা আরো গরীব হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে উৎপাদিত সম্পদে সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি সরকারিভাবে সকল জনসাধারণের মধ্যে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা থাকতো, তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কোন সমস্যাই থাকতো না।

চ. আবাদী জমির ফলন বৃদ্ধি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের একর প্রতি উৎপাদনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। জাপানে একর প্রতি শস্য উৎপাদনের হার ৪৬৭৯ পাউন্ড–অর্থাৎ প্রায় দুই মেট্রিক টন। বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় প্রতি একরে ১৫৭৫ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় এক টন।[৩৮] উচ্চ ফলনশীল বীজ রাসায়নিক সার সহজ লভ্যকরণ, পানি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমরা আমাদের একর প্রতি ফলন অনেক পরিমানে বাড়াতে পারি।

৩৮। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০০৫

খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, রাসায়নিক সারের দাম দিন দিন বাড়ানো হচ্ছে। অথচ এই সার নামেমাত্র দামে সরবরাহ করে আমরা উৎপাদনের হার অনেক বাড়াতে পারি। পরিবার পরিকল্পনার যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তার কিছু অংশ সার সরবরাহ করার জন্যে বরাদ্দ করা হলেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বিদুৎ সরবরাহের মাধ্যমে

সেচ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা যায়। পাওয়ার পাম্প পরিচালনার জন্যে তৈলের পরিবর্তে বিদুৎ ব্যবহার অনেক কম খরচ হয়। আজই সব করা সম্ভব নয়। জনসংখ্যা যেমন এক লাফে বেড়ে দিগুন হচ্ছে না, তেমনি ফসল উৎপাদনের পরিমাণও একদিনেই দিগুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কাজ করা যেতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার পেছনে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শুন্যে নামানোর জন্যে ৬০ বছর ধৈর্য ধরতে পারি তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে আমরা সে তুলনায় অনেক কম সময়েই সাফল্য অর্জন করতে পারব। প্রয়োজন শুধু সংকল্প বাস্তবায়নের।

এ জন্যে সরকারী উদ্যেগে কৃষকদের মধ্যে একটি আন্দোলন শুরু করা দরকার। উন্নত বীজ,সার ও পাওয়ার পাম্পকে সহজলভ্য করণ এবং থানা পর্যায়ে নিযুক্ত কৃষি অফিসারদের সরেজমিনে ঘুরে ফিরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃষকদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করা প্রয়োজন। দপতরী লাল ফিতার দৌরাত্ম দূর করা অপরিহার্য। অন্যথায় কৃষকেরা সময়মত সার, বীজ ও পাম্প পাবেন না। এ সাহেব, ওই সাহেবের কাছে ধর্ণা দিতে দিতে মওসুম পার হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির এক চতুর্থাংশ শীতকালে আবাদ করা হয় না। বা কিছু হয় তাও তরি-তরকারী, ডাল, তৈলবীজ ও তামাক ইত্যাদি। অথচ ঐ সময় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা থাকে না। শুধু পানি সরবরাহের অভাবে জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। যদি এর তিন চতুথাংশ জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে খাদ্য চাষ করা হয় তাহলে প্রতি বছর শুধু শীত মওসুমে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন। বাংলাদেশের সমগ্র জনতার জন্যে খাদ্যদ্রব্যের যা প্রয়োজন তার পরিমাণ এর অর্ধেকেরও কম। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈনক ছাত্র এ বিষয়ে একটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণেরও পরিকল্পনা পেশ করেছেন। ঐ পরিকল্পনা মুতাবিক শীতকালে দশ লক্ষ একর জমিতে ধান উৎপাদনের লক্ষমাত্রা স্থির করে নিলে ১০-১২ হাজার নলকূপ বসাতে হবে। প্রতিটি গভীর নলকূপ বসাতে খরচ হবে ৭০/৭০ হাজার টাকা। তবে একটি গভীর নলকূপের সাহায্যে ১০০ একর জমিতে সেচ কার্য চলে। আর ঐ জমিতে হাইব্রিড বা উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করে খুব সহজেই একর প্রতি ৫০ মণ হিসেবে ১০০ একর জমিতে ৫০০ মণ ধান ফলানো যায়। আর ধানের দাম ৫০০ টাকা হলেও ৫ হাজার মণের দাম দাঁড়ায় ২৫ লক্ষ টাকা। ৮০ হাজার টাকা খরচ করে যদি ২৫ লক্ষ টাকার সম্পদ উৎপন্ন করা যায় তাহলে তা খুবই লাভজনক। খরচের দাম যদি আরো বাড়িয়ে ধরি এবং উৎপাদন আরো হারে হিসাব করি, তবু এতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।[৩৭]

৩৭। জনৈক গ্র্যজুয়েট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ***ময়মনসিংহ মাসিক ডাইজেস্ট,*** (ঢাকা:১৯৭২ইং) পৃ.২১৯-২২২)

ছ. বিদেশে দক্ষ কর্মচারী ও শ্রমিক প্রেরণ

এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক লোক বেকার থাকার দরুন নানাবিধ অর্থনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে দক্ষ লোকের অভাব খুব বেশী। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কাজের উপযুক্ত দক্ষ লোক তৈরী করার জন্যে যথেষ্ট নয়। সাধারণভাবে

উচ্চশিক্ষা লাভ করে যুবকগণ বেকার ঘুরে বেড়ায়। কারণ শিক্ষকতা ও কেরানীর কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করার যোগ্যতা তাদের থাকে না। অর্ধশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয়, তারা মাটিকাটা ও বোঝাটানা ছাড়া অন্য কোন কাজই জানে না। তাই শিক্ষিত লোকদের তুলনায় যেমন চাকরির শুন্যপদ অনেক কম, তেমনি মাটিকাটা ও বোঝাটানার কাজেও প্রয়োজনীয় সংখ্যার চাইতে কর্ম-প্রার্থী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলছে। আর প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেকার লোকের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের কোন দায় দায়িত্বই কেউ গ্রহণ করে না। ফলে দিন দিন অসামাজিক কাজ বেড়েই চলছে।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে আজ অর্থের সয়লাব। আরব দেশগুলোতে একসময় চরম দারিদ্র্য বিরাজ করছিল। আজ মাটির নিচে অফুরন্ত তৈলের ভান্ডার আবিষ্কার হয়েছে। সমগ্র আরব জগতের চেহারাই এজন্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে দেশে ব্যাপক ভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। গড়ে উঠেছে শহরের পর শহর। সুউচ্চ আকাশচুম্বী ইমারতগুলো এয়ারকন্ডিশন করে তাতে যাবতীয় আধুনিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মরুভূমি আর পাহাড়ের দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে শহর ও বন্দর। অথচ তাদের দেশে লোকের অভাব। আরব দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োগ করার জন্যে তাদের প্রয়োজন দক্ষ কর্মকারী ও শ্রমিকের। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের যে চাহিদা সে চাহিদা পূরণ করার জন্যে সৌদি আরবসহ, কুয়েত, কাতার, মিশর, লিবিয়া, মরক্কোতে, বাংলাদেশের শ্রমিক ও পেশাজীবিরা কাজ করছেন। একইভাবে নিকট ও দূরপ্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ব্রুনাই দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বহু মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতেও বহু বাংলাদেশী চাকুরী ও ব্যবসাসহ নানা ধরনের কাজ করছে। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৫৯ লাখ মানুষ কর্মরত ছিলেন। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৮৪২৩ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে ২০০৮ সালের বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাশের অবস্থান ছিল ১২ তম। ২০০৯ সালে তা অষ্টম স্থানে উন্নীত হয়। এ সময় সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিল ২য়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে পড়েনি তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অংকের রেমিটেন্স।[৩৮]

৩৮। প্রফেসর মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, ***বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়,*** (অষ্টম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোড) পৃ. ৪৯

বর্তমানে সৌদিআরব সহ তৈল সমৃদ্ধ আরব দেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশায় বাংলাদেশী শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমরা আরবী ভাষা ও বিভিন্ন বিষয়ে অদক্ষ শ্রমিককে দক্ষ করে গড়ে তুলে ব্যাপক আকারে শ্রমিক প্রেরণ করে বিপুল পরিমাণ

বৈদেশিক রেমিটেন্স আহরণ করতে পারি। এতে আমাদের দুদিক থেকে সুবিধা হবে। প্রথম বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে, দ্বিতীয়ত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহন করা আশু প্রয়োজন।

জ. দুর্নীতির মূলোৎপাটন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র দুর্নীতি (Corruption) বিরাজ করছে। সমাজদেহের সর্বত্র দুর্নীতির মতো সামাজিক ব্যাধি সার্বিক সামাজিক উন্নয়নকে ধ্বংস করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলো যেমন দুর্নীতির বিচিত্র রিপোর্ট প্রকাশ করছে, তেমনি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে দুর্নীতির আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে মনে হয় যেন এটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে। দুর্নীতিই যেন সামাজিক সুনীতিতে পরিণত হয়েছে।

দুর্নীতি একটি ব্যাপক ও জটিল প্রত্যয়। দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ জটিল কাজ। দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা-ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবী প্রভৃতির অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। Social work dictionary- র ব্যাখ্যানুযায়ী[৪০] æCorruption is in political and pablic service administration, The abusc of office for personal gain, usually through brivery, extortion, influnce pedlling and special treatment given to some citizens and not others”... রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্যে অপব্যবহারকে বুঝায়। সাধারণত, ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যাক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণপ্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলা হয়। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী রামনাথ শর্মার মতে, æ In corruption a person wilfuly neglected his specified duty in order to have an undue advantage.”[৩৯] অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।

৩৯। Upendrnath Tagar, Corrnption in Aneient India, মোঃ আতিকুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকা : আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০) পৃ. ৩৩৫

দুর্নীতি হলো দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ। স্ব-স্ব পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থউদ্ধারের লক্ষ্যে কৃত অপরাধ মূলক আচরনই হলো দুর্নীতি। প্রকৃতি ও কলাকৌশলগত দিক থেকে দুর্নীতি ভিন্নধর্মী অপরাধ। যা

দুর্নীতিবাজদের দৈহিক অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন: উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধভাবে পেশাগত প্রভাব খাটানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রভাব

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক ব্যাধি হলো দুর্নীতি। সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি বিস্তৃত। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি বিস্তৃত। জার্মানীর দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল'- এর মন্তব্য হলো-[৪০]

"বাংলাদেশের দুর্নীতির রেকর্ডের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী যদি হিসেব করা হয়, তাহলে সবচেয়ে খারাপ যে ১০টি দেশ বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম"। ১৯৯৬ সালে উক্ত সংস্থার সূচক অনুযায়ী বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল চতুর্থ। UNDP-এর রিপোর্টে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকাকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে। অথচ মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৯ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৫০ তম দেশ। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সাংবিধানিক দায়িত্বপালন, সমানাধিকার ভোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুদুরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে দুর্নীতি।

২০০১ সালে Transparency International-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্থ দেশসমূহের মধ্যে প্রথম।[৪১] যদিও পরবতীর্তে দুর্নীতির মাত্রা পর্যায়ক্রমে কমে আসছে।

১. বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যক্তি ও দলীয় স্বর্থে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা অবৈধভাবে কাজে লাগানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি, রাজনৈতিক দুর্নীতির পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। যার প্রভাবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৪০। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৫
৪১। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা : ৫ জুলাই ২০০১।

২. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যহার করে অর্থ আত্মসাৎ, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে অনিহা, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি, প্রশাসনিক দুর্নীতি সমাজে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করে। স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে সমাজের যোগ্য ব্যক্তিরা স্থায়ী স্বার্থ

হতে বঞ্চিত হয়। প্রশাসনিক দুর্নীতি মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী। কারণ দুর্নীতির মাধ্যমে যদি সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তবে দায়িত্ব পালনের প্রতি আগ্রহ লোভ পায়। যা পরিণামে প্রতিভা বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে তোলে।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি জাতীয় জীবনে বিপর্যয় বয়ে আনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতির মাধ্যমে পরীক্ষার পাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাস ও জাল সনদপত্র প্রভৃতি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থবির করে দিচ্ছে।

৪. দুর্নীতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। দুনীতির প্রভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে আত্মসাৎ করার ফলে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

৫. দুর্নীতি দারিদ্র প্রসারের সহায়ক। দুর্নীতির আশ্রয়ে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করার মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাব দারিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া দুর্নীতির প্রভাবে দারিদ্র বিমোচন কার্যত্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। ফলে দারিদ্র হ্রাস না পেয়ে দারিদ্র প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়।

৬. দুর্নীতি সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতির প্রভাবে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি গঠিত হতে পারে না। সমাজে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ব্যপক দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়ে নীরবতা পালনে বাধ্য হয়। সাময়িক আদর্শ ও মূল্যোবোধের অবক্ষয় ডেকে আনে দুর্নীতি। দুর্নীতি সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত, কলহ সৃষ্টি করে। দুর্নীতি চক্রাকারে ক্রিয়াশীল আত্মঘাতী সামাজিক ব্যাধি, দুর্নীতি সমাজে যে ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয়ে অন্যকে প্রতারিত করে, আবার সেও অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনিও ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন। এভাবে চক্রকারে দুর্নীতি সমাজে প্রসারিত হয়। দুর্নীতির প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভুমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ফলে সমাজের মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতি ক্যান্সারের ন্যায় নীরবে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতিকে মূলোৎপাটনের জন্যে দুর্নীতির বিরোদ্ধে জনগনকে সচেতন করতে হবে। দুর্নীতি দমনে যথার্থ ও কঠোর আইন প্রণয়ন করে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি প্রদানে সচেষ্ট হতে হবে। এমনকি

দুর্নীতিবাজকে চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে নানারূপ নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি নিমূলে অব্যাহত চেষ্টা চালাতে হবে। নিম্নে বাংলাদেশে দুর্নীতি মুকাবিলার জন্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

ক.

১. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

২. সমাজ জীবনে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

৩. দুর্নীতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি সম্পর্কে জনগনের মধ্যে সচেতনতা ও অনুভূতি সৃষ্টি করা।

৪. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে তাকওয়ার অনুশীলন করা।

৫. সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা।

৬. আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন গঠনের প্রতি জনগণকে উৎসাহ দান।

৭. জীবন যাপনে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

৮. সন্তানদের এমন পরিবেশে গড়ে তোলা যাতে তারা স্বভাবগতভাবে নৈতিকমূল্যবোধ সম্পন্ন হয় এবং অন্যায়কে ঘৃণা করতে শেখে।

খ.

৯. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা

১০. সৎ ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও কর্মী গড়ে তোলা।

১১. বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়তের যথাযথ অনুসরণ।

১২. রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায ও যাকাত কায়েম করা এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।

গ.

১৩. কর্মজীবী মানুষের সম্মানজনক, ন্যয়সঙ্গত ও দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সময়োপযোগী পারিশ্রমিক লাভের ব্যবস্থা করা।

১৪. জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

ঘ.

১৫. দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ।

১৬. অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনকারী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৭. মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ.

১৮. প্রশাসনে সৎ, তাকওয়াবান, দায়িত্বশীল ও দক্ষকর্মী নিয়োগ।

১৯. প্রশাসনে জনগনের অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করে প্রশাসনকে জনগনের কাছে জবাবদিহি ব্যবস্থা করা।

২০. প্রশাসকের প্রশাসনিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ.

২১. দুর্নীতি পরায়নদের ইসলামী শরীয়া মুতাবিক শাস্তিদান নিশ্চিত করা।

২২. সৎ ও ন্যায়পরায়ন লোকজনকে সমাজিকভাবে সর্বাধিক মর্যাদাদান ও পুরুস্কৃত করা।

২৩. দুর্নীতি পরায়নদের সামাজিকভাবে ঘৃণা প্রদর্শন, বয়কট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করা।

২৪. বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, আস্থাভাজন নেতৃত্ব ও সেচ্চসেবী সংস্থা ইত্যাদির যৌথ উদ্যোগে দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠন ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

উপরোক্ত সুপারিশমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

ঝ. মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করা।

সর্বনাশা মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্বসভ্যতার বিরাট হুমকি। বর্তমান মাকদদ্রব্যের আধুনিক সংস্করণ মারিজুয়ানা, আফিম, কোকেন, এ্যালকোহল, ক্যানাবিস, মদ, ডিডোব্রিল, হিরোইন, ফেন্সিডিল, গাঁজা, প্যাথেড্রিন, ইয়াবা, রেক্টিফাইড স্পিরিট, প্রভৃতি মাদকদ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজে কামানের ন্যায় কাজ করছে। ফলে দিনের পর দিন হত্যা ও ধর্ষণসহ নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের শিকার। [৪২]

৪১। সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী-১৯৯৩ইং) পৃ: ২৬৬

৪২। ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ৩২২

এক পরিসংখ্যানে জানা যায় প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় ধুমপান ও তামাক জাত দ্রব্য গ্রহণের পরিনামে। হত দরিদ্র আমাদের বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যসেবীদের সংখ্যা ১২ লক্ষাধীক।[৪৩] এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে অভিজাত শ্রেণীর লোক। ইনজেকশন জাতীয় মাদকদ্রব্যের সুবাদ অনেক কোটিপতিও প্যাথেডিন ইনজেকশন নিয়ে নেশা করছে। যুব

সমাজ মাদক সেবন করে হচ্ছে নারী আসক্ত, খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি রাহাজানী, ছিনতাই ও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এ মাদকাসক্তি। এর ফলে যেমন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রসার ঘটছে তেমনি নৈতিক গুণাবলীওহ্রাস পেয়ে শূন্যের কোটায় চলে যাচ্ছে।

মাদকদ্রব্য বা মাদকাসক্তি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধ নৈতিকস্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে, তা সমাজ জীবনের গতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ করছে এর বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। মাদকদ্রব্যের সর্বগ্রাসী আক্রমন থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করে একটি কল্যাণকর ও গতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সরকার, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং আগ্রহী গোষ্টীর সামনে আশু করণীয় কয়েকটি দিকের সুপারিশ ঃ

১. মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও নেতিবাচক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ বেচাকেনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। এ ক্ষেত্রে সকল গণমাধ্যম ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আলোচনা সভা ও মাদক বিরোধী অভিজান পরিচালনা করতে হবে।

২. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ বেচা-কেনা প্রতিরোধের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে এর যোগান সীমিত করা। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঔষধ প্রস্ততকারী সংস্থা এবং মাদকদ্রব্যের কাঁচামাল এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং নিষিদ্ধ মাদক উদ্ভিদের চাষ বন্ধ করে বিকল্প-ফসল উৎপাদনের কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

৩. মাদকদ্রব্যের চোরাচালান দমন ও নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে হলে নিয়ন্ত্রণ কৌশলের উন্নয়ন অনিবার্য। এ ক্ষেত্রে বৈধ ও আইনগত আন্ত: সরকার সহযোগিতা গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এ লক্ষ্যে কতিপয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে: ক. পাচারের জন্যে দায়ী অপরাধীকে বিচারের জন্য বিদেশী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পন। খ. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। গ. গভীর সমুদ্রে জাহাজ ও আকাশ পথে বিমানের উপর সতর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বোভৌম দেশের সীমান্তের স্থল ও নৌপথে করাকড়ি আরোপ করা। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে কিশোর এবং যুবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া জাতীয় প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অতিউচ্চ মূল্যে সম্পর্কে প্রচার বন্ধ করতে হবে, যাতে দেশের বেকার বা যুবসমাজ অর্থ লোভে মাদক দ্রব্য পাচারে উৎসাহিত হতে না পারে।

বলাবাহুল্য, নেশার জিনিসের কুফল সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে গিয়ে পাছে কাউকে নেশার প্রতি কৌতুহলি করে তোলা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বোপরি মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক প্রচারনা যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনগণের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি এবং পুলিশ, কাষ্টমস্, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থাকে সক্রিয়করণ ও তাদের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

উপরন্তু, ড্রাগ নেশার নানা জিনিসের প্রতি নির্ভরশীলতা এইডস, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো ভয়াবহ ব্যধি বিশ্ব জুড়ে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে। এ অবস্থায় এ সবের উৎপাদন, প্রস্তুত ও ব্যবহারকে সীমিত করেই কেবল এর গতিরোধ করা সম্ভব নয়। এ সঙ্গে প্রয়োজন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করণ। কারণ, দেশে প্রচলিত আইনের ভয় ও অন্য কোন ভয়-ভীতির চেয়ে আল্লাহ্র ভয়ই পারে একজন মানুষকে সুস্থ ও সংযত জীবন-যাপনে অভ্যস্থ করে তুলতে। বিশ্বজুড়ে তরুণ ও যুবসমাজের একটা অংশের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এরজন্যে সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধ:পতনকে দায়ী করার অবকাশ আছে। ধর্মীয় মূল্যেবোধই কেবল এ অবস্থার হাত থেকে তরুণ ও যুবসমাজকে রক্ষা করতে পারে। নেশামুক্ত, সুস্থ ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা আজ স্ব-প্রমাণিত।

ঞ. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা (Illiteracy and Ignorance) যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে অন্তরায়। বিভিন্ন অনুসন্ধানেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা অধিক উৎপাদনক্ষম হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। অন্যদিকে নিরক্ষরলোকেরা কম উৎপাদনক্ষমতার কারণে অর্থনেতিক অগ্রগতিতে কম অবদান রাখে। রাশিয়ার গবেষক স্টুমিলিন এক গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে, মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ স্বাক্ষরতা শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় মাত্র ১২ থেকে ১৬ শতাংশ।[৪৩] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা শুধু মানবসম্পদকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে অন্তরায় নয়, এর সাথে সাথে উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে এবং

ধ্যানধারণা ও যোগ্যতা অর্জনে বাধা দেয়। এছাড়া এখানে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনগণের সংশ্লিষ্টতা কম থেকে যাচ্ছে। এমনকি গ্রামের ঐতিহ্যমুখী অজ্ঞ-নিরক্ষর নেতৃত্বও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে মরাত্মক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।[৪৪] নিরক্ষরতা অজ্ঞতাপ্রসূত গতানুগতিকতা, অদৃষ্টবাদিতা স্বচ্ছ জীবনবোধের ঘাটতি জনগণকে কর্মোদ্যোমী না করে শ্রম ও সম্পদের অপচয় ঘটাতে সহায়তা করে এবং উন্নয়নবিমুখ করে। এতে মানুষ সীমিত প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে অনুভব উপলব্ধি করে কম, কিংবা সাথে উৎপাদন কৌশলের কোন সম্পর্ক খুজেঁ পায় না আবার সম্পদ অর্জনও করতে পারে না। [৪৫] নিয়তিবাদী মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝে নিজের অসাহয়ত্বে নিজেকে কর্মহীন ভাবতে শেখে ও সর্বক্ষেত্রে ভাগ্য আর আল্লাহর উপর অযৌক্তিক নির্ভরশীলতার দায়িত্বহীন হয়ে উঠে।[৪৬] গতানুগতিকতা সামাজিক পরিবর্তনকে কিভাবে ব্যাহত করে এর ব্যাখ্যায় ফাষ্টার বলেন,[৪৭]

æ Societies where the positive structures against being templed by novlty are strong where aphorisms and maxims are quoted to validate tradition and where the critics havn's the would-be-innovator-a fertile field for a broad program of social change does not exist.”

৪৩। S. G. Strumilin, The Economic significance of People's Education (1924). উদ্বৃত : UNESCO Seminar Report, (Bankok : April, 1964), P. 347

৪৪। Gunner Myrdal, Beyond the welfare state (New Heven: Yale University Press 1960), P. 207

৪৫। George Forster Peasant Society and the image al-limited good, American Anthropologist, Vol. 67, No. 2, PP. 293-294

৪৬। E. L. Banfield, The Moral Basis of a Bank ward Society, (New York: The free press Illinois, 1958), P. 114

৪৭। G. Foster, Traditional culture and Impact of Technological change (New York: Harper and Brothers Publishers, 1962), P. 171

আবার অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার কারনেই বাংলাদেশের জনগণ নিজের সমস্যা মুকাবিলায় নিজের উদাসীন হয়ে সকল ব্যাপারেই সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে বা দাবী তুলে থাকে।

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সমাজ জীবনে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থা ও সমস্যার জন্যেও দায়ী। এর জন্যে জনগনের বৃহৎ অংশ আজ অদক্ষ জনশক্তি হয়ে আছে। অদক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান হয়না বলে বেকরত্ব ও নির্ভরশীলতা বাড়ে। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার জন্যেই জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অদৃষ্টবাদিতা, গোড়ামী ও কুসংস্কার দেখা দেয়, যার পরিণতিতে

দারিদ্র ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, অসাম্য, নারীনির্যাতন ও সামাজিক অনাচার ইত্যাদি বেড়ে উঠে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পরিবার সমাজ জীবনে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা শুধু সামাজিক সমস্যাই নয়, অনেক সামাজিক সমস্যার প্রত্যক্ষ কারণ। বাংলাদেশে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা মুকাবিলার কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো-

১. ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ

এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। ইসলাম প্রতিটি মুসলিমের উপর জ্ঞানর্জন করা ফরজ ঘোষণা করেছে। জ্ঞানর্জনের মাধ্যমেই একজন মুসলিম নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। সুতরাং জ্ঞানার্জন একজন মুসলিমের জন্যে অতি আবশ্যক। অবশ্যকতার এ অনুভূতি যদি সকল মুসলিম হৃদয়ে আন্দোলিত হয়, তবে এদেশ অতি সহজেই নিরক্ষতা ও অজ্ঞতার অবিশাপ থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পারবে। এদেশে যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছেন, তাদের প্রতিটি ধর্মেই বিদ্যার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মূলত বিদ্যার্জন ব্যতীত নিজ ধর্ম পালন করা সম্ভব নয়। তাই স্ব-ধর্মীয় আদেশ হিসেবে সবাই বিদ্যার্জনে আগ্রহী হলে এ দেশ হবে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অভিশাপ হতে মুক্ত। সকলেই হবে স্বাবলম্বী উন্নত জীবন-যাপনের অধিকারী।

২. প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন

বাংলাদেশে সরকার ১৯৯১ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষনা করেছে বটে: কিন্তু সীমাবদ্ধতার কারণে যেমন: সম্পদের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু শিক্ষা প্রশাসন সংকট, প্রাথমিক শিক্ষার দক্ষ শিক্ষক সংকট, সুষ্ঠু পরিকল্পনার আইন ও আয়োজনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করণের অপারগতা ইত্যাদির ফলে তা ১০০ ভাগ সফল করা যাচ্ছে না।

এ ক্ষেত্রে সরকারকে সুষ্ঠু শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে, যেসব দারিদ্র পরিবার ছেলেমেয়েদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে সেসব ছেলেমেয়েদের সুবিধার প্রতি নজর দিয়ে কর্মসূচি নির্ধারণ প্রয়োজনে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে, দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণের আরো ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরদিকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সচেতনতা বা দায়িত্ববোধের গরজ সৃষ্টি হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, জাতি যত শিক্ষিত হবে তাদের জীবনমান ততটা উন্নত হবে।

৩. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষানীতি প্রনয়ন

যে কোনো দেশের শিক্ষানীতি সে দেশের জনগণের ইতিহাস ঐতিহ্য চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এর সুফল লাভ সহজতর হয় কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য

আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা নীতি প্রনীত হয়নি। বৃটিশ সরকার এদেশ দখল করার পর এ উপমহাদেশে শত শত বছর ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েক করে। তাদের এ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল, "সমাজে এমন একটি শ্রেণী তৈরী করা যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হবে। এ নতুন শিক্ষানীতি গুটিকয়েক দোভাষী মার্কা" (ইংরেজি জানা লোক) আজ্ঞাবহ কর্ম তৈরি করে মূলত বৃটিশ আমলে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংকুচিত করে রাখে। পাকিস্তান আমলে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশন (১৯৫৯) হোসেন কমিশন (১৯৬৩), বাংলাদেশ আমলে গঠিত খুদরতই-ই-খুদা কমিশন (১৯৭৪), জাকির কমিশন (১৯৭৮), মফিজ কমিশন (১৯৮৭) সহ অন্যান্য কমিশনের রিপোট এ দেশেই ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি বিধায় এ দেশের মানুষ তা মেনে নেয়নি।

বর্তমানে আমাদের দেশে দুধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে একটি হলো মাদ্রাসা শিক্ষা অপরটি আধুনিক শিক্ষা। মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্ররা ধর্মীয় বিধি-বিধান ভালভাবে জানলেও বর্তমান পৃথিবীর আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে । অপরদিকে আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত ছাত্ররা প্রচলিত দুনিয়ার ভালমন্দ অনেক কিছু জানলেও প্রকৃত মু'মিন হয়ে জীবন-যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করে না। এ দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে চিন্তা ও আদর্শ গত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করছে। ফলে এ দেশের বিপর্যয় অনিবার্য। এই সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের ইতিহাসঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একই একক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েক করা একান্ত অপরিহার্য। এর মাধ্যমে জাতি বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে, পাবে মানুষের মত মানুষ হবার শিক্ষা ব্যবস্থা, উৎসাহিত হবে এ আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। ফলে দেশ হবে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতামুক্ত হবার পথে ধাবমান। জাতির জীবন হবে উন্নততর।

৪. মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম চালুকরণ

দেশকে নিরক্ষর ও অজ্ঞতামুক্ত করতে হলে শুধু নবাগত নতুন প্রজন্ম থেকে শিক্ষিত করে তুললেই হবে না। যে সমস্ত বয়স্ক পুরুষ নারী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদেরকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে মসজিদ ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম অনন্য অবদান রাখতে পারে। এ দেশের শহরগুলো ছাড়াও প্রতিটি গ্রামে রয়েছে এক বা একাধিক মসজিদ। এ সকল সমজিদকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের রেজিষ্ট্রেরী প্রদান করে ইমাম মুয়াজ্জিন

সাহেবদের মাসিক কিছু ভ্রাতা প্রদান করলে এ কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

৫. শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য মর্কসূচী জোরদার করণ

বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করেছেন। এর ফলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ কমসূচি আরো ফলপ্রসূ করার জন্যে প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম আরো জোরদার করা উচিত।

৬. শিক্ষার ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করা

বাংলাদেশে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হলে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত, "উন্নয়নশীল-দেশসমূহে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ" শীর্ষক এক পুস্তিকায় শিক্ষাখাতে কম বরাদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক সেজন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোয় উচ্চশিক্ষার সরকারী ব্যয় পরিশোধ করা এবং সর্বোচ্চ সুফলের লক্ষ্যে সরকারী ব্যয় পুন:বরাদ্দের ন্যায় কতিপয় সুপাবিশ করেছে । এতে শিক্ষার জন্যে ঋণ দান, উচ্চ শিক্ষার জন্য বাছাই, জনশিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণ এবং সরকারী ও কমিউনিটি অর্থনুকুল্যে পরিচালিত স্কুলের প্রসারকে উৎসাহদানের কথা বলা হয়েছে।[৪৮]

এছাড়া বেতন মওকুফ বৃত্তি বাড়ানো, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পুরোনো বিদ্যালয় সংস্কার, শিক্ষা সামগ্রীর পর্যাপ্ত প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা-সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পোষাক-পরিচ্ছদ ও বই-পুস্তক প্রদান ইত্যাদির জাতীয় ভিত্তিক পদক্ষেপের জন্যে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। আর এক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা হ্রাস পাবে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

৪৮। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা: ১৪ আগষ্ট, ২০০৩

৫. শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসও দুর্নীতি উচ্ছেদ

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহের সাথে "সন্ত্রাস ও দুর্নীতি" শব্দদ্বয় ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এ সন্ত্রাসের শিকার হয়ে এ যাবত প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য ছাত্র। যথেষ্ট চলেছে যা পত্র-পাত্রিকার মাধ্যমে প্রায়শই জানা যায়। এ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দেশকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা মুক্ত করনের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত করলে মানুষ শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। জ্ঞানার্জনে হবে উৎসাহী। ফলে দেশ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণের পথে অগ্রসর হবে।

৬. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কারণে অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ যুবক/যুবতি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে সম্মানজনক কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে হতাশায় প্রহর গুনছেন। বাংলাদেশের এ বিপুল জনসংখ্যাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিনত করে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নে সমৃদ্ধ করা খুব কঠিন কাজ নয়। আমাদের কর্মসংস্থানের অভাবে আমাদের দক্ষ মানব সম্পদ বিদেশে যেয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের এ বিপুল জনসংখ্যা দক্ষজনসম্পদে পরিণত হলে দেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে সহজেই।

ট. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদ প্রথা রহিতকরণ

সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সুদের ক্ষতিকর দিক কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। সুদের এ মহাবিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা দেশে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণও শিউরে উঠেছেন। সুদের ইতিহাসই স্বাস্থ্য দেয় মানুষের স্বার্থপরতার কারণে সুদের প্রচলন হয়েছে। সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিচার বিবেচনা, আচার-আচারণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সুদ-খায় তাদের মধ্যে ক্রমে স্বার্থপরতা লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, তারা সমাজে অন্যান্য লোকের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটা সামনে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া -মমতা, মহানুভূতি, মহমর্মিতা অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সমাজে সুদ দিতে না পারলে মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্যে জরুরী ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় সুদী সমাজে সুদই যাবতীয় আর্থিক লেন-দেন ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। যারা সুদ দিতে সক্ষম তাদের জন্যে মহাজন এবং মহাজনদের দ্বারা গঠিত ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু যারা সুদ দিতে অক্ষম তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা, মৌখিক মহানুভূতিটুকু দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়। ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "এ ধরনের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থ লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।" [৪৯]

সুদ আর্থ-সামাজিক শোষনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। স্বল্পঋণ গ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতারা স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়।

সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবনযাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনী শ্রেনী আরো ধনী হয়। পরিণামে সমাজে সামাজিক শ্রেনী বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্থ মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপানশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোদের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে করয়ে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনশীল খাতে ও বিনা সুদে ঋণ মিলে না। বোঝার উপর শাকের আটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে আরো ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে ধনী আরো ধনী হয়। আর ক্রমে ক্রমে নি:শেষ হয়ে যায় দরিদ্র।

সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকের ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এ ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত ফসল না হওয়া সব সময়ই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেও না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋনের সংস্থানে বের হতে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা তা বন্ধক রেখে সুদ আসলসহ শুধতে হয়। তা না হলে কি মহাজন, কি ব্যাংক সকললেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নয়।

৪৯। Dr. Anwer Iqbal Quraishi, ***Islam and the Theary of Interest*** (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh 1987), P. 148

উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সুদ পুঁজিবাদী শোষণ, বৈষম্য ও জুলুমের প্রধান হাতিয়ার। সুদ অর্থনৈতিক গতিকে শ্লথ করে দেয়। অর্থ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ফটকা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয় 'সুদ প্রথা চালু রেখে আমাদের কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের যত রকম পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন সুদ প্রথা বহাল রেখে তা সম্ভব নয়। কেননা, সুদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এজন্যেই পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ

সুদের বিরুদ্ধে কড়া হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা হতে সুদ প্রথা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এ সব আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সুদের বিপরীতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা

সুদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হলে ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। অবশ্য ১৯৬৩ সালে মিশরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকের বিস্ময়কর সুফল, বিশ্বের সকল মুসলিম ও অমুসলিম দেশকে ইসলামী লেন-দেন ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। যার ফলশ্রুতিতে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে নব্বই এর দশক পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ১৫৩ টি ব্যাংক এর দশ সহস্রাধিকের মতো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. করযে হাসানা ও মুদারাবাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা : সমাজের বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থান কিংবা পুর্নবাসনের ব্যবস্থা স্বরূপ তাদের জন্যে 'করযে হাসানা' শুধু মাত্র মূলধন ফেরত দেয়ার শর্তে ঋণ এবং মুদারাবা পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৩. ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা : বাস্তব জীবনে ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতির উপর সম্যক জ্ঞান লাভের জন্যে ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচির অন্তভুক্ত করা ।

৪. ইসলামী অর্থনীর বিভিন্ন শাখাতে সম্মান শ্রেনীর স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপান্তরিত করে শিক্ষাথীদের গভীরভাবে ইসলামী অর্থনীতি বোঝার সুযোগ প্রদান করা।

৫. ইসলামী অর্থনীতির সুপ্ত বিষয়াবলীকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ বিষয়ে গবেষনার সুযোগ করে দয়।

৬. গণসচেনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা : এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । যেমন ঃ

ক. প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে

খ. লেখনীর মাধ্যমে

গ. জুম'আর মসজিদে খতীবের মাধ্যমে

ঘ. গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকগণের মাধ্যমে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে।

ঠ. কৃষির উন্নয়ণ

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে।[৫০] কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য কৃষি নির্ভর এ দেশের শতকরা প্রায় ৬০ জন কৃষকই ভূমিহীন।[৫১]

ফলে এ ৬০ ভাগ কৃষকই দরিদ্র। আর সর্বমোট কৃষকের সংখ্যা আরো বেশী। বলতে গেলে বাংলাদেশের যে ৫ কোটি লোক দরিদ্র, তাদের অধিকাংশ কৃষক। সুতরাং এদেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে হলে কৃষির উন্নয়ন তথা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষকের আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষাবাদের প্রশিক্ষণ দান, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ শুরু, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কৃষকদের শিক্ষিত করণ, সুদমুক্ত সহজলভ্য কৃষি ঋণ বিতরণ, সুলভ মূল্যে উন্নত বীজ ও সারের প্রপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

ড. প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশ। তবে দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নিম্নরূপ।

ক. জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত (বছরে গড়ে ২০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়) [৫২]

খ. মৃত্তিকা ও তার উর্বরাশক্তি

গ. নদ-নদী (ছোট-বড় প্রায় ২৩০টি) [৫৩]

ঘ. বনজ সম্পদ (মোট ভূ-ভাগের প্রায় ৯.৩ শতাংশ) [৫৪]

ঙ. কৃষি সম্পদ (দেশীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ) [৫৫]

চ. খনিজ সম্পদ (কয়লা, তৈল, গ্যাস, চনা পাথর, চীনামাটি, গন্ধক, কঠিন শীলা, সিলিকা, বালু, তামা, লবণ, সাদা মাটি, অন্যান্য খনিজ পদার্থ আত্যাদি।

ছ. প্রাণিজ সম্পদ (মাংস = বছরে ৩ লাখ ২৬ হাজার মে. চন) [৫৬]
(ডিম = বছরে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ পিছ) [৫৭] (দুগ্ধজাত দ্রব্য = অপর্যাপ্ত)

জ. মৎস সম্পদ (বছরে ৪৫ হাজার টন ধরা পড়ে) [৫৮]

ঝ. মানব সম্পদ (বিপুল পরিমাণ শিক্ষিত প্রশিক্ষিত জনশক্তি)

৫০। প্রফেসর মু: মঞ্জুর আলীখান আ.স.ম সালাউদ্দীন, মু. কামরুল ইসলাম, ***বাংলাদেশের অর্থনীতি*** (ঢাকা : হাসান বুক হাউজ, ২০০১ ইং) পৃ: ২০৮।
৫১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৫৩। প্রাগুক্ত, ৯১
৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ, কিন্তু এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। দেশটির দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক।

ঢ. অবচয়রোধ

Dhaka University Institutional Repository

অপচয় দারিদ্রের অন্যতম হাতিয়ার। এ অপচয় ব্যক্তিগতভাবেও হতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবেও হতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে সীমাহীন অপচয় ধনী ব্যক্তিকেও দারিদ্রের কাতারে শামিল করে দেয়। রাষ্ট্রীয় অপচয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বড় বাধা। সরকারী আমলাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপরিমিত ব্যয় দেশের উন্নয়নের ধারাকে সকল আমলা, কর্মকর্তা, কর্মচারী যদি দেশের দারিদ্র জনগোষ্ঠির অবস্থার উন্নয়নে আন্তরিক হয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদ অপচয় না করে বরং যথাযথভাবে (তাকওয়ার ভিত্তিতে) ব্যয় করেন, তবে তা দেশের দারিদ্র বিমোচনের অনেকখানি সহায়ক হবে।

ণ. ভোগ-বিলাসের অপনোদন

আমাদের দেশের ধনীশ্রেনী ভোগ বিলাসের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অপচয় করে থাকেন, তা যদি দারিদ্র্যের মাঝে বিতরণ করা হতো, তবে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো না। এ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যবধান, তা উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভোগ বিলাসের ঠেলে দেয়। বেসরকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মচারীদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, তা উচ্চ শ্রেনীর কর্মচারীদেরকে ভোগ-বিলাসে দারুনভাবে উৎসাহিত করে। দেশের প্রচলিত এ ব্যবধানকে কমিয়ে এনে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে যদি আরো বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা যায় বা নিম্নশ্রেনীর কর্মচারীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটান যায়, তবে তা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

ত. যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করণ

দারিদ্র্য বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। বিশ্বের চলমান পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এ সমস্যার সমাধনে শুধু ব্যর্থই হয়নি বরং সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলছে। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ মহানবী (স) এর শিক্ষা এবং আদশ্যই সর্বকালের দরিদ্র নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। দারিদ্র বিমোচনে রাসূলের আনীত আদর্শের মধ্যে 'যাকাত' অন্যতম। এ যাকাত শুধু আমাদের শরীআতে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যম নয়, বরং তা পূর্ববর্তী উম্মতের শরী'আতেও দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার ছিল। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রের দারিদ্র্য বিমোচনের নিশ্চিত গ্যারান্টি। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এ দেশের অধিকাংশেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্যের নির্মম কাষাঘাতে জর্জরিত। মুসলিম দেশ-হিসেবে এ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সকল ধনীব্যক্তিরা যাকাত দানের আওতায় এলে দু-এক বছরের মধ্যেই এ দেশ থেকে দারিদ্রতা দূরীভূত হত অনায়েসেই। বর্তমানে বাংলাদেশে 'যাকাত বোর্ড' নামে একটি বোর্ড থাকলেও তা আল্লাহ ঘোষিত যাকাতের ফরদিয়াতকে নফলিয়াতে রূপান্তিত করছে। যদি উক্ত বোর্ডকে শরীআহ দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার সাধন করে সৎ ও যোগ্য লোকের মাধ্যমে যাকাত নির্ধারণ, উত্তোলন, বন্টন, পরিকল্পনা প্রনয়ন, সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আন্তরিক পৃষ্ঠপোষণ এবং সহায়ক পদক্ষেপ সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয়, তবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এদেশে দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

থ. সর্বপরি আল্লাহর আনুগত্য

কুর'আন হাদীস থেকে জানা যায় এবং প্রতিটি মুসলমানই একথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা। তিনিই সকলের রিযিক সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন। কেননা, তিনি শুধু খালিক বা স্রষ্টাই নন বরং রব বা প্রতিপালকও মানুষ জন্মগত দিক থেকেই তাঁর দাস। তার দেহের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গই স্রষ্টার নির্দেশ মেনে চলে। চুখ দেখে কান শুনে, মগজ চিন্তা করে, পা চলে, হাত কাজ এবং দেহের সকল যন্ত্রই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, দেহের রক্ত চলাচল, খাদ্য গ্রহণ ও থেকে সার শরীরে শোষণ করে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত নিপুণতার সাথেই করা হচ্ছে। দেহ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের এসব কাজে মানুষের হস্তক্ষেপ করার কোনই ক্ষমতা নেই। বরং দেহ যন্ত্রের জন্যে স্রষ্টা যেসব নিয়ম কানুন বেধে দিয়েছে তা মেনে চলাই স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র উপায়। মানুষ যদি নিজের দেহের কর্তৃত্ব দাবী করে এবং আল্লাহ প্রবর্তিত দেহ যন্ত্রের নিয়মকানুনের হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়, তাহলে তার দেহে রোগ সৃষ্টি হবে। এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই সুস্থ জীবন যাপনের একমাত্র পথ হচ্ছে মানবদেহের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধান ও নিয়ম কানুন মেনে চলা।

হযরত আদম (আ.) এর যুগ থেকেই আল্লাহর এ নিয়ম চলে আসছে। যারা আল্লাহ তা'আলার আইন-কানুন মেনে চলে তাঁর অধীন হয়ে জীবন যাপন করে এবং আল্লাহ্র নাফরমানী চেড়ে দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। তাদের সকল প্রকারের দুঃখ কষ্ট ও অভাব-অভিযোগ থেকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই মুক্ত রাখেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন ঃ

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين -

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বিপুল পরাক্রমশালী রিজিকদাতা"[৫৯]

এবং তিনি আরো বলেছেন ঃ

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب

"যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যে যে কোন উৎস থেকে রিযিকের সংস্থান করে দেন যে, সে ঐ উৎস সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না।" [৬০]

৫৯। আল-কুর'আন, ৫১:৫৮

৬০। আল-কুর'আন, ৬৫: ২-৩

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض -

"জনপদবাসী যদি ঈমান আনে ও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে চলে তাহলে আসমান যমীনের বরকত সমূহ খুলে দেখা হবে। [৬১]

Dhaka University Institutional Repository

এসব আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করে যারা চলে তাদের সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করা এবং রিযিক সরবরাহ করা স্বয়ং আল্লাহরই দায়িত্ব। সুতরাং আল্লাহভীতির পথ অবলম্বই হচ্ছে আমাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ। এখন প্রশ্ন হতে পারে; তাহলে আমরা কি নিজেরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে বসে থাকবো ? আর এভাবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলে কি আল্লাহ আমাদের সমস্যাবলী সমাধান করে দিবেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং কুর'আন হাদীসের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের অসংখ্য উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট বিবেচনা করবে না; বরং তার চেষ্টা-তদবির আল্লাহর মঞ্জরী লাভ করলেই তা সফল হতে পারে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে।

এ বিশ্বাসের ফলাফল কি ? সমস্যা সমাধানের যাবতীয় চেষ্টা তদবির করার জন্যে মানুষ উপায়-পন্থা অবলম্বন করার সময় আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করবে না। সকল চেষ্টা-তদবির যদি তার আনুগত্যের সীমায় গন্ডীবদ্ধ থাকে, তাহলেই তিনি এসব প্রকল্পে সফলতা দান করতে পারেন। এটা ভাবাবেগপূর্ণ কথা নয়, বরং এটাই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। সূরা তালাকের পূর্বোল্লিখিত আয়াতে একথাই স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আমরা মুসলমান, আমাদের সকল বিষয়েই আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। আমরা অন্য কোন জাতির অন্ধ অনুকরণ করতে পারি না। আমরা যত দিন পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবো ততদিন মুসলমান হিসেবেই বেঁচে থাকবো এবং যখন মৃত্যুবরণ করবো, তখন মুসলমান হিসেবেই মরবো। যদি এটাই আমাদের জীবনে লক্ষ্য হয় তাহলে ব্যক্তি জীবন হোক অথবা পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন হোক অথবা সাংস্কৃতিক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা হোক অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। যদি এভাবে আমরা চেষ্টা যত্ন চালিয়ে যাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান লাভ করা যেতে পারে। অন্যথায় সমস্যাকে জটিল করে তোলা ছাড়া কিছুই করা সম্ভব হবে না।

৬১। আল-কুর'আন, ৭: ৯৬

উপসংহার

মানব জাতির হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান অবতীর্ণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, তা অনেকের কাছে মনে হতে পারে–

Dhaka University Institutional Repository

এটি একটি সেকেলে ধর্ম যা বহু শতাব্দী পূর্বের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তার যথার্থতা থাকলেও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার সময়ে তার বাস্তবতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবতা এটাই, সৃষ্টির জন্য যা চিরকল্যাণকর সৃষ্টিকর্তার চেয়ে ভাল জানার কেউ নেই। স্রষ্টার বিধান মানব জাতির দিক দর্শন, গাইডবুক হিসেবে সৃষ্টির প্রতি বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ বিশেষ। ইসলাম সেকাল বা একালের ধর্ম নয়, এটি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার ধারাবাহিক রিসালাতের পরিপূর্ণতা পাওয়া জীবন ব্যবস্থা যা সর্বকালের ও সর্বযুগের মানব জাতির জন্য উপস্থাপিত সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। ইসলামে পরিবার গঠন, পরিবার গঠন ব্যবস্থাপনা এত সুস্পষ্ট যে, এর খুঁটিনাটি বিষয়াবলীরও আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সমাধান এখানে স্থান পেয়েছে। ইসলাম মানবতার ধর্ম । মানব কল্যাণের ধর্ম। ইসলামের পারিবারিক নীতি, ব্যবস্থাপনা, গঠন প্রক্রিয়া এর বাইরে নয়। ইসলামে যে পারিবারিক নীতির সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এক অনুপম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা-ই এ অভিসন্দর্ভে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমেই পরিবারের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরিবার সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পরিবার বিরোধী আধনিক যুক্তিধারার বাস্তবসম্মত জবাব দানের পাশাপাশি পরিবারের বৈশিষ্ট্য শ্রেনীবিন্যাসের বর্ণনার আলোকপাত করা হয়েছে। পরিবার গঠনের মৌলিক উপাদান বিয়ে। বিয়ের গঠন প্রক্রিয়া, বিয়ের উদ্দেশ্য, বিয়ে সম্পাদনসহ পরিবারের এ অবকাঠামোগত দিকগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে।

মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র হচ্ছে সুশৃংখল, বৈধ ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক সূত্রে গাঁথা পূত-পবিত্র পারিবারিক জীবন। মানব বংশের সম্প্রসারণ, নারী-পুরুষের যৈবিক চাহিদা পূরণ, মানব সভ্যতার লালন, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, মানব সন্তানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, তাহ্যীব-তামাদ্দুন, বিবেক-বুদ্ধির উন্নয়ন, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন পরিবার ভিন্ন অন্য কোন অবকাঠামো বা সংস্থার মাধ্যমে সম্ভব নয়, বিধায় অত্র অভিসন্দর্ভে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে প্রামাণ্য দলীল ও ক্ষুরধার যুক্তির নিরিখে।

বিয়ে বা নারী-পুরুষের এ যুগল বন্ধন যেন বিশ্ব প্রকৃতির শাশ্বত রূপ। পরিবার গঠন প্রক্রিয়ার এ অমোঘ বিধি শুধু যে শ্রেষ্টজীব মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়; বিশ্ব প্রকৃতির সকল জীবের মধ্যে এ নিয়ম সমভাবে প্রতিফলিত । এ পুত-পবিত্র বন্ধনের ফলে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় নিষ্কলুষ অন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম-ভালবাসা এবং আবেগ উদ্দীপ্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। তাদের মধ্যে অর্পিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যা অত্র অভিসন্দর্ভে স্থান পেয়েছে কুর'আন হাদীসের দলীল সাপেক্ষে অত্যন্ত বলিষ্টতার সাথে।

আমাদের দেশসহ গোটা বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণকে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে রূপ দেয়া হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীদের যুক্তিসমূহ (যেমন-ভূমি সংকট, খাদ্য সংকট, দাম্পত্য সুখ-সাচ্ছন্ধে অসুন্তুষ্টি ইত্যাদি) আজ আসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে একে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র বলে অবিহিত করেছেন। ইসলাম ঢালাওভাবে এ জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে সমর্থন করেনা। তবে আল্লাহ পাকের প্রতিপালন ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা ও কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ ব্যতীত একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ তথা স্ত্রী সন্তানের স্বাস্থ্য, স্তন্যদান, সুষ্ঠু প্রতিপালনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ প্রয়োজনে 'আযল বা তদ্রুপ অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বৈধ করেছে। দারিদ্র্য শুধু বাংলাদেশে নয়, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশ্বের চলমান পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এ সমস্যা সমাধানে শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সা.)-এর আনীত "সুদ মুক্ত, যাকাত ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার" বাস্তবায়ন এবং সহায়ক পদক্ষেপসমূহ (যেমন-দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ দান, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সম্ভাবনাময়ী শিল্পসমূহের বিকাশ সাধন, ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক, কর্মমুখী, কারিগরি শিক্ষা চালু, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, কাঙ্খিত পরিবেশে নারীদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি) গ্রহণের মাধ্যমে এদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধানকল্পে কতিপয় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ যেমন- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণতকরণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উৎপাদন ও রপ্তানী বহুমুখী করণ। প্রাকৃতিক সম্পদের বহুমুখী

ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন, যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রমিক রপ্তানি ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অপরাধ ও দুর্নীতিকে বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে ইসলাম 'প্রতিকার' ও 'প্রতিরোধ' মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সমাজে অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার বা তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়ার উপর সর্বাধিক গুরুতারোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী বিধানের পূর্ণ অনুসরণ, তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির লালন এবং পরকালমুখী জীবন গঠনের আহবান জানানো হয়েছে। মহাবিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অর্থনৈতিক, ও সামজিক জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যে ঐশী-বিধান অবতীর্ণ করেছেন। মানুষ সে বিধানকে বাদ দিয়ে যখন নিজেস্ব চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ দ্বারা অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে শুরু করেছে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কালের আবর্তনের সাথে সাথে সে সমস্যা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষকে সকল মতাদর্শ পায়ে দলে আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে ফিরে আসতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশসহ এ অশান্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে শান্তির ফল্গুধারা।

মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের পারিবারিক ও অর্থ-সামাজিক সমস্যা আমাদেরই সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে আমাদের দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের পারিবারিক ও অর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে যে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা ও দিক -নির্দেশনা প্রদান করেছে, তারই আলোকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে– এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গিকার। মহান আল্লাহ্ আমাদের সাহায়তা দান করুন। আমিন!

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুর'আনুল কারীম ঃ

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখ্‌শারী ঃ আল কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযীল, *তাফসীরে কাশ্‌শাফ,* বৈরুত: দারুল মা'রিফাত, তা.বি

কাযী নাসীরুদ্দীন আবু সা'ঈদ উমর ঃ আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল

Dhaka University Institutional Repository

আল বায়যাবী : ***তাফসীরে বায়যাবী***, ইউ.পি, দারুল ফিরাস লিন নাশর, তা.বি।

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসীর ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ***তাফসীরে ইবনে কাসীর,*** পেশাওয়ার ঃ মাকতাবাতু হাককানিয়া, ১৯৯২

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী ঃ মাফাতিহুল গায়ব, ***তাফসীরে কাবীর,*** মাকবাতু আলামিন ইসলামিয়া, ১৪১৩ হি.।

আল্লামা মাহমুদ আল আলুসী ঃ ***তাফসীরে রুহুল মা'আনী***, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৫।

শায়খ কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ্ শাওকানী ঃ ***তাফসীরে ফাতহুল কাদীর***, বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, তা.বি.।

ঃ ***নায়লুল আওতার***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৮৩।

আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপতী ঃ ***তাফসীরে মাযহারী***, কোয়েটাঃ মাকতাবাতু রাশীদিয়া, তা.বি.।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল কুরতুবী ঃ ***আল জামিউল আহকামিল কুরআন***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি.।

আবূ বকর আল জাস্‌সাস ঃ ***আহকামুল কুর'আন,*** লাহোর ঃ সুহায়েল একাডেমি, ১৯৯১।

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ ***তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন,*** অনুঃ মাওঃ মহীউদ্দিন খান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মাহেল্লী ঃ **তাফসীরুল জালালাইন,** দেওবন্দঃ মিরকাত মুখতার, তা.বি।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল ফারা আল বাগাবী ঃ ***মা'আনিমুত তানযীল,*** বৈরুতঃ মাকতাবাতুল ইলম, তা.বি.।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী ঃ ***জামিউল বয়ান ফী তাবীলিল কুরআন তাফসীরুত্ তাবারী***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি.।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ ঃ ***ফী যিলালিল কুরআন***, অনুবাদ হাফেজ মুনীরউদ্দীন আহমাদ, লন্ডনঃ আল কুরআন একাডেমী, ১৯৯৮।

আল্লামা জামালুদ্দীন আল কাসেমী ঃ ***মাহাসিনুত তাবীল***, বৈরুতঃ বঙ্গানুবাদঃ বায়ানুল কুরআন, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৮৯।

ইবনুল আরাবী ঃ ***আহকামুল কুর'আন***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি.।

আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল বাগদাদী ঃ ***তাফসীরুল খাযেন***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি.।

মুহাম্মদ আলী আস্ সাবূনী ঃ ***সাফাওয়াতুত তাফাসীর***, তেহরানঃ দারুল ইহসান,

তা.বি.।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী ঃ ***সহীহুল বুখারী***, বৈরুত: দারুল ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, ১৯৯২ ইং।

ঃ ***আল- আদাবুল মুফরাদ***, ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, তা.বি.।

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ ***সহীহ মুসলিম***, দেওবন্দঃ শিরকাত মুখতার, ১৯৮৬।

আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস ঃ ***সুনানে আবূ দাউদ***, দিল্লীঃ মাকতাবা রশীদিয়া, তা.বি.।

আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্ তিরমিযী ঃ ***জামিউত তিরমিযী***, দিল্লীঃ মাকতাবা রশীদিয়া, তা.বি.।

আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী ঃ ***সুনানে নাসায়ী***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯৫।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ ঃ ***সুনানে ইবনে মাজাহ***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি.।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস ঃ ***আল মুয়াত্তা***, দেওবন্দঃ শিরকাত মুখতার, তা.বি.।

ইমাম আলী ইবনে উমার ইব্ন আহমাদ দারে কুতনী ঃ ***সুনানে দারে কুতনী***, বৈরুতঃ দারু ইহউয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, তা.বি.।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্ দারেমী ঃ ***সুনানুদ দারেমী***, করাচীঃ কাদীমী কুতবখানা, তা.বি.।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল ঃ ***আল মুসনাদ***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তা.বি.।

শায়খ ওয়ালীউদ্দীন ঃ ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

হাফিজ আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার আল আসকালানী ঃ ***ফতহুল বারী***, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.।

ঃ ***বুলুগুল মারাম***, ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, তা.বি.।

আল্লামা বদরুদ্দীন ‘আইনী ঃ ***উমদাতুল কারী***, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.।

আল্লামা সান‘আনী কাহলানী ঃ ***সুবুলুস সালাম***, মিসরঃ মাকতাবাতু মুসতাফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩ হি.।

মহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া আন্ নববী ঃ ***শারহে মুসলিম***, দেওবন্দঃ শিরকাত মুখতার, তা.বি.।

ঃ ***শরহে মুসলিম***, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, ১৩৯২ হিঃ।

আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী ঃ ***শু‘আবুল ঈমান***, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৯০।

ঃ ***আস সুনানুল কুবরা***, মক্কাঃ মাকতাবাতু দারুল বায, ১৯৯৪।

আবূ সুলায়মান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ঃ ***মা‘আলিমুস সুনান***, হালাবঃ আল মাতবাউল ইলমিয়াহ,

আল খাত্তাবী তা.বি.।

আবুল কাসিম আত্ তিববানী ঃ *আল মু'জামুল আওসাত*, কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.।

আবদুর রউফ আল-মানাভী ঃ *ফায়যুল কাদীর*, মিসরঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

ইউসুফ ইব্‌ন মুসা আল হানাফী ঃ *মু'তাসারুল মুখতাসার*, বৈরুতঃ দারুল কুতুব, তা.বি.।

আল্লামা সুয়ূতী ঃ *আল জাবিউস সাগীর*, জিদ্দাঃ দারু তায়েরুল ইলম, তা.বি.।

সুলাইমান বিন আহমদ আত্ বিববানী ঃ *আল মুজামুল কাবীর*, মাউসুলঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৩।

আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী ঃ *শারহু মা'আনিল আসার*, দামিস্কঃ দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৮৮ ইং।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ঃ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, দিল্লীঃ রাশিদীয়া কুতুবখানা, ১৩৭৩ হি.।

শায়খ আবদুল হক দেহলভী ঃ *মুকাদ্দমা*, কানপুরঃ মাতবাউল মাজিদী, তা.বি.।

শামসুদ্দীন দাউদী ঃ *তাবাকাতুল মুফাসসীরিন*, কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহাবা, ১৩৯২/১৯৭২।

আলাউদ্দিন হিন্দি ঃ *কানযুল উম্মাল*, বৈরুতঃ মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪০৫/১৯৮৫।

মুহাম্মদ নাসিরউদ্দীন আলবানী ঃ *আল্-হাদীসু হুজজিয়্যাতুন বিনাফসিহী ফিল 'আকা'ঈদ ওয়াল আহকাম*, কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬/১৯৮৬।

আল্লামা আহমাদুল বান্না ঃ *বুলুগুল আমানী মিন আসরারিল ফাত্হির রাব্বানী*, দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুতঃ তা.বি.।

ইবনুল–আসীর ঃ *উসুদুল–গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৩৭৭/১৯৫৭।

ইব্‌ন তাগরী বারদী ঃ *আন্–নুজুমুয যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসরা ওয়াল কাহিরাহ্*, মিসরঃ ১৪৫১ হি.।

ইব্‌ন নাদীম ঃ *আল–ফিহরিস্ত*, সম্পাদনাঃ G. Flugel-2, ১২৮৮/১৮৭১

ইমাম আহমদ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ ঃ *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, মক্কাঃ মাকতাবা নাহ্যাতুল হাদীসাহ, ১৪০৪/১৯৮৪

আহমাদ ইব্‌ন আলী আল–খাতীব ঃ *তারীখু বাগদাদ*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খাঞ্জী, ১৪৪৯/১৯৩১

মুহাম্মদ সাইয়্যিদ আমীমুল ইহ্সান ঃ *তারীখু-ই-ইসলাম*, প্রকাশকঃ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ নু'মান,

		কালুটোলা, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃঃ।
ইব্‌ন খালদুন	ঃ	*আল ইবার*
	ঃ	*মুকাদ্দিমাহ্*, দারুল কলম, বৈরুতঃ ১৯৮১।
ইব্‌ন খাল্লিকান	ঃ	*ওয়াফায়তুল–আইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয্‌–যামান।*
ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলী আশ্‌–শীবাযী	ঃ	*তাবাকায়তুল ফুকাহা,* বাদগাদ প্রেস, ১৯৫৬/১৯৩৭
মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল–তুওয়াইজিরী	ঃ	*মুখতাসার আল ফিকহুল ইসলামী,* দিল্লীঃ মাকতাবায়ে রাশিদীয়া, তা.বি.।
ইবনুল- কাইয়্যিম	ঃ	*ইলামল-মুকি‘ঈদ আন্ রাববিল-আলামীন,* মিসরঃ মাকতা‘আতুস্-সা‘আদাহ্, ১৩৭৪/১৯৫৫
আবদুর রহমান ইবনুল আলী ইবনুল জাওযী	ঃ	*আল মুনতাযিম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম,* হায়দারাবাদঃ দাইরাতুল মা‘আরিফ, ১৩৫৭/১৯৩৮
ইয়াকুত হামাভী	ঃ	মু‘জামুল বুলদান, কায়রোঃ মাকতাবাহ খানজী, তা.বি.।
ইয়ায ইব্‌ন মুসা আন্দালুসী	ঃ	*আশ্ শিফা বিতারীকি হুকুকিল মুসতাফা,* বৈরুতঃ তা.বি.।
আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবিদুল্লাহ যিরাকসী	ঃ	*আল-কুরআন ফী উলূমিল কুরআন,* হিন্দুস্থান, ১৩০৪/১৮৮৭।
মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী	ঃ	*তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* হায়দারাবাদঃ দাইরাতুল-মা‘আরিফ, ১৩৭৬/১৯৪৬।
ড. সুবহী সালিহ	ঃ	*উলূমুল-হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু,* বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৮৪।
আবুল হাসান বালাযুরী	ঃ	*ফতূহুল বুলদান,* বৈরুতঃ দারুল মাকতাবিল হিলাল, ১৯৮৮।
ড. ইব্রাহীম মাদকুর	ঃ	*আল– মু‘জামুল ওয়াসিত,* দেওবন্দঃ হোসাইনিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।
হাফিয ইবনু হাজম	ঃ	*আল আহকাম,* কায়রোঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১০ হি.।
উবায়দুল্লাহ	ঃ	*শরহুল বেকায়া,* দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে রাহমানিয়া, তা.বি.।
মুহাম্মদ ইবন সা‘দ	ঃ	*আত্ তাবাকাতুল কুবরা,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩২৬ হি.।
মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক	ঃ	*কিতাবুল মাগাযী,* বৈরুতঃ দারুত্ তুরাছ আল–ইসলামী, ১৯৯০ খৃ.।
ড. মুহাম্মদ সালাম	ঃ	*আল ইসলাহ ওয়া তানজিমুল উসরা,* কায়রোঃ দারুল মা‘আরিফা, ১৪১৫ হি.।
আল্লামা আহমাদুল সুস্তফা আল মারাগী	ঃ	*তাফসীরে আল মারাগী,* বৈরুতঃ তা.বি।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ মানজুর কালাজী ঃ ***মা'আরিফুল হাদীস,*** কারাচী: দারুল ইশা'আত, তা.বি.।

শায়খ আহমদ মুল্লাজিউন ঃ ***তাফসীরে আল আহমদিয়া,*** বোম্বে: ভারত, ১৩২৭ হি:।

রাগিব আল–ইস্পাহানী ঃ ***আল মুফরাদাত ফী গারায়িব আল-কুরআন,*** মিসর: মুস্তাফা আল বাবী আল হালাবী, ১৩১৪ হি:।

সায়্যিদ সাবিক ঃ ***ফিকহুস সুন্নাহ,*** কায়রো: দারুল ফাত্হ লিল ইলমিল আরাবী, ১৯৯০ খৃ.।

বুরহানুদ্দীন আল মারগিনানী ঃ ***আর হিদায়া,*** অনু: আবু তাহের মিছবাহ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ ইং।

শায়খ সামারকন্দি ঃ ***তামবিহুল গাফিলিন,*** বৈরুত: দারুল কলম, তা.বি.।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

আবদুস শহীদ নাসিম ঃ ***ইসলামের পারিবারিক জীবন,*** ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০১।

মাওলানা আবদুর রহীম ঃ ***পরিবার ও পারিবারিক জীবন,*** ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০।

মো: গাউছুল আজম ঃ ***সমাজবিজ্ঞানের উপাদান,*** ঢাকা: মিলেনিয়াম প্রকাশনী, ২০১২।

জাবেদ মুহাম্মদ ঃ ***আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম,*** ঢাকা: আল-মারুফ পাবলিকেশন্স, ২০১১।

লুইস হেনরী মর্গান ঃ ***আদিম সমাজ,*** অনুবাদ: বুলবুল ওসমান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

বার্ট্রান্ড রাসেল ঃ ***পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,*** অনুবাদ: শত্যজিৎরায় গুপ্ত ও শর্মিষ্ঠা রায়, কলিকাতা: বাউল মন প্রকাশন, ১৯৯৮।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূইয়া ঃ ***আধুনিক রাষ্ট্র,*** ঢাকা: মিলেনিয়াম প্রকাশনী, তা.বি.।

ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী ঃ ***কুরআন হাদীসের আলোকে ঈদ,*** কুরবাণী, আকিকাহ, ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০০৯/১৪৩০

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ***দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,*** ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ: ২০০০।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ঃ ***মু'মিনের পারিবারিক জীবন,*** ঢাকা: আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ ***সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি,*** ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ১৯৯০।

মোঃ আমির হোসেন মিয়া ঃ ***সমাজবিজ্ঞান,*** ঢাকা: ১৯৯০।

আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ঃ ***আদর্শ পরিবার,*** রাজশাহী: আল ইসলাম কম্পিউটার, ২০০২।

শায়খ আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী ঃ ***তাযবীজে রাহমানী বা ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি,*** ঢাকা: তাওহীদ প্রেস, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

গাজী শামছুর রহমান ঃ *নারী প্রসঙ্গে বাংলাদেশে আইনের ভাষ্য,* ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভেন্সমেন্ট (আশা), ১৯৮০।

এ.বি.এম আবদুল মান্নান মিয়া ঃ *পারিবারিক জীবনে ইসলাম,* ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ১৯৯৮।

বশির উদ্দিন বিন আবদুল হামীদ আল-মাছুম ঃ *ইসলামে নাম করণের পদ্ধতি,* ঢাকা: ১৯৯০ ইং।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী ঃ *ইসলামে হালাল হারামের বিধান,* অনুবাদ মাওলানা আবদুর রহীম, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৪।

আবদেল রহীম উমরান ঃ *ইসলামী ঐহিত্য পরিবার পরিকল্পনা,* অনু: শামসুল আলম ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা আই.ই.এস, ইউনিট ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের যৌথ প্রকাশনা, ১৯৯৫।

মাওলানা আবুল হাসান আহমাদ ঃ *আল কুদুরী,* ঢাকা: এমদাদীয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

আহমদ মনসুর ঃ *বহু বিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা:),* ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেশন্স ১৯৯৫।

স্যার সৈয়দ আমীর আলী ঃ *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম,* অনু: ড. রশীদুল আলম, কলকাতা: ১৯৮৭।

গোলাম মোস্তফা ঃ *বিশ্ব নবী,* ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ আব্বাসউদ্দিন ঃ *মেহেদী পাতার রং মাখানো হাতে কোরআনের উপহার,* ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, ১৯৯৩।

হাফেজ শহীদুল্লাহ ফারুক ঃ *বিশ্বনবীর জীবনী,* ঢাকা: আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৫।

ড. ওসমান গণি ঃ *ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস,* কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬।

হামমুদাহ আবদালাতি ঃ *ইসলামের রূপরেখা,* ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট ওরগানাইজেশন, ১৪০৪ হি:।

ড. মো: তবিবুর রহমান ঃ *সোসাল সিস্টেম এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইন ইসলাম,* ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১২।

কে.এম আওরঙ্গজেব ঃ *লিপ্টি মানচিত্র, কিমোগ্রাফী এন্ড ফ্যামিলি প্লানিং,* ঢাকা: কবির পাবলিকেশন্স, ২০০৭।

আবদুল খালেক ঃ *জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও বাংলাদেশ,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮১।

ঃ *আল-কুরআন ও আমাদের সমাজ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

ঃ *নারী,* ঢাকা: দীনী পাবলিকেশন্স

	ঃ	*অর্থনৈতি ব্যবস্থায় যাকাত* , ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭ ইং।
ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন	ঃ	*আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৪।
প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক ডা: সারওয়াত জাবীন	ঃ	*কুরআন ও হাদীসের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ ও গর্ভাশয় ভাড়া খাটানো,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১১।
আবদুল হামীদ ফাইযী	ঃ	*আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ,* ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১০।
নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত	ঃ	*সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম,* ঢাকা: ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৫।
আবদুল মান্নাব তালিব	ঃ	*ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুর্ণগঠন,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪।
মো: নূরুল ইসলাম	ঃ	*বাংলাদেশের সমাজ সমস্যা,* ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০০৬।
আবু আহমদ সাইফুদ্দীন বেলাল	ঃ	*কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন,* ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, ২০১১ ইং।
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল করিম	ঃ	*ইসলামী আদর্শের মর্মকথা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৫।
নসল্লাহ খান আযীয	ঃ	*ইসলামের জীবন চিত্র,* অনু: আবদুল শহীদ নাসিম, ঢাকা: বণালী প্রকাশনী, ১৯৮৫।
মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী	ঃ	*ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার,* ঢাকা: কারায়েতা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।
মাওলানা আবদুর রহীম	ঃ	*নারী,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪।
ফাতেমা আলী	ঃ	*ইসলামে নারী,* ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।
মাওলানা আমিরুল ইসলাম ফরদাবাদী	ঃ	*নবী (সা.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা,* নারায়ণগঞ্জ: ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫।
মাওলানা এ.কে. সিরাজুল ইসলাম	ঃ	*ইসলামে নারী ও মানবাধিকার,* ঢাকা: মা প্রকাশনী, ১৯৯৪।
মাওলানা আতাউর রহমান কাশেমী	ঃ	*উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব,* ঢাকা: আজিজিয়া কুতুবখানা, ১৪১৩ হিঃ।
মুহাম্মদ জামালুদ্দীন	ঃ	*মুসলিম নারীর পোষাক ও কর্ম,* ঢাকা: এশা রাহনুমা সাইনস ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮।
মুফতী আবদুল্লাহ ফারুক	ঃ	*ইসলামে নারীর মান,* যশোর: আল ফারুক প্রকাশনী, ১৯৯৮।

মাওলানা ইসহাক ওবায়দী ঃ *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬।

মুফতী রুহুল আমিন ঃ *নারী জন্মের আনন্দ*, ঢাকা: রাহমানীয়া প্রকাশনী, ১৯৯৮।

মাওলানা মুহাম্মদ তাহের ঃ *রমণীর মান*, ঢাকা: আল-কাওসার প্রকাশনী, তা.বি.।

সাইয়েদ জালালুদ্দীন ঃ *ইসলামী সমাজে নারী*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১।

ড. মাহবুবা রহমান ঃ *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮।

মাওলানা আফলাতুন কায়সার ঃ *জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ইসলাম*, ঢাকা: কুতুবখানা এমদাদিয়া ১৯৮৩।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস ঃ *সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, ঢাকা: মুক্তমন প্রকাশনী ১৯৯৮ ইং।

ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন ঃ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ ইং।

মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মো: সাহাবউদ্দীন ঃ *ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি*, ঢাকা: পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স ১৯৯৬ ইং।

ড: কামাল সিদ্দিকী ঃ *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র: স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, তা.বি।

অধ্যাপক খুরশীদ আলম ঃ *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০ ইং।

মাওলানা সাইয়েদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী ঃ *ইসলামী সমাজে নারী*, অনু: মো: মোজাম্মেল হক, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৮ ইং।

ইমাম গাযযালী ঃ *এহইয়াও উলুমিদ্দিন*, ঢাকা: (অনু: মাওলানা ফজলুল করীম), ১৯৬৩।

মো: জাহাঙ্গীর হোসেন ঃ *মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অর্থনীতি*, অপ্রকাশিত এম, ফিল থিসিস, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ১৯৯৯ ইং

ড: তোফাজ্জল হোসেন ঃ *জনসংখ্যা বিস্ফোরন ও আগামী পৃথিবী*, ঢাকা: বইমঞ্চ, ১৩৯৫ বাংলা।

এ.কে নাজিবুল হক ঃ *মন ও মনোবিজ্ঞানী*, ঢাকা: সৃজনী প্রকাশনী ১৯৮৯ ইং।

নূর মোহাম্মদ আজমী ঃ *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ ইং।

ড: নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী ঃ *ইসলামে মালিকানার রূপরেখা*, অনু: মাওলানা সেকেন্দার মমতাজী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০।

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ঃ *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, ঢাকা: ইসলামিক

ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ ইং।

বোরহানউদ্দীন খান ঃ *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা: প্রভাতী প্রকাশনী ১৯৯৫ ইং।

সৈয়দ বদরুদ্দোজা ঃ *হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শিক্ষা ও অবদান,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৭ ইং।

এম এ মান্নান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* ঢাকা: ইসলামীক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ ইং।

ড: সায়েজুর রহমান ঃ *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন ১৯৮৭ ইং।

মাওলানা মুনতাছির আহমদ ঃ *যাকাত দর্পণ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেম ১৯৭৮ ইং।

ড: মাহমুদ আহমাদ ঃ *অর্থনৈতিক টন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা,* ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: তা. বি.।

কে এম মনিরুজ্জমান ঃ *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯ ইং।

সৈয়দ শওকাতুজ্জামান ঃ *সমাজকল্যাণ সমীফল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০ ইং।

শাহ মোহম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি কি ও কেন?* ঢাকা: ইসলামিক বুক বাইয়ার্স লি., ১৯৮৪ ইং।

মুফতী মোহাম্মদ শফী ঃ *ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা,* অনু: ফরিদউদ্দীন মাসউদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ ইং।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ইং।

ড: হাসান জামান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ ইং।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩ ইং।

সাইয়্যেদ হাসান মুসান্না নদভী ঃ *ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ ইং।

এম এ হামিদ ঃ *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ১৯৯১ ইং।

ড: কে টি হোসেন ও ড: সাদেক ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা

বোর্ড, ১৯৯৬ ইং।

এস. ই হক ঃ *মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষিত,* ঢাকা: ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩ ইং।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আ: খালেক ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স ১৯৯৫।

মাওলানা আকরম খাঁ ঃ *মোস্তফা চরিত*, ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী, ১৯৭৫ ইং।

আতিকুর রহমান ঃ স্নাতক সমাজ কল্যাণ, ঢাকা: কুরআন মহল, ১৯৯০ ইং।

মোহাম্মদ আজিজুর হক ঃ *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা,* ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ ইং।

আফজালুর রহমান ঃ *হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবনী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং।

আব্দুল মতিন ঃ *মাদকাদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন*, ঢাকা: মাদল প্রকাশনী, ১৯৯০ ইং।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঃ *মানব সম্পদ উন্নয়ন: প্রেক্ষিত ইসলাম*, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৬

সায়্যিদ সুলাইমান নদভী ঃ *সিরাতুন্নবী, আযমগড়: দায়েরাতুল মা'আরিফ*, ১৯৫১

নুর মোহাম্মদ আজমী ঃ *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ ইং।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ঢাকা: ই:ফা বা, ১৯৯১ ইং।

মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ ঃ *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ ১৪২০/১৯৯৯।

সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন উমরী ঃ *ইসলামী সমাজে নারী*, অনু: মো: মোজাম্মেল হক, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী,১৯৯১

ইসহাক ওবায়েদী ঃ *যুগে যুগে নারী,* ৪র্থ প্রকাশ, ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।

আলবাহী খাওলী ঃ *নারী: ইসলামের দৃষ্টিতে*, অনু: মো: নুরুল হুদা, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং।

মাওলানা মো: আকরাম খাঁ ঃ *মোস্তফা চরিত*, ৪র্থ সং, ঢাকা: ঝিনুক পুস্তিকা ১৯৩৫/১৯৭৫।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, ঢাকা: ১৯৮২।

পরিবার পরিকল্পনা ম্যানুয়াল ঃ *পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,* ২০০৭

ইংরেজী গ্রন্থসমূহ:

Dr. Ahmed Sharabassy, : ***Islam and family planning,*** Beirut: Vol:ii

George Peter Murdock : ***Social Structure***, New York : The Free Press,

1965

R.M. Maciver and C.H Page : ***Society : An Introduetory Analysis*** London: 1959

Alfred Meclung Lee : ***Principles of Sociology,*** New York:1965

Prof. Kingsely Davis : ***Human Society***, London: 1966

Meyer. F. Nimkoff : ***Marriage and the family***, Boston:1947

Kathryn Allen Rabuzzi : ***Family***, New York : 1986

Malinowski : ***Kinship in Ereyclopedia Britannica***, London-1974

Ernes W. Burgess and Harvey Locke : ***The Family***, New York- 1945

David and Newman : ***Sociology***, London: Pin Forge Press, 1997

Jack Nobbs : ***Sociology***, London: Macmillan Edncation Ltd. 1978

R. Brifbault : ***The Mother: A sludy of the origins of sentiments and Institutions***, London: George and Unwin Ltd. 1927

Wester Mark : ***The History of Human Marriage***, London: 1997

Ram nath shama : ***Principles of Sociology***, J.K. Publishers, West Sussex, U.K-1982

Pitiris A. Sorokin : ***Social Mobility***, London : 1920

: ***Ontenporary Sociological Theories***, London:1928

: ***Social and Cultural Dynamics*** London:1987

: ***Society, cultur and Personality*** London:1949

: ***Sociological Theory of today***, London:1961

Mirza Mohammad Hossain : ***Islam and socialism***, Lahore-1947

A.W. Green : ***Sociology, An Analysis of life in modern society, Megraw Hill.*** U.S.A 1964

Dr. Eustace : ***The Sexual, Marital and family Relationship of the English Weman*** London: 1955

Dr. Eustace : ***The Chastily Outmoded***, London: 1960

Tolcott Parsons : ***The Stability of American Family System***, London: Bell and Vogel (Ed), 1961

Barnes and Rucdi : ***The American Way of life***, New York1951

Freedman, Whelpton and Compbell : ***Family Plannig***, ***Sterility and Populalion Growth***, New York: 1969

Agrawal Kundanlal : ***Economics of Development and Lpanning***, New Delhi, Vikash Publishing House, 1993

Mr. Oslinson : ***Population Dynamics***, London-1960

Colin Clark : ***Population Growth and living Standars***, London: 1953

Raymend Pearl : ***The Biology of Population Growth***, London: 1964

Horace, Belshaw : ***Population Growth and levels of Consumption With special reference to countries in Asia***, Landon:1956

Darwin, Sir charles : ***The Pressure of population whats New?*** London : 1958

Chanda Sekhar, Dr. Sripati : ***Hungry People and Emply lands***, London :1956

Richard Meer : ***Science and Economic Development***, Massachusetts: 1956

Abu Fadl Mohsin Ebrahim : : ***Abortion, Birth control and Surrogate Parenting***: An Islamic Perspective, 1989

Alan Gray et al : Summary report on Traditional Family planning in Bangladesh in collabortion of NIPORT, ICDDR, ACP, USAID. Dhaka.

Ghysuddin Ahmed : ***Woman Rights and Family value: Islam and Mordern Perspective***, ERA Enterprise, Savar, Bangladesh

Mohammed Fazlur Rahman Ansari ***Foundation of Faith world federation of Islamic Mission***, Karachi, 1974

Muhammad Ali : ***The Religion of Islam***, The Ahamdiyat Anjuman, Lahor, Pakistan.

Professor Abdel Rahim : ***Family plannig in the legacy of Islam***. UNDP. Pvt. Ltd. 1985

Mansingh Das : ***Roles of Women in Muslim countries***, New Dilhi : Md. Publications Pvt. Ltd. 1985

Arther Zefri : ***The family in Islam***, New York, Harfar and Row, 1959

Muhammad Shabbir Khan : ***Status of Women in Islam***, New Delhi: A.P.H Publishing Corporation, 1996

Zakia A siddiquee and Anwar Jahan Jaberi : ***Muslim Women***, New Dilhi: M.D. Publications 1993

Nazhal Afza and Khurshid Ahmed : ***The Position of women in Islam***, Kuwait: Islamic book Publisher 1982

Report of the commission Marriage : ***Divorce and the church***, London:1971

Maulana Mohammad Ali : ***The Religion of Islam***, Lahore: The Ahmadiyyah Anjuaman Isha, at Islam, 1950

থিসিস

ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন : *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ : *ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ও কর্ম,* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মাহবুবা রহমান : *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে নারী,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মো: শফিকুল ইসলাম : *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান,* ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব : *আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এফ.এম.এ. এইচ তাকী : *বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ (সা:)-এর রচিত উপাদানের ঐতিহাসিকতা,* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্র পত্রিকা

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা

দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

মাসিক মদীনা, ঢাকা

মাসিক পৃথিবী, ঢাকা

বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা

বাংলাদেশ টাইমস, ঢাকা: ১৯ মে, ১৯৭৬ ইং

Dhaka University Journal of Business stadies (Dec-1997) P.N. 101